ট্যাভারনিয়ারের দেখা ভারত

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ❋ ❋ ১৯৮৪

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, কলিকাতা

মুদ্রক :
কিঙ্করকুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

ফার্মা কেএলএম-এর প্রয়াত কর্ণধার

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়-এর প্রতি

শ্রদ্ধার্ঘ রূপে

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

ট্যাভারনিয়ার ও তার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

আলো ও আঁধারে রাঙা পৃথিবীর বুকে প্রথম কবে শিশু চোখ মেললেন জঁা-বাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার তার সঠিক দিনক্ষণ জানা না থাকলেও বছরটি ছিল খ্রীষ্টাব্দের ১৬০৫। স্থান—ফ্রান্সের রাজধানী নগরী প্যারিস। পিতা গ্যাব্রিয়েল ছিলেন রোমের পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী বা প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান ধর্মানুগামী। ধর্মান্ধদের জানোয়ার ধর্মিতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ১৫৭৫-এ দুই ভাইসহ বেলজিয়ামের অ্যান্তওয়ের্প ছেড়ে ঠাঁই নিয়েছিলেন প্যারিসে। মূলতঃ ছিলেন বোধহয় তারা ফ্রান্সের বাসিন্দা। গ্যাব্রিয়েল একজন ভূগোলবিদ হলেও পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন খুব সম্ভব বণিগ্‌ বৃত্তিকেই। তার পুত্রসন্তানদের মধ্যে ট্যাভারনিয়ার ছিলেন বোধহয় দ্বিতীয়। বড় ভাই মেলশিওর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন একজন বিশিষ্ট মানচিত্রকর হিসাবে। এক কাকা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন খোদাইকর ও চিত্রকর হিসাবে। তার নামও মেলশিওর।

ভূগোল তথা প্রকৃতি অনুরাগী পরিবারে জন্মে, দেশ বিদেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক নানা বৈচিত্র্যের কাহিনী ও আলোচনা শুনে শুনে দেখা দিয়েছিল কিশোর ট্যাভারনিয়ারের মনে নিজ চোখে তা দেখার ও জানার, দেশ ভ্রমণের, অদম্য তৃষা। তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে "জীবনের প্রথম শিক্ষাপর্বকে যদি দ্বিতীয় জন্মপর্ব রূপে গণ্য করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে তা-ই, তাহলে বলা যেতে পারে, এ পৃথিবীতে এসেছিলাম আমি ভ্রমণের তৃষা নিয়েই। ভূ-বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিদিন আমার বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হত বহু বিদ্বান ব্যক্তির। এ বিষয়টির ওপর ভাল দখল থাকার জন্য নাম কিনেছিলেন তিনি। সেই কিশোর বেলায় আমিও তা শুনতাম মোহাবিষ্ট হয়ে। মানচিত্রের মাধ্যমে যে কটি দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটান হয়েছিল সেগুলির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন মনের আশ মিটত না আমার। সেই বয়সেই অধৈর্য হয়ে উঠলাম তার মধ্যে কতক দেশকে নিজ চোখে দেখার জন্যে।"

"বাইশ বছর পুরো হবার মধ্যে দেখা হয়ে গেল আমার ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জর্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও ইতালী সহ ইওরোপের সেরা

ভূভাগ। ভালভাবেই বলতে শিখে গেলাম সব থেকে দরকারী ও সর্বাধিক প্রচলিত (ইওরোপীয়) ভাষাগুলিও।"

তার এই ইওরোপ ভ্রমণ পর্ব শুরু হয়েছিল ১৫ বছর বয়স থেকে। যখন পোল্যাণ্ড দর্শনে যান তখন তার বয়স অন্ততঃ পঁচিশ। তবে, ওপরের বর্ণনা থেকে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে তার আগেই সেখানে এক সংক্ষেপ ভ্রমণ সেরে এসেছিলেন তিনি। এই ভ্রাম্যমান জীবনপর্ব মধ্যেই আয়ত্ত করেছিলেন তিনি সমর বিদ্যা। গড়ে উঠেছিল ইওরোপের বহু উচ্চ অভিজাতর সঙ্গে যোগাযোগ। তার বহু ভাষাজ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তাকে এদিকে।

১৬৩০ পর্যন্ত তার সব ভ্রমণই ছিল ইওরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওই বছরের শেষদিকে বা ১৬৩১-এর শুরুতে ইওরোপের সীমানা অতিক্রম ক'রে পা রাখলেন তিনি এশিয়ার বুকে। তুরস্ক, পারস্য আর ভারত দর্শনের স্বপ্ন নিয়ে। এই প্রথম এশিয়া-পথিক পর্বে পূর্ণ হল না তার ভারত দেখার সাধ। তুষ্ট থাকতে হল তুরস্ক আর পারস্য পরিক্রমা ক'রেই। পারস্য দেখে অলেপ্পো হয়ে ফিরে গেলেন তিনি ইওরোপে। আলেকজান্দ্রেত্তা ও সেখান থেকে মাল্টা হয়ে পা রাখলেন ইতালীতে ১৬৩৩-এর কোন এক সময়ে। সঙ্গে তার কতক পারসিক ট্যারকোয়াজ বা আসমানী রঙা রত্ন পাথর।

পরবর্তী পাঁচ বছরকার তার জীবন ইতিবৃত্ত প্রায় অজানা আমাদের।

১৬৩৮-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর হলেন তিনি দ্বিতীয়বার এশিয়া-পথিক। সঙ্গে জনাকয়েক অনুগামী। আছেন তার মধ্যে একজন শিল্পী, একজন শল্যবিদ এবং অনুজ দানিয়েল। এবার তিনি শুধু দর্শন অভিলাষী নন, পুরা দস্তুর বাণিজ্য অভিসারীও। সসম্মানে ভ্রমণ এবং জাগতিক প্রাচুর্য অর্জন—এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্য থেকেই এ জীবন-বৃত্তি তিনি বেছে নিয়েছিলেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। মার্সেই বন্দর থেকে জাহাজে চেপে এলেন আলেকজান্দ্রেত্তায়। তারপর সেখান থেকে অলেপ্পো। ছয় সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে ২৭শে ডিসেম্বর এক বাণিজ্য যাত্রীদলের সঙ্গে রওনা হলেন পূবে। মসহদ, বসরা, শীরাজ পার হয়ে ১৬৩৯-এর এপ্রিল শেষে বা মে-র শুরুতে হাজির হলেন ইস্পাহানে। দেখা করলেন পারস্যের শাহের সাথে। বাণিজ্য এবং ভ্রমণ দুয়ে মশগুল থেকে হলেন এক সময়ে ভারত-পথিক। তার জীবনীকার মঁসিয়ে জোরেট-এর অনুমিতি অনুসারে ১৬৩৯-এর শেষ নাগাদ যাত্রা শুরু করেন তিনি ইস্পাহান থেকে। ১৬৪০-এ প্রথমে পদার্পণ করেন ঢাকায়। এবং ১৬৪০-৪১-এর

[এগারো]

শীতকাল অতিবাহিত করেন আগ্রায়। এ সময়ে জলপথ কিংবা স্থলপথ ধরে ভারতে এসেছিলেন তিনি, নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না তা। এই গ্রন্থ মধ্যে দেয়া তার নিজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৬৪১-এ আগ্রা থেকে সুরাট যাবার পথে এসেছিলেন তিনি বুরহানপুরে। এছাড়া, ওই বছরেরই শেষ নাগাদ উপস্থিত হন তিনি গোয়াতেও। এই ভ্রমণকালে আগ্রায় শান্তির পরিবেশ মধ্যে রাজত্ব ক'রে চলতে দেখেন তিনি শাহ-জহানকে। গোয়া থেকে যান তিনি গোলকুণ্ডায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে বিশদ খোঁজখবর নেন হীরা খনিগুলি সম্পর্কে। হয়ত গিয়েছিলেনও হীরা খনিগুলিতে। তারপর স্থলপথ ধরে ১৬৪২-এর বসন্তকালে ফিরে আসেন সুরাট। যান সেখান থেকে আহমদাবাদ। ১৬৪২-এর শেষ বা ১৬৪৩-এর শুরুতে উপস্থিত হন জাহাজ চেপে পারস্যের বন্দর আব্বাস-এ।

১৬৪৩-এর ৬ই ডিসেম্বর প্যারিস থেকে তৃতীয়বার এশিয়া-পথিক হলেন ট্যাভারনিয়ার। ইতিমধ্যে কখন কোন পথ ধরে জন্মভূমিতে ফিরে গেছেন তা আমাদের অজানা। আগের বারের মতো একই পথ ধরে উপস্থিত হলেন আলেকজান্দ্রেত্তা। এলেন তারপর অলেপ্পো-য়। ১৬৪৪-এর ১৬ই মার্চ যাত্রা করলেন সেখান থেকে দুই কপুচিন পাদ্রীর সাথে। ইস্পাহানে পা রাখলেন ওরা মে। খুব সম্ভব বন্দর আব্বাস হয়ে ১৬৪৫-এর জানুয়ারীতে হাজির হলেন সুরাট। ১৯শে জানুয়ারী যাত্রা করলেন দৌলতাবাদ ও নান্দের হয়ে গোলকুণ্ডা। গেলেন সেখানকার হীরাখনিগুলিতে। প্রথমে রাওলকুণ্ডা বা রমলকোটের খনি এলাকায়, তারপর গোলকুণ্ডা ফিরে সেখান থেকে কানই কল্লুর খনি এলাকায়। যান তিনি বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে বিরাজিত কোয়েল নদী বা সোমেলপুর খনি অঞ্চলেও। তবে, এই সময়ে অথবা পরবর্তী কোন পর্বে তা জানা যায় না সঠিক। ১৬৪৭-এ ভারত দর্শনে সাময়িকভাবে দাঁড়ি টেনে ফিরে গেলেন তিনি পারস্যে (প্রথম পর্ব, ৮ম পরিচ্ছেদ)। খুব সম্ভব ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। ১৬৪৮-এর শুরুতে ফিরে এলেন আবার। ১১ই জানুয়ারী দর্শন মেলে তার ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ মিনগ্রেলা বা ভেনগুরলায়। সুরাট থেকে ময়েসট্রিখট নামের একটি জলযানে চেপে এসেছিলেন সেখানে তিনি। গেলেন সেখান থেকে গোয়ায়। ১৬৪১ এ একবার গোয়া ঘুরে যান তিনি। ইতিমধ্যে সেখানে যে অর্থনৈতিক ধস দেখা দিয়েছে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি তা দেখে। ১১ই মার্চ ফিরে এলেন ভেনগুরলায়। যাত্রা করলেন সেখান থেকে এপ্রিলের ১৪ তারিখে জাহাজে চেপে বাটাভিয়ায় (আধুনিক জাকার্তা, জাভা)। এই ভ্রমণের

একাধিক উদ্দেশ্য মধ্যে একটি ছিল অনুজ দানিয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বাটাভিয়া থাকাকালে দু ছুটি নিকট ভ্রমণ যাত্রায় বেরিয়ে বস্তম গেলেন ট্যাভারনিয়ার। সেখানকার রাজার সঙ্গে অনুজ দানিয়েলের গড়ে উঠেছিল গভীর হৃদ্যতা। অতএব ট্যাভারনিয়ারকেও গভীর সমাদর দেখালেন রাজা। বস্তম থেকে দ্বিতীয়বার ফিরে যখন সুমাত্রায় যাবার উদ্যোগ করছেন এমন সময়ে নিদারুণ রোগাক্রান্ত অবস্থায় বস্তম থেকে হাজির হলেন অনুজ দানিয়েল। শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না ট্যাভারনিয়ার।

এ ঘটনার পর বাটাভিয়া থেকে জাহাজে চেপে ফিরে গেলেন ট্যাভারনিয়ার হল্যাণ্ড। এবং সেখান থেকে ফ্রান্স। প্যারিসে পা রাখেন সম্ভবতঃ ১৬৪৯-এর বসন্তকালে।

ভারত থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাওয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় এবং বাটাভিয়া থাকাকালে কতক ডাচ কর্মচারীর পে-বিল কেনার সূত্রে হল্যাণ্ডের ডাচ কোম্পানী থেকে তার প্রাপ্য আদায় করার জন্য দু বছরের মতো এরপর ইওরোপেই কাটালেন ট্যাভারনিয়ার। পরে, ১৬৫১-র ১৮ই জুন প্যারিস থেকে আবার যাত্রা করলেন পূবের পথে। হলেন চতুর্থ বারের জন্য এসিয়া-পথিক। অলেপ্পোয় উপস্থিত হলেন ৭ই অক্টোবর। কিন্তু দেশ জুড়ে গোলযোগ দেখা দেয়ার দরুন সেখান থেকে যাত্রা শুরু করা আর সম্ভব হল না সে-বছর। রুদ্ধশ্বাস ঘটনা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পারস্য অতিক্রম ক'রে উপস্থিত হলেন পর বছর শেষ পর্যন্ত সাগর উপকূলের বন্দর আব্বাসে। গোলকুণ্ডার রাজার একটি জাহাজে চেপে ১৬৫২-র ১১ই মে হলেন তিনি তৃতীয় বারের জন্য ভারত-পথিক। নামলেন মসুলিপত্তম। দিনটি ২রা জুলাই গেলেন মাদ্রাজ। তারপর গণ্ডিকোট, গোলকুণ্ডার রাজার প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। পয়লা সেপ্টেম্বর পৌঁছলেন সেখানে। গোলকুণ্ডার রাজার হয়ে সবে গণ্ডিকোট দখল করেছেন মীর জুমলা। এ সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্য রাজার কাছে কতক মুক্তা বেচা। মীর জুমলার সাথে এ সময়কার সাক্ষাতকারগুলি তার কার্যক্ষমতা সম্পর্কে অতি উঁচু ধারণা সৃষ্টি করে ট্যাভারনিয়ারের মনে। তার কাছে আশ্বাস পেয়ে পনের তারিখে গোলকুণ্ডামুখি হলেন তিনি। কিন্তু ট্যাভারনিয়ারের নিজের অসহিষ্ণুতার জন্যই মাঝপথে ভেস্তে গেল রত্ন বিক্রীর সুযোগ। সাথী ম'সিয়ে দু জর্ডিনকে নিয়ে অবিলম্বে রওনা হলেন তিনি সুরাটের দিকে। ১৬৪৩-এ যে-পথ ধরে গোলকুণ্ডা এসেছিলেন সে-পথ ধরেই।

[তেরো]

নভেম্বরের ৫ বা ১৫ তারিখ পৌঁছে গেলেন সুরাট। তার অল্প কয়েকদিন পরেই মারা গেলেন জডিন। তার শেষকৃত্য সমাধা ক'রে রওনা হলেন ট্যাভারনিয়ার আহমদাবাদ। গুজরাটের মুঘল শাসনকর্তা শায়েস্তা খানের আমন্ত্রণ পেয়ে তার কাছে রত্নাদি বেচার জন্য। লেনদেন সাঙ্গ হবার পর ফিরে এলেন আবার সুরাট। ৬ই মার্চ ঔরঙ্গাবাদের পথ ধরে রওনা হলেন সেখান থেকে গোলকুণ্ডা। এবং গোলকুণ্ডা থেকে হীরা খনিগুলিতে। ৬৫৩-তে ফিরলেন সুরাট। এসে জানতে পেলেন, জাহাজ ধরে পারস্য ফিরে যাবার পথ বন্ধ। যুদ্ধ বেধেছে ইংরাজ ও ডাচদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ১৬৫৪-র ৮ই জানুয়ারী পাঁচখানি ডাচ রণতরীর এক বহরের একটিতে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিলেন তিনি ডাচদের সঙ্গে হৃদ্যতার সুযোগে। হরমুজ থেকে আগত একটি ইংরাজ পণ্যবাহী জাহাজ বহরকে আটক করার জন্য পাঠান হয়েছিল এ ডাচ বহরটিকে। এই সংঘর্ষে জোর মার খেল ইংরেজরা। নানা কারণে পথে অনেক বিলম্বের পর ৭ই মার্চ ভিড়ল ডাচ রণতরী বহর আব্বাস বন্দরে। ইস্পাহান রওনা হলেন সেখান থেকে ট্যাভারনিয়ার। পথে দর্শন অভিলাষ নিয়ে উপস্থিত হলেন কেরমান। কিনলেন সেখান থেকে ফ্রান্সে রপ্তানি করার জন্য বিপুল পরিমাণে সেখানকার প্রসিদ্ধ সরেস জাতের পশম। দেশে ফেরার সুযোগ না থাকায় তারপর ঘুরে ঘুরে দেখে চললেন পারস্যের আগে না দেখা বিভিন্ন অঞ্চল। প্যারিসে ফিরলেন সম্ভবতঃ ১৬৫৫-র শরৎকালে।

১৬৫৭র ফেব্রুয়ারীতে পঞ্চমবার পূব-পথিক হলেন ট্যাভারনিয়ার। মার্সেই বন্দর ত্যাগ করার অল্পকাল পরেই জলদস্যুরা পিছু ধাওয়া করল জাহাজটির। বাধ্য হল সেটি তউলনের কাছে একটি বন্দরে আশ্রয় নিতে। সঙ্গে নিয়ে চলা বস্তু সম্ভার সহ স্থলপথে ফিরে এলেন তিনি দেশে। অন্যান্য ভারি পণ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে চলল সেই জাহাজটিই। মার্সেই থেকে চাপলেন আবার ইতালীগামী একটি ইংরাজ জাহাজে। তুসকানীর দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাতকারের পর একটি ডাচ জাহাজে চেপে এলেন তুরস্কের স্মারনা বন্দরে। ইরিভান ও তাবরিজ হয়ে পৌঁছলেন ইস্পাহানে। সেখানে খবর পেলেন, মুঘল সিংহাসনের অধিকার নিয়ে শাহ-জহানের পুত্রদের মধ্যে বিবাদের দরুন জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে ভারতে। ভারতে আসার বাসনা গুটিয়ে রাখলেন তাই কিছু দিনের জন্যে। তারপর নিজে সুরাট যাত্রার পূর্বে লিখলেন শায়েস্তা খানের কাছে এক পত্র। শায়েস্তা খানের জন্য ইওরোপ থেকে সংগ্রহ করা দুর্লভ সামগ্রীগুলি,

অধিকাংশ এক বিশ্বস্ত লোক মারফত আগেভাগে পাঠিয়ে দিলেন মসুলিপত্তম। পত্রের উত্তরে শায়েস্তা খান প্রথমে তাকে লিখলেন জহানাবাদ আসার জন্য। যাতে নিরাপদে ও বিনা বাধায় মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন পাঠালেন সেজন্য এক উদার ছাড়পত্র। বর্ষার জন্য সুরাটে আটকে গেলেন ট্যাভারনিয়ার। ইতিমধ্যে এল শায়েস্তা খানের কাছ থেকে আরো দুখানি পত্র। প্রথমটিতে লিখলেন তাকে বুরহানপুরে এসে দেখা করার জন্য। দ্বিতীয়টিতে নির্দেশ পাঠালেন ঔরঙ্গাবাদ আসতে। সুরাটের শাসনকর্তা মীর্জা অরবের কাছে যখন বিদায় নিতে গেলেন তিনি জানালেন ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো হয়েছে তার এদেশে আসার সংবাদ। তাই, যতদিন পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোন নির্দেশ না আসছে ততদিন যেন সুরাট ত্যাগ না করেন তিনি। পরিস্থিতি জানিয়ে তখন শায়েস্তা খানের কাছে পত্র দিলেন ট্যাভারনিয়ার। শাসনকর্তা যাতে তাকে সুরাট ছাড়ার অনুমতি দেন সেজন্য প্রার্থনা করলেন তার হস্তক্ষেপ। শায়েস্তা খান সেইমতো নির্দেশ পাঠালেন শাসনকর্তার কাছে। ছ মাস সুরাটে এভাবে আটকে থাকার পর শায়েস্তা খানের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাত্রা করলেন ট্যাভারনিয়ার। শায়েস্তা খান তখন অবরোধ ক'রে রয়েছেন দাক্ষিণাত্যের চাকন (চৌপর)। সেখানে হাজির হয়ে শায়েস্তা খানের সঙ্গে লেন-দেন চুকে যাবার পর যাত্রা করলেন তিনি দক্ষিণে গোলকুণ্ডার হীরাখনি অঞ্চলে। ১৬৬০-এর শেষ বা ১৬৬১-র প্রথম নাগাদ ফিরে এলেন সুরাট। সেখান থেকে তারপর পারস্য। এবং পারস্য থেকে ১৬৬২-র কোন এক সময়ে জন্মভূমি প্যারিসে।

ইতিমধ্যে রথ দেখা ও কলা বেচার নীতি অনুসরণ ক'রে অর্জন করেছেন তিনি প্রভূত সম্পদ। পার হয়েছেন ৫৬টি বসন্ত। পনের থেকে ছাপান্ন—এই দীর্ঘ ৪১ বছরের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন দেশে দেশে দিশে দিশে। দেখা দিল স্বভাবতঃই এবার তার মনে থিতু হবার বাসনা। করলেন তাই এতকাল পর বিয়ে। এক বড় ব্যবসায়ীর কন্যাকে। নাম মডেলিন।

থিতু হবার বাসনা সত্ত্বেও ষষ্ঠ বারের জন্য আবার পুবের পথিক হতে হল ট্যাভারনিয়ারকে। শেষবারের মতো বেশ কিছু অর্থ উপার্জন এবং যেখানে যা দেনা পাওনা রয়েছে তার নিষ্পত্তি ক'রে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার জন্যই এবারকার যাত্রা তার। সঙ্গে নিলেন চার লক্ষ লিভর (তিন লিভর=দুই রূপিয়া) মূল্যের বহু সম্ভার। সাথী হিসাবে নির্বাচন করলেন এক তরুণ ভাইপোকে। মরিস ট্যাভারনিয়ারের ছেলে তিনি। এছাড়াও একজন শল্যবিদ এবং আরো তিনজন বিশিষ্ট অনুগামী।

[পনেরো]

১৬৬৩-র ২৭শে নভেম্বর প্যারিস ছাড়লেন সদলবলে। ১৬৬৪র ১০ই জানুয়ারী জাহাজে চাপলেন লেগহর্ণ যাবার লক্ষ্য নিয়ে মার্সেই বন্দর থেকে। বহু দুর্ঘটনার মধ্য-দিয়ে অল্পের জন্য মরণ এড়িয়ে পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত স্মারনায়। ২৫শে এপ্রিল থেকে ৯ই জুন পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে বণিক যাত্রীদলের সঙ্গে রওনা হলেন তাবরিজ। তিনমাস একটানা পথ চলার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর হাজির হলেন সদলবলে ইরিভান। তাবরিজ পৌঁছলেন ৯ই নভেম্বর। যাত্রার ধকল সইতে না পেরে এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তার দুই অনুগামী। একজন ঘড়ি নির্মাতা, অন্যজন স্বর্ণকার। মারা গেলেন দুজনেই। বাধ্য হলেন ভাইপো পীর়ী-কেও এখানে কপুচিন আশ্রম-প্রধানের কাছে রেখে যেতে। ১৪ই ডিসেম্বর উপস্থিত হলেন ইস্পাহানে। তিনদিন পর সাক্ষাৎ করলেন পারস্যের শাহ দ্বিতীয় আব্বাসের সাথে। বেচলেন তার কাছে সঙ্গে নিয়ে আসা মুক্তাগুলি ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় রত্ন ও দুর্লভ সামগ্রী। এবং বেশ চড়া দামেই। আদায় করলেন বিনা শুল্কে পারস্যে অন্যান্য সামগ্রী বেচার সুযোগ। গ্রহণ করলেন শাহ তার ভাইপোর দায়িত্বও। দিলেন নিজের তৈরী করা নক্সা মতো কতক রত্নালঙ্কারেরও বরাত।

১৬৬৫-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চম বা শেষবারের মতো ভারত-পথিক হলেন তিনি ইস্পাহান থেকে। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পৌঁছলেন বন্দর আব্বাসে। জাহাজে চেপে ৫ই মে নাগাদ পা রাখলেন সুরাট বন্দরে। এ সময়ে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি সুরাটের ইংরাজ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি চিঠি দেন তার কাছে। বোধহয় ইওরোপে যুদ্ধ নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে এতে এই সন্দেহ থেকে ডাচরা সুকৌশলে চুরি করল সে চিঠিখানি। রাখল তার বদলে সাদা কাগজ ভরাট অনুরূপ একটি খাম। অতীতে বাটাভিয়ায় তার প্রতি করা ডাচ ব্যবহার এবং বর্তমান ঘটনাটি ডাচদের প্রতি ঘোর বিরূপ ক'রে তুলল তার মন। অন্যদিকে ইংরাজরাও হয়ে উঠল তার প্রতি ঘোর সন্দেহ পরায়ণ, দিল এমনকি হত্যার হুমকি পর্যন্ত। 'ফলে, ভারত ভ্রমণের যা কিছু পূর্ব-পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল তার। ডাচ আচরণের জন্য কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দিলেন তিনি বাটাভিয়ায়, ভারতীয় অঞ্চলের ডাচ প্রধানের কাছে। হুমকি দিলেন, যদি সন্তোষজনক পদক্ষেপ না নেয়া হয় তবে ফ্রান্সে ফিরে যাবার পর এ নিয়ে তোলপাড় করবেন তিনি, অভিযোগ পেশ করবেন পারস্যের শাহের কাছেও। কিন্তু ডাচদের পক্ষ থেকে তার ক্ষোভ দূর করার কোন গরজ দেখা'ন

হয়েছিল বলে মনে হয় না। আর এটিই সম্ভবতঃ তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল The History of the Conduct of the Dutch in Asia বইটি লিখতে।

অন্যদিকে, ট্যাভারনিয়ার স্বরাটে পা দিতেই সেখানকার শাসনকর্তা ধরিয়ে দিলেন তার হাতে একখানি ফরমান। তার সঙ্গে নিয়ে আসা যা কিছু রত্ন ও দুর্লভ সামগ্রী সবার আগে দেখাতে হবে সম্রাট ঔরঙজেবকে। তিনি কেনা-কাটার পর যা থাকবে তা-ই শুধু বিক্রী করতে পারবেন অন্যত্র। কেনাকাটায় এই অগ্রাধিকার বিধি সম্প্রতি চালু করেছেন ঔরঙ্গজেব। সুতরাং ভারতে এলে সবার আগে শায়েস্তা খানের কাছে যাবেন—এ প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা এবার আর সম্ভব হল না ট্যাভারনিয়ারের পক্ষে। তাছাড়া, শায়েস্তা খানও তখন সুদূর পূবে, বাঙলায়। অতএব জহানাবাদ বা দিল্লীর দিকেই রওনা হলেন ট্যাভারনিয়ার। গেলেন সম্ভবতঃ বুরহানপুর, সিরোঞ্জ, গোয়ালিয়র ও আগ্রা হয়ে। সেপ্টেম্বর মাসের বার তারিখ পেলেন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। বেচলেন তার কাছে কতক অতি মূল্যবান রত্ন-সামগ্রী। সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী ও মামা, শায়েস্তা খানের বড ভাই জাফর খানও কিনলেন কতক সামগ্রী। কিন্তু তার সাথে মন কষাকষি দেখা দিল একটি বড মুক্তাকে কেন্দ্র ক'রে। এটির জন্য যে দাম ট্যাভারনিয়ার চাইলেন প্রথমে তা দিয়ে কিনে নিয়েও, পরে সম্ভবতঃ রাজকীয় রত্ন যাচাইকারদের প্ররোচনায় দিতে চাইলেন দশ হাজার টাকা কম। তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে বেচলেন সেটিকে শেষ পর্যন্ত ট্যাভারনিয়ার ঢাকায় শায়েস্তা খানের কাছে। কিন্তু টাকা দেয়ার বেলা দেখা দিল তার সাথেও এটির দাম নিয়ে বিরোধ। শেষ অবধি সেই দশ হাজার টাকা কম নিয়েই তুষ্ট থাকতে হল তাকে।

দু মাস জহানাবাদে কাটান এ সময়ে ট্যাভারনিয়ার। ঔরঙজেবের আগ্রহে সুযোগ জুটে যায় তার সম্রাটের দুর্লভ রত্নরাজি প্রত্যক্ষ করার। আর, পেয়ে যান সেই অবসরে সম্রাটের জন্ম উৎসব ও সেই উপলক্ষে ওজন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সুযোগও।

জন্ম-উৎসব শেষ হল ৯ই নভেম্বর। পরদিন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি সম্রাটের রত্নরাজি। এরপর গেলেন আগ্রায়। সেখান থেকে ২৫শে নভেম্বর যাত্রা করলেন শায়েস্তা খানের সাথে দেখা করার জন্য বাঙলায়। সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক বার্নিয়ার এবং রচেপট নামের আরেকজন সাথী। এলাহাবাদ ও বনারস হয়ে পৌঁছলেন পাটনায়। পাটনা তখন বাঙলা সুবার প্রধান বাণিজ্য

কেন্দ্র। আট দিন সেখানে কাটিয়ে ২২শে ডিসেম্বর তরী ভাসালেন গঙ্গার বুকে। ১৬৬৬-র ৪ঠা জানুয়ারী উপস্থিত হলেন একদা রাজধানী শহর রাজমহলে। ৬ই এপ্রিল মঁসিয়ে বার্নিয়ার তার সঙ্গ ছেড়ে যাত্রা করলেন কাশিমবাজার। ট্যাভারনিয়ার এগিয়ে চললেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। ১৩ তারিখ পৌঁছলেন সেখানে। দেখা করলেন পরদিন নবাব শায়েস্তা খানের সঙ্গে। তার কাছে রত্নাদি বেচে কাশিমবাজারের ওপর হুণ্ডি নিয়ে ২৯ তারিখ যাত্রা করলেন সেখানে। নৌ পথে-ই। পৌঁছলেন ১২ই ফেব্রুয়ারী। ঠাঁই নিলেন সেখানকার ডাচ কুঠিতেই। মুঘল কোষাধ্যক্ষের কাছে হুণ্ডি উপস্থিত করলে অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন তিনি। বললেন, তিনদিন হল শায়েস্তা খানের কাছ থেকে আদেশ এসেছে অর্থ না দেয়ার জন্য। পরে অবশ্য শায়েস্তা খান আদেশ দিলেন কুড়ি হাজার কেটে রেখে বাকী টাকা দিয়ে দিতে। এবং শেষ অবধি ট্যাভারনিয়ারকে তুষ্ট থাকতে হল দশ হাজার টাকা কম নিয়ে।

টাকা আদায় চুকে যাবার পর ফিরে এলেন ট্যাভারনিয়ার পাটনায়। জুন, জুলাই কাটালেন সেখানেই। ২রা জুলাই সুযোগ হল তার গ্রহণ ও তদুপলক্ষে স্নান ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার। সম্ভবতঃ অগাষ্ট মাসে আগ্রায় ফিরে আসেন তিনি। সেখানে ফরাসী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয় পারস্য ও ভারতে একটি কুশলী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা নিয়ে। সুরাটে ফিরে আসেন ১লা নভেম্বর। দেখা হয় সেখানে পর্যটক মঁসিয়ে থিভেনটের সাথে। মাদ্রাজ ও গোলকুণ্ডা পর্যটন সেরে সুরাটে এসেছেন তিনি। ১৬৬৭-র প্রথম দিকে, সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, বন্দর আব্বাসগামী জাহাজে চেপে সুরাট তথা ভারত ত্যাগ করেন ট্যাভারনিয়ার। সেখানে পৌঁছে মোলাকাত ঘটে অন্যান্য ইওরোপীয় ছাড়াও প্রসিদ্ধ পর্যটক চার্ডিনের সঙ্গে। মাস কয়েক ইস্পাহান কাটিয়ে যাত্রা করলেন পশ্চিমমুখি। ১৬৬৮-র প্রথম দিকে পা রাখলেন কনস্তান্তিনোপল-এ। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে হলেন স্বদেশ অভিমুখি। প্যারিসে ফিরলেন ৬ই ডিসেম্বর। তার নিজের কথায় 'চল্লিশ বছর কাল মধ্যে ঘুরেছি আমি ৬০,০০০ লীগেরও বেশি। এর মধ্যে মাত্র একবারই এসিয়া থেকে ইওরোপ ফিরেছি আমি জলপথ ধরে। ছটি ভ্রমণ পর্ব মধ্যে বিভিন্ন সড়ক পথ ধরে অবসর মতো ঘুরে ঘুরে দেখেছি সমগ্র তুর্কী, পুরো পারস্য, সারা ভারতবর্ষ, এবং বিশেষ ক'রে বিখ্যাত হীরা খনি অঞ্চল, যেখানে আমার আগে কোন ইওরোপীয়-ই যায়নি আর।' (শেষের মন্তব্যটি অবশ্য সঠিক নয়। তার

আগে ১৫৭০-এ ফ্রেডেরিক, ১৬২২-এ মেথল্ড, এবং আরো কতক ভ্রমণ করেন খনি এলাকা)।

স্বদেশে ফেরার পরে পরে এরূপ বিখ্যাত একজন পর্যটককে দেখার আগ্রহ নিয়ে রাজা চতুর্দশ লুই আমন্ত্রণ জানালেন তাকে দরবারে। এই সুযোগে তার সাথে বেশ কিছু পরিমাণ ব্যবসাও ক'রে নিলেন ট্যাভারনিয়ার। বেচলেন তার কাছে কয়েকটি বড় হীরা ও কতক অন্যান্য দামী রত্ন পাথর। কৃতিত্ব ও মাতৃ-ভূমি সেবার স্বীকৃতি হিসাবে জানানো হল তাকে সম্মান ও সংবর্ধনা, উন্নীত করা হল অভিজাতর সোপানে। ১৬৭০ এপ্রিলে কিনলেন তিনি জেনেভার কাছে ঔবনী (Aubonne)-র জমিদারী। সেখানকার দুর্গটিকে সংস্কার ক'রে সাজিয়ে নিলেন প্রাচ্য রীতিতে। এখানে বসেই তৈরী করেন তিনি তার ভ্রমণ বিবরণীর পাণ্ডুলিপি। ছ ছটি সুদীর্ঘ ভ্রমণের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা লিপির এলোমেলো বিরাট স্তূপকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশযোগ্য রূপ দেয়া ছিল না মোটেই সহজসাধ্য কাজ। বিশেষতঃ তিনি নিজে যেখানে লেখক বা ঐতিহাসিক নন, একজন ব্যবসায়ী, সাহিত্য বা ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি ভাল বোঝেন টাকা-তুমান-ডুকাটের হিসাব। পাণ্ডুলিপি সংকলন ও সম্পাদনায় আংশিকভাবে সাহায্য করেন তাকে **Samuel Cnappuzeau** এবং আংশিকভাবে খুব সম্ভবত **Danlier des Landes**। দুজনেই ছিলেন লেখক। প্রথম জন ছিলেন আবার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-বিদও। দ্বিতীয় জন ছটি ভ্রমণ পর্বের একটিতে সঙ্গী হয়েছিলেন ট্যাভার-নিয়ারের। কিন্তু এই অভিজ্ঞ সাহায্যকারীরা তার বিবরণের সম্পাদনায় তাকে নিষ্ঠভাবে সাহায্য করেছিলেন বলে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় না। থেকে গেছে বিবরণ মধ্যে বহু কিছু অসঙ্গতি, বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী তথ্য ও বক্তব্য। এ সত্ত্বেও তার বিবরণ নিঃসন্দেহে এক বিপুল তথ্যের খনি।

এসিয়ার কোন ভাষাই জানতেন না ট্যাভারনিয়ার। সর্বত্রই কাজ চালিয়েছেন তিনি দোভাষীর মাধ্যমে। আবার কতক তথ্য অপরের মাধ্যমে সংগৃহীত। এক্ষেত্রে, এই বিপুল তথ্য খনি মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অজুহাতে তার বিবরণের গভীর গুরুত্ব মোটেই উড়িয়ে দেয়া চলে না। সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে বিদেশী প্রত্যেক পর্যটককেই দাঁড় করাতে পারি আমরা আসামীর কাঠগড়ায়। বরং উচ্চশিক্ষিত না হয়েও বহু ক্ষেত্রে তিনি যে গভীর উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই আশ্চর্যকর, অপ্রত্যাশিত। তার কাছে কি কি পাইনি খুঁত ধরা পণ্ডিতের মতো

তার অভিযোগ তালিকা প্রস্তুত না ক'রে যা পেয়েছি তার জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

১৬৭৫-এ ট্যাভারনিয়ারের প্রথম বই প্রকাশিত হয় **'Nouvelle Relation du Serrail du Grand Signior'** নামে। তার **magnum opus, the Six Voyages** প্রকাশ পায় পরের বছর। তার বিবরণী প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে প্রকাশ হবার পর। লাভ করে থিভেনট, বার্নিয়ার এবং চার্ডিন—যারা ট্যাভারনিয়ারের চেয়ে খুব সম্ভবতঃ অনেক বেশি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন—তাদের বিবরণের চেয়েও অনেক বেশী সমাদর। এর একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে ট্যাভারনিয়ার তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন কিছু বর্ণনা করেননি, করেছেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও রসবোধসম্পন্ন ব্যক্তির দর্শক মন নিয়ে। ১৬৭৯-তে প্রকাশ করেন তিনি **the Recueil de plusieurs Relations** বইটি।

১৬৭৯ থেকে ১৬৮৪ পর্যন্ত অবসর জীবন মধ্যেও সম্ভবতঃ অল্প বিস্তর ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন ট্যাভারনিয়ার। অন্ততঃ তিনি যে কর্মব্যস্ত জীবন যাপন ক'রে চলছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন। ১৬৮৪ তে ব্রাণ্ডেন-বার্গ-এর ইলেকটর-এর আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত হলেন বার্লিনে। ডেকেছিলেন পূব জগতে উপনিবেশ ও বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার পরামর্শ গ্রহণের জন্য। এ ব্যাপারে তার হয়ে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়ার জন্যও। ট্যাভারনিয়ারের বয়স তখন ৭৯। ভারতে ইলেকটরের দূত হবার প্রস্তাব পেয়ে দেখালেন এ বয়সেও ভারতে আসার উৎসাহ। স্থির হল তিনটি অস্ত্রসজ্জিত জাহাজে ক'রে যাওয়া হবে ভারতে। ট্যাভারনিয়ারকে শুধু দূত হিসাবেই নির্বাচন করা হল না, নিযুক্ত করা হল ইলেকটরের অবৈতনিক পারিষদ এবং নৌ-বিষয়ক উপদেষ্টা রূপেও। এর অল্প পরেই বেচে দিলেন তিনি ঔবনীর জমিদারী। সম্ভবতঃ আবার বিদেশ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করার জন্যে। কিন্তু শেষ অব্দি সব পরিকল্পনা বাতিল করলেন ইলেকটর। তবু বাণিজ্যের নেশা থেকে হটে আসতে পারলেন না ট্যাভারনিয়ার। ২,২২,০০০ ফ্রাঙ্ক লগ্নী ক'রে পাঠালেন বাণিজ্যের জন্য ভাইপো পীয়ী-কে ভারতে। শোনা যায়, পীয়ী নাকি পারস্যে স্থায়ী ভাবে থেকে যান এবং ফাঁকি দেন লাভের পুরো প্রাপ্য থেকেই। এবং ক্ষতি উশুল করার জন্যে ১৬৮৭-তে সপ্তম বারের জন্য এশিয়া-পথিক হন তিনি। বাস্তব ঘটনা যাই হোক, প্রমাণ মেলে, সুইডেনের রাজার ছাড়পত্র নিয়ে ১৬৮৯-র ফেব্রুয়ারী নাগাদ তিনি উপস্থিত হন রাশিয়ায়। এই বিখ্যাত অতিথি

যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মস্কো আসতে পারেন তার সুব্যবস্থা ক'রে দেয়ার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয় সীমান্তে।

শেষ পর্যন্ত রাশিয়াতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ট্যাভারনিয়ার। তবে সে ঘটনার সঠিক তারিখ আমাদের অজানা।

।। এক ।। ইস্পাহান থেকে গোমব্রুন (বন্দর আব্বাস) হয়ে সুরাট যাবার পথ-পরিচয়।

ধরুন, আপনি এখন পারস্যের ইস্পাহান শহরে। ভাবছেন, কিভাবে, কোন পথ ধরে যাবেন ভারতবর্ষে। দর্শন করবেন মহাপ্রতাপী মুঘলদের ক্ষমতা কেন্দ্র দিল্লী ও জহানাবাদ।

ভারতের সঙ্গে পারস্যের সীমান্ত রেখা চারশো ক্রোশেরও বেশি দীঘল। একেবারে সাগর-কূল থেকে মাউন্ট তউরুস বা ককেসাস (প্রকৃত পক্ষে হিন্দু কোহ) পর্যন্ত। এসত্ত্বেও তুরস্ক থেকে পারস্যে যাবার যত পথ রয়েছে, নেই অত পারস্য থেকে ভারত যাবার। দুয়ের সীমান্ত মধ্যে রয়েছে তেপান্তরের মতো ধু ধু বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মেলেনা যেখানে এক ফোঁটা জল। তাই, যাবার মতো পথ বলতে মাত্র দুটিই। এর একটি পথ ধরে যেতে হলে দিতে হবে আংশিক ভাবে সাগরপাড়ি। এজন্য যেতে হবে ইস্পাহান থেকে বন্দর হরমুজ-এ, চড়তে হবে সেখান থেকে জাহাজে। অন্যটি পুরোপুরি ভূ-পথ। চলে গেছে কন্দহারের মধ্য দিয়ে।

ভারত মহাসাগর এলাকা নয় আমাদের ইওরোপীয় সাগর এলাকার মতো। উপায় নেই সেখানে সারা বছর ধরে যখন খুশী সাগর পাড়ি দেয়ার। নভেম্বর থেকে মার্চ, এই মাস কটিই যা জাহাজ চলাচলের মরশুম। তাই হরমুজ থেকে সুরাট যাবার বা সুরাট থেকে হরমুজ আসার জন্য সাগর পাড়ি দেয়ার সুযোগ পাবেন শুধু যা তখন-ই। এর মধ্যেও' রয়েছে আবার কিছু বৈচিত্র। ফেব্রুয়ারী শেষ হবার পর সুরাট থেকে যাত্রা করার সুযোগ পাবেন আপনি খুবই কম। কিন্তু হরমুজ থেকে যাত্রা করতে হলে শুধু মার্চ মাসের শেষ অবধি কেন, ১৫ই এপ্রিল পর্যন্তও মিলবে সে সুযোগ। যে পশ্চিমা বাতাস ভারতে বর্ষা ঋতুকে আবাহন ক'রে আনে তা বইতে শুরু করে এ সময় থেকেই। প্রথম চার মাস বাতাস বয়ে চলে উত্তর-পূব দিশি থেকে। এর আনুকূল্যে সুরাট থেকে হরমুজ আসা সম্ভব হয় পনের থেকে কুড়ি দিনের ভেতর। ইতিমধ্যে ডিগ্রী-ডিগ্রী ক'রে

কোণ পরিবর্তন ক'রে পরিণত হয় এ বায়ু উত্তরা বাতাসে। সম্ভব হয় এ সময়েও হরমুজ থেকে সুরাট এবং সুরাট থেকে হরমুজ যাতায়াত। তবে সময় লাগে তখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন। যদি চোদ্দ-পনের দিন মধ্যে হরমুজ থেকে সুরাট আসতে চান তাহলে উচিত হবে মার্চ বা এপ্রিলের শুরুতে জাহাজে চাপা। সারা পথ পাবে সে তখন অনুকূল পশ্চিমা বায়ু।

হরমুজ থেকে যে সব জাহাজ যাত্রা করে তারা পারস্য উপকূল থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার জন্য ক্রমশঃ কাছাকাছি হতে থাকে আরব উপকূলের। এগিয়ে চলে (উত্তর পূব আরবে অবস্থিত ওমানের রাজধানী) মসকাত-এর দিকে। সুরাট থেকে যাত্রা করা জাহাজগুলিও হরমুজ উপসাগরে প্রবেশের জন্য অনুসরণ করে এই একই পন্থার। তবে, উভয়দিকগামী কোন জাহাজই থামে না কিন্তু মসকাতে। থামলেই শুল্ক দিতে হবে সেখানকার আরবীয় রাজাকে। পর্তুগীজদের কাছ থেকে অধিকার ক'রে নিয়েছেন তিনি এ বন্দরটিকে।

তিনটি পাহাড়ের বিপরীতদিকে একেবারে সাগরকূলে অবস্থিত মসকাত শহরটি। এর কূলে ভেড়া এ কারণে বেশ কষ্টসাধ্য। গড়ে উঠেছে শহরটি একটি পাহাড়ের গোড়া ঘেঁষে। এ পাহাড়টির ওপর তৈরি করেছিল পর্তুগীজরা গুটি তিন-চারেক দুর্গ। মসকাত, হরমুজ ও বসরা পূব জগতের এ তিনটি এলাকাতে কিন্তু অতি অসহ্য গরম। এতকাল এ সাগরের নৌ-বাণিজ্য ছিল ইংরাজ ও ডাচদের একচেটিয়া। ইদানিং বছর কতক হল কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে পরিস্থিতির। আর্মেনিয়ান, ভারতীয় মুসলমান এবং বণিয়াদের জাহাজও দিয়ে চলেছে সাগর পাড়ি। তবে ভারতীয়রা নৌ-চালনা বিদ্যাটির গভীরতায় তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারেননি বলে তাদের জাহাজে যেতে স্বভাবতঃই অস্বস্তি দেখা দেবে আপনার মনে। এছাড়া ফ্রাঙ্ক (গ্রীক বাদে অন্যান্য ইউরোপীয়ান)-দের মতো নিয়োগ করে না তারা সুদক্ষ দিশারীও।

সুরাটগামী জাহাজগুলি যায় দিউ ও সেন্ট জিন (সনজান)-এর জলপথ ধরে। তারপর নোঙর ফেলে সুওয়ালী বিরামস্থলীতে। এটি সুরাট থেকে মাত্র চার কোশ আগে। আর নদী মোহনাটি এ থেকে উত্তরদিকে মাত্র দুকোশ দূরে। সুরাট সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে থাকা একমাত্র বন্দর। সুরাট ও সুওয়ালী মধ্যে আনা-নেয়া করা হয় শকট ও নৌকায় ক'রে। বড় জাহাজগুলি এ নদীতে প্রবেশ করতে পারে না মোহনায় বালিচর থাকার দরুন। সুওয়ালীতেই খালাস করতে হয় তাদের। এ ছাড়া ডাচ ও ইংরাজ দুয়েরই নেই সুরাট প্রবেশের

অনুমতি। এজন্য সুওয়ালীতেই করতে হয় তাদের পণ্য খালাস, ফিরে যেতে হয় সেখান থেকেই। তবে কিছুকাল হল বর্ষা বিরতি কালে জাহাজগুলিকে নদী-বুকে রাখার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে ইংরাজদের।

সুরাট মাঝারি আকারের একটি শহর। যে দুর্গটি রয়েছে সেখানে তাও তেমন মজবুত বা শক্তিশালী নয়। জলপথেই যান, আর স্থলপথেই যান, যেতে হবে আপনাকে এটির পাশ দিয়ে। দুর্গটির চারকোণায় রয়েছে চারটি গম্বুজ। দেয়ালের ওপর আঙিনা না থাকার দরুন কামানগুলিকে বসানো হয়েছে পৃথক মঞ্চ তৈরি ক'রে। দুর্গটির শাসনকর্তার নেই কিন্তু নগরের ওপর কোন কর্তৃত্বই। রয়েছে তার পৃথক একজন শাসনকর্তা। বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য কর তিনিই আদায় ক'রে থাকেন এ প্রদেশ থেকে। নগরটির ঘের দেয়াল মাটি দিয়ে তৈরি। সাধারণ অধিবাসীদের বাড়িগুলি গোলাবাড়ির মতোই দেখতে। নিছক নলখাগড়া দিয়ে গড়া। ভেতরে কি ঘটছে না ঘটছে তা যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায় এ জন্য তার ফাঁকগুলি ভরাট করা হয়েছে গোবর মেশানো মাটির প্রলেপ দিয়ে। মাত্র নয় বা দশ খানি সুনির্মিত কোঠা-বাড়ি চোখে পড়বে সারা সুরাট শহরে। শাহ-বন্দর বা বন্দর-অধিকর্তা-ই এর মধ্যে দু-তিন খানি বাড়ির মালিক। বাকি কটি মুসলমান সওদাগরদের। ইংরাজ ও ডাচদের কুঠিগুলিও সেগুলির তুলনায় একটুও খারাপ নয়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট ও অধিনায়ক সেগুলিকে ছিমছাম রাখার জন্য নিয়মিত যত্নের সঙ্গে ক'রে থাকেন তার সংস্কার। নিজ নিজ কোম্পানীগুলির কাছ থেকেই আদায় ক'রে নেন সে খরচ তারা। তবে, এ আবাসগুলির একটিও কিন্তু তাদের নিজস্ব নয়, সব কটিই ভাড়া বাড়ি। সম্রাট কোন ফ্রাঙ্ককেই অনুমতি দেন না এখানে নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্য। তার আশঙ্কা, এরূপ অনুমতি দিলে হয়তো সেগুলিকে পরিণত করবে তারা দুর্গে। শ্রদ্ধেয় কপুচিন পাদ্রীগণ বেশ বড়সড় একখানি বাড়ি গড়েছেন এখানে ইওরোপীয় আদলে। সুন্দর একটি গীর্জাও বানান হয়েছে তার পরিসর মধ্যে। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তার এক বড় অংশ, জুগিয়েছি আমিই তাদের। তবে, উপরোক্ত বাধা-নিষেধের দরুন এর জমি কিনতে হয়েছে চিলেবি নামের অলেপ্পো-বাসী এক ম্যারোনাইট সওদাগরের নামে।

।। দুই ।।

ভারতের শুল্ক, মুদ্রা, বিনিময়, ওজন ও পরিমাপ বিধি।

জাহাজ থেকে পণ্য নামানোর সাথে সাথেই তা হাজির করতে হয় দুর্গটির লাগোয়া শুল্ক-ভবনে। এখানকার কর্মচারীরা বেশ কঠোর, অতি সতর্কতার সাথে তারা তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাসী ক'রে থাকেন প্রতিটি ব্যক্তিকে। সাধারণ যাত্রীরা যে সব জিনিষ সঙ্গে আনেন তার প্রত্যেকটির ওপরেই গুণতে হয় তাদের চার থেকে পাঁচ শতাংশ শুল্ক। ইংরাজ ও ডাচ কোম্পানীগুলিকে গুণতে হয় সে তুলনায় কম। তবে, দরবারে প্রতিবছর প্রতিনিধি পাঠানো ও উপহার দেয়ার জন্য তারা যে পরিমাণ খরচ করতে বাধ্য হয় তা ধরলে তাদেরও গুণতে হয় সাধারণ ব্যক্তি বা সওদাগরদের প্রায় কাছকাছিই।

সোনা ও রূপার মুদ্রার ওপর শুল্ক দিতে হয় শতকরা দুই হারে। শুল্ক ভবনে সেগুলি গোণা শেষ হলে টাঁকশালের পরিচালক (টাঁকশাল দারোঘা) সেগুলি নিয়ে য'ন স্থানীয় টাঁকশালে,' রূপান্তর ঘটানো হয় সেগুলিব স্থানীয় মুদ্রায়। মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয় বিশুদ্ধতার মান অনুযায়ী আনুপাতিক হারের স্থানীয় মুদ্রা। এ মুদ্রা কবে তিনি দেবেন তা নির্ভর করে তার অঙ্কের ওপর। প্রতিশ্রুত দিনে যদি তা দিতে তিনি ব্যর্থ হন, তবে যত দিন দেরি ঘটে সেজন্য দেয়া হয় সুদ। মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও প্রাপ্য মেটানোর ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বেশ ঝানু। মুদ্রা তিন-চার বছরের পুরানো হলেই গচ্চা দিতে হয় তা থেকে আধ-শতাংশ। বেশি পুরানো হলে ধরা হয়ে থাকে ঐ অনুপাতে ক্ষয়। তাদের বক্তব্য, অসংখ্য হাত ঘোরার দরুন প্রতিটি মুদ্রাই কিছু না কিছু পরিমাণ ক্ষয়ে যেতে বাধ্য।

যে-কোন ধরনের রূপা-ই নিয়ে আসতে পারেন আপনি মুঘল সাম্রাজ্যে। প্রতিটি সীমান্ত শহরেই রয়েছে একটি ক'রে টাঁকশাল। তার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে রূপাকে চরমতম মানে বিশুদ্ধ ক'রে নেয়ার সুব্যবস্থা (এই শোধন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে আইন-ই-আকবরীতে)। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সব-রকম সোনা ও রূপাকে নির্দিষ্ট মানে পরিশুদ্ধ ক'রে স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয় এদেশে। রূপার বাট বা পুরানো রূপার থালা ইত্যাদি যে সব রৌপ্য

সামগ্রীর ওপর শিল্পকর্মের দাম না দিয়ে তা সংগ্রহ করা সম্ভব সে সব সঙ্গে নিয়ে গেলে কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না তার ফলে। কিন্তু মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে গেলে অনিবার্য ভাবেই দিতে হয় কিছু না কিছু গচ্চা। কেননা, একবার মুদ্রা তৈরির খরচ দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলিকে, দিতে হয় এখানে এসে আরেকবার স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরের খরচ। কেনা-বেচার বেলা চলিত সাধারণ সর্ত এই যে পণ্যের স্বীকৃত মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে বর্তমান বছরে তৈরি মুদ্রায়। যদি পুরানো মুদ্রায় দিতে চান তবে অবশ্যই মুদ্রার বয়স অনুযায়ী ওজন হ্রাসের জন্য দেয় গচ্চার পরিমাণ গুণতে হবে আপনাকে। এর হার আগেই বলেছি ওপরে। শহর থেকে দূরে, গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ ভালভাবে পরিচিত নয় মুদ্রার সঙ্গে। যেখানে ভাঙানি দেয়ার মতো শরাফ বা পোদ্দার নেই সেখানে আগুনে ফেলে যাচাই না ক'রে কেউ নেবে না কারো কাছ থেকে কোন রূপার মুদ্রা। আর নদীর খেয়া-ঘাটে বিশেষভাবে চোখে পড়বে এ জিনিসটি। খেয়া-নৌকাগুলি সাধারণতঃ ঝুড়ির বেত দিয়ে তৈরি ও ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে মোড়া। এজন্য এগুলি বেশ হালকা। বনের ভেতর লুকিয়ে রাখে এগুলি মাঝিরা। পার করার মজুরী অগ্রিম হাতে পাবার পরই ঘাড়ে ক'রে বার ক'রে আনে সেটিকে গোপন স্থান থেকে।

সোনার বেলা, যে সব সওদাগরেরা তা পণ্য হিসাবে নিয়ে আসে তারা এরূপ মাথা খাটিয়ে তা লুকিয়ে আনে যে তার অতি নগণ্য অংশই ধরা পড়ে শুল্ক কর্মচারীদের কাছে। শুল্ক ফাঁকি দেয়ার জন্য যতরকম পন্থার অনুসরণ করা সম্ভব তার কোনটিই বাদ দেয় না এসব ব্যবসায়ীরা। এর একটি কারণ, ইওরোপে এ ধরনের শুল্ক ফাঁকি দিতে গেলে যতটা ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, এখানে তা নেই। কেননা, ভারতে এ ধরনের প্রতারণা ধরা পড়লে শতকরা পাঁচের বদলে শতকরা দশ বা দুগুণ শুল্ক দিয়েই পেয়ে যায় রেহাই এরা। তবে কিছুদিন হল পরিবর্তন ঘটেছে এ কানুনের। বর্তমানে এরকম খেসারত দিয়ে শুল্ক কর্মচারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। ইংরেজ কাপ্তেনরা জাহাজ ছেড়ে তীরে এলে তাদের কোনরকম তল্লাসী করা হবে না—এরকম এক সুবিধা তাদের দিয়েছেন সম্রাট। কিন্তু একদিন এক ইংরাজ কাপ্তেন (সিন্ধের কিছুটা ওপর দিকে থাকা ভারতের অন্যতম বড় শহর) তত্ত্ব খাবার উদ্যম করতে তাকে আটক করলেন শুল্ক রক্ষীরা। বাধা দেবার চেষ্টা ক'রেও সফল হলেন না তিনি। সবরকম প্রতিবাদ সত্ত্বেও তল্লাসী করা হল তার দেহ। পাওয়া গেল সোনা। প্রকৃতপক্ষে,

ইতিমধ্যেই বারকয়েক ঐ শহরে গিয়ে জাহাজ থেকে পাচার করেছেন তিনি বেশ কিছু পরিমাণ সোনা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সাধারণ হারে এজন্য শুল্ক আদায় ক'রে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হল তাকে। ইংরাজ কাপ্তেন ভদ্রলোক বেশ ক্ষুব্ধ হলেন এ ধরনের লাঞ্ছনা ভোগের জন্য। হয়ে উঠলেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর। এবং তা নিলেনও এক কৌতুককর উপায়ে। তখনো মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়েনি এমন একটি বাচ্চা শুয়োরকে মেরে করা হল সেটিকে রোষ্ট। তারপর থলথলে চর্বি মাখানো অবস্থায় সেটিকে একটি চীনা বাসনে রেখে, ঢাকা দেয়া হল একটি রুমাল দিয়ে। এরপর এক বান্দাকে আদেশ করলেন তিনি সেটি তার পিছু পিছু শহরে বয়ে নিয়ে চলার জন্য। যেমনটি তিনি ভেবেছিলেন ঘটল ঠিক তেমনটিই। শুল্ক ভবনের সুমুখ দিয়ে যাবার কালে শহরের শাসনকর্তা, বন্দর অধিকর্তা ও টাঁকশালের দারোগা বসেছিলেন সেখানে। দেখেই তারা উন্মুখ হয়ে উঠলেন তাকে আটকাবার জন্য। কিন্তু বান্দাটি কোনরকম ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে চলল তার হাতের ঢাকা দেয়া চীনা বাসনটি নিয়ে। তিন প্রধান তখন কাপ্তেনকে বললেন: ওকে ডাকুন, ও কি নিয়ে চলেছে তা পরখ ক'রে দেখা প্রয়োজন। কাপ্তেন যতই তাদের বোঝাবার ছল করলেন যে বান্দাটি এমন কিছুই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না যা শুল্ক যোগ্য, কিছুতেই তারা কান দিলেন না তাতে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর কাপ্তেন বান্দার হাত থেকে থালাটি নিয়ে এলেন শুল্ক-ভবনে। শাসনকর্তা ও শাহ-বন্দর (বন্দর অধিকর্তা) এবার তীক্ষ্ণ সুরে তার কাছে জানতে চাইলেন: ওতে কি আছে তা দেখাতে আপত্তি করছিলেন কেন এতক্ষণ? 'শুল্ক যোগ্য কিছু নেই বলেই'—ফুঁসে উঠে জবাব দিলেন কাপ্তেন। তারপর রুক্ষভাবে বাসনটি ছুঁড়ে দিলেন তাদের সুমুখে। ফলে শুয়োরটির গায়ে মাখানো থলথলে চর্বি চারদিকে ছিটকে জায়গাটিকে নোঙরা ক'রে তুলল, নোঙরা ক'রে দিল তিন প্রধানের পোশাক আশাক। মুসলমানেরা শুয়োরকে ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের ধর্ম-শাস্ত্র অনুযায়ী অপবিত্র জীব এটি, যাতেই এদের ছোঁয়া লাগে তা-ই হয়ে যায় অপবিত্র। অতএব, প'রে থাকা পোশাক-আশাক বদল করতে বাধ্য হলেন তারা। সরিয়ে নেয়া হল গদী থেকে কার্পেট। বানাতে হল শুল্ক ভবনটিকেও আবার নতুন ক'রে। সাহসী হলেন না এজন্য তারা ইংরাজ কাপ্তেনটিকে কোনরকম দোষারোপ করতে। কোম্পানীর সঙ্গে আচরণের বেলা বন্দর অধিকর্তা ও টাঁকশালের দারোগা দুজনকেই চলতে হত যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা ক'রে। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে তার কাছ থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকে তাদের

দেশ। ইংরাজ ও ডাচ উভয় কোম্পানীর প্রধান ও তাদের সহকারীদের সাথে করেন এজন্য যথেষ্ট সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার তারা। জাহাজ থেকে বন্দরে আসার কালে কখনে করা হয় না তাদের তল্লাশী। অপর দিকে তারাও লুকিয়ে চুরিয়ে সোনা বয়ে আনার ঝুঁকি নেন না ব্যক্তিগত সওদাগরদের মতো। মনে করেন একে তারা মর্যাদা হানিকর ব'লে। তত্ত-র সাথে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হত আগে। এখন তা ক্রত কমে চলেছে দিন দিন। মুখে বালি জমে চড়া পড়ে গিয়ে নদী মোহনাটির অবস্থার ঘটে চলেছে ক্রমশই অবনতি, হয়ে পড়েছে নদীতে জাহাজ প্রবেশ ও চলাচল দিন দিন দুঃসাধ্য। [এ জন্য ঔরঙ্গজেব পরবর্তীকালে সিন্ধু মোহনায় গড়ে তোলেন নতুন একটি বন্দর।]

ইংরেজরা যখন দেখলেন, শুরু করা হয়েছে আবার তাদের নিয়মিত তল্লাশী, তখন আরম্ভ করলেন তারা সোনা পাচারের জন্য নানারকম ছোট-খাটো কৌশল অবলম্বন। ইওরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল এ সময়ে তাদের মধ্যে পরচুলা মাথায় দেয়ার রীতি। যতবার তারা জাহাজ থেকে কূলে আসতেন এই পরচুলার জালের ভেতর (প্রথম জেমস প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা) জ্যাকোবাস, (তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রচলিত গোলাপ-খচিত স্বর্ণমুদ্রা) রোজ নোবল ও (প্রাচীন ইওরোপীয় স্বর্ণমুদ্রা) ডুকাট লুকিয়ে এনে শুরু করলেন তা পাচার। একবার শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কয়েক বাক্স প্রবাল সুরাটে পাচারের জন্য মতলব আঁটলেন এক সওদাগর। জাহাজ যখন নদীতে প্রবেশ করল তখন তিনি দড়ি দিয়ে বাক্সগুলিকে বেঁধে জাহাজের পিছনদিকে রেখে দিলেন দু তিন ফুট জলের নিচে ডুবিয়ে। শুল্ক-কর্মচারীরা পণ্য-পরিদর্শনের জন্য জাহাজে এলে তাদের দৃষ্টিতে আর ধরা পড়ল না সেগুলি। জাহাজ থেকে সব মাল খালাস হতে যে কদিন সময় লাগল তার ভেতরে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলি শহরে। শুল্ক কর্মচারীরা টের পেল না বিন্দু-বিসর্গও। এত চাতুরী খেলিয়েও কিন্তু শেষ অবধি কপাল চাপড়াতে হল সওদাগরকে। কারণ কিছুই নয় আর। সুরাটের কাছে এই নদীজল সবসময়ে কাদাভরা ঘোলাটে। প্রবালের বাক্সগুলি দীর্ঘদিন নদীজলে ডোবানো থাকার ফলে সেই জল ভেতরে ঢুকে লেগে গেল প্রবালগুলির গায়ে। ধরে গেল তাতে দাগ ও ছাতা। অনেক মাজাঘষা ক'রে পরিষ্কার করার পরও বেচা গেল না সেগুলিকে সঠিক দামে। পরিণতিতে, শতকরা বারো ভাগেরও বেশি ক্ষতি সইতে হল তাকে।

মহাপ্রতাপী মুঘলদের সাম্রাজ্য মধ্যে যে সব মুদ্রার চল রয়েছে সোনার বাক্

তারই বিবরণ এবার। তবে, আগেই আভাস দিয়েছি, লাভের মুখ দেখতে হলে তৈরি মুদ্রার চেয়ে বাট বা অন্য যে কোন আকারে সোনা ও রূপা নিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

তৈরি সামগ্রীর আকারে সোনা বা রূপা নিয়ে যাওয়াটাই সব থেকে সুবিধাজনক। তখন সুযোগ পাচ্ছেন আপনি এগুলিকে বাটে পরিণত করার, সর্বাধিক মাত্রায় পরিশুদ্ধ ক'রে নেয়ার। পরিশুদ্ধ করার সময়ে যে সব ধাতুমল নিষ্কাশন করা হয় এ থেকে, গুণতে হয় না তার ওপরে কোন শুল্ক। আবার, সোনা ও রূপার মুদ্রা না নিয়ে যাবার দরুন মুদ্রা তৈরির খাতে আপন দেশে রাজা ও টাঁকশালকে যে শুল্ক গুণতে হয়, তাও বেঁচে যাচ্ছে আপনার। তবু, যদি আপনি তৈরি স্বর্ণ-মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তাহলে রোজ-নোবল, পুরানো জ্যাকোবাস, আলবার্টাস নিয়ে যাওয়াই হবে সব থেকে ভাল। বিগত শতকের তৈরি পর্তুগাল ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন মুদ্রাও নিয়ে যেতে পারেন সাথে। এসব প্রাচীন মুদ্রা সব সময়েই কিছু না কিছু লাভের মুখ দেখতে সাহায্যে করবে সওদাগরদের। ভাল জাতের স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ভারতে নিয়ে যাবার মতো হল বিভিন্ন রাজা ও রাজধানী শহরগুলির তৈরি সবরকম জর্মান ডুকাট এবং পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও ডেনমার্কের ডুকাট। এই সব ডুকাট মুদ্রা সমমূল্যে গৃহীত হয় সেখানে। ভেনিসে তৈরি স্বর্ণ-ডুকাটকে সব থেকে বেশি কদর দেয়া হত আগে। আমাদের (ফরাসী) মুদ্রা মানে বিচার করলে অন্যান্য দেশী ডুকাটের তুলনায় এগুলি বিক্রী হত চার থেকে পাঁচ সোল বেশি দরে (পাঁচ-সোল—৪$\frac{1}{2}$ ফার্দিং)। কিন্তু বছর বারো বা তার কাছাকাছি হল যেন সতর্ক হয়ে গেছে এ ব্যাপারে তারা। ফলে অন্য ডুকাটের সঙ্গে এগুলি একই মূল্যে বিকোয় এখন। ডুকাট ছাড়া অন্য যে সব বিদেশী মুদ্রার চল রয়েছে তার ভেতর নাম করা যেতে পারে কায়রোর গ্রাণ্ড সেনিয়র মুদ্রা সমূহ, (আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ) সলী ও মরক্কোতে চলিত মুদ্রাসমূহ। তবে এ তিন দেশের মুদ্রা বিকোয় এখানে সব থেকে কম দরে, অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় সাধারণতঃ চার সোল শস্তায়।

মহাপ্রতাপী মুঘল সাম্রাজ্যের সবখানেই সোনা ও রূপা ওজন করা হয় 'তোলা' নামের পরিমাপ ভিত্তিতে। তাদের এক তোলা আমাদের পরিমাপ পদ্ধতির নয় দেনিয়ের আট গ্রেনের সমান (—২২৪ ফরাসী গ্রেন—১৮১.৫ গ্রেনট্রয়)। প্রতারণা এড়ানোর জন্য সম্রাটের মোহর ছাপ আঁকা পেতলের বাটখারা দিয়ে

সোনা ও রূপা ওজন করা হয় সাধারণত। একশো তোলার বেশি না হলে একবারেই ওজন করা হয় পুরো'টা। সচরাচর ওই পরিমাণ সোনা বা রূপা ওজন করার মতো বাটখারাই কাছে রাখে পোদ্দাররা। মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়নি এমন সোনা ও রূপা পরিমাণে বেশি হলে তা যাচাই ক'রে নেয়া হয় যথাযথ ভাবে। যাচাই ক'রে তার বিশুদ্ধতার মাত্রা ধার্য হবার পর তা কেনার জন্য উৎসুক ক্রেতাদের মধ্যে সুরু হয়ে যায় দর-নিয়ে প্রতিযোগিতা।

অনেক সওদাগর আছেন যারা সময়ে সময়ে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার কিংবা তারও বেশি ডুকাট আনেন সঙ্গে ক'রে। এগুলি ওজনের জন্য সম্রাটের মোহর ছাপ দেয়া পৃথক ধরনের বাটখারা রয়েছে যার ওজন ঠিক একশো ডুকাটের সমান। যদি ক্ষয়ে যাবার দরুন ১০০ ডুকাটের ওজন ওই বাটখারার সমান না হয় তবে ক্ষুদে ক্ষুদে গুড়ির সাহায্যে ঠিক করা হয় তার ঘাটতির পরিমাণ। সমস্ত মুদ্রা ওজন হয়ে গেলে যে পরিমাণ ঘাটতি দেখা যাবে তার মূল্য খেসারত দিতে হয় সওদাগরকে। ডুকাট বা অন্য যে কোন ধরনের স্বর্ণমুদ্রা হোক না কেন তা ওজন করার আগে কাঠকয়লা দিয়ে জ্বালানো একটি বড় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় সেগুলিকে। প্রতিটি মুদ্রা আগুনে তেতে লাল টকটকে হয়ে গেলে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে তুলে আনা হয় সেগুলিকে। কোন মুদ্রা নকল কিনা তা পরখ করার জন্য, মুদ্রার গায়ে মোম আঠা ইত্যাদি সামগ্রী লাগিয়ে তাকে ওজনদার ক'রে তোলার চতুরী কাঁচিয়ে দেয়ার জন্য করা হয়ে থাকে এটি। কখনো কখনো এরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে মুদ্রা জাল করা হয়ে থাকে যে ধরা সম্ভব হয় না তা এভাবে আগুনে পুড়িয়েও। এজন্য একে একে প্রতিটি মুদ্রাকে বাঁকিয়ে পরখ ক'রে চলে পোদ্দাররা। এ প্রক্রিয়ায় খারাপ মুদ্রা ধরা পড়ে যায় সহজেই। এগুলিকে কেটে ফেলা হয় সঙ্গে সঙ্গে। পরখ শেষ হবার পর পরিশোধন ক'রে নেয়া হয় খারাপ মুদ্রাগুলির সোনাকে। এভাবে যে সোনা পাওয়া যায় তা থেকে তার দামও মিটিয়ে দেয় তারা ভাল ডুকাটের দরে। এরপর (এইসব ডুকাট মুদ্রা সহ) সমস্ত সোনা দিয়ে তৈরি ক'রে তারা স্থানীয় মোহর। বাদ দেয়া হয় একমাত্র যা একপিঠে মুখাকৃতি খচিত থাকা ডুকাটগুলিকে। এগুলিকে না গালিয়ে বা স্থানীয় সোনা মোহরে রূপান্তরিত না ক'রে বেচে দেয়া হয় সাধারণতঃ সওদাগরদের কাছে। তাতার দেশবাসী বা ভুটান, আসাম প্রভৃতি ভারতের উত্তরাঞ্চলের ও অন্যান্য দূরদেশীয় বণিকেরা কিনে নেয় এগুলি। ওই সব দেশের মেয়েরা তাদের প্রধান প্রধান অলঙ্কারগুলি তৈরি করে এইসব

ছুকাট মুদ্রা দিয়েই। বিশেষতঃ টিকলি তৈরি ক'রে চুলের সঙ্গে আটকে ঝোলায় এগুলি তাদের কপালে। যে মুদ্রাগুলিতে মুখাকৃতি খচিত নেই সেগুলির কোন কদর নেই ও এই সব উত্তর-দেশবাসী বণিকদের কাছে।

অন্যান্য সব স্বর্ণমুদ্রার ক্ষেত্রে, অনেকগুলিই বেচার সুযোগ রয়েছে স্বর্ণকার, স্বর্ণ-নিষ্কাশক ও অন্যান্য যারা এ ধাতুটি নিয়ে কাজ কারবার করে তাদের কাছে। যদি স্থানীয় সোনা-মোহর তৈরি না ক'রে যেমন আনা হয়েছে তেমন ভাবে তা বেচে দেয়া যায় তবে তা দিয়ে মুদ্রা তৈরি করানো হয় না আর। তবে এরকমটি ঘটে খুব কমই। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় একমাত্র যখন সম্রাটেরা সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন। এ সময়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিতরণের জন্য রূপার টাকার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এগুলিও। বেচা চলে এগুলি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্য অভিজাতদের কাছেও। সম্রাট রাজ্যাধিকার লাভের দিন তাকে উপহার দেয়ার জন্য এগুলি প্রচুর প্রয়োজন হয় তাদের। কেননা, এ দিনটি উপলক্ষ্যে বা প্রতি বছর সম্রাটকে ওজন করার মহাসমারোহের দিনটিতে তাকে উপহার দেয়ার যোগ্য রত্নাদি বা অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না সকলের পক্ষে। বরং এসব অনুষ্ঠানের বেলা সোনার টাকা (বা মোহর) পেলেই হয় তারা বেশি খুশী। অধিক উচ্চ বা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ বাগানোর আশায় সভাসদদের উপহার দেয়ার জন্যও চাহিদা রয়েছে এসব স্বর্ণমুদ্রার।

এ সব সোনা-মোহরের মহিমা যে কি অপার তা জানার সুযোগ হয়েছিল একবার আমার। সে-দেশ ভ্রমণকালে একবার আমার চোখের সামনেই ঘটে এ ঘটনাটি। বর্তমান সম্রাট ঔরঙজেবের পিতা শাহ-জহান তার দরবারের একজন আমীরকে নিযুক্ত করেছিলেন তত্ত প্রদেশের শাসনকর্তার পদে। এ প্রদেশটির রাজধানী শহর হল সিন্দি (দেবল বা দেউল সিন্দি ও পরবর্তী কালের লারী বন্দর)। শাসনকালের প্রথম বছর থেকেই শোনা যেতে থাকল তার নামে নানা স্বেচ্ছাচারিতা, প্রজাদের ওপর নানা দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়নের গুরুতর অভিযোগ। এ সত্ত্বেও তাকে প্রায় চার বছর কাল সে-প্রদেশ শাসন ক'রে চলার সুযোগ দেয়ার পর ডেকে পাঠান হল দরবারে। তত্তের প্রতিটি লোক খুশী হল এ সংবাদ শুনে, তারা ভাবল, এবার নিশ্চয়ই তাকে তার দুষ্কর্মের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেবেন সম্রাট। অথচ ঘটল কিন্তু একেবারেই উলটো ঘটনা। তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন সম্রাট, অর্পণ করলেন এলাহাবাদের শাসনভার, যা আগেরটির চেয়েও অনেক গৌরবজনক পদ। তার প্রতি সম্রাটের এরূপ সদয় ব্যবহারের কারণ

কিন্তু আর কিছুই নয়। আগ্রায় পৌঁছবার আগেই তিনি সম্রাটের কাছে গোপনে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার সোনা-মোহর। এ ছাড়া আরও বিশ হাজার সোনা-মোহর উপহার পাঠিয়েছিলেন বেগম সাহিব, হারেমের অন্যান্য মহিলা ও দরবারের কতক সভাসদের কাছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য। বেগম সাহিব (শাহ-জহানের প্রথম কন্যা জাহানারা বেগম)-ই ছিলেন এ সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। এরা সকলেই এবং বিশেষ ক'রে সভাসদরা খুবই খুশী হলেন তার কাছ থেকে প্রচুর সোনা-মোহর উপহার পেয়ে। খুশী হওয়ার কারণ শুধু এ নয় যে এগুলি রাখার জন্য অল্প ঠাঁইয়ের দরকার হয় এবং লুকিয়ে রাখা যায় এজন্য খুব সহজেই। সব চেয়ে বড় কথা, সম্রাট ও সরকারের অজান্তে এভাবে তারা সুযোগ পায় মৃত্যুর পর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে যেতে এবং এরূপ রেখে যেতে পারাকে মনে করে তারা বিরাট কৃতিত্ব ও গৌরবের কাজ বলে। একটি কারণও আছে এর। রাজ্যের যে কোন আমীর মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পদ সরকারে বর্তায়। আমীরদের স্ত্রী পান শুধু তাকে দিয়ে যাওয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার সামগ্রী।

সোনা মোহরের কথায় ফিরে আসি আবার। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে বণিকদের মধ্যে কিন্তু চল নেই এ মুদ্রার। একটি মোহরের মূল্য ১৪ টাকার বেশি না হলেও অতি কদাচিৎ দেখা যায় এগুলি তাদের কাছে। রাখেন এগুলি প্রধানতঃ আমীর বা অভিজাতরাই। এ দিয়ে প্রাপ্য মেটাবার বেলা এর মূল্য হিসাব করেন রূপার টাকার ভিত্তিতেই। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেষ্টা করেন চলিত দাম অপেক্ষা অন্ততপক্ষে সিকি টাকা বেশি নিতে। ফলে মোহরে প্রাপ্য নিতে হলে লাভের কিছু অংশ খোয়াতে হয় বণিকদের। (বর্তমান) সম্রাটের মামা শায়েস্তা খানের কাছে (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আহমদাবাদে) বেচলাম একবার ৯৬ হাজার টাকার সামগ্রী। যখন প্রাপ্য মেটাবার প্রশ্ন উঠল তিনি জানতে চাইলেন কোন ধরনের মুদ্রায় তা নিতে চাই আমি, টাকায় অথবা মোহরে। আমি কোন উত্তর দেয়ার আগেই যোগ করলেন তিনি, যদি তার ওপর আমার আস্থা থেকে থাকে তাহলে রাজী হয়ে যাব আমি মোহরে নিতেই। আর এ পরামর্শ দিচ্ছেন না মোটেই তিনি তার নিজের সুবিধার দিকে চেয়ে। আমি তখন জানালাম, তার পরামর্শই মেনে নেব আমি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন মোহরে আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু দাবি তুললেন, প্রতিটি মোহরের দাম ধরা হবে ১৪½ টাকা। বাজারে এর চালু দাম যে মাত্র

১৪ টাকা তা অজানা ছিল না আমার। তবু মেনে নিলাম তার দাবি। ভাবলাম, তিনি খুশী থাকলে, এই হারে প্রাপ্য দিয়ে আমার যে পরিমাণ লোকসান ঘটাতে চাইছেন তা বা তার একাংশ পুষিয়ে নিতে পারব অন্যভাবে। দুদিন পার ক'রে আবার দেখা করতে গেলাম তার সাথে। তখন জানালাম; তিনি যে দরে আমায় মোহর দিয়েছেন, অনেক চেষ্টা ক'রেও সে দরে বেচতে পারছি না তা বাজারে। তিনি ১৪$\frac{১}{২}$ টাকা দর ধরলেও বাজার দর ১৪ টাকার বেশি নয়। এজন্য ২৬০০০ টাকায় ৩৪২৮$\frac{৩}{১৬}$ টাকা ক্ষতি সইতে হচ্ছে আমাকে। শুনে রাগে দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন তিনি। বললেন, যে ডাচ পোদ্দার এ কথা বলেছে তাকে এতবার জুতোপেটা করবেন তিনি। অর্থ বলতে কি বোঝায় তা শিখিয়ে দেবেন এইসব লোকদের। তিনি যে মোহর আমায় দিয়েছেন তার সবগুলিই পুরানো। বর্তমানে যে সব রূপার টাকা তৈরি হচ্ছে তার তুলনায় এর দাম $\frac{১}{১৬}$ ভাগ বেশি। আসলে তিনি ভেবে নিয়েছিলেন, যে কথাগুলি তাকে আমি বলেছি তা বোধহয় ফাঁস ক'রে দিয়েছে আমার কাছে আমার ডাচ পোদ্দার-ই। এইসব এসীয় রাজা-রাজড়াদের মন মেজাজ জানা আমার। এদের কথাবার্তায় রাগ করা বৃথা। তাই করলাম না কোন প্রতিবাদ। তাকে বলে যেতে দিলাম মনের সাধ মিটিয়ে। যখন দেখলাম, তিনি কিছুটা শান্ত হয়েছেন, মুখে হাসি ফুটেছে, আমি মুখ খুললাম বিনীতভাবে। বললাম, তিনি আমাকে যে মোহর দিয়েছেন হয় তা আমাকে ফেরত দেয়ার সুযোগ দিন, নয়তো তা নেয়ার ফলে যে পরিমাণ অর্থ আমি কম পেয়েছি তা মিটিয়ে দিন আমাকে। অবশ্য তিনি নিজ মুখে যেমনটি একটু আগে মোহরের দর স্বীকার করেছেন তেমনি ১৪$\frac{১}{১৬}$ টাকায় মোহর নিতে আমার আপত্তি নেই কোন। একটিও কথা না বলে তিনি খানিকক্ষণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, যে মুক্তাটি তিনি তখন কিনতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন তা এখনো আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ আছে। সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে সেটি বার ক'রে এগিয়ে দিলাম তার হাতে। স্বচ্ছ সুন্দর রঙের একটি বড় মুক্তা। তবে আকৃতিতে সুন্দর নয়। এজন্যই কেনেননি তখন এটিকে।

সেটি হাতে তুলে দেয়ার পর তিনি বললেন: এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। এক কথায় বলুন, কি দাম পেলে বেচবেন এটিকে। সত্যি বলতে কি এটিকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে দিয়ে দিতাম মাত্র তিনহাজার টাকা পেলেও। কিন্তু তার কাছে দর হাঁকলাম ৭০০০ টাকা। শুনে তিনি বলে উঠলেন:

পাঁচ হাজার দেব এ মুক্তাটির জন্যে। আর তা দিলে, মোহর নেয়ার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে আপনার তা পুষিয়ে যাবে সব। কাল আসুন, দিয়ে দেব আপনাকে এ পাঁচ হাজার।' আমি চাই আপনাকে খুশী মনে বিদায় করতে, তাই একটি খিলাত (সম্মানী পোশাক) এবং একটি ঘোড়াও দেয়া হবে এছাড়া আপনাকে। আমি তখন কুর্নিশ জানালাম তাকে। অনুরোধ করলাম, যেন তিনি একটি জোয়ান ঘোড়া দেন আমাকে, কেননা, যেতে হবে আমাকে অনেক দূর দেশে। প্রতিশ্রুতি মতো পরদিনই তিনি একটি লম্বা ঢিলা বহির্বাস, একটি ঢিলা বড় জামা, দুটি কোমরবন্ধনী ও একটি পাগড়ী থাকা একপ্রস্থ খিলাত বা সম্মানী পোশাক দিলেন আমাকে। বহির্বাস ও ঢিলে জামাটি সোনার বুটিদার কিংখাব দিয়ে তৈরি। কোমরবন্ধনী দুটি সোনা ও রূপার ডোরা দেয়া। পাগড়ীটি সূতী কাপড়ের। আগুনে লাল রঙা কাপড়ের গায়ে সোনার সুতো দিয়ে ডোরা কাটা। যে ঘোড়াটি দেয়া হল তার সাথে কোন জিন নেই, পিঠটি রূপার ঝালর দেয়া একখণ্ড সবুজ মখমল দিয়ে ঢাকা। রত্ন শোভিত মাথার সাজটি বেশ সরু, গায়ে তার চুমকির মতো কতক রূপোর মুদ্রা বসানো। তার আচার ব্যবহার দেখে মনে হল না যে এর আগে কোন আরোহীকে পিঠে নিয়েছে সে। ওই যাত্রায় যেখানে আমি ছিলাম সেই ডাচ ভবনে সেটি আনতেই এক যুবক চড়ল তার পিঠে। সাথে সাথে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত রকমের লাফঝাঁপ জুড়ে চেষ্টা ক'রে চলল সে যুবকটিকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য। ভবন-সংলগ্ন ওই মাঠের মাঝে ছিল একটি কুঁড়েঘর। ডাচ যুবকটিকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় দাপাদাপি করতে করতে বেমক্কা দিল সে ঐ কুঁড়েটি ডিঙোবার জন্য এক বিরাট লাফ। পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেল যুবকটি একটুখানির জন্যে। এ ধরনের দুর্দান্ত ঘোড়া আমার পক্ষে যুৎসই হবে না বুঝে সেটি ফেরত দিলাম শায়েস্তা খানকে। যা ঘটেছে তাও খুলে বললাম তাকে। শেষে যোগ করলাম, আমি যে দেশে ফিরে যাই তা চান না বোধহয় তিনি! এরকম বলার কারণ আর কিছু না। তার জন্য কতক দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে আনার জন্য যাতে আমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাই সেজন্য তিনিই ছিলেন বেশি উৎসুক তখন। আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন শুধু। দিলেন তারপর তার পিতা (জহাঙ্গীর মহিষী নূরজহান বেগমের ভাই আসফ খান) যে ঘোড়াটিতে চড়তেন সেটি নিয়ে আসার আদেশ। এটি একটি বড় পারসিক ঘোড়া। জোয়ান থাকা কালে পাঁচ হাজার একু (=১০ হাজার টাকা) দিয়ে কেনা হয়েছিল এটিকে।

কিন্তু যখন এটি আমাকে দিলেন তখন তার বয়স ২৮ বছরেরও ওপরে। একেবারে জিন বল্গা সহ নিয়ে আসা হল ঘোড়াটিকে, তার সামনেই তার পিঠে চড়তে বললেন আমাকে। ঐ পর্যন্ত আমি যত ভাল ঘোড়া দেখেছি তার মতোই সুন্দর পদক্ষেপ তখনো ঘোড়াটির। আমি তার পিঠে চড়ার পর তিনি জিগ্যেস করলেন: এবার আপনি সন্তুষ্ট তো? এ ঘোড়া কখনো ফেলে দেবে না আপনাকে পিঠ থেকে। উত্তরে তাকে ধন্যবাদ জানালাম আমি। নিলাম সেই সাথে বিদায়ও তার কাছ থেকে। পরের দিন আমার যাত্রা শুরুর পূর্বক্ষণে পাঠিয়ে দিলেন তিনি বড় এক ঝুড়ি আপেল। শাহ্-জহান তাকে যে ছয় ঝুড়ি আপেল পাঠিয়েছিলেন এটি তারই একটি। কাশ্মীর থেকে আনানো। একটি বড় পারসিক তরমুজও ছিল ঝুড়িটি মধ্যে। সব নিয়ে বোধহয় ১০০ টাকা মূল্যের সামগ্রী। ডাচ সেনানায়কের স্ত্রীকে উপহার দিলাম সেগুলি। ঘোড়াটি নিয়ে চললাম গোলকুণ্ডায়। দিলাম সেখানে বেচে। বুড়ো হলেও তখন পর্যন্ত সেটি সবল ও সক্ষম বলে পেয়ে গেল্যাম ৫০০ টাকা।

আবার ফিরে আসি মুদ্রা প্রসঙ্গে। (ফ্রান্সের) লুই ডোর, স্পেন ও ইতালীর পিস্তোল স্বর্ণমুদ্রা বা অন্য কোন ধরনের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ভারতে এনে কোন লাভ নেই কিন্তু। অনেক লোকসান সইতে হবে তাতে। এসব মুদ্রার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নয় ভারতীয়রা। তা ছাড়া সব রকম মুদ্রাই গালিয়ে তার সোনা পরিশোধন ক'রে নেয় তারা। এবং যথেষ্ট লাভ ক'রে এ দ্বারা। অন্যান্য যে সব মুদ্রার কথা আগে বলেছি সেগুলি প্রত্যেকেই চেষ্টা করে শুল্ক-কর্মচারীদের ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে সঙ্গে আনার জন্য। যারা তাতে সফল হয় তারা ডুকাট প্রতি পাঁচ থেকে ছয় সোল লাভ ওঠায় সেগুলি বেচে।

এবার বলা যাক রূপার মুদ্রার কথা। দেশীয় ও বিদেশীয় এ দুয়ের ভেতর শোনানো যাক প্রথমে দ্বিতীয়টির বৃত্তান্ত।

যে সব বিদেশী রূপার মুদ্রা এদেশে আমদানি হয়ে থাকে তা হল জর্মান রিক্স-ডেলার ও স্প্যানিশ রিয়াল। প্রথমটি নিয়ে আসেন পোলাণ্ড, ক্ষুদ্র তাতার দেশ ও মস্কোভি অঞ্চলের দিক থেকে যে সব বণিকেরা আসেন তারা। অন্য মুদ্রাটি নিয়ে আসেন কন্সতান্তিনোপল, স্মাইরনা, অলেপ্পো প্রভৃতি দেশের বণিকরা। তবে প্রধান অংশই নিয়ে আসেন সেই সব আর্মেনিয়ান বণিকরা যারা রেশম বস্ত্র বিক্রী ক'রে থাকেন সারা ইওরোপ জুড়ে। সমস্ত সওদাগরেরাই পারস্যের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এই সব রূপার মুদ্রা। কেন

না, শুল্ক-কর্মচারীরা জানতে পেলেই নিয়ে যাওয়া হবে এগুলি সেখানকার টাঁকশালে, পরিণত করা হবে আব্বাসী মুদ্রায়। এটিই হল পারস্যের শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা। এই আব্বাসী নিয়ে ভারতে এলে পরিণত করা হবে তাকে আবার স্থানীয় মুদ্রা 'তঙ্কা' বা টাকায়। আর এ সবের ফলে, পারস্যে যে পরিমাণ রাজ-শুল্ক দিতে হবে ও উভয় দেশে মুদ্রা তৈরির পারিশ্রমিক খাতে যে মর্য গুণতে হবে, সব মিলিয়ে সওদাগরকে লোকসান সইতে হবে শতকরা সাড়ে দশ ভাগ। একশো রিয়ালের বিনিময়ে শেষপর্যন্ত ভারতে এসে পায় সে ১৯১$\frac{1}{8}$ টাকা।

অন্যদিকে সেভিলিয়ান রিয়াল ভারতে নিয়ে এলে এর একশোর বদলে পাওয়া যায় এ দেশে ২১৩ থেকে ২১৫ টাকা। আর মেক্সিকান-এর একশোর বদলে মেলে ২১২ টাকা। একশো রিয়ালের বিনিময়ে ২১২ টাকা পেলে লাভ হয় ১০$\frac{1}{8}$ রিয়াল। আর সেভিলিয়ান-এর ক্ষেত্রে লাভ হয় শতকরা এগারো পর্যন্ত।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার, স্প্যানিশ রিয়াল আবার তিন চার ধরনের। উৎকর্ষতার মান অনুযায়ী এর এক একশোটির বিনিময়ে মেলে এদেশে ২০৮ থেকে ২১৪ এবং ২১৫ টাকা। এগুলির মধ্যে সেরা হল সেভিলিয়ান। সঠিক ওজনের হলে এর একশোর বদলে পাওয়া যায় সাধারণতঃ ২১৩ টাকা। এবং কখনো কখনো ২১৫। দরের এই ওঠানামা নির্ভর করে বাজারে এর আমদানির কম-বেশির ওপরে।

স্প্যানিশ রিয়াল মুদ্রার সঠিক ওজন ২ টাকা থেকে তিন গ্রোস ৭$\frac{1}{2}$ গ্রেন (বা ১৮৭ গ্রেন-ট্রয়) বেশি (নিচে প্রকাশিত মত অনুযায়ী ৫৮ গ্রেন ট্রয় বেশি। প্রকৃত ব্যবধান সম্ভবত ১ গ্রোস ৭$\frac{1}{2}$ গ্রেন বা ৬৯ গ্রেন-ট্রয়ের কাছাকাছি)। কিন্তু টাকায় ব্যবহৃত রূপার মান অনেক ভাল। আমাদের সাদা একুর মতো সেভিলিয়ান রিয়ালের বিশুদ্ধতার মান যেখানে ১১ দেনিয়ের সেখানে টাকার বিশুদ্ধতার মান ১১ দেনিয়ের ১৪ গ্রেন। মেক্সিকান রিয়ালের বিশুদ্ধতার মান মাত্র ১০ দেনিয়ের ২১ গ্রেন। স্প্যানিশ রিয়ালের প্রকৃত ওজন ৭৩ ভাল (৪৩৮ গ্রেন-ট্রয়)। এর বিনিময়ে পাবেন আপনি ৪$\frac{1}{2}$ মাহমুদী। এক মাহমুদী ২০ পইসার সমান। ফলে এক স্পানিশ রিয়ালের বিনিময়ে পাচ্ছেন আপনি ৯০ পইসা—তবে ভাল মানের হওয়া চাই এবং যেমনটি আগে বলেছি ওজনও হওয়া চাই ঠিক তেমনটি ৭৩ ভাল। ৮১ ভালে এক আউন্স এবং (স্বাভাবিক মানের) এক ভাল ৭ দেনিয়েরের সমান।

জর্মান রিক্স ডেলার রিয়ালের চেয়ে ওজনদার। এর ১০০-র বিনিময়ে

পাবেন আপনি ২১৬ টাকা। ১০০ রিয়াল ও ১০০ রিক্স-ডেলারের বিনিময়ে যথাক্রমে ২১৫ ও ২১৬ টাকা পর্যন্ত পাওয়ার দরুন মনে হতে পারে প্রতি টাকার দাম বোধহয় ৩০ সোলেরও কম। কিন্তু পরিবহন খরচ ও শুল্কাদি হিসাবে আনলে দেখা যাবে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে দিতে হচ্ছে বণিকদের তার চেয়েও বেশি। (স্বর্ণমুদ্রার ন্যায়) এসব রিয়াল ও রিক্স-ডেলারও ওজন করা হয় ১০০ হিসাবে। ওজন কম হলে এই ঘাটতি বা ক্ষয় ধার্য করা হয় ক্ষুদে ক্ষুদে নুড়ির সাহায্যে, ঠিক যেমনটি করা হয়ে থাকে স্বর্ণমুদ্রার বেলা। ঠিক মতো দাম পেতে হলে সংগ্রহের বেলা বণিককে দেখে নিতে হবে, প্রতিটি মেক্সিকান রিয়াল ও সেভিলিয়ানের ওজন হয় যেন ২১ দেনিয়ের ৮ গ্রেন বা ৫১২ গ্রেন। আর আমাদের সাদা একুর বেলা তার ওজন হয় যেন ২১ দেনিয়ের ৩ গ্রেন বা ৫০৭ গ্রেন (ফ্রেঞ্চ গ্রেন)।

এবার আসা যাক এ দেশীয় মুদ্রার কথায়। তঙ্কা বা টাকার ভগ্নাংশ বা খুচরা হিসাবে চলিত রয়েছে ভারতে ½, ¼, ⅛ ও ১/১৬ মানের মুদ্রা (আধুলি, সিকি, দু-আনি, আনি)। টাকার ওজন ৯ দেনিয়ের ১ গ্রেন, আর তার রূপার বিশুদ্ধতার মান ১১ দেনিয়ের ১৪ গ্রেন। মাহমুদী নামের একটি রূপার মুদ্রাও চলিত রয়েছে সে-দেশে। তবে এ মুদ্রাটির লেন-দেন শুধু সুরাট আর গুজরাট প্রদেশ মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ভারতের ছোট মুদ্রাগুলি তৈরি করা হয়ে থাকে তামা দিয়ে। এগুলির নাম পইসা। আমাদের দুই লিয়ার্দের সমান প্রত্যেকটি। আধ পইসা, দু পইসা এবং চার পইসার মুদ্রাও রয়েছে কিছু কিছু। আপনি যখন যে প্রদেশে রয়েছেন সে প্রদেশের বিনিময় মূল্য ভিত্তিতেই পইসার পরিবর্তে টাকা বা টাকার পরিবর্তে পইসা সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে। এই বিনিময় হার কোথাও কিছু কম, কোথাও বা কিছু বেশি। শেষ বার যখন আমি সুরাট যাই তখন সেখানে টাকার মূল্য বলা হল আমাকে ৪৯ পইসা। কখনো কখনো পাওয়া যায় পঞ্চাশ পইসা পর্যন্ত। আবার দাম পড়ে গিয়ে কখনো দাঁড়ায় ৪৬ পইসা। আগ্রা ও জহানাবাদে মেলে ৫৫ থেকে ৫৬ পইসা। অর্থাৎ, যতই আপনি তামা খনি অঞ্চলের কাছাকাছি হবেন ততই বেশি পইসা পাবেন টাকার বিনিময়ে। মাহমুদীর দর একেবারে বাঁধাধরা, সব সময়েই ২০ পইসা। এছাড়া আরো দু প্রকারের ক্ষুদে মুদ্রা চলিত রয়েছে মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে। এর একটি হল ছোট আকারের তিতো বাদাম, অন্যটি কড়ি। গুজরাট প্রদেশে একমাত্র স্থানীয় বাসিন্দারাই খুচরা মুদ্রা

হিসাবে ব্যবহার করে এইসব তিতো বাদামের। পারস্য থেকে আমদানি করা হয় এগুলি। রুখা শুখা পাহাড়ী অঞ্চলে জন্মায় সাধারণতঃ। কলোসিন্থ বা তিতো আপেলের চেয়েও বেশি তিতো এসব বাদাম। অতএব ছোট ছেলেমেয়েরা মজা ক'রে খেয়ে শেষ করবে এ ভয় নেই। কখনো ৩৫ কখনো ৪০টি মেলে এক পইসায়।

অন্য খুচরো মুদ্রাটি হল সেই বিশেষ প্রজাতের ঝিনুক যার কিনারাগুলি ভেতর-দিকে ওলটান। এগুলিকে বল হয়ে থাকে কড়ি। একমাত্র মাল দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না এগুলি (একথা ঠিক নয়। মাল দ্বীপপুঞ্জ এর প্রধান সরবরাহকারী হলেও আরো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মেলে এগুলি)। এই দ্বীপপুঞ্জের রাজার আয়ের একটি প্রধান উৎস এই কড়ি। মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সুবায়, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যে, এমনকি আমেরিকার বিভিন্ন দ্বীপেও এগুলি সরবরাহ করে তারা মুদ্রার চাহিদা মেটাতে। সাগরের কূলবর্তী এলাকায় এক পইসার বিনিময়ে মেলে এগুলির আশিটি। আর, যতই ভেতর এলাকার দিকে যাবেন, পরিবহন খরচের দরুন ততই কমে আসবে এর পরিমাণ। ফলে, আগ্রা এলাকায় পইসা পিছু পাবেন এগুলি ৫০ বা ৫৫টি। ভারতীয় গণনা পদ্ধতিতে ১০০,০০০ টাকাকে বলা হয় এক লক্ষ, ১০০,০০০ লক্ষকে বলা হয় এক ক্রোড, ১০০,০০০ ক্রোড়কে এক পদ্ম ও ১০০,০০০ পদ্মকে এক নীল (প্রকৃতপক্ষে ১০০ লক্ষ—এক কোটি। ১০০ কোটি=এক পদ্ম, ১০০০ কোটি=এক নীল)।

ভারতের যে সব গ্রামে কোন পোদ্দার নেই, বুঝতে হবে সে গ্রামটি সত্যি-সত্যিই খুব ছোট। এদের শরাফ বলা হয় সে-দেশে। এরাই সেখানে দেনা-পাওনা মেটায়, বা হুণ্ডী দেয় মহাজন হিসাবে। সাধারণভাবে এ-সব পোদ্দারদের সাথে একটা বোঝাপড়া রয়েছে প্রাদেশিক শাসনকর্তার। কড়ির সাথে পইসার ও পইসার সাথে টাকার বিনিময় হার যেমন খুশী বাড়ায় এরা। গ্রাণ্ড সিনিয়র (তুর্কীর সুলতান)-এর সাম্রাজ্যে যে সব ইহুদীরা পোদ্দারের ব্যবসা করে তারা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বা নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ভারতের পোদ্দাররা (এত নিপুণ যে) শিক্ষানবিশী করার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করবে না এদের কাছে।

এদের প্রাপ্য মেটানোর প্রথাটি বড়ই বেয়াড়া ধরনের। সোনা মোহর প্রসঙ্গে আগেই জানিয়েছি কিভাবে প্রাপ্য পরিশোধ করা হয় ওই মুদ্রায়। তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হল কোন একটি রূপার মুদ্রার প্রচলনকাল যতই পুরানো, তার

মূল্য নতুন বা কাছাকাছি বছরে তৈরী মুদ্রার তুলনায় ততই কম। কেননা, অসংখ্য হাত বদল হবার দরুন ক্ষয়ে হালকা হয়ে গেছে সেগুলি তুলনামূলক ভাবে। ফলে, কোন সামগ্রী বেচার কালে আপনার বলে নেয়া দরকার যে এর দাম চান আপনি শাহ-জহানী বা নতুন মুদ্রায়। না হলে আপনাকে দাম মেটান হবে পনের, কুড়ি কি তারও বেশি বছর আগে তৈরী টাকায়। সইতে হবে তখন আপনাকে শতকরা চার পর্যন্ত লোকসান। কেননা, যেসব মুদ্রার তৈরীকাল দু বছরের মধ্যে নয় তা বিনিময় করতে গেলেই তারা দাবি ক'রে বসবে ½ শতক, কিংবা নেহাৎ পক্ষে ¼ শতক। কোন পইসা বা টাকাটি কবে তৈরি হয়েছে তা পড়ার ক্ষমতা যেসব গরীব লোকের নেই তাদের ঠকতে হয় এর ফলে। সব সময়েই কিছু না কিছু কেটে রাখা হয় তাদের কাছ থেকে, টাকা প্রতি আধ বা এক পইসা, পইসা প্রতি তিন বা চার কড়ি।

রূপার টাকা নকল হতে দেখা যায় না বড় একটা। কখনো ক্বচিৎ কোন সাধারণ বণিকের দেয়া টাকার থলির মধ্যে যদি জাল টাকার দেখা মেলে তবে সেটি কেটে ফেলা ও চুপচাপ ক্ষতি সয়ে নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এনিয়ে হই-চই করতে গেলে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তা। সম্রাটের জারী করা আইন অনুসারে তখন সে টাকার থলিটি ফেরৎ দিতে হবে যার কাছ থেকে সেটি নেয়া হয়েছে তাকে। তিনি ফেরৎ দেবেন তাকে যিনি দিয়েছেন তার কাছে। এভাবে হাত ফিরতি হয়ে চলবে থলিটি যতক্ষণ না জানা পড়ছে টাকাটির নকলকারী কে। ধরা পড়ার পর শাস্তি হিসাবে কেটে নেয়া হবে তার একটি আঙুল। নকলকারী যদি ধরা না পড়ে, এবং প্রথম যিনি টাকার থলিটি দিয়েছেন তিনি যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তবে সামান্য জরিমানা আদায় ক'রে অব্যাহতি দেয়া হয় তাকে। এর ফলে বিরাট রোজগারের পথ খুলে গিয়েছে পোদ্দার বা শরাফদের। টাকা দেয়া কি নেয়া উভয় কালেই প্রত্যেকে সেগুলি যাচাই করিয়ে নেয় তাদের দিয়ে। এজন্য দস্তুরি পায় তারা প্রতি ১০০ টাকায় $\frac{1}{16}$ টাকা (বা এক আনা)।

সরকৎ (মাল-ই-সরকার) বা রাজকীয় কোষাগার থেকে খারাপ মুদ্রা দেয়া হয় না কখন। সংগৃহীত প্রত্যেকটি মুদ্রা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে থাকেন সম্রাটের শরাফরা। বড় বড় আমীরদেরও রয়েছে এ কাজের জন্য নিজস্ব শরাফ। কোষাগারে রাখার আগে কাঠকয়লা দিয়ে জ্বালানো বড় এক অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়া হয় রূপার টাকাগুলিকে। আগুনে তেতে যখন হয়ে যায় প্রত্যেকটি টকটকে লাল তখন জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে বার ক'রে আনা হয় সেগুলিকে। যদি

কোনটির রঙ নিরস দেখা যায় কিংবা তাতে অন্য ধাতুর মিশ্রণ রয়েছে জানা যায় কেটে ফেলা হয় সেটিকে সাথে সাথে। এছাড়াও কোষাগারে রাখার বেলা খোদাই যন্ত্রের সাহায্যে একটি বিশেষ চিহ্ন এঁকে দেয়া হয় প্রতিটি মুদ্রায়। এই ক্ষুদে চিহ্নটি ফোটাবার বেলা পুরো এফোঁড় ওফোঁড় করা হয় না মুদ্রাটিকে, সামান্য গভীর ক'রে দাগিয়ে দেয়া হয় মাত্র। এরকম সাত কি আটটি পর্যন্ত দাগ দেখা যায় এক একটি মুদ্রায়। তার মানে সাত কি আটবার রাজ-কোষাগার দর্শন ক'রে এসেছে সেটি। প্রতিটি থলিতে এক হাজার ক'রে মুদ্রা রেখে প্রধান কোষাধ্যক্ষের সীলমোহর দিয়ে এঁটে দেয়া হয় তার মুখ। ওপরে লিখে রাখা হয় কোন্ কোন্ বছরে তৈরী হয়েছে সে মুদ্রাগুলি। এই সূত্র ধরে সম্রাট ও আমীরদের কোষাধ্যক্ষরা ক'রে থাকে বেশ কিছু উপরি রোজগার। আপনি তো পণ্য বেচলেন হাল বছরে তৈরি নতুন টাকার ভিত্তিতে। এ দিকে কোষাধ্যক্ষদের কাছে যখন প্রাপ্য নিতে গেলেন তারা ছল খুঁজে চলল কি ক'রে আপনাকে তা মিটিয়ে দেয়া যায় পুরানো টাকায়। যার ফলে খোয়াতে হতে পারে আপনাকে শতকরা ছয় ভাগ পর্যন্ত। যদি আপনি নতুন টাকায় প্রাপ্য নিতে চান তাহলেই আপনাকে আপোষ-রফায় যেতে হবে তাদের সঙ্গে। পঞ্চমবারের ভ্রমণকালে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য গেলাম আমি (নবাব) শায়েস্তা খানের সঙ্গে দেখা করতে। আগের বার তাকে কথা দিয়েছিলাম, বেচার জন্য আগামীবার যা কিছু সামগ্রী নিয়ে আসব দেখাব তাকেই তা সর্বপ্রথম। তাই সুরাটে পৌঁছান মাত্র পাঠালাম আমার আগমন সংবাদ তাকে। তিনি তখন অবরোধ ক'রে রয়েছেন দাক্ষিণাত্যের চৌপার (চাকন) শহর। নির্দেশ এল সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। বেচলাম ইওরোপ থেকে নিয়ে আসা সামগ্রীর অধিকাংশই তার কাছে। তিনি জানালেন, সেনাদের দেয়ার জন্য ক'রে চলেছেন তিনি সুরাট থেকে টাকা আসার প্রতীক্ষা। যে কোনদিন এসে পড়তে পারে তা। এলেই ওঁই থেকে মিটিয়ে দেবেন আমার প্রাপ্য। যার অধীনে এরূপ এক বিশাল সেনাবাহিনী, তিনি যথেষ্ট টাকা সঙ্গে না নিয়েই এখানে এসেছেন আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। তাই আমি ভাবলাম সোনা-মোহর বা রূপার টাকায় আমার প্রাপ্য চুকিয়ে দেয়ার বেলা আগের বারের মত এবারও আমার কিছু লোকসান ঘটানোর মতলবে বলছেন এরকমটি তিনি। হল শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই। তবে, খাওয়াদাওয়ার জন্য আমার ও আমার লোকজনের ও সঙ্গের ভারবাহী পশুদের যা কিছু প্রয়োজনীয় তা প্রতিদিন দুবেলা

অকৃপণভাবে জুগিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন তিনি। বেশির ভাগ দিনই আমায় নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর সাথে একত্রে আহারের জন্য। দশ বারো দিন অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলাম, তিনি যে টাকার অপেক্ষা ক'রে চলেছেন তা এল না তখন চলে যাবার জন্য মনস্থির ক'রে গেলাম তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর তাঁবুতে। আমার ইচ্ছার কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন একটু, ভারি হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। বললেন: কি জন্যে চলে যেতে চাইছেন আপনি টাকা না নিয়েই? এভাবে টাকা না নিয়ে চলে গেলে কে তা দেবে পরে আপনাকে? তাঁরই মত গর্বিত ভঙ্গিমা ফুটিয়ে উত্তর দিলাম: আমার রাজাই তা দেবেন আমায়। তিনি এত মহানুভব যে বিদেশে কোন কিছু বিক্রী ক'রে তাঁর প্রাপ্য যদি তাঁর কোন প্রজা না পায় তিনি নিজেই ক'রে থাকেন তার ক্ষতি-পূরণ। উষ্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলেন: 'এভাবে তাঁর যে ক্ষতি ঘটবে তা কি ক'রে পূরণ করবেন আপনাদের রাজা'? আমি উত্তর দিলাম: দুই বা তিনখানি সেরা রণতরী পাঠিয়ে এদেশে। সুরাট বন্দর বা তার উপকূল-ভাগের কাছাকাছি এসে সেগুলি অপেক্ষা ক'রে চলবে মোচা থেকে ফিরে আসা জাহাজগুলির (ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য)। আমার এ উত্তর যেন হুল ফুটিয়ে দিল তাঁকে। যে রকম উপহাসসূচক কথাবার্তা বলছিলেন আর সাহস করলেন না তা বলে চলতে। ডেকে পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোষাধ্যক্ষকে। আদেশ করলেন ঔরঙ্গাবাদের ওপর আমাকে একখানি হুণ্ডি দিয়ে দেয়ার জন্য। এতে বেশ খুশী হলাম আমি। কেননা, গোলকুণ্ডা যাবার বেলা ঐ শহরটি হয়েই যেতে হবে আমাকে। তাছাড়া টাকা বয়ে নিয়ে চলার পরিবহন খরচ ও ঝুঁকি—রেহাই পেয়ে গেলাম দুইয়ের হাত থেকেই এর ফলে। পরদিনই পেয়ে গেলাম হুণ্ডিটি। বিদায় নিলাম নবাবের কাছ থেকে। ততক্ষণে উবে গেছে তাঁর রাগ। অনুরোধ করলেন, আবার যদি ভারতে আসি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুল না করি যেন। ষষ্ঠ বা শেষ ভ্রমণকালে রেখেছিলাম তাঁর সে অনুরোধ। যখন সুরাটে এলাম সেবার, তিনি তখন বাঙলায়। সেখানে গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সাথে। সঙ্গে নিয়ে আসা সামগ্রী মধ্যে যা পারস্যের শাহ কি মহাপ্রতাপী মুঘল সম্রাটের কাছে বেচতে পারিনি সেই পড়ে থাকা জিনিসগুলি তিনিই কিনে নিলেন আমার কাছ থেকে।

হুণ্ডিটির কথায় ফিরে আসি এবার। এলাম সেটি নিয়ে ঔরঙ্গাবাদ। দেখা করলাম সেখানকার প্রধান কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে। তিনি কখনো দেখেননি আমায়

এর আগে। তবে জানালেন, আমি যে কেন এসেছি তার কাছে তা জানেন তিনি। তিনদিন-হল জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। আমাকে দেয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে টাকার। এনে দেয়া হল আমায় টাকার থলিগুলি। আমার শরাফ খুললেন তার একটি থলি। দেখা গেল তাতে যে টাকা রয়েছে তা নিলে সইতে হবে আমায় শতকরা দু'ভাগ লোকসান। বিনীত ভ'বে কোষ'ধ্যক্ষকে আমি বললাম : আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার যে কি তা কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। আমি এখুনি শায়েস্তা খানের কাছে লোক পাঠাচ্ছি এর প্রতিবাদ জানাতে, যাতে নতুন টাকায় আমায় প্রাপ্য দেয়া হয় সেই দাবি পেশ করতে। নয়ত আমার কাছ থেকে যেসব সামগ্রী কেনা হয়েছে বলব তা ফেরত দিয়ে দেয়ার জন্য। করলাম সোজাসুজি তাই। কিন্তু যে লোকটিকে পাঠালাম তার কাছে সে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে কোন উত্তর নিয়ে ফিরে এল না দেখে গেলাম আবার কোষাধ্যক্ষের কাছে। বললাম, নবাবের কাছ থেকে যখন কোন খবর এল না তখন বিক্রী করা সামগ্রীগুলি ফেরত নেয়ার জন্য এবার আমি নিজেই যাচ্ছি তার কাছে। মনে হয়, কি তার করণীয় এ সম্পর্কে নির্দেশ পেয়ে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে। আমায় দৃঢ়মনা দেখে তিনি বললেন : যা আমি করতে চাইছি তা যদি সত্যিই করি দুঃখিত হবেন তিনি। ভাল হবে তার চেয়ে, যদি একটা আপোষ-রফায় আসি দুজনে আমরা। খানিক কথাবার্তার পর যে শতকরা দুই কম দেয়ার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন উদ্ধার করা সম্ভব হল তা থেকে শতকরা এক। বাকি একভাগ পাকাপাকিভাবেই খোয়াতে হত যদি না ওই সময়ে এসে পড়তেন অন্য একজন শরাফ। তার একটি হুণ্ডি ছিল গোলকুণ্ডার ওপর। অথচ হয়ে পড়েছিল তার অর্থের সমূহ দরকার। অতএব অতি আনন্দের সঙ্গে আমার নগদ টাকার পরিবর্তে আগ্রহ দেখালেন ওই হুণ্ডিটি হস্তান্তরিত করতে। যাতে পনের দিনের মধ্যেই গোলকুণ্ডায় নতুন মুদ্রায় প্রাপ্য পেয়ে যাই ক'রে দিলেন সে ব্যবস্থাও।

এইসব শরাফরা রূপার টাকা যাচাই করার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন ছোট ছোট তেরটি ধাতুখণ্ড। প্রত্যেকটি খণ্ডের অর্ধেকটা তামার আর বাকি অর্ধেকটা রূপার। এগুলি হল তাদের পরশপাথর। এই তেরটি খণ্ডের প্রত্যেকটির (রূপার) মান ভিন্ন ভিন্ন। অল্প পরিমাণ রূপার মুদ্রা বা কোন রূপার সামগ্রী যাচাই করতে হলে সেজন্য ব্যবহার করা হয় এগুলি। প্রচুর পরিমাণ রূপার মুদ্রার ক্ষেত্রে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণতঃ পরিশোধনকারীদের কাছে।

রূপা কেন'-বেচার জন্য ব্যবহার করা হয় 'তোলা' পরিমাপ। তোলার ওজন ৯ দেনিয়ের ৮ গ্রেনের্ব কিংবা ৩২ ভালের সমান। আর আগেই বলেছি, ৮১ ভালে এক (ফ্রেঞ্চ) আন্‌স। ফলে একশো তোলা হল ৩৮ আন্‌স ২১ দেনিয়ের ৮ গ্রেনের সমতুল।

তেরটি বিভিন্ন মানের রূপার প্রচলিত দাম এইরকম। একেবারে নিরস মানের রূপায় দাম প্রতি তোলা পনের পইসা যা আমাদের মুদ্রার ৯ সোল ২ দেনিয়েরের সমান। পরবর্তী অন্যান্য ১১টি মানের দাম তোলাপ্রতি যথাক্রমে ১৮, ২০, ২৩, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৬ ও ৪৯ পইসা।

এইসব শরাফদের চরম মিতব্যয়ী স্বভাবের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ বিবরণ। সাধারণভাবে ভারতবাসীদের প্রত্যেকেরই স্বভাব তাই। অথচ এ সম্পর্কে ইওরোপীয়রা কিন্তু সচেতন নয় এখন পর্যন্ত। দৃষ্টান্তরূপে এই বিশেষ উদাহরণটির উল্লেখই যথেষ্ট। কষ্টিপাথরে সোনা যাচাইয়ের পর তার যতটুকু সেই পাথরে লেগে থাকে আমরা উপেক্ষা করি সাধারণতঃ তাকে। অথচ তারা কিন্তু ওই নগণ্যতম অংশটুকুও তার নষ্ট হতে দেয় না। আধা কালো-পিচ ও আধা মোম দিয়ে তৈরি একটি ছোট্ট গোলকের সাহায্যে কষ্টিপাথরটি ঘসে তা সংগ্রহ ক'রে চলে তারা নিয়মিত ভাবে। বছর কয়েক পর ওই গোলাটি পুড়িয়ে বার ক'রে নেয় তার মধ্যে জমা হওয়া সোনা। এই গোলকটি আমাদের টেনিস বল আকারের। আর, কষ্টিপাথরটি আমাদের স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত পাথরের সাথে পুরোপুরি অভিন্ন।

যত কিছু পণ্যসামগ্রী মুঘল সাম্রাজ্যে উৎপাদিত হয় তার সবটা এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের উৎপাদনের আংশিক জড়ো হয় সুরাট বন্দরে। এখান থেকেই তা এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান যায় সাগর পথে। সুরাট পৌঁছে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য যেতে হবে আপনাকে লাহোর, আগ্রা, আহমদাবাদ, সিরোঞ্জ, বুরহানপুর, ঢাকা, পাটনা, বনারস, গোলকুণ্ডা, দাক্ষিণাত্য, বিজাপুর, দৌলতাবাদ প্রভৃতি শহরে। যাবার বেলা সঙ্গে নিতে হবে সুরাট থেকে রূপার টাকা, তাই দিয়ে সর্বত্র প্রাপ্য মেটাতে হবে সমান অনুপাতে। যদি এসব স্থানে মাল কিনতে গিয়ে টাকায় টান পড়ে যায়, দেয় টাকা মিটিয়ে দিতে পারেন সুরাটে এসে। এভাবে ধারে মাল কিনলে পরিশোধ করতে হবে তা দু-মাসের মধ্যে। দিতে হবে এজন্য বিলের ওপর চড়া হারে বিনিময় মূল্য।

সুরাটে পরিশোধ ক'রে দেয়ার সর্তে লাহোরে পণ্য কিনলে বা হুণ্ডি দিলে

গুণতে হয় তার ওপর ৬½ ভাগ। আগ্রার বেলা শতকরা ৭½ থেকে পাঁচ। আহমদাবাদের বেলা শতকরা এক থেকে দেড়। সিরোঞ্জের ক্ষেত্রে শতকরা তিন। বুরহানপুরের ক্ষেত্রে আড়াই থেকে তিন। ঢাকার বেলা দশ। পাটনার ক্ষেত্রে সাত থেকে আট। আর বনারসের ক্ষেত্রে ছয়।

শেষ তিনটি স্থানের বেলা হুণ্ডি দেয়া হয় একমাত্র আগ্রার ওপর, এবং আগ্রায় আবার সুরাটের ওপর। এ দুই যোগ করলে দাঁড়ায় ওপরে বলা খরচের পরিমাণ। গোলকুণ্ডার বেলা দিতে হয় চার থেকে পাঁচ শতাংশ। গোয়ার বেলাও তাই। দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে তিন শতাংশ। বিজাপুরের ক্ষেত্রেও তাই। আর দৌলতাবাদের বেলা এক থেকে দেড়।

কোন কোন বছর এই বিনিময় হার এক থেকে দুই শতাংশ বেড়ে যায় আরো। যখনই আঞ্চলিক রাজা কিংবা ক্ষুদ্র অধিপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে, শুল্ক দাবি ক'রে বসে তার এলাকার মধ্য দিয়ে মাল চলাচলের জন্য, তখনই দেখা দেয় এ ধরনের পরিস্থিতি। আগ্রা ও আহমদাবাদের মধ্যে আছেন এরকম দু-দুজন রাজা। একজন হলেন অস্তিবর [দস্তিবর বা দান্তওয়াড়া] অধিপতি, অন্যজন বড়গাঁও [সম্ভবতঃ বাগলানা] অধিপতি। এদিক থেকে দুজনেই তারা বড় হয়রান ক'রে থাকেন ব্যবসায়ীদের। সিরোঞ্জ ও বুরহানপুর হয়ে আগ্রা-সুরাট যাতায়াত করলে এ দুজন রাজার এলাকা এড়িয়ে চলা যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু এ সড়ক পথটি চলে গেছে উর্বরা এলাকার মধ্য দিয়ে, ফলে পার হতে হয় অনেকগুলি নদী। আর তার অধিকাংশ নদীতেই নেই কোন সেতু, নেই পারাপারের জন্য কোন নৌকাও। ফলে বর্ষা ঋতুর পরবর্তী দুটি মাস পর্যন্ত এ নদীগুলি পারাপার হওয়া হয়ে পড়ে একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, যেসব বণিকদের সাগর যাত্রার জন্য মরশুম মত সুরাট হাজির হওয়া জরুরী তারা সাধারণতঃ যাতায়াত করে এ দুই রাজার এলাকা হয়েই। এ পথ দিয়ে যাতায়াত করা চলে যে কোন ঋতুতেই। এমনকি বর্ষাকালেও। বরং এ সময়ে জলে বালি জমাট বেঁধে যাতায়াতের সুবিধা ক'রে দেয় আরো। আর পুরো দেশটিই তাদের বলতে গেলে বালুকাকীর্ণ। তাছাড়া, বিনিময় হার অধিক হওয়ায় অবাক হবার কোন কারণও নেই কিন্তু। কেননা, যারা এভাবে টাকা ধার দেয়, নিতে হয় তাদের যথেষ্ট ঝুঁকি। পাঠানো মাল যদি পথে চুরি হয়ে যায় হারাতে হয় তাদের পুরো টাকাটাই।

জাহাজে চড়ার জন্য সুরাট এসে যাবার পর পাবেন আপনি যথেষ্ট টাকার

দেখা। ভারতীয় অভিজাতদের প্রধান ব্যবসাই হল লাভের আশায় জাহাজের ওপর টাকা লগ্নী করা। হরমুজ, বসরা, মোচা, এমনকি বস্তম, অচীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গামী জাহাজের ওপরও তারা লগ্নী করেন নিয়মিত। মোচা ও বসরার জন্য বিনিময় হার হল ২২ থেকে ২৪ শতাংশ। হরমুজের ক্ষেত্রে ১৬ থেকে ২০। অন্য যেসব স্থানের নাম করেছি তার বেলা প্রতিটি স্থানের দূরত্ব অনুযায়ী। ঝড় বাত্যার দরুন পণ্য-সামগ্রী যদি খোয়া যায়, কিংবা লুট ক'রে নেয় ভারত-সাগরীয় অঞ্চল জলদস্যুগিরিতে রত মালাবারীরা, তাহলে ক্ষতি সইতে হয় যিনি তার ওপর টাকা ধার দিয়েছেন সেই মহাজনকেই।

ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে শোনাতে চাই একটি কথা শুধু য আর। এখানে, পৃষ্ঠ র কিনারে, দেয়া হল আগ্রায় ব্যবহৃত এল ব গজ এর এক-দশমাংশ এবং আহমদাবাদ ও সুরাটে চলিত এলের এক-অষ্টমাংশের দৈর্ঘ, ওজনের ক্ষেত্রে সেখানকার সাধারণ 'মণ' আমাদের ১৬ আনস ওজনের লিভারের ৬৯ লিভারের সমান। কিন্তু নীল ওজন করার বেলা যে মণের ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু ৫৩ লিভারের সমতুল। সুরাটে সবকিছু চলে সেরের হিসাবে। তাদের এক সের আমাদের ১৬ আনস-ওলা লিভারের পৌনে দুই লিভার।

।। তিন ।। ভারতের যানবাহন, পরিবহন ব্যবস্থা ও ভ্রমণ-রীতি

আগ্রা ভ্রমণের জন্য যাত্রাশুরুর আগে একটুখানি শুনিয়ে নেয়া যাক ভারতের পরিবহন সংস্থা ও পর্যটন রীতি-নীতির কথা। পর্যটনকে স্বাচ্ছন্দ্যকর ক'রে তোলার জন্য ফ্রান্স বা ইটালীতে যে সব বিধি-ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, এখানকার বিধি-ব্যবস্থা তার তুলনায় কোন অংশে খাটো বা কম অস্বাচ্ছন্দ্যকর নয় আমার মতে। পারস্যের চেয়ে এখানকার পরিবহন ব্যবস্থা বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। ক্যারাভান বা পর্যটক ও বণিকদলের যাতায়াত ও মাল আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় না এখানে গাধা, খচ্চর কিংবা ঘোড়া। এখানকার ভূ-ভাগ যথেষ্ট সমতল বলে সব-ধরনের পরিবহনের জন্যই কাজে লাগান হয় ষাঁড় ও শকট। যে সব সওদাগর

পারস্য থেকে একটি ক'রে ঘোড়া সঙ্গে আনেন, তারা এটি করেন শুধু জাঁক দেখানোর জন্যই। হয় সারা পথ লাগাম ধরে সেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেন, নয়তো সুবিধামতো দর পেলে বেচে দেন কোন অভিজাতের কাছে।

এক একটি ষাঁড়ের পিঠে ৩০০ থেকে ৩৫০ লিভার (মোটামুটি চার থেকে পাঁচ মণ) বোঝা চাপান হয় সাধারণতঃ। লবণ, ভুট্টা, চাল প্রভৃতি পণ্য সামগ্রী পিঠে নিয়ে এক একটি যাত্রী বা বণিকদলের সঙ্গে যখন দশ থেকে বার হাজার ষাঁড় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এগোয় তখন সত্যই তা দেখার মতো একটি দৃশ্য। এই পণ্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয় তারা বিশেষ-বিশেষ বিনিময় কেন্দ্র-গুলিতে। যেখানে শুধু গম জন্মায় সেখানে নিয়ে যায় চাল, যেখানে চাল জন্মায় সেখানে নিয়ে যায় গম জাতীয় শস্যাদি, যে সব অঞ্চলে লবণ নেই সেখানে নিয়ে যায় লবণ। এ ধরনের পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয় উট-ও, তবে খুব কম। প্রধানতঃ অভিজাতদের লটবহর বয়ে নেয়ার জন্যই সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে সেগুলিকে। যখন মরসুমের চাপ দেখা দেয়, সময়মতো জাহাজে মাল তোলার জন্য তাড়াতাড়ি সুরাট পৌঁছানোর দরকার হয়, তখন নিয়ে যাওয়া হয় তা শকটের বদলে ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিটি এলাকাই সু-আবাদী। প্রতিটি মাঠ সুষ্ঠু ভাবে জলখাত দিয়ে ঘেরা। সেচের জন্য প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব পুকুর বা জলভাণ্ডার। ফলে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় যাত্রীদলকে। যখনই ওপরে বলা ধরনের অন্য কোন যাত্রী বা শকট বাহিনীর মুখোমুখি হয় তারা, পথ যথেষ্ট প্রশস্ত না হওয়ার দরুন দু তিন দিন পর্যন্ত চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয় এক এক সময়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য দলটি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারেই উপায় থাকে না এগোবার। যে সব লোক এইসব ষাঁড় চালকের কাজ করে তারা আর কোন পেশায় না. গিয়ে পড়ে থাকে জীবনভর শুধু এই নিয়েই। ঘর বেঁধে স্থায়ী ভাবে বাস করে না তারা কোথাও, সারা জীবন পথ চলে বেড়ায় স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে। রয়েছে এদের কারো কারো একশোটি পর্যন্ত ষাঁড়। অন্যদের কারো বা তার চেয়ে কম, কারো বা বেশি। একজন সর্দারও আছে এদের। তিনিই পালন করেন এদের রাজার ভূমিকা। গলায় তার সর্বক্ষণ ঝোলানো থাকে একটি মুক্তোর মালা। যে চালকগোষ্ঠী গম, জোয়ার প্রভৃতি পরিবহন কর্মে নিয়োজিত তারা যখন চাল পরিবহন বাহিনীর মুখোমুখি হয় তখন একে অন্যকে পথ ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে লেগে যায় প্রায়ই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। তাদের ভেতর এ ধরনের বিবাদ বিসম্বাদ রাজ্যের

ব্যবসা-বাণিজ্য ও খাদ্য পরিবহনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে ক'রে মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হল এক বৈঠকের। উভয় গোষ্ঠীর প্রধানই এলেন তাঁর কাছে। উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থে যাতে তারা সৌহার্দ বজায় রেখে চলে, আর যাতে মারামারি ক'রে রক্ত ঝরানো না হয় ভবিষ্যতে এ জন্য সম্রাট উপদেশ দিলেন দুজনকে। উপহার দিলেন দুই দলপতিকে এক লক্ষ ক'রে টাকা ও একছড়া ক'রে মুক্তার মালা।

ভারতের পরিবহন রীতির কথা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে জানা দরকার যে এদেশের বিগ্রহ-পূজকদের মধ্যে চারটি উপগোষ্ঠী বর্তমান। এরা মনারী (বনজারা?) নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মতো। এরা তাঁবুতে বাস করতে অভ্যস্ত। এবং অন্য আর কোন পেশায় মন না দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্যশস্যাদি পরিবহনকেই বেছে নিয়েছে আপন জীবিকা রূপে। এদের প্রথম গোষ্ঠীটি পরিবহন করে শুধু গম, বজরা প্রভৃতি। দ্বিতীয় গোষ্ঠী চাল। তৃতীয় গোষ্ঠী ডাল। এবং চতুর্থ গোষ্ঠী নুন। শেষেরটি পাওয়া যায় প্রধানতঃ সুরাট থেকে। আনা হয় এমনকি সুদূর কুমারিকা অন্তরীপ থেকেও। এদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সহজেই চেনা যায় তাদের কপালে আঁকা তিলক থেকে। এদের পুরোহিতেরা, যাদের কথা অন্যত্র বলব, প্রথম গোষ্ঠীর লোকেদের চিহ্নিত ক'রে থাকে লাল কাথ দিয়ে। নাকের ওপর একটি টানা দাগ সহ এঁকে দেয়া হয় কপালে তা দিয়ে একটি চুড়োর মতো। আটকে দেয়া হয় তার ওপরে গোলাপ ফুলের আকারে কখনো বা নটি কখনো বা বারোটি গমের দানা। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকেদের চিত্রিত করা হয় হলদে কাথ দিয়ে একই ভাবে। তবে আটকে দেয়া হয় তার ওপরে চাল। তৃতীয় গোষ্ঠীটির লোকদের চিত্রিত করা হয় ধূসর রঙা কাথ দিয়ে, আটকানো হয় তাদের তিলকের ওপর জোয়ার। চিত্রিত করা হয় তাদের কাঁধও, তবে আটকানো হয় না সেখানে কোন শস্যদানা। চতুর্থ গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের গলায় ঝোলানো একটি থলিতে ক'রে বয়ে বেড়ায় এক চাকা লবণ। চাকাটির ওজন কখনো কখনো আট থেকে দশ লিভার পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার বেলা পেটে আঘাত করে তারা সেই চাকাটি দিয়ে। এছাড়া প্রত্যেকেরই গলায় ঝোলানো রয়েছে বড় হেজেল-বাদামের আকারে একটি ক'রে তাবিজ। ঝোলায় এগুলি তাদের ষাঁড় ও অন্যান্য পোষা প্রাণীদের গলায়ও। আপন ছেলেমেয়েদের মতোই ভালোবাসে তাদের। বিশেষ ক'রে নিঃসন্তান হলে তো কথাই নেই।

এদের মেয়েদের পোশাক-আশাক বলতে শুধু যা একখণ্ড সাদা বা রঙীন সাধারণ কাপড়। কোমরের নিচে পাঁচ-ছ ফেরতা প্যাঁচ দিয়ে সায়ার মত ক'রে সেটি পরে তারা। মনে হবে, বুঝিবা একের ওপর আর পরেছে তিন চারটি ক'রে সায়া। কোমর থেকে ওপরের দিকে গায়ে ফুলের নক্সা আঁকা। বিভিন্ন প্রকার গাছের শিকড়ের রস দিয়ে বহুবর্ণে রঞ্জিত করে তারা এই ফুলগুলিকে। দেখলে মনে হবে তাদের গায়ের চামড়াটি বুঝিবা একখণ্ড ফুলের নক্সা তোলা কাপড়।

ভোরবেলা পুরুষরা যখন বাহনগুলির পিঠে বোঝা চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মেয়েরা লেগে পড়ে তাঁবুগুলি খুলে তা গুটিয়ে নেয়ার কাজে। পুরোহিতরাও থাকে দলের সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে তাঁবু ফেলা হয়েছে, সেখানকার সব থেকে মনোরম স্থানটিতে এসময়ে গোষ্ঠীদেবতার বিগ্রহটিকে স্থাপনা করেন তিনি। এই বিগ্রহটি একটি নাগের। ছ-সাত ফুট উঁচু একটি লাঠির সঙ্গে জড়ানো। তাকে প্রণাম জানাতে ছোটে দলের প্রত্যেকে। মেয়েরা তিনবার ক'রে পাক খেয়ে চলে তাকে ঘিরে। সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ হলে বিগ্রহটিকে সরিয়ে নেন পুরোহিত। তার জন্য পৃথক নির্দিষ্ট ষাঁড়ের পিঠে রাখেন সেটিকে।

শকট বাহিনীতে থাকে সাধারণতঃ একশো বা বড় জোর দুশো শকট। দশ থেকে বারোটি ষাঁড় টেনে নিয়ে চলে এক একটি শকটকে। সঙ্গে থাকে চারজন ক'রে সৈনিক। পণ্যের মালিককেই গুণতে হয় তাদের মাইনে। শকটটির গায়ে প্যাঁচানো থাকে দুগাছা কাছি। তার প্রান্তগুলি দুপাশে বার করা। সৈনিক চারজন কাছির সেই চার প্রান্ত ধরে হেঁটে চলেন শকটের দুপাশে। রাস্তা খারাপের দরুন যদি কখনো বেসামাল হয়ে শকটটি কোন দিকে উলটে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন বিপরীত দিকে থাকা সৈনিক দুজন ওই কাছি ধরে রোধ করেন তা।

আগ্রাসহ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যেসব শকটবাহিনী সুরাট আসে এবং ফিরে যায় আগ্রা ও জহানাবাদ হয়ে, তাদের প্রত্যেককে বাধ্য করা হয় চুণ বয়ে নিয়ে যেতে। ব্রোচ থেকে আসে এ চুর্ণ। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মার্বেল পাথরের মত জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যায় এগুলি (এ সম্পর্কে Watt-এর **Commercial Products of India** পৃষ্ঠা ৭১৩ দেখুন)। সম্রাটের বিরাট আয় হয়ে থাকে এ থেকে। এ চুণ তিনিই পাঠান আপন ইচ্ছামত যেখানে খুশী। এগুলি পরিবহন করার প্রতিদানে ওইসব শকট থেকে আদায় করা হয় না কোনরকম শুল্ক।

এবার বলা যাক ভারতের ভ্রমণ-রীতি সম্পর্কে। ষাঁড়ই পালন করে এদেশে ঘোড়ার ভূমিকা। এদের কতক এমন স্বচ্ছন্দ গতি যে আমাদের দেশের ভাডাটে ঘোডার সাথে তুলনীয়। তবে, কেনা বা ভাড়া করার সময় দৃষ্টি দেয়া দরকার, যেন এক ফুটের চেয়ে দীঘল না হয় এদের শিঙ। সেক্ষেত্রে মাছি তাডানোর জন্য পিছন দিকে মাথা ঘোরাতে গিয়ে কখন হয়ত ছেঁদা ক'রে দেবে আপনারই পেট। এরকম কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বলেই শোনালাম আপনাকে এ সাবধানবাণী। আমাদের ঘোড়ার মতই চালাতে হয় এগুলিকে। বলগা বলতে শুধু যা একখণ্ড দড়ি। আঁটা রয়েছে এটি হয় তাদের মুখবন্ধনী নয়ত নাসা-বন্ধনীর সাথে। যেসব অঞ্চল সমতল, পাথর-শূন্য, সেখানে নাল পরানো হয় না এদের পায়ে। যেসব অঞ্চল অসমতল রুক্ষ সেখানে পা সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় এর। ইওরোপে ষাঁডকে সাজ পরাতে হলে তা সাধারণতঃ আটকানো হয় তার শিঙের সাথে। কিন্তু ভারতীয় ষাঁডের কাঁধে রয়েছে বড আকারের কুঁজ। চার আঙুল চওড়া চামডার ফাঁস অনায়াসে আটকানো চলে এর সঙ্গে। তাই সাজ পরানোর বেলা সেটিকে কুঁজের সঙ্গে আটকে দেয়া হয় একটি ফাঁস দিয়ে।

একসাথে দুজনে বসে ভ্রমণ করার মত ছোট ও অতি হালকা ধরনের গাড়িও (বহল) রয়েছে এদেশে। তবে, অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হলে একা একটি গাডিতে ঠাঁই নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এর ফলে নিজের পোশাক-আশাক, পানীয় সম্ভার এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ছোটখাট জিনিসগুলিও পারবেন সাথে নিয়ে যেতে। মাত্র একজোড়া ষাঁড় টানে এ গাডি। এই গাডি বা বহলগুলি আমাদের মত গদি মোড়া ও পর্দা ঘেরা হলেও (ঝাঁকুনি প্রতিরোধের জন্য) আলগা ভাবে ঝোলান নয়। তবে আমার শেষ বারের পর্যটনকালে আমাদের দেশের আদলে ওইরকম একটি গাডি বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি। এটি টানার জন্য একজোডা ষাঁড় সংগ্রহ করতে খরচ হয়েছিল আমার ৬০০ টাকা। এ দাম শুনে চমকাবেন না যেন। কতক ষাঁড আছে যে-গুলি রীতিমত তেজী। ক্ষমতা রাখে একটানা ৬০ দিন পর্যন্ত পথচলার। অতিক্রম ক'রে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ ক্রোশ পথ। চলে একটানা সারাক্ষণ। ভ্রমণ পথের আধেক পার হবার পর প্রতিদিন খাওয়ানো হয় তাদের আমাদের পেনি-রোলের আকারের দু'তিন দলা ঘি ও গুড় মাখানো ময়দা। এছাড়াও প্রতি সন্ধ্যায় আধঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে মটর-কলাই চূর্ণ। এক একটি গাড়ির ভাড় দৈনিক প্রায় এক টাকা। সুরাট থেকে সড়ক পথে আগ্রা যেতে হলে পথে কাটাতে হবে

আপনাকে ৩৫ থেকে ৪০ দিন, পুরো ভ্রমণের জন্য ভাড়া গুণতে হবে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যেতে হলেও পার হতে হয় প্রায় একই দূরত্ব, খরচও তাই সমান। সারা ভারতের যেখানেই যান, গুণতে হবে এই একই হারে ভাড়া।

আরাম ভোগের জন্য যারা কড়ি গোণার ক্ষমতা রাখেন তাদের ঝোঁক পালকীতে ক'রে বেড়ানোর দিকে। এতে চড়ে ভ্রমণ করতে অতি আরাম। এটি এক ধরনের শোবার পালঙ্ক, ৬ থেকে ৭ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া, চারপাশ নিচু গরাদ দিয়ে ঘেরা। বাঁশ নামে এক ধরনের বেত আছে এ দেশে। কাঁচা অবস্থায় তাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে, তার ওপর মখমল বা কিংখাব জুড়ে তৈরি করা হয় পালকীর ওপরকার ছাউনি। পথ চলার বেলা যখন যেদিক থেকে রোদ পড়ে, সেদিককার ছাউনি ফেলে রোদ আড়াল ক'রে দেয় পালকীর পাশে পাশে হেঁটে চলা একজন পরিচারক। আরেকজন পরিচারক বয়ে চলে একটি লাঠির মাথায় কঞ্চি বা বেত দিয়ে বুনোট একটি ঢালের মত জিনিস। সুন্দর ধরনের কাপড় দিয়ে মোড়া এটি। পালকীর আরোহীর মুখে রোদ পড়লে এটি দিয়ে আড়াল করে তাড়াতাড়ি সে তা। পালকীটি বয়ে নিয়ে চলার জন্য দরকার হয় সামনে ও পিছনে খুব বেশি হলে তিনজন ক'রে লোক। প্যারিসে আমাদের কেদারা বাহকেরা যে গতিতে এগোয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে এটি বয়ে চলে এরা। এবং অনেক স্বচ্ছন্দ গতিতে। কেননা, ছোটবেলা থেকেই তালিম পায় তারা এ জীবিকায়। যদি আপনার খুব তাড়াতাড়ি যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, এগোতে চান দৈনিক ১৩-১৪ কোশ, নিন পালকী বয়ে চলার জন্য ১২ জন লোক সাথে। তাহলে পালা ক'রে বয়ে চলার ও বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবে তারা। তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে আপনার সর্বমোট মাসিক চার টাকা। যদি দূর পাল্লার যাত্রা হয়, টানা ৬০ দিনেরও বেশি বাইরে কাটাতে হয়, তাহলে মাসিক পাঁচ টাকা।

যারা সম্ভ্রম জাগানোর ভঙ্গিমায় ভ্রমণ করতে চান, বহল বা পালকী যাতেই চাপুন না কেন, সঙ্গে নেন কুড়ি কি তিরিশজন সশস্ত্র রক্ষী। কতকের হাতে তীর-ধনুক, বাকিদের কাছে মাস্কেট বা পলতে বন্দুক। পালকী-বাহকদের সমান এদের মাইনে। ব্যাপারটি চোখ-ধাঁধানো ক'রে তোলার জন্য সময়ে সময়ে সঙ্গে নিয়ে চলেন একটি পতাকাও। কোম্পানীর মর্যাদা বাড়াবার জন্য ইংরাজ ও ডাচরা এভাবেই পর্যটন করে সবসময়ে। সঙ্গে নেয়া রক্ষীরা শুধু মর্যাদা বৃদ্ধিতেই

সহায়ক হয় না, আগে তার নিরাপত্তার দিকটিও। দেয় পালা ক'রে রাত্রি-প্রহরা। মোট কথা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা অভিযোগ করার কোন সুযোগই দেবে না তারা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে শহর থেকেই এদের ভাড়া' করুন না কেন, সেখানে থাকা এদের সর্দার দায়বদ্ধ থাকেন এদের সততার জন্য। নিযুক্তি লাভের বেলা এরা প্রত্যেকে দেয় তাকে একটাকা ক'রে।

প্রতিটি বড় গ্রামেই পাবেন সাধারণতঃ একজন ক'রে প্রশাসকের দেখা। কিনতে পাবেন ভেড়া, মুরগি ও পায়রা। কিন্তু যেসব গ্রামে শুধু বণিয়া (বা হিন্দু)-দের বাস সেখানে মিলবে শুধু ময়দা, চাল, শাক-সবজি ও দুধ।

যেসব পর্যটক ভারতের প্রবল উত্তাপ গা-সহা ক'রে তুলতে পারেননি, বাধ্য হয়েই তারা পথ চলেন রাতে এবং বিশ্রাম নেন দিনে। যখন তারা কোন শহরে আশ্রয় নেন, সেটি দেয়াল ঘেরা হলে, রাতে পথ চলার জন্য শহর ত্যাগ করতে হয় সন্ধ্যার আগেই। কেননা, রাত নামলেই বন্ধ হয়ে যায় শহরের ফটক। আপন এলাকা মধ্যে কোন চুরি ডাকাতি হলে শহরের শাসনকর্তাকে সেজন্য জবাবদিহি করতে হয় বলে রাতে কাউকেই অনুমতি দেন না শহর ত্যাগ করার। বলেন—এই-ই সম্রাটের আদেশ এবং আমি তা মেনে চলতে বাধ্য। আমি নিজে যখনই এরূপ শহরে উপস্থিত হয়েছি, প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী কিনে নিয়ে, সন্ধ্যার আগেই শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছি কোন না কোন গাছতলায় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে। অপেক্ষা করেছি সেখানে যাত্রা শুরুর সময় না হওয়া অবধি।

ভারতে দূরত্ব মাপা হয় গোস (বা গো) এবং ক্রোশ পরিমাপ ভিত্তিতে। এক গোস প্রায় আমাদের চার লীগের কাছাকাছি। আর এক কোশ মোটামুটি-ভাবে এক লীগের সমান। [গোস বা গো পরিমাপ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। এক গোস ৮ বা ১০ মাইলের সমান বা চার কোশের কাছাকাছি। সিংহলীয় গোস ৩½ থেকে চার মাইল। পুরানো ফরাসী লীগের দূরত্ব ২ মাইল ৭৪৩ গজ। আর ক্রোশ বা কোশের আকবর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য ২ মাইল ১০৩৮ গজের সমান। তবে ভারতের সর্বত্র কোশের প্রচলিত দৈর্ঘ্য একরকম নয়। এসম্পর্কে আইন-ই-আকবরী দেখুন।]

।। চার ।।

সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রা যাবার পথ-পরিচয়

তুরস্ক ও পারস্যের পথঘাট আমার যতটা সুপরিচিত, ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলির পথঘাট আদপেই কম অজানা নয় তার চেয়ে। প্যারিস থেকে ইস্পাহান গিযেছি আমি ছবার। আর ইস্পাহান থেকে আগ্রা ও বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আরো কতক অঞ্চলে গিয়েছি তারও দ্বিগুণ বার।

আগেই বলেছি, সুরাট থেকে আগ্রা যাবার জন্য রয়েছে দুটি সড়ক পথ। একটি বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে। অন্যটি আহমদাবাদ হয়ে। এখানে শোনাই প্রথম সড়কপথটির বিবরণ।

সুরাট থেকে ১৪ কোশ এগিয়ে গেলে বরনোলি (বরদোলি)। এটি একটি বড় শহর। খেয়ার সাহায্যে একটি নদী (পূর্ণা নদী) পার হতে হয় এখানে। যাত্রার এই প্রথম পর্বটিতে যে এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা মিশ্র ধরনের। কোথাও দেখা মেলে অরণ্যের। কোথাও গম আর ধান ক্ষেত।

বরনোলি থেকে বলোর দশ কোশ। এটি একটি বড় গ্রাম। প্রায় এক কোশ পরিধির একটি জলাধারের গা ঘেঁসে গ্রামটি। তীরের কাছে সুন্দর একটি দুর্গ। তবে পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে। গ্রামটির প্রায় পৌনে এক কোশ কাছাকাছি বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী। একটি অগভীর স্থান দিয়ে হওয়া যায় হেঁটে পার। তবে অনেক কষ্টে। জলের নিচে মাথা উঁচু করা অনেক পাথর ও শিলাখণ্ড, যে কোন সময়ে উলটে যেতে পারে গাড়ি। দ্বিতীয় দিনের এই সড়ক পথ চলে গেছে পুরো বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

বলোর থেকে কেরকোয়া (আধুনিক কিরকা) বা যার এখন চলতি নাম বেগমসাহেবার সরাইখানা পাঁচ কোশ পথ। সরাইটি বড়, অনেকটা জায়গা নিয়ে গড়া। শাহ-জহানের (বড়) মেয়ে বেগম সাহেবার আদেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠান রূপে তৈরি হয়েছে এটি। আগে বলোর থেকে নবপুর পর্বটি ছিল বেশ দীর্ঘ। যে রাজারা মুঘলদের করদ হওয়া সত্ত্বেও আধিপত্য মেনে নিতে আগ্রহী ছিলেন না তাদেরই রাজ্য সীমানায় এ স্থানটি। ফলে প্রতিটি যাত্রীদলকেই সইতে হত

এখানে কিছু না কিছু লাঞ্ছনা। তার ওপর সারা রাজ্যটিই আবার অরণ্য ভরা। এই সরাইখানা থেকে নবপুর যাবার পথে হেঁটে পার হতে হয় দুটি নদী। একটি মধ্যপথে, অন্যটি নবপুরের কাছে (দুটিই তাপ্তীর শাখা নদী)।

কেরকোয়া থেকে নবপুর (বা নারায়ণপুর) পনেরো কোশ। এটি একটি বড় গ্রাম, অনেক তাঁতীর বাস এখানে। তহলেও চালই এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য। পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাবরে দরুন তা উর্বর ক'রে তুলেছে এখানকার জমিকে ; ধান চাষের জন্য যত জলের প্রয়োজন তা মেলে এটি থেকেই। এ রাজ্যে যত চাল উৎপাদিত হয় তার মানের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এজন্য খুব কদর এর। এ চালের আকার খুব ছোট, সাধারণ চালের অর্ধেক। ভাত এত ধবধবে হয় যে হার মানায় তুষারকেও। তাছাড়া কস্তুরীর মত সুগন্ধীও আবার। ভারতের প্রতিটি অভিজাতই খান না এছাড়া অন্য আর কোন চাল (বাসমতী বা পুথদাস চাল)। পারস্যের কাউকে কোন লোভনীয় উপহার দিতে হলে নিন এই চাল একটি বস্তা তার জন্য। কেরকোয়ার কাছ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে সেটি ও এখাদে বলা অন্যান্য নদীগুলি মিশেছে গিয়ে সুরাট (তাপ্তী) নদীতে।

নবপুর থেকে নসরবর (নন্দুরবার) ৯ কোশ। নসরবর থেকে দোল-মেদন ১৪ কোশ। দোল-মেদন থেকে সেনকেরা (সিনখেদা) ৭ কোশ। সেনকেরা থেকে তাল্লেনের (থালনের) দশ কোশ। এই তাল্লেনেরে যে নদীটি পার হতে হয় সেটি চলে গেছে ব্রোচের দিকে (এ তথ্য ভুল। থালমেরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটি তাপ্তী। আর ব্রোচ অভিমুখী নদীটি হল নর্মদা)। সেখানে এ নদীটি খুব চওড়া। আরো এগিয়ে মিশিছে গিয়ে কাম্বে উপসাগরে।

তাল্লেনের থেকে চৌপরি (চোপরা) ১৫ কোশ। সেখান থেকে সেনকুইলিস (সাঙ্কলী) ১৩ কোশ। তারপর নবির (ববের) দশ কোশ। সেখান থেকে বলদেজপুর (বল্লেদা) ৯ কোশ। এই বলদেজপুরে ব্রামপুর (বুরহানপুর)-এ দেয় শুল্ক মেটাতে হয় পণ্য বোঝাই শকটগুলিকে। যাত্রীবাহী শকটগুলিকে অবশ্য গুণতে হয় না কোন শুল্ক। নবপুর থেকে ব্রামপুর পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটিই গম, চাল ও নীলের জন্য খ্যাত। বলদেলপুর থেকে ব্রামপুর (বুরহানপুর) পাঁচ কোশ।

ব্রামপুর একটি বড়সড়, বহু ভগ্নাবশেষ ছড়ানো শহর। ঘর-বাড়ির বেশির ভাগই খড়ের ছাউনি। শহরের ঠিক মাঝেই রয়েছে একটি বড় দুর্গ, এখনো খাড়া সেটি (আকবরের তৈরি লাল কেল্লা)। এটিই শাসনকর্তার আবাস। এ প্রদেশটির শাসন-গুরুত্ব এত অধিক যে সম্রাটের কোন পুত্র বা কাকা-মামার ওপর দেয়া

হয়ে থাকে সে দায়িত্ব শুধু। বর্তমান সম্রাট ঔরঙজেব, তার পিতার রাজত্ব সময়ে দীর্ঘকাল শাসন করেছেন এ প্রদেশটি। পরে যখন উপলব্ধিতে এল, বাঙলা সুবার ওপর নজর দিলে কিরূপ লাভবান হওয়া যেতে পারে, দেয়া হল তখন তার ওপরেই গুরুত্ব। সেটিই পরিণত হল প্রতাপবান মুঘল সাম্রাজ্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুবায়। পূর্বে এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। যাই হোক, প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে রামপুর শহরটিতে। এই জেলা ও সমগ্র সুবাটিতে করা হয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রসম্ভার উৎপাদন। পারস্য, তুরস্ক, মাস্কোভি, পোলাণ্ড, অ্যারাবীয়া, গ্রাণ্ড কায়রো ও অন্যান্য দেশে হয়ে থাকে তা রপ্তানি। এর কতক বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা, ফুলের নক্সা তোলা। মেয়েরা ওড়না ও অবগুণ্ঠন হিসাবে ব্যবহার করে এগুলি। ব্যবহার করা হয় বিছানার আচ্ছাদনী এবং রুমাল হিসাবেও। কতক বস্ত্র আবার একেবারেই সাদা, স্ফূর্তি ক'রে সোনা বা রূপার সুতা দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ডোরা কাটা। দুদিককার আঁচলের দিকটিতেও এক ইঞ্চি থেকে বারো কি পনেরো, কোন কোনটিতে আরো বেশি বা কম চওড়া ক'রে সোনা, রূপা বা রেশমের সুতা দিয়ে ফুলের নক্সা তোলা। এগুলির সোজা-উলটা বলে কিছু নেই, দুদিকই সমান সুন্দর। পোলাণ্ডে দারুণ চাহিদা রয়েছে এর। সেখানে যেগুলি রপ্তানি করা হয় সেগুলির আঁচলে যদি অন্ততঃ তিন-চার ইঞ্চি চওড়া সোনা বা রূপার কাজ না থাকে তবে বিক্রী করা বেশ শক্ত। আবার সুরাট থেকে হরমুজ, ট্রেবিজোন্দ থেকে কৃষ্ণ-সাগরের মিনগ্রেলিয়া বা অন্যান্য বন্দর পর্যন্ত সাগর-পাড়ি দেয়ার বেলা যদি এই সোনা ও রূপা কালচে হয়ে যায় তাহলে বেচার সময়ে অনেক ক্ষতি সইতে হয় সওদাগরদের। তাই সেগুলিকে অতি যত্নের সঙ্গে প্যাক করতে হয়, রীতিমত সতর্ক থাকতে হয় যাতে ড্যাম্প না লাগে। এরূপ সুদীর্ঘ সাগর যাত্রায় যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় এজন্য। কতক রঙের আবার সারা গায়েই ডোরা কাটা, অর্ধেক কাপাস, অর্ধেক সোনা বা রূপার সুতা দিয়ে বোনা। এ ধরনের বস্ত্রগুলিকে বলা হয় ওড়নী। এক একটি খণ্ডে থাকে পনেরো থেকে কুড়ি এল (বা গজ) বস্ত্র, দাম একশো থেকে দেড়শো টাকা। যেগুলি সবচেয়ে সস্তা তার দামও প্রতি খণ্ড দশ বা বারো টাকার নিচে নয়। যেগুলি শুধু দুই এলের মত লম্বা সেগুলিকে ওড়না বা অবগুণ্ঠন রূপে ব্যবহার করে মেয়েরা। পারস্য ও তুরস্কে ব্যাপকভাবে বিক্রী হয় এগুলি। অন্যান্য ধরনের বস্ত্রও তৈরি হয় রামপুরে। তুলার এত প্রাচুর্য রয়েছে এমন প্রদেশ সারা ভারতবর্ষে দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়ে না।

ব্রামপুর ছেড়ে যাত্রা করার পর ওপরে বলা বড় নদীটি (তাপ্তী) ছাড়া পার হতে হয় আরো একটি নদী। কোন সেতু নেই এটির ওপর। তাই, জল যখন কম থাকে তখন চরা এলাকা দিয়ে হেঁটে পার হতে হয়, বর্ষাকালে চড়তে হয় নৌকায়। সুরাট থেকে ব্রামপুরের দূরত্ব ১৩২ কোশ। এই কোশই হল ভারতবর্ষে পথ-পরিমাপের নিম্নতম একক। শকটগুলি এক ঘন্টারও কম সময় নেয় এই দূরত্ব পার হতে।

ব্রামপুর থেকে পিগুন্থি-সের ৫ কোশ। এখানে বলে দেয়া দরকার, পুরো বইটির মধ্যে যেখানেই স্থাননামের সঙ্গে 'সেরা' (বা সরাই) শব্দটি যুক্ত আছে, রয়েছে সেখানেই বিরাট দেয়াল বা বেড়া ঘেরা এক একটি অঙ্গন। তার ভেতরে, চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে ৫০ কি ৬০ খানি কুড়েঘর। থাকে সেখানে কতক পুরুষ ও মহিলা। কিনতে পাবেন তাদের কাছে ময়দা, চাল, মাখন, শাক-সবজি। দেবে আপনাকে রুটি তৈরি ক'রে কিংবা ভাত রেঁধেও (সাধারণতঃ ভথীয়ারা নামে পরিচিত এরা)। যদি সহসা কোন মুসলমান যাত্রী এসে উপস্থিত হয়, ভেড়ার মাংস বা মোরগ সংগ্রহের চেষ্টায় সে ছোটে তখন গ্রামের ভেতর। পর্যটককে যারা খাদ্য যোগায় তারা ঐ ঘরগুলি মধ্যে যেখানি পর্যটক থাকার জন্য বাছেন সেটি পরিষ্কার ক'রে চারপাই পেতে দেয় একটি। পর্যটক সঙ্গে নিয়ে আসা তোশক বা গদী বিছিয়ে নেয় তার ওপর।

পিগুন্থি-সেরা থেকে তিন কোশ গেলে পন্দের। তারপর ছ কোশ গেলে বলবি-সেরা। তারপর ৫ কোশ গেলে নেভেল্‌কি-সেরা। আরো পাঁচ কোশ গেলে কৌশেম্বা। তার তিন কোশ পরে চেনিপুর (চইনপুর)। তার আট কোশ পরে চরৌয়া (চরোয়া)। আরো আট কোশ এগোলে বিচ-ওলা। তারপর চার কোশ এগোলে এণ্ডি (হাণ্ডিয়া)। এখানে পার হতে হয় একটি নদী। এ নদীটি এগিয়ে চ'লে বনারস ও পাটনার মাঝামাঝি স্থানে মিশেছে গিয়ে গঙ্গায় (এ বিবরণ ভুল। এণ্ডি বা হাণ্ডিয়া নর্মদা নদীকূলে। ট্যাভারনিয়ার এ নদীটিকে শোন নদী বলে ভুল করেছেন বলেই এই বর্ণনা-বিভ্রাট।)

এণ্ডি থেকে অনকুইনস চার কোশ। তারপর টিকিরি পাঁচ কোশ। তারপর তোকমেদেন চার কোশ, নোভাসেরা (নৌসেরা) চার কোশ, ইছাভৌর (ইচ্ছাবর, ভুপাল) চারকোশ, সিগনোর (সীহোর, ভুপাল) পাঁচ কোশ, চেকাইপুর (শেইখপুর) তিন কোশ, দৌর-আয়ে (দুরাইবা) তিন কোশ, আভের-কইয়া

(হাথিয়াখেরা) তিন কোশ, তিলোর (দিলোদ ?) চার কোশ, সন-কইরা তিন কোশ, সিরোঞ্জ বারো কোশ।

সিরোঞ্জ একটি বড় শহর। অধিবাসীদের অধিকাংশই বেণিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্প-কারিগর। পুরুষানুক্রমে বাস ক'রে আসছে এখানে তারা। তাই কতক বাড়িঘর এখানকার পাথর এবং ইট দিয়ে গড়া। সব রকম রঙীন বস্ত্রের বিরাট বিক্রী এখানে। এই বস্ত্রসম্ভার চিট্জ (চিন্ৎজ, চিট বা ছিট) নামে পরিচিত। পারস্য ও তুরস্কের সমগ্র জনসাধারণ এই বস্ত্রই ব্যবহার করে পোশাকরূপে। অন্যান্য কতক দেশে বিছানা ও টেবিল-আচ্ছাদনী রূপেও ব্যবহৃত হয় এগুলি। সিরোঞ্জ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও উৎপাদন করা হয় এ ধরনের বস্ত্রসম্ভার। তবে, এত ঝলমলে নয় তার রঙ। বারকয়েক কাচলেই ফ্যাকাশে হয়ে যায় তা। সিরোঞ্জের বেলা ঘটে ঠিক তার বিপরীতটি। যতই কাচা হয় ততই বেশি খোলতাই হয় তার রঙ। একটি নদী বয়ে গেছে এখান দিয়ে। এটির জলে এমন কিছু পদার্থ রয়েছে যা এই ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব দান ক'রে রঙে। বর্ষা ঋতুর চার মাস কারিগররা বিদেশী বণিকদের বরাত অনুযায়ী বস্ত্রগুলিকে চিত্রিত ক'রে চলে নানা নক্সায়। কেননা, বর্ষা ঋতু চলে যেতে না যেতেই এর জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে বেশ। আর এ সময়ে এই জলে বস্ত্রগুলি ধুলে পাকা হয়ে যায় তার রঙ, হয়ে ওঠে ঝলমলে।

বিশেষ এক ধরনের মসলিনও বোনা হয় এখানে। এগুলি এত মিহি যে কেউ তা পরলে, কোনকিছু পরেছে বলেই মনে হয় না, বস্ত্র ভেদ ক'রে স্পষ্ট দেখা যায় তার সর্বাঙ্গ। এ বস্ত্র রপ্তানি করার অনুমতি দেয়া হয় না বণিকদের। এর পুরোটাই শাসনকর্তা পাঠিয়ে দেন মুঘল হারেমে ও প্রধান সভাসদদের কাছে। আপন দেহকে লোভনীয় ক'রে তোলার জন্য সুলতানা ও বড় বড় অভিজাতদের রমণীরা এগুলি পরেন, ব্যবহার করেন গ্রীষ্মের পোশাক হিসাবেও। সম্রাট ও অভিজাতরা তখন উপভোগ করেন তাদের দেহ-সৌন্দর্য, বাধ্য করেন ওই পোশাকে তাদের নাচতে (এই মসলিন আব-ই-রভান নামে পরিচিত)।

ব্রামপুর (বুরহানপুর) থেকে সিরোঞ্জের দূরত্ব ১০১ কোশ। এই দূরত্ব কিন্তু আসলে সুরাট-ব্রামপুর (১৩২ কোশ) দূরত্বের তুলনায় বেশি। কেননা, (শেষোক্ত অঞ্চলের এক কোশ দূরত্ব পার হতে এক ঘন্টার কম সময় নিলেও) এ অঞ্চলের এক কোশ পার হতে লাগে এক একটি শকটের কখনো এক ঘন্টা কখনোবা সোয়া ঘন্টা। এই ১০১ কোশ পথ পার হবার বেলা চারিদিকে চোখে পড়বে শুধু সুফলা

গম ও ধান ক্ষেত। দেখলে মনে পড়ে যাবে আমাদের দেশের বৌউস অঞ্চলের শস্য ক্ষেতগুলির কথা। অরণ্য বলতে গেলে চোখেই পড়ে না। সিরোঞ্জ থেকে আগ্রা পর্যন্ত ভূভাগও অনেকটা এই ধরনের। গ্রামগুলি একের পর আর অতি কাছাকাছি বলে ভ্রমণ করা চলে বেশ আরামের সঙ্গে। যেদিন যেমন খুশী ধীরে সুস্থে এগোতে পারেন আপনি।

সিরোঞ্জের পর ৬ কোশ গেলে মগলকি-সেরা (মুঘল-সরাই)। আরো দু কোশ গেলে পৌলকি-সরাই (পালকী-সরাই)। তারপর তিন কোশ গেলে কসরিকি-সেরা (কছনোর-কি-সরাই)। তার ছ-কোশ পরে চদোলকি সেরা (শাহদৌরা)। আরো ছ-কোশ গেলে কল্লাবাস (কালাবাগ)।

কল্লাবাস একটি বড শহর। আগে একজন বড় রাজার রাজধানী ছিল এটি। ছিলেন তিনি মুঘল সম্রাটের করদ। বণিকরা পণ্য নিয়ে এপথ দিয়ে যাবার বেলা লুণ্ঠন করা হত সাধারণত তাদের। আদায় করা হত অত্যধিক শুল্ক। ঔরঙজেব সিংহাসনে আসীন হবার পর শিরচ্ছেদ করলেন তার। হত্যা করা হল তার বহুসংখ্যক প্রজাকে। গড়া হল শহরটির কাছে রাজপথের ওপর কতক মিনার। চারদিকে তার বেশ কয়েকটি জানালা। দু-ফুট অন্তর বসানো প্রতিটি জানালায় ঝুলছে একটি ক'রে নরমুণ্ড। এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হয় আমার ১৬৬৫-তে শেষ ভ্রমণকালে। যখন আমি কল্লাবাস উপস্থিত হলাম তার খুব বেশিদিন আগে ঘটেনি এ হত্যালীলা। সবগুলি মুণ্ডই তখন পূর্ণ আকৃতি সম্পন্ন। ভেসে আসছিল দুর্গন্ধ।

কল্লাবাসের দু-কোশ পর অকমতি। তারপর ন-কোশ গেলে কোলাসর (কোলারস, গোয়ালিয়র)। একটি ছোট শহর এটি। অধিবাসীদের সকলেই বিগ্রহপূজক। শেষবারের ভ্রমণকালে যখন শহর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি, উপস্থিত হল এ সময়ে আটটি বড় কামান। কতক ৪৮ পাউণ্ডার, বাকিগুলি ৩৬ পাউণ্ডার। ২৪ জোড়া ষাঁড় বয়ে চলেছে প্রতিটি কামানকে। পিছু পিছু চলেছে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট বলবান হাতি। যখনি পড়ছে সুমুখে কোন খারাপ পথ, ষাঁড়গুলির অসুবিধা হচ্ছে টানতে, সাহায্য করছে হাতিটি।

শহরটির বাইরে, সমগ্র রাজপথের দুধারে সারি সারি বড় গাছ। এ গাছগুলিকে বলে তারা ম্যাঙ্গো বা আম। গাছগুলির কাছ ঘেঁসে স্থানে স্থানে ছোট ছোট মন্দির। প্রত্যেকটিরই ভেতরে একটি ক'রে বিগ্রহ। এই মন্দিরগুলির একটির কাছেই খাটান হয়েছে আমার তাঁবু। মন্দিরটির প্রবেশ-দ্বারের কাছে তিনটি

বিগ্রহ, প্রত্যেকটিই প্রায় পাঁচফুটের মতো লম্বা। হাতিটি ওই মন্দিরটির পাশ ধরে যেতে যেতে যেই তার কাছাকাছি হল, টুক ক'রে শুঁড় দিয়ে একটি বিগ্রহকে তুলে নিয়ে করল ভেঙে দুটুকরো। তুলে নিল তারপর দ্বিতীয় বিগ্রহটিকেও। এত জোরে তাকে উঁচু ক'রে দূরে ছুঁড়ল যে মাটিতে আছড়ে পড়ে হয়ে গেল সেটি চার খণ্ড। তৃতীয়টির বেলা শুঁড় দিয়ে সেটিকে এমন ধাক্কা মারল যে ভেঙে ছিটকে পড়ল মুণ্ডটিই। কতকের মনে ধারণা হল মাহুতের কাছ থেকে সংকেত পেয়েই এ কাজ করেছে হাতিটি। আমি অবশ্য প্রত্যক্ষ করিনি সেরকমটি কিছু। যাই হোক, ব্যাপারটিকে খুব খারাপ ভাবেই নিল বেণিয়ারা। তবে সাহস পেল না টু শব্দটিও করতে। কেননা, কামানগুলির সাথে দুহাজারেরও বেশি লোক। আর তাদের সকলেই পাদশাহের সেনাবাহিনীর এবং মুসলমান। একমাত্র প্রধান গোলন্দাজরাই শুধু ফ্রাঙ্ক—ফরাসী, ইংরাজ ও ডাচ। সম্রাট পাঠাচ্ছিলেন এগুলি দাক্ষিণাত্যে। সেখানে তার সেনাবাহিনী তখন রাজা শিবজীর মুখোমুখি। বিগত বছর (১৬৬৪) সুরাট লুটপাট করেন তিনি। সুযোগ পেলে অন্যত্র শোনাব সে কাহিনী। (পাঠান হচ্ছিল এগুলি দাক্ষিণাত্য অভিযানে রত জয় সিংহের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য।)

কোলাসর থেকে ছ কোশ এগিয়ে গেলে সনশিলি (সৌপ্রী)। তারপর চার কোশ গেলে ডেণ্ডরি। আরো তিন কোশ পরে গাতে (ঘাট)। গাতে পাহাড় মালার মাঝে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ। দৈর্ঘে এক কোশের আটভাগের এক ভাগের মতো। প্রবেশ মুখে এখনো চোখে পড়বে দু-তিনটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পথটি এত সরু যে বহলগুলি অতি কষ্টে পাশ কাটাতে পারে একে অন্যের।

দক্ষিণের সড়ক পথ ধরে যারাই আগ্রা আসেন, তা সে সুরাট, গোয়া, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মসুলিপত্তন বা অন্য যে কোন স্থান থেকেই হোক না কেন, পার হতেই হবে এ গিরিপথটি তাদের। দ্বিতীয় সড়ক বলতে রয়েছে একমাত্র য আহমদাবাদের মধ্য দিয়ে আসা পথটি। আগে এই গিরিপথটির দু-দিকেই ছিল দুটি ফটক। আগ্রা-প্রান্তের ফটকটির কাছে পাঁচ ছটি দোকান আছে বেণিয়াদের। মেলে সেখানে ময়দা, ঘি, চাল, শাকপাতা, তরিতরকারী। শেষবারের ভ্রমণকালে এখানে আটকে গেলাম দু'দিন। আর এগোতে গেলে নদী পার হওয়া দরকার। কিন্তু নদীর জল কমার বদলে, গত তিন-চার দিনের বর্ষার দরুন বেড়েই চলেছে ঘন্টায় ঘন্টায়। এ অবস্থায় এ নদী নৌকায় পার হতে

হলে এগিয়ে যেতে হয় এখান থেকে আধ কোশ খানেক আমায়। তার চেয়ে জল নেমে গেলে চরা-পথ ধরে হেঁটে পার হওয়া অনেক সুবিধাজনক। কেনন', খেয়া ঘাটটি যেখানে রয়েছে সেখানে মালপত্র নিয়ে পৌঁছাতে হ'লে বহল ও শকট থেকে নামাতে হবে সব কিছু। পায়ে হেঁটে বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। এমনকি গাড়িগুলোকেও বয়ে নিতে হবে টুকরো টুকরো ক'রে খুলে। আধ কোশ পথ —ভাবে সব কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া যে কত ঝঞ্ঝাটের তা ভাবুন একবার। এ পথের পুরোটাই টিলা আর বড বড় পাথরে ভর্তি। পথের একপাশে নদী, অন্য পাশে পাহাড়। ফলে যখনই নদী-জল বাড়ে, বন্যা হয়, পথও ডুবে যায় জলে। একমাত্র স্থানীয় অধিবাসীরাই তখন যা চলাচল করতে পারে এ পথ দিয়ে। যাত্রীদলই স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। তাই, যতভাবে যতটা যা পারে আদায় ক'রে নেয় তারা যাত্রীদের কাছ থেকে। এ সমস্যাটি না থাকলে, সহজেই এখানে নদী পারাপার সহজ ক'রে তোলা যেত সেতু গড়ে। সেজন্য কাঠ ও পাথর কোন কিছুরই অভাব ছিল না এখানে। (এই গিরিপথটি সম্ভবত ডোঙ্গরি থেকে ৬½ মাইলের মতো দূরে, সিন্দ নদী তীরবর্তী গোপালপুরের কাছে। সিন্দ যমুনার একটি শাখানদী।)

গাতে (ঘাট) পার হয়ে চার কোশ এগিয়ে গেলে নাদের (সিন্দ নদীর দক্ষিণ-তীরে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত নরওয়র)। নাদের (বিন্ধ্য পাহাড় মালার অংশবিশেষ একটি খাড়া) পাহাড়ের ঢালের দিকে গড়ে ওঠা বড়সড় শহর। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একটি দুর্গের মতো। পুরো পাহাড়টিই দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভারতের অন্যান্য শহরের মতো এখানকার বাড়িঘরগুলিরও বেশির ভাগ খড়ের ছাউনি দেয়া ও একতলা। যারা ধনী একমাত্র তাদের বাড়িগুলিই দোতালা ও পাকা ছাদ দেয়া। শহরের পরিসর মধ্যে থাকা কয়েকটি পুকুর আগে বাঁধানো ছিল কাটা পাথর দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে অবহেলিত। এক কোশ মতো এগিয়ে গেলে এখনো দেখা যায় সেখানে কয়েকটি সুন্দর সমাধিসৌধ। যে নদীটি পার হয়ে এখানে এলাম এবং চার থেকে পাঁচ কোশ এগিয়ে আবার যে নদীটি পার হতে হবে, তারা দুটিতে তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে শহর ও পাহাড়টিকে। দিয়েছে তাকে ঠিক যেন অনেকটা উপদ্বীপের আকৃতি। তারপর দীর্ঘপথ একেবেঁকে বয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে নদীটি গঙ্গায়। এই নাদেরে তৈরী হয়ে থাকে এক ধরনের তুলার আস্তরণ দেয়া শয্যা আবরণী। কতক সাদা। বাকিগুলি সোনা, রূপা ও রেশমের সুতা দিয়ে ফুলের নক্সা তোলা।

নাদের থেকে ন কোশ গেলে বরকী-সেরা (বরকী সরাই)। আরো তিন কোশ পরে ত্রীই (অন্ত্রী)। আরো ছ-কোশ পরে গোয়ালিয়র (গোয়ালিয়র)। এটি একটি বড় শহর। ভারতের অন্যান্য শহরগুলির মতো যেমন তেমনভাবে গড়ে ওঠা। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী। পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়। শহরটি তারই পাশে (পূবে)। পাহাড়ের মাথার দিকটি বুরুজ শোভিত দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঘেরের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি পুকুর। বর্ষার জল জমা হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এগুলি। এখানে তারা যতটা যা চষ-আবাদ করে সেনাদলের প্রয়োজনের দিক থেকে তা যথেষ্ট। এ কারণেই এ স্থানটি (পাহাড় চূড়ার দুর্গটি) ভারতের মধ্যে সেরা রূপে বিবেচিত। পাহাড়টির উত্তর-পশ্চিম মুখো ঢালের দিকে শাহ-জহানের গড়া প্রমোদ-ভবনটি। পুরো শহরটিকে দেখা যায় সেখান থেকে। ফলে, দুর্গ রূপে ব্যবহারযোগ্য এটি। এই প্রমোদ-ভবনটির নিচের দিকে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে কতক উত্তাল মূর্তি। সবকটিরই আকৃতি দৈত্যের মতো। এর মধ্যে একটি মূর্তি অসম্ভব দীর্ঘ। (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুনওয়ার বংশের আমলে খোদিত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি এগুলি)।

এদিককার অঞ্চলগুলি মুসলমান সম্রাটদের অধিকারে আসার পর থেকেই গোয়ালিয়র দুর্গটিকে ব্যবহার ক'রে আসা হচ্ছে শাহজাদা ও বড় বড় আমীরদের নিরাপদ বন্দীশালা হিসাবে। বিশ্বাসঘাতকতার পথ অনুসরণ ক'রে সিংহাসনে আসীন হবার পর শাহ-জহান যেসব শাহজাদা ও আমীরদের আপন স্বার্থ বিরোধী বলে মনে করলেন, একের পর এক বন্দী ক'রে পাঠালেন তাদের গোয়ালিয়র। তবে, তাদের সকলকেই দিলেন তিনি বেঁচে থাকার ও সম্পদ ভোগের সুযোগ। তার পুত্র ঔরঙ্গজেব কিন্তু করলেন ঠিক তার বিপরীত। তিনি যখনই কোন আমীরকে এখানে পাঠালেন, ন-দশ দিনের মাথায় সরিয়ে দিলেন তাদের বিষপ্রয়োগ ক'রে। যাতে জনসাধারণ তাকে রক্তপিপাসু সম্রাট বলে নিন্দামন্দ করার সুযোগ না পায় সেজন্যই এগোলেন তিনি এই বাঁকা পথ ধরে। যেই তিনি আপন ছোট ভাই মুরাদকে মুঠোর মধ্যে পেলেন, অমনি বন্দী করলেন তাকে, রাখলেন এই দুর্গে। গেলেন এখানেই তিনি মারা। অথচ পিতা শাহ-জহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তিনিই উৎসাহ যোগান তাকে। ফলে গুজরাটের শাসনকর্তা থাকা কালে করলেন নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা মুরাদ। এ শহরটি মধ্যে গড়া হয়েছে তার জন্য একটি উপযুক্ত দৃষ্টিনন্দন স্মৃতি-সৌধ।

বর্তমান সেটি এ উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি মসজিদের ভেতর। সম্মুখে তার একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। পুরো পরিসরটি নিচু প্রকোষ্ঠমালা দিয়ে ঘেরা, রয়েছে সেখানে কয়েকটি দোকানও। ভারতের রীতি হল, জনসাধারণের ব্যবহারার্থে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হলে তাকে ঘিরে একটি বড বাজার-এলাকা তৈরি করা। থাকে সেই সাথে গরিবদের জন্য একটি সাহায্য সংস্থাও। প্রতিদিন করা হয় সেখান থেকে সাহায্য বিতরণ। যিনি এগুলি ক'রে দেন তার কল্যাণার্থে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় এইসব উপকৃতরা।

গোয়ালিয়র ছেড়ে পাঁচ কোশ এগোবার পর পড়বে একটি নদী। নাম লনিক (সম্ভবতঃ সনিব—শঙ্ক বা শঙ্খ নদী। এটি কুনওয়ারী নদীর শাখা)। পায়ে হেঁটে পার হতে হয় এটি। গোয়ালিয়রের তিন কোশ পরে পত্তের-কি-সেরা। তার দুই কোশ পর কুয়ারী-কি-সেরা (কুনওয়ারী-কি সরাই)।

পত্তের-কি-সেরায় (প্রকৃতপক্ষে কুনওয়ারী-কি সরাইয়ে) দেখা যায় দুটি খিলানের ওপর গড়া একটি সেতু। তার নিচ দিয়ে যে নদীটি বয়ে চলেছে সেটির নাম কুয়ারী নদী (কুনওয়ারী—কুমারী নদী)

কুয়ারী-কি-সেরা থেকে দু কোশ এগিয়ে গেলে দোলপুর (ধউলপুর)। বড় একটি নদী বয়ে চলেছে এখান দিয়ে, নাম চম্বল নদী (চম্বল নদী)। পার হতে হয় নৌকায়। আগ্রা ও এলাহাবাদের মাঝ বরাবর মিশেছে গিয়ে যমুনায়। দোলপুরের পর দু কোশ এগিয়ে গেলে মিনাস-কি-সেরা (মনিয়া-কি সরাই)। এর কাছে (এখান থেকে এগিয়ে যাবার পথে ?) একটি নদী, নাম যাগো (যাযৌ/যমুনার শাখানদী)। কাটা পাথরে তৈরি খুব লম্বা একটি সেতু দিয়ে পার হতে হয় এ নদীটি। সেতুটির নাম ইয়াউল-কা-পোল (যাযৌ-কা পুল)। মিনাস-কি-সেরা থেকে আট কোশ এগিয়ে যাবার পর দেখা পাবেন এ সেতুটির।

আগ্রা পৌঁছে যাতে কেউ শুল্ক ফাঁকি না দিতে পারে সেজন্য এ সেতুটির কাছাকাছি স্থানে যাচাই করা হয় সকলের জিনিসপত্র। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখা হয় কাঁচের বয়মে ভিনিগারের মধ্যে ডোবানো ফলের পেটিতে ক'রে লুকিয়ে মদ পাচার করা হচ্ছে কিনা। সেতুটি থেকে চার কোশ এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবেন আপনি আগ্রায়। সিরোঞ্জ থেকে আগ্রা ১০৬ কোশ। এই কোশ স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের। সুরাট থেকে আগ্রা মোট ৩৩৯ কোশ।

।। পাঁচ ।। সুরাট থেকে আহমদাবাদ হয়ে আগ্রা যাবার পথ-পরিচয়

সুরাট থেকে বাইশ কোশ এগিয়ে গেলে বরোচ (ব্রোচ)। এ দুই শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় গম, চাল, জোয়ার ও আখের প্রচুর ফলন। শহরটিতে ঢোকার আগে নৌকায় ক'রে পার হতে হয় একটি নদী। এ নদীটি চলে গেছে কাম্বে শহরের দিকে, মিশেছে গিয়ে তারপর ওই একই নামধারী উপসাগরে।

বরোচ একটি বড় শহর। আছে এখানে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা একটি প্রাচীন দুর্গ। এখানকার নদীটির জন্য বরাবর এ শহরটির চারিদিক জোড়া নাম। বস্ত্রসম্ভার ধবধবে ক'রে তোলার উপযোগী পদার্থ সমৃদ্ধ এর জল। মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকেই বস্ত্রসম্ভার নিয়ে আসা হয় এজন্য এখানে। বিশেষ ক'রে যে সব অঞ্চলে এ ধরনের জল তেমন প্রচুর নেই। বাফতা নামের খাটো আড়, লম্বা দৈর্ঘের বস্ত্রসম্ভার বোনা হয়ে থাকে এ অঞ্চলে। এবং প্রচুর। এগুলির বুনোটও যেমন ঘন, দেখতেও তেমনি খুব সুন্দর। দাম চার থেকে একশো টাকা পর্যন্ত। আমদানি ও রপ্তানি দুয়ের জন্যই সব ধরনের সামগ্রীর ওপর আদায় করা হয় এখানে বন্দরশুল্ক। অতি সুন্দর একটি বাসভবন রয়েছে এখানে ইংরাজদের। [১৬১৬-তে তারা ফ্যাক্টরী স্থাপনা করে এ শহরে]। মনে পড়ে, একবার ইংরাজ কোম্পানীর সভাপতির সাথে আগ্রা থেকে সুরাট ফেরার বেলা উঠেছি এসে এখানে। পৌঁছতেই কতক বাজীকর এসে ভোজবাজী দেখানোর প্রস্তাব করল তার কাছে। উৎসুক হয়ে তাতে সায় দিলেন তিনি। শুরু হল প্রদর্শনী। প্রথমেই জ্বালাল তারা বড় ক'রে একটি অগ্নিকুণ্ড। একটি শিকলকে সেই আগুনে তাতিয়ে করা হল টকটকে লাল। তারপর এটি দিয়ে সর্বাঙ্গে আঘাত ক'রে এমন ভাবভঙ্গী ক'রে চলল যেন সত্যিই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তাদের। অথচ হল না কিন্তু কোন ক্ষত কারো শরীরে। এ খেলাটি শেষ হবার পর নিল তারা একখণ্ড ছোট লাঠি। পুঁতে দিল সেটি মাটিতে। তারপর কোম্পানীর একজন কর্মীকে জিগ্যেস করল, কোন ধরনের ফল খেতে চায় সে। কর্মীটি উত্তর দিল: আম। এরপর একজন বাজীকর চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে মাটিতে উবু হল বার পাঁচ ছয়েক। আমি কৌতূহলী হয়ে, সে কি কৌশল অবলম্বন করে তা উঁচু থেকে ভাল ক'রে দেখার

জন্য উঠে চলে গেলাম একটি ঘরে। দেখে চললাম একটি পর্দার ফাঁক দিয়ে। লোকটি একটি ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলল বগলের খানিকটা। সেখান থেকে ঝরা রক্ত মাখিয়ে দিল ওই লাঠিটির গায়ে। যতবার সে (উবু হবার পর) মুখ তুলল, ততবার সকলের চোখের সামনে বেড়ে চলল লাঠিটি। তৃতীয় বার দেখা দিল তাতে ডালপালা মুকুল। চতুর্থ বারে পাতায় ভরাট হয়ে গেল গাছটি। পঞ্চম বারে আমাদের চোখের সামনে ফুটল সে গাছে ফুল। ইংরাজ সভাপতির সাথে ছিলেন তার ধর্মযাজক। একজন ডাচ সেনানায়কের ছেলেকে ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন তাকে আহমদাবাদ থেকে। এবং তাকেই অনুরোধ করা হয়েছিল শিশুটির ধর্মপিতা হওয়ার জন্য। কেননা, যে সব অঞ্চলে ডাচ বণিক ও সেনারা একত্রে বসবাস করতেন সে সব অঞ্চল ছাড়া ছিল না এ দেশের আর কোথাও ডাচ ধর্মযাজক। এই ইংরাজ ধর্মযাজক আপত্তি জানিয়েছিলেন বাজীকররা খেলা আরম্ভ করার একেবারে শুরুতেই। বলেছিলেন, খৃস্টান হয়ে এ ধরনের ভোজবাজী দেখার দৃশ্যকে পারছেন না তিনি একেবারেই সমর্থন করতে। যখন তিনি দেখলেন, এ লোকগুলো সামান্য একখণ্ড শুকনো কাঠের টুকরোকে আধঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বসন্তকালের ন্যায় ফুল ও পল্লবে ভরা চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটি সবুজ বৃক্ষে পরিণত করেছে, জোর দাবি তুললেন এ প্রদর্শনী ভেঙে দেয়ার জন্য। উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যারাই এ ধরনের ভোজবাজীর দর্শক হবে তাদের তিনি কোনরকম ধর্মীয় সেবা করবেন না ভবিষ্যতে। বাধ্য হলেন সভাপতি খেলা থামিয়ে দিয়ে বাজীকরদের বিদায় ক'রে দিতে। ইওরোপে যাদের ইজিপসিয়ান বা বোহেমিয়ান (যাযাবর) বলা হয়ে থাকে তাদের মতোই এরা সপরিবারে ঘুরে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। এই প্রদর্শনীর জন্য মাত্র দশ কি বারো এক (২০ বা ২৪ টাকা) তাদের হাতে গুঁজে দিতেই বিদায় নিল তারা বেজায় খুশী মনে।

যারা (বরোচ থেকে আগ্রা যাবার বেলা) কাম্বে দেখতে চান সেজন্য হাঁটতে হয় তাদের মাত্র পাঁচ কি ছ কোশ ঘুরপথ। সোজা সড়ক পথে বরোচের পরই বরোদা। কিন্তু কাম্বে দর্শনার্থীরা সে পথে না গিয়ে চলে যান সোজা কাম্বেতে। তারপর সেখান থেকে আহমদাবাদে। তবে ব্যবসায়িক প্রয়োজন বা দেখার বিশেষ আগ্রহ না থাকলে ঐ ঘুরপথ ধরে কেউই চলে না সাধারণতঃ। কেননা, আগেই বলেছি, ও পথ ধরে গেলে চলতে হয় পাঁচ-ছ কোশ বেশি। তাছাড়াও রয়েছে বিশেষভাবে উপসাগর সঙ্গম পার হবার ঝুঁকি।

কাম্বে ওই নামের উপসাগর মুখে অবস্থিত একটি বড় শহর। ভারতের অভ্যন্তর থেকে আনা সুদৃশ্য অ্যাগেট ব অকীক পাথর দিয়ে তৈরি হয় এখানে নানারকম বাটি, ছুরির বাঁট, পুঁতি ও আরো নানা সুদৃশ্য শিল্পসামগ্রী। সরখেজের মতো একই ধরনের নীলও উৎপাদিত হয়ে থাকে এই শহর প্রান্তে। ভারতীয় অঞ্চলে পর্তুগীজদের রবরবার আমলে প্রচুর জাহাজ এখানে আসা-যাওয়ার দরুন রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এ বন্দরটি। সাগর উপকূল ঘেঁসে চোখে পড়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ি। পর্তুগীজদের ধাঁচে তৈরি, তাদের মতোই জাঁকজমক ক'রে সাজান। কিন্তু বর্তমানে এর বেশির ভাগ বাড়িই জনবর্জিত, ক্রমশঃ ভাঙনের মুখে। ওই সময়ে কাম্বেতে এরূপ সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা হত যে অন্ধকার ঘনাবার দু ঘন্টা পরেই আটকে দেয়া হত প্রতিটি রাস্তা তার দুই প্রান্তে থাকা দুই ফটক বন্ধ ক'রে দিয়ে। এখনো রয়েছে সে ফটকগুলি। এখনো ওই ভাবে বন্ধ ক'রে দেয়া হয় সেখানকার কতক প্রধান প্রধান পথের ফটক। বিশেষ ক'রে বাজার এলাকার ভেতরে যে পথগুলি গেছে তার ফটকগুলি। এ শহরটির ব্যবসা-বাণিজ্যের একাংশ হাতছাড়া হয়ে যাবার একটি প্রধান কারণ হল এখানকার সাগরে বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমশঃ চরা পড়ে যাওয়া। আগে সমুদ্র আরো কাছাকাছি ছিল, ছোট ছোট জাহাজগুলি আসা-যাওয়া করতে পারত অনায়াসে এখানে। কিন্তু, বর্তমানে পাবে বড জোর শহরের চার-পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত কাছাকাছি আসতে। (কাম্বের বাণিজ্য হ্রাসের আংশিক কারণ বোম্বে ও সুরাটের সাথে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, আংশিক কারণ উপসাগর মুখে চর র সৃষ্টি ও প্রবল ঘূর্ণী জোয়ার)।

অসংখ্য ময়ূর রয়েছে ভারতে। বিশেষ ক'রে বরোচ, কাম্বে ও বরোদা এলাকায়। কচি ময়ূরের মাংস দেখতে সাদাটে, স্বাদ ও গন্ধ সুন্দর, অনেকটা টার্কির মতো। সারাদিন ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায় মাঠে। অন্ধকার নামলেই ঠাঁই নেয় গিয়ে গাছের ডালে ডালে। দিনের বেলা এদের কাছাকাছি হওয় খুব কঠিন। শিকারীর দিকে নজর পড়লেই পালিয়ে যায় এরা তিতিরের চেয়েও চঞ্চল গতিতে। ঢুকে যায় বনে-জঙ্গলে। সেখানে তাদের পিছু নেয়া একেবারে অসম্ভব, পদে পদে পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে যাবার আশংকা। রাতে কিন্তু ধরা যায় সহজেই। সেজন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয় তা এইরকম। দু পিঠে জীবন্ত-আকারের ময়ূরীর ছবি আঁকা একটি কাপড় বা চট লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে সেটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয় তাদের দিকে। লাঠির একেবারে মাথায় থাকে দুটি

জলন্ত মোমবাতি। এই আলোয় ময়ূরীর ছবির প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতেই একেবারে লাঠির কাছ পর্যন্ত গলা বাড়িয়ে দেয় সে। সেখানে লটকানো থাকে দড়ি দিয়ে তৈরি একটি ঢিলা ফাঁস। ময়ূরটির গলা সেটির ভেতর ঢুকে যেতেই চিত্র সহ লাঠিটি ধরে থাকা লোকটি দেয় ওই ফাঁসের দড়ি ধরে টান। ফলে ফাঁসটি আটকে যায় ময়ূরের গলায়, হয় সে বন্দী। তবে বিগ্রহপূজক রাজাদের এলাকা মধ্যে পাখি বা কোন রকম প্রাণী হত্যা না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন যেন। মুসলমান শাসকদের এলাকায় অবশ্য কোন বিপদের আশঙ্কা নেই এজন্য। সেখানে কোন বাধা নিষেধ নেই শিকারের ওপর। একবার পারস্যের এক ধনী সওদাগর দস্তিবরের (দাস্তা বা দাস্তওয়ার'-র হিন্দু) রাজার এলাকা মধ্য দিয়ে পার হবার বেলা বাহবা লোভেই হোক আর সে-দেশীয় রীতিনীতি না জেনেই হোক গুলী ক'রে মেরে বসলেন একটি ময়ূরকে। এই ঘোর ধর্মবিরুদ্ধ কাজে ক্ষেপে গেল বেণিয়ারা, করল তাকে আটক। বাজেয়াপ্ত করল তার সঙ্গে থাকা সব টাকা। তিন লক্ষের মতো হবে তা। তারপর গাছের সঙ্গে বেঁধে ক'রে চলল তিনদিন ধরে চাবুক পেটা। তাতেই মারা গেল বেচারা।

কাম্বে ছেড়ে মাত্র তিন কোশ খানেক এগোবার পর পৌঁছবেন আপনি একটি গ্রামে। একটি মন্দির আছে এখানে। ভারতের অধিকাংশ নর্তকীই পূজা দেয়ার জন্য আসে এ মন্দিরটিতে। রয়েছে এখানে অনেক নগ্নমূর্তি। তার মধ্যে একটি মূর্তি অ্যাপোলোর অনুরূপ, তার গোপনাঙ্গগুলিও সম্পূর্ণ অনাবৃত। নর্তকীরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, যৌবনের রোজগার থেকে জমানো অর্থ দিয়ে কেনে তারা কচি মেয়ে দাসী। শেখায় এদের নাচ, চটুল গান ও এই কুখ্যাত জীবিকার অন্যান্য সব কলা কৌশল। যখন এরা এগারো বারো বছর বয়সে পা দেয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে তাদের এই মন্দিরে। তাদের বিশ্বাস, এদের এই বিগ্রহের মনোরঞ্জনে উৎসর্গ করলে হবে তা তাদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যদায়ক। (দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার সেবাদাসীতে পরিণত করণ প্রথার এক অস্পষ্ট বিবরণ এটি।)

এই মন্দিরটি থেকে ছ কোশ এগিয়ে গেলে চিদাবাদ (সঈদাবাদ)। মুঘল সম্রাটদের তৈরি চোখ জুড়ানো সৌধগুলির মধ্যে একটি এখানে। এক বিরাট পরিসর নিয়ে এ সৌধটি। সঙ্গে বিস্তীর্ণ বাগিচা ও একাধিক বড় পুকুর। গৃহটিকে সুশোভিত করার জন্য ভারতীয় প্রতিভাধরদের পক্ষে যত যা কিছু করা সম্ভব করা হয়েছে তা সবই। চিদাবাদ থেকে আহমদাবাদ মাত্র পাঁচ কোশ।

এবার বরোচ ফিরে এসে এগিয়ে চলা যাক সাধারণ সড়কপথটি ধরে। এ পথে বাইশ কোশ চলার পর পৌঁছবেন আপনি বরোদায়। এটি সরেস মৃত্তিকার বুকে গড়ে ওঠা একটি বড় শহর। বস্ত্রসম্ভারের একটি বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে ১৮ কোশ এগোলে নেরিয়াদ (নদীয়াদ)। তারপর আরো ২০ কোশ গেলে আহমদাবাদ।

আহমদাবাদ ভারতবর্ষের বড় শহরগুলির মধ্যে একটি। রেশমী বস্ত্রসম্ভার, সোনা ও রূপার দেয়াল আবরক বস্ত্র এবং রেশমের সঙ্গে অন্যান্য সুতা মিশেল দিয়ে তৈরী বস্ত্র, সোরা, চিনি, আদা, মিষ্টি মাখানো ও সাধারণ তেঁতুল, হরীতকী ও নীল। এই নীল তৈরি হয়ে থাকে আহমদাবাদ থেকে তিন কোশ দূরে সরখেজ নামের একটি বড় শহরে।

এখানে একটি মন্দির ছিল আগে, মুসলমানেরা সেটি দখল ক'রে রূপান্তরিত করেছে মসজিদে। মর্মর পাথরে মোড়া তিনটি প্রাঙ্গণ পার হয়ে ঢুকতে হয় সেখানে। প্রতিটি প্রাঙ্গণই দরদালান ঘেরা। জুতো খুলে খালি পায়ে না গেলে ঢুকতে দেয়া হয় না তৃতীয় প্রাঙ্গণটিতে। মসজিদের বাইরের দিকটি মোজাইক বসিয়ে অলঙ্কৃত করা। এগুলির বেশির ভাগই বিভিন্ন রঙা অকীক পাথর দিয়ে তৈরি। আনা হয়েছে কাম্বে থেকে। শহর থেকে দুদিনের পথ দূরে থাকা পাহাড়গুলিতে মেলে এ অকীক। পূর্বতন পৌত্তলিক রাজাদের অনেকগুলি স্মৃতি সৌধ বর্তমান এখানে। মোজাইক পাথরে তৈরি। দেখতে ভজনালয়-গুলির মতো। মর্মর পাথরে তৈরি স্তম্ভ সংলগ্ন নিচু প্রকোষ্ঠ দিয়ে ঘেরা। শহরের উত্তর-পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী (সাবরমতী)। বর্ষাঋতু তিন থেকে চার মাস কাল স্থায়ী হয় ভারতে। এ সময়ে নদীটি হয়ে ওঠে রীতিমতো পৃথুলা ও খরস্রোতা। বন্যায় চারিদিক ভাসিয়ে দিয়ে প্রচুর ক্ষতি ঘটায় প্রতি বছর। ভারতের প্রতিটি নদীই এই চরিত্রের। এ কারণে এবং আহমদাবাদের এ নদীটির ওপর কোন সেতু না থাকায় দরুন এটি হেঁটে পার হবার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় বর্ষা ঋতুর পরও দেড় থেকে দু মাস। দু-তিন খানি নৌকা রয়েছে বটে, কিন্তু জল নেমে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাহায্যে পারাপার হওয়া দুষ্কর। তাছাড়া নৌকায় পার হতে সময়ও নেয় অনেক। কৃষকরা এ নদী পার হওয়ার জন্য মোটেই আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতির মুখাপেক্ষী নয়। বুকে ও তলপেটে হাওয়া ভরা ছাগলের চামড়ার থলি বেঁধে তারই সহায়তায় এপার ওপার হয় সাঁতরে। পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই। ছোট শিশুদের বেলা ব্যবহার

করা হয় চার আঙুল চওড়া মুখ থাকা গোল মাটির পাত্র। তার ভেতর শিশুটিকে বসিয়ে দিয়ে, নিজে সাঁতরে চলার বেলা ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় পাত্রটিকে।

বানরদের গভীর শ্রদ্ধা করে বেণিয়ারা। এমনকি কতক মন্দিরে খেতে দেয় পর্যন্ত তাদের। আহমদাবাদে দু-তিনটি বাড়ি রয়েছে যেগুলিকে পরিণত করা হয়েছে পশু-হাসপাতালে। গরু, ষাঁড়, বানর ও অন্যান্য যে-সব পশু রোগগ্রস্ত বা অক্ষম হয়ে পড়ে তাদের নিয়ে আসা হয় এখানে। করা হয় সেবা, দেয়া হয় খেতে। আহমদাবাদে প্রতিটি বাড়ির ছাতেই রয়েছে একটি ক'রে ছোট চত্বর। প্রখর গ্রীষ্মকালে সেখানেই ঘুমায় বাড়ির বাসিন্দারা। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার ওই চত্বরটিতে চাল, জোয়ার, আখের সময়ে আখ এবং মরশুম অনুযায়ী অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী রেখে দেয়া হয় বানরদের জন্য। ওই দুটি দিন বানররা তাই বাইরে থেকে দলে দলে এসে ভিড় জমায় আহমদাবাদে। ওই খাবার খেতে হাজির হয় প্রতি বাড়ি বাড়ি। যদি ঘটনাক্রমে কোন বাড়ির চত্বরে ঢুকে খাবার না পায়, শুরু ক'রে দেয় হামলা। করে বাড়ির অবশিষ্টাংশের ছাউনিতে ব্যবহৃত টালিগুলি ভেঙে তছনছ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভাল ক'রে গন্ধ শুঁকে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোন কিছুই খায় না বানররা। তাছাড়া আগামী দিনের জন্য দুই গালে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় ক'রে রাখার পরই অবশিষ্ট খাদ্য গিলে পেটের ভেতর চালান করে তারা। (এ ধারণা ভুল। শুধু অবসর সময়ে আরাম ক'রে চিবিয়ে খাবার জন্য খাদ্য-থলিতে কিছুক্ষণের জন্য খাবার পুঁজি ক'রে রাখে তারা)।

আহমদাবাদের ডাচ ভবনে চাকুরী নিয়ে সবে দিনকতক আগে দেশ থেকে সেখানে হাজির হয়েছিল এক ডাচ যুবক। জানত না সে এ দেশের রীতিনীতি। ডাচ ভবনের সামনের অঙ্গনের একটি গাছে একটি বড় বানর দেখে নিজের লক্ষ্য ভেদ নৈপুণ্য এবং সেই সাথে, পরে যা প্রকাশ পেল, যৌবনোচ্ছ্বাস প্রদর্শনের জন্য গুলি ক'রে বসল সেটিকে। ডাচ অধিনায়কের সঙ্গে বসে আছি একই টেবিলে আমি তখন। গুলির শব্দ কানে যেতে না যেতেই ডাচ কোম্পানীর অধীনে কর্মরত বেণিয়ারা জুড়ে দিল বেজায় সোরগোল। অধিনায়কের কাছে ছুটে এল যুবকটির বিরুদ্ধে সুতীব্র স্বরে অভিযোগ জানাতে। জানাল, আর তারা কাজ করবে না কেউ ডাচ ভবনে। বহু কষ্টে, অনেক মার্জনা ভিক্ষার পর, শান্ত হল তারা। ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার রাজী করা হল তাদের সেখানে কাজ ক'রে চলার জন্য।

আহমদাবাদের আশেপাশে অসংখ্য বানর। এই প্রাণীরা যেখানেই থাকে সেখানেই কিন্তু কাকের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। এর কারণ, কাকরা যখন বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে বানররা সেই বাসায় হানা দিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙে দেয় ডিমগুলোকে। একবার আগ্রা থেকে ফেরার পথে ইংরাজ সভাপতির সঙ্গে আহমদাবাদে বিরাম নিয়ে যাত্রা করলাম আবার সুরাটের দিকে। এখানে তার কিছু দরকারী কাজ ছিল বলেই এই বিরাম। আহমদাবাদ ছেড়ে চার-পাঁচ কোশ এগোবার পর দৃষ্টি পড়ল একটি ছোট আম্রকুঞ্জের দিকে। দেখি, গাছের মাথায় অনেকগুলি বড় বড় বানর। পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই। মেয়ে-বানরগুলির কয়েকটির কোলে ছোট শিশু। আমরা যে যার নিজের গাড়িতে। তাই ইংরাজ সভাপতি দাঁড়িয়ে গেলেন তার গাড়ি থামিয়ে। জানালেন, তার সঙ্গে রয়েছে একটি বিশেষ ধরনের ভাল বন্দুক। দমান (দমন)-এর শাসনকর্তা সেটি উপহার দিয়েছেন তাকে। বললেন: আপনি তো একজন ভাল বন্দুক চালক, দেখুন না একবার এই বানরদের ক'রো ওপর সেটি পরখ ক'রে। আমার পরিচারকদের মধ্যে এ দেশীয় একজন ইঙ্গিত ক'রে এই ধরনের ঝুঁকি নিতে বারণ করল আমায়। সুতরাং অনিচ্ছা জানালাম আমি। চেষ্টা করলাম তাকেও থামিয়ে রাখতে। কিন্তু সম্ভব হল না তা। বন্দুকটি তাক ক'রে একটি মেয়ে-বানরকে গুলি ক'রে বসলেন তিনি। বানরটি দুটি ডাল আঁকড়ে ওপরেই রয়ে গেল, কোল থেকে পড়ে গেল বাচ্চাটি নিচে। পরক্ষণেই, কি জন্য পরিচারকটি আমায় নিষেধ করেছিল করলাম তা প্রত্যক্ষ। আম্রকুঞ্জে থাকা সবকটি বানর নিমেষে তেড়ে এসে আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল সভাপতির গাড়ির ওপর। সংখ্যায় তারা ষাটেরও বেশি। যদি না জনাকয়েক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তার গাড়ির জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দিত, এবং পরিচারক বাহিনী তাদের তাড়িয়ে দিত তবে পড়তে হত প্রাণেই মারা তাকে। সভাপতির গাড়ি থেকে মাত্র কয়েক পা দূরেই ছিল আমার গাড়ি। বানরগুলো তা আক্রমণ করার জন্য ছুটে না এলেও তাদের উত্তেজনার বহর দেখে আতঙ্ক ধরে গেল আমার। সবগুলি বানরই বড় আর বেশ শক্ত-সমর্থ। এত ক্ষেপে গিয়েছিল তারা যে প্রায় এক কোশ পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করল সভাপতির গাড়িটির।

আহমদাবাদের ১৩ কোশ পরে পনসার। তার ১৪ কোশ পরে মাসানা (মহসানা)। আরো ১৪ কোশ এগোলে চিতপুর (সিধপুর)।

চিতপুর একটি যথেষ্ট ভাল শহর। চিটুজ (চিন্‌ৎজ) নামের রঙিন সুতী কাপড়ের বিরাট ব্যবসা হয় বলে শহরটির এ ধরনের নাম। চার-পাঁচশো পা

দক্ষিণ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট নদী। একবার ভ্রমণকালে যখন পৌঁছেছি এ শহরটিতে, তাঁবু ফেলা হল শহরের কাছে থাকা একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের 'এককোণে দু-তিনটি গাছের ছায়ায়। একটু পরেই দেখলাম, স্থানীয় কিছু লোক শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য নিয়ে চলেছে গুটি চার-পাঁচ সিংহকে। প্রশ্ন করতে তারা জানাল, সাধারণতঃ পাঁচ বা ছ-মাস সময় নেয় এরা শিক্ষিত হয়ে উঠতে। এজন্য প্রতিটি সিংহকে বারো পা মত ছাড়াছাড়ি ক'রে রেখে, এক একটি শক্ত মোটা কাঠের খুঁটির সঙ্গে আঁটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় তাদের পেছনের পাগুলি। আরেকটি দড়ি পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়া হয় তাদের গলায়। এ দড়ির অন্য প্রান্তটি থাকে সিংহ-প্রশিক্ষকের হাতে। ওই খুঁটিগুলি সাধারণতঃ পোতা হয় ১৫ থেকে ২০ পা সামনে থাকা আরেক সারি খুঁটির সোজাসুজি। সিংহটি যতটা লম্বা ঠিক ততটা ছাড় দেয়া আরো একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় তাদের পিছনের পাগুলি ঐ সময়ে। সিংহটিকে যখন ছোট নুড়ি বা কাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিরক্ত ও নাজেহাল ক'রে তোলা হয় তখন সে পিছনের পা দুটির সঙ্গে বাঁধা ওই দুটি দড়িতে যতটা ছাড আছে পারে না শত চাইলেও তার বেশি এগোতে। এ সময়ে এদের দেখার জন্য জড়ো হয়ে থাকে অনেক লোক। উত্তেজিত ও প্ররোচিত সিংহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেও প্রশিক্ষক তার গলায় বাঁধা দড়িটি হাতে ধরে ক'রে চলেন তাকে নিয়ন্ত্রণ। আর এভাবেই সিংহকে ধাপে ধাপে ক'রে তোলা হয় মানুষের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত ও তার অনুগত। চিতপুরে গিয়ে গাড়িতে বসে বসেই দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার এই সিংহ-প্রশিক্ষণ দৃশ্য।

পরদিন হল আরেক অভিজ্ঞতা। দেখার সুযোগ হল একদল ফকীর বা মুসলমান দরবেশকে। গুণলাম একে একে। সাতান্ন জন। এদের যিনি সম্প্রদায় প্রধান তিনি ছিলেন সম্রাট জহাঙ্গীরের ঘোড়া-অধিকর্তা। তার পৌত্র সুলতান বুলাকী (খুসরুর পুত্র দাওয়র বক্স)-কে তারই কাকা শাহ্ জহানের আদেশে ফাঁসিতে ঝোলান হলে দরবার ত্যাগ করেন তিনি। সম্প্রদায় প্রধানের নিচে রয়েছেন চারজন দল-প্রধান। ছিলেন এরাও শাহ্-জহানের দরবারের বড় আমীর। এই পাঁচ দরবেশের পরনে রয়েছে সব সমেত তিন কি চার এল পরিমাণ কমলা রঙের সুতীর কাপড় দিয়ে তৈরী নেংটি। কাঁধের ওপর একটি ক'রে বাঘছাল। সঙ্গে জিন ও বলগা আঁটা আটটি সরেস ঘোড়া। এগুলিকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলা হচ্ছে তাদের আগে আগে। তিনটি ঘোড়ার বলগা-

সোনার, জিনও সোনার পাত দিয়ে মোড়া। অন্য পাঁচটির বলগা রূপার, জিনও রূপার পাতে মোড়া। প্রতিটি ঘোড়ার পিঠেই একটি ক'রে চিতাবাঘের ছাল। অন্য সব দরবেশদের পরনে শুধু যা ওই একটি ক'রে নেংটি। চুলগুলিকে গোছ পাকিয়ে মাথার ওপর অনেকটা পাগড়ীর মতো ক'রে বাঁধা। প্রত্যেকেই রীতিমতো অস্ত্রসজ্জিত। অধিকাংশের সঙ্গেই তীর-ধনুক। কতকের সাথে পলতে বন্দুক। বাকিদের কাছে খাটো বর্শা এবং আরেক ধরনের অস্ত্র যা দেখা যায় না ইওরোপে। এগুলি ধারালো লোহা দিয়ে তৈরী, প্লেটের কিনারার মতো। ভেতরের অংশ পুরো অনুপস্থিত। মাথা দিয়ে গলিয়ে এর আট দশটি ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে চলেছে সকলে ভাঁজ করা গলবস্ত্র বা রূফের মতো (এগুলি চকর বা চক্র)। প্রয়োজন মতো গলা থেকে এক একটি চাকতি বার ক'রে নেয় তারা। যখন কারো দিকে তাক ক'রে সেটি ছোঁড়ে তাকে প্রায় দু'টুকরো ক'রে ফেলে তা। প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে একটি ক'রে শিকার কালে ব্যবহৃত শিঙার মতোও। কোথাও এলে ও সেখান থেকে যাবার কালে উচ্চনিনাদী স্বরে তারা বাজায় এটিকে। থাকে এছাড়াও বিদার মতো লোহার হাতিয়ার, অনেকটা কর্ণিকের ধাঁচে তৈরি। ভ্রমণকালে সাধারণতঃ এটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলে ভারতীয়রা। যে জায়গাটিতে তাঁবু ফেলতে চায় সেখানকার জমিন সমতল ক'রে নেয় এটি দিয়ে। অনেকে আবার বেশি আরাম ক'রে শোবার জন্য ধুলো গাদা ক'রে তাকেই ব্যবহার করে গদী ও পাশবালিশ হিসাবে। এই দরবেশদের মধ্যে তিনজনের হাতে ছিল লম্বা বাঁকানো র‍্যাপিয়ার তলোয়ার। স্পষ্টতই কোন ইংরাজ বা পর্তুগীজের কাছ থেকে পেয়েছে এগুলি। সঙ্গের তল্পিতল্পা বলতে চার বাক্স ভরাট আরবিক ও পারসিক বই এবং কতক বাসনপত্র। এছাড়া অসুস্থ ও অক্ষমদের বয়ে নিয়ে চলার জন্য রয়েছে সাথে দশ বারোটি ষাঁড়ও। আমার বহর সহ যেখানে আমি আস্তানা গেড়েছিলাম সেখানে হাজির হলেন এই দরবেশের দল। আমার সঙ্গে তখন পঞ্চাশ জনের মতো পাইক-পেয়াদা। সকলেই এ দেশীয়। আগেই বলেছি ভ্রমণ-কালে সাধারণতঃ এদেরই নিয়োগ করা হয় রক্ষী ও পরিচারক রূপে। আমার সাথে বহু লোকজন দেখে দরবেশ দলটির সম্প্রদায়-প্রধান খোঁজ নিলেন আমার সম্পর্কে। তারপর, আমি যে স্থানটি দখল ক'রে রয়েছি সেটি আস্তানা গাড়ার উপযোগী অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় বিস্তীর্ণ বলে অনুরোধ জানালেন সে স্থানটি তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য। সম্প্রদায়-প্রধান ও তার অনুগামী অন্য চার মুখ্য দরবেশের পরিচয় জেনে তাদের প্রতি সৌজন্য দেখানোর জন্য আমি রক্ষা করলাম

তাদের সে বিনীত অনুরোধ। সে স্থানটি তাদের ছেড়ে দিয়ে তাঁবু ফেললাম অন্য একটি উপযোগী স্থানে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিল তারা জায়গাটিকে। করল মসৃণ ও সমতল। সময়টি শীতকাল, পড়েছে কিছুটা ঠাণ্ডা। তাই দুটি আগুন জ্বালালে তারা প্রধান পাঁচ দরবেশের জন্য। সুমুখ ও পিছন দুদিক গরম করার জন্য দুই আগুনের ঠিক মাঝখানে এসে বসলেন তারা। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই, তাদের নৈশভোজ হয়ে যাবার পর, শহরের শাসনকর্তা প্রধান পাঁচ দরবেশকে সম্মান জানানোর জন্য এলেন সেখানে। তারা যে কটি দিন সেখানে থাকলেন, পাঠালেন চাল ও তারা আহারে অভ্যস্ত এমন অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। কোন অঞ্চলে উপস্থিত হলে সম্প্রদায়-প্রধানের নির্দেশে কতক দরবেশ যান সেখানকার শহর ও গ্রামগুলিতে ভিক্ষার জন্য। যা কিছু খাদ্য সামগ্রী এভাবে পান তা সাথে সাথে দলের সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়া হয় সমানভাবে। ক'রে নেন প্রত্যেকেই নিজের রান্না নিজে। যা কিছু বাড়তি থাকে প্রতি সন্ধ্যায় বিলিয়ে দেন তা গরিবদের। পরদিনের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখেন না কোন কিছুই।

চিত্তপুর (সিদপুর) থেকে বারো কোশ এগিয়ে গেলে বালমবুর (পালনপুর, একই নামের রাজ্যের রাজধানী)। আরো এগারো কোশ গেলে দন্তিয়ুর (দান্তা বা দান্তওয়ারা)। সেখান থেকে আরো সতেরো কোশ পরে বরগাস্ত (বেরগাম)।

বরগাস্ত একজন রাজার রাজ্য এলাকা। এখানে শুল্ক দিতে হয় সবাইকে। একবার আগ্রা যাবার বেলা পৌঁছলাম এসে বরগাস্তে। রাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল না, পরিচয় হল শুধু তার দীওয়ান-এর সাথে। অতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন তিনি আমার সঙ্গে। উপহার পাঠালেন চাল, মাখন, ও মরশুমী ফল-ফলাদি। প্রতি-উপহার রূপে পাঠালাম আমি সূতী, সোনা ও রেশমের তিনটি কোমরবন্ধনী, চারখানি রঙীন সূতী-রুমাল ও দু বোতল মদিরা—একটি তার ব্রাণ্ডি, অন্যটি স্প্যানিশ। বিদায় নেয়ার দিন কুড়িজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন তিনি নিরাপদে আমায় চার-পাঁচ কোশ পথ এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য।

সেবারের যাত্রা শেষ ক'রে ফেরার পথে আমার ভারি ভারি মালগুলি আগেই পাঠিয়ে দিলাম শকটে ক'রে। তারপর পথ সংক্ষেপ করার জন্য করলাম এই সড়ক ধরেই ফিরে যাবার প্রস্তাব। সঙ্গে আমার এ দেশীয় যাটজনের মতো পাইক-পেয়াদা, সাত-আটজন পরিচারক। বরগাস্তের রাজার রাজ্য সীমানার কাছে এসে যখন তাঁবু ফেললাম, এক সন্ধ্যাবেলা সব কজন পাইক জোট বেঁধে আমার কাছে এসে জানাল বরগাস্তের মধ্য দিয়ে গেলে নেয়া হবে অথবা সদলবলে

প্রাণ হারাবার ঝুঁকি। এ রাজ্যের রাজা রেহাই দেন না কাউকেই, দস্যুবৃত্তিই তার একমাত্র পেশা। যদি অন্ততঃ দেড়শো জন পাইক নিয়োগ করা না হয় তাহলে তার দৌড়ালীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। চারদিক থেকে ছুটে এসে ছেঁকে ধরে শেষ ক'রে দেবে তারা। আমার ও প্রত্যেকের জীবন রক্ষার জন্য দিচ্ছে তারা এ পরামর্শ আমাকে। আমি খানিকক্ষণ যুক্তিতর্ক করলাম তাদের সঙ্গে, করলাম ভীরুতার জন্য তিরস্কারও। তারপর, পাছে তারা আমার গোয়ারতুমির জন্য বিরূপ হয় এই আশঙ্কায় সায় দিলাম দলে আরো পঞ্চাশ জন নতুন লোক নেয়ার জন্য। তখন গেল তারা আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে লোক সংগ্রহ করতে। রাজার রাজ্যসীমা পার হতে লাগে মাত্র তিনদিন। এজন্য দাবি করলে তারা জন পিছু চার টাকা ক'রে, যা সাধারণতঃ এদের মাসমাইনের সমান। পরদিন যখন আমি যাত্রা করতে চাইলাম, আমার পাইকরা দ্বিধা ও সংশয়গ্রস্ত মন নিয়ে এগিয়ে এল আমায় বাধা দেয়ার জন্য। জানালে, আমার সঙ্গে যেতে রাজী নয় তারা। নেই তাদের প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন ইচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুরোধ জানালে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করার জন্য যেন আমি কোন অভিযোগ না করি আগ্রায় তাদের সর্দারের কাছে। এরূপ অনুরোধের কারণ, সেই সর্দারই এদের আচার-আচরণের জন্য নিয়োগকারীর কাছে দায়বদ্ধ। আমার ব্যক্তিগত পরিচারকদের মধ্যেও তিনজন ভিড়ে গেল ওদের দলে। অনুগত রইল শুধু আমার সহিস, বহল-চালক ও তিনজন পরিচারক। যিনি আমায় সদাসর্বদা বিপদ থেকে ত্রাণ ক'রে এসেছেন সেই ঈশ্বরের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে যাত্রা করলাম এদের নিয়েই। কোশখানেকের মতো এগোবার পর পিছন পানে তাকিয়ে দেখি পাইকদের কতক আমায় অনুসরণ ক'রে চলেছে দূর থেকে। গাড়ি থামাবার আদেশ দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলাম তাদের জন্য। যে-জন প্রথম কাছে এসে পৌঁছাল তাকে বললাম, যদি তারা আমার সাথী হতে চায় তাহলে ওভাবে পিছু পিছু না চলে, চলুক আমার গাড়ির পাশে পাশে। দেখলাম তখন পর্যন্তও তারা ভয়ে দোদুলচিত্ত। তাই শেষে বললাম: এরকম ভীতুদের কোন দরকার নেই আমার। দিলাম চূড়ান্তভাবে তাদের বিদায়। এগিয়ে গেলাম তারপর আরো কোশখানেকের মতো। সহসা দেখি একটি পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে পঞ্চাশজনের মতো ঘোড়সওয়ার। তাদের ভেতর চারজন এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তা দেখে আমি মাটিতে নামলাম গাড়ি থেকে। সঙ্গে তেরটি বন্দুক। দিলাম প্রত্যেকের হাতে তা থেকে একটি ক'রে। ঘোড়-সওয়াররা কাছাকাছি

হতেই যদি তারা আমাদের আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় গাড়িটিকে উভয়পক্ষের মাঝে প্রতিবন্ধ রূপে স্থাপনা ক'রে প্রস্তুত হয়ে গেলাম গুলি করা'র জন্য। তারা তখন ইঙ্গিতে অভয় বাণী শোনাল আমাকে। একজন জানাল, রাজা শিকারের জন্য এসেছেন এখানে। আগন্তুক দেখে তিনিই আমাদের পরিচয় জানার জন্য পাঠিয়েছেন তাদের। তখন আমি জানালাম: আমিই সেই ফিরিঙ্গি যে পাঁচ ছ'সপ্তাহ আগে এসেছিল এখানে। সৌভাগ্যের বিষয়, যাকে আগেরবার আমি ব্রাণ্ডি ও স্প্যানিশ মদিরা উপহার দিয়েছিলাম রাজার সেই দীওয়ানও এগিয়ে আসছিলেন ওই চার ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু। আমায় দেখে বরাভয় দিলেন তিনি। প্রকাশ করলেন আবার সাক্ষাতের সুযোগ হবার জন্য আনন্দ। সেই সঙ্গে উৎসুক ভাবে জানতে চাইলেন আমার কাছে আরো মদিরা আছে কিনা। উত্তর দিলাম: ও জিনিষটি ছাড়া কখনো ভ্রমণ করিনে আমি। প্রকৃতপক্ষে, আগ্রার ইংরাজ ও ডাচরা সেখান থেকে ফেরার বেলা উপহার দিয়েছিলেন কয়েক বোতল আমাকে। দীওয়ান সাথে সাথে ছুটে গেলেন রাজার কাছে। রাজা নিজেই তখন এলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। শোনালেন স্বাগত বাণী। অনুরোধ করলেন আরো দেড় কোশ খানেক এগিয়ে একটি বিশেষ গাছের নিচে তাঁবু ফেলতে আমায়। জানালেন, তিনি অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হবেন আমার সাথে মদিরা পানে যোগ দিতে। সন্ধ্যা নাগাদ এলেন তিনি সেখানে। দু দিন কাটল একসঙ্গে হাসি-খুশী-আনন্দের মধ্যে। রাজা আনালেন সেখানে তার নর্তকীদের। এদের ছাড়াও যে ভালভাবে আনন্দ-উপভোগ করা যায় পারসিক ও ভারতীয়রা যেন ভাবতেই পারে না তা। বিদায় নেয়ার বেলা পুরো তিনদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে নিরাপদে রাজ্য সীমানা পার ক'রে দেয়ার জন্য দুশো জন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন তিনি। তাদের মাত্র তিন-চার পাউণ্ড তামাক উপহার দিয়েই অব্যাহতি পেলাম আমি। আহমদাবাদে এসে যখন পৌঁছলাম সেখানকার লোকেরা তো বিশ্বাসই করতে চাইল না একথা। যে রাজা তার রাজ্য মধ্যে যাত্রীদের নাজেহাল করার জন্য কুখ্যাত তিনি কিনা এমন সদ্‌ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে!

বরগাস্ত থেকে আগ্রা অভিমুখে এগোলে ১৫ কোশ পরেই পড়বে বিমল। আরো পনেরো কোশ পরে মোদরা। সেখান থেকে দশ কোশ গেলে চালোউর (জালোর)। চালোউর একটি পাহাড়ের ওপর চারিদিক দেয়ালঘেরা এক প্রাচীন শহর। বেশ দুরারোহ। আগে একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল এটি। ছুটি

জলাধারের একটি রয়েছে পাহাড়ের মাথায়, অন্যটি নিচে। এর মধ্য-এলাকা দিয়ে ও পাহাডের গোড়া দিয়ে শহর মধ্যে যাবার পথ। চালোউর থেকে কনতাপ (খন্দপ) বারো কোশ। তারপর সেতলানা (সীতলওয়ানা) পনেরো কোশ। সেখান থেকে পলভসেনী (পলাণ্ডী) চৌদ্দ কোশ। তারপর এগারো কোশ এগিয়ে পিপহস্ (পীপাব)। আরো ষোল কোশ গেলে মিরদা (মেরতা বা মৈরতা)।

দাস্তয়ুর থেকে মিরাদ তিনদিনের পথ (এ বিবরণ কিন্তু অসঙ্গতি পূর্ণ। উভয়ের দূরত্ব ১২৫ কোশ এবং বিরামপর্ব নটি। এক্ষেত্রে এ দূরত্ব পার হতে অন্ততঃ ৯দিন লাগার কথা)। সমগ্র দেশটি পাহাড়ী অঞ্চল। অর্ধ-স্বাধীন রাজার রাজ্য। মুঘলদের আধিপত্য মেনে নিয়ে সামান্য কর দিয়ে থাকেন তাদের। প্রতিদানে মুঘল সম্রাটও আবার তার সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন রাজাকে। এর ফলে যে কর তিনি দেন, পেয়ে থাকেন সম্রাটের কাছ থেকে তার চেয়েও অনেক বেশি।

মিরদা (মেরতা) একটি বড শহর হলেও বিশৃঙ্খল ভাবে গড়ে ওঠা। বহুবার ভারত ভ্রমণ মধ্যে একবার এখানে যখন এলাম, দেখি সমস্ত সরাইগুলি লোকে ভরা। শাহ-জহানের দ্বিতীয় ছেলে সুলতান সুজার সঙ্গে আপন মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য শাহ-জহানের মামী তথা শায়েস্তা খানের পত্নী চলেছেন তার মেয়েকে নিয়ে। আমি তখন বাধ্য হয়েই তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলাম নদীতীরে থাকা সুপারি বড়ো গাছের ফাঁকে। ঘন্টাদুয়েক কাটতে না কাটতেই রীতিমতো চমকে গিয়ে দেখি হানা দিয়েছে সেখানে পনেরো থেকে কুড়িটি হাতি। সমানে ভেঙে চলল তারা ওই সব বড় বড় গাছগুলির ডালপালা। যে ভাবে আমরা শুকনো জ্বালানী কাঠগুলিকে ভাঙি ঠিক তেমনি অনায়াসেই শুঁড় দিয়ে ভাঙছে বড় ও মোটা মোটা ডালগুলিকে। দেখলে রীতিমতো অভিভূত হয়ে যেতে হয় বিস্ময়ে। মিরদার অধিবাসীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই করা হচ্ছিল গাছপালাগুলিকে এভাবে তছনছ বেগমের আদেশে। কেন তারা তাকে সংবর্ধনা জানায়নি, কেন চলিত রীতিমত তাকে উপহারাদি দেয়নি—এই হল তার রাগের কারণ।

মিরদা (মেরতা) থেকে বারো কোশ গেলে বোরোও (ভরুণ্ডা)। তার আঠারো কোশ পরে কোইতসিয়েল (কুচেলা)। আরো চৌদ্দ কোশ গেলে বন্দর-সোনেরি (বন্দর-সিন্ধ্রী)। তার ষোল কোশ পরে লডোনা (লুদানা)।

সেখান থেকে বারো কোশ গেলে চসউ (চক্সু)। তার সতেরো কোশ পরে হুয়ালি (লোহওয়ান)। আরো উনিশ কোশ গেলে হিন্দু (হিন্দৌন)। তার দশ কোশ পরে বনিয়ানা (বয়ানা)।

আশেপাশের সমগ্র অঞ্চল মধ্যে একমাত্র শেষ দুটি শহরেই তৈরি করা হয়ে থাকে গোল ক'রে ডেলা পাকানো নীল। এই নীল সবার সেরা বলে দামও দ্বিগুণ।

বনিয়ানা (বয়ানা) থেকে ১৪ কোশ পথ চলার পর পৌঁছবেন আপনি ভেত্তপুর (ফতহপুর সীক্রী)। এটি একটি অতি পুরানো শহর। তৈরি হয়ে থাকে এখানে পশমের গালিচা। এ শহর থেকে বারো কোশ এগোলেই আগ্রা।

সুরাট থেকে আগ্রা মোট ৪১৫ কোশ। যদি প্রতিদিন সমান ভাবে ১৩ কোশ ক'রে এগোন যায় তবে ৩২ দিনে পার হওয়া যায় এ দূরত্ব। তবে স্থানে স্থানে বিশ্রাম নেয়ার বা থামার প্রয়োজন হয় বলে এ পথ পার হতে সময় নেয় সাধারণতঃ ৩৫ থেকে ৪০ দিন।

ছয় ॥ ইস্পাহান থেকে কন্দহার হয়ে আগ্রা যাবার পথ-পরিচয়

ইস্পাহান থেকে কন্দহার পর্যন্ত পথের বর্ণনা পারস্য বিবরণ গ্রন্থেই শুনিয়েছি এর আগে। তাই কন্দহার থেকে আগ্রা পর্যন্ত সড়কের বর্ণনাই দেয়া যাক এখানে। দুটি সড়ক রয়েছে আসার। একটি কাবুল হয়ে, অন্যটি মুলতানের মধ্য দিয়ে। শেষেরটি দশ দিনের পথ সংক্ষেপ। তাহলেও কদাচিত এ পথ ধরে আসে যাত্রীরা। কন্দহার থেকে মুলতান পর্যন্ত প্রায় সমগ্র পথটিই পার হতে হয় মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। তিন থেকে চার দিনের মধ্যেও মেলেনা কখনো কখনো জলের দেখা। এটিই এ পথ ধরে আসার প্রধান বাধা। তাই কাবুলের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া পথটিই সুপ্রচলিত সড়ক। কন্দহার থেকে কাবুল মধ্যে রয়েছে ২৪টি বিশ্রাম-পর্ব। কাবুল থেকে লাহোর মধ্যে ২২টি। লাহোর থেকে

দিল্লী বা জহানাবাদ মধ্যে ১৮টি। এবং দিল্লী থেকে আগ্রা মধ্যে ৬টি। এছাড়া ইস্পাহান থেকে ফরা পর্যন্ত বাটটি ও ফরা থেকে কন্দহার পর্যন্ত কুড়িটি। সব মিলিয়ে ইস্পাহান থেকে আগ্রার দূরত্ব ১৫০ পর্ব। কিন্তু যেসব সওদাগরেরা জরুরী প্রয়োজনে আসেন তারা কখনো কখনো তিন-চার জন একত্রে দল বেঁধে দ্রুত এগোন ঘোড়ার পিঠে চেপে। ৬০ থেকে ৭৫ দিনে অতিক্রম করেন এ পথ।

মূলতান শহরে উৎপাদন করা হয় বেশ কিছু পরিমাণ বস্ত্রসম্ভার। আগে এগুলি নিয়ে যাওয়া হত তত্ত শহরে। কিন্তু চরা পড়ে বড় জাহাজ চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আনা হচ্ছে এসব বস্ত্র আগ্রায়, তারপর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে সুরাটে, ঠিক যেমনটি করা হয়ে থাকে লাহোরে উৎপাদিত কতক সামগ্রীর বেলা। কিন্তু এর ফলে পরিবহন ব্যয় অত্যধিক পড়ে বলে খুব কম ব্যবসায়ীই গরজ দেখায় মূলতান বা লাহোরের সামগ্রীর ওপর টাকা লগ্নী করতে। তাই বহু কারিগরই চলে গেছে সে অঞ্চল ছেড়ে। কমে গেছে যথেষ্ট পরিমাণে এ দুটি সুবা থেকে সম্রাটের আয়। যে সব বেনিয়ারা দেশত্যাগ ক'রে ব্যবসার জন্য পারস্য আসে তাদের অধিকাংশই আসে মূলতান থেকে। অনুসরণ করে সেখানে ইহুদীদের মতো একই জীবিকা। অবৈধ হারে সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে তাদেরও হার মানায় এরা। তাদের ধর্মের একটি অনুশাসন অনুযায়ী বছরের কতক নির্দিষ্ট দিনে পাখির মাংস খেতে পারে তারা। দু'তিন ভাই মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে একই স্ত্রীকে, বড় ভাইকেই গণ্য করা হয় সব সন্তানের পিতা রূপে। (ট্যাভারনিয়ার মাংস ভোজন ও বিবাহ দুটি ক্ষেত্রেই ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন এখানে)। এ শহর ছেড়ে বহু নর্তক-নর্তকী ছড়িয়ে পড়েছে পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে।

কন্দহার থেকে কাবুল ও লাহোর হয়ে আগ্রা আসার সড়ক পথটির বর্ণনা শোনাই এবার। কন্দহার থেকে দশ কোশ এগোলে চরিসফর (শহর-ই-সফা)। তার বারো কোশ পর জেলত (কলাত-ই-ঘিলজাই)। আরো আট কোশ পরে বেত্তাজী (আব-ই-তাজী)। তার ছ'কোশ পরে মেজুর (মনসুর)। সেখান থেকে সতেরো কোশ গেলে করাবাত (কারাবাগ)। তার সতেরো কোশ পরে চকেনিকৌজ (শিগান্)।

ভারতের প্রান্তসীমানা জুড়ে কন্দহার থেকে চকেনিকৌজ মধ্যে কতক অঞ্চল রয়েছে যা ছোট ছোট বহু সর্দারদের দ্বারা শাসিত। পারস্যের শাহের প্রতি তাদের কিছুটা আনুগত্য বর্তমান।

চকেনিকৌজ থেকে কাবৌল (কাবুল) ৪০ কোশ। এই ৪০ কোশ পথ

পার হবার বেলা দেখা মেলে মাত্র তিনটি হতশ্রী গ্রামের। না মেলে সেখানে রুটি, না ঘোড়ার জন্য যবের দানা। এপথ পার হবার বেলা প্রয়োজনীয় যা কিছু সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। জুলাই ও আগষ্ট মাসে বয়ে চলে এখানে উষ্ণ বায়ু-প্রবাহ (সিমুন)। ঠিক যেমনটি দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ব্যবিলন ও মোসুলের কাছে। এর ফলে দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট, এমনকি অনেকে মারাও পড়ে এর দরুন হঠাৎ।

কাবুল একটি বড় শহর। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বেশ ভাল। উজবেগ অধিবাসীরা ঘোড়া বেচার জন্য আসে এখানে প্রতি বছর। এই ব্যবসার পরিমাণ তাদের আন্দাজ মতো বছরে ষাট হাজার টাকারও বেশি। পারস্য থেকেও নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে প্রচুর ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি জাতীয় পশু। তাছাড়া, ভারত ও পারস্যের এক বিরাট বাণিজ্য বিনিময় কেন্দ্র এটি। পাবেন মদিরাও। খাদ্য সামগ্রীর দরদাম বেজায় শস্তা এখানে।

কাবুল থেকে বরিআব (বরিক-আব) উনিশ কোশ। তারপর নিমলা (নিমলাবাগ) সতেরো কোশ। সেখান থেকে অলিবউয়া (আলিবাগান বা ইলাহ-বাগ) উনিশ কোশ। তারপর তক (দক) সতেরো কোশ। আরো ছ কোশ এগিয়ে কিয়েমরি (খইবর)। তার চৌদ্দ কোশ পরে চউর (পেশোয়ার)। আরো চৌদ্দ কোশ পরে নোভচয়ার (নৌশহর)। সেখান থেকে উনিশ কোশ গেলে অটেক (অত্তক)।

অটেক শহরটি গড়ে উঠেছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে থাকা এক শৈল-অন্তরীপে। মুঘল সাম্রাজ্যের সেরা দুর্গগুলির মধ্যে এটি একটি। সম্রাটের অনুমতি-পত্র ছাড়া কোন বিদেশীকে ঢুকতে দেয়া হয় না এ শহরটিতে। শ্রদ্ধেয় জেসুইট ফাদার রোউক্স (Roux) ও তার সঙ্গী এই সড়ক ধরে যেতে চেয়েছিলেন ইস্পাহানে। কিন্তু পেলেন না সম্রাটের অনুমতি-পত্র। তখন পিছু হটে ফিরে গেলেন তারা লাহোর। যাত্রা করলেন নদীপথে সিন্দ। তারপর গেলেন সেখান থেকে পারস্য। (অত্তক সিন্ধু ও কাবুল নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত)।

অটেক থেকে ১৬ কোশ গেলে কালাপান (কালা-কি-সরাই)। আরো ১৬ কোশ গেলে রউপত (রওয়াত)। তার ১৬ কোশ পরে তউলপেকা (তুলপুরী)। সেখান থেকে ১৯ কোশ এগিয়ে কেরলী (কয়িয়ালা)। আরো ১৬ কোশ এগিয়ে জেরাবাদ (ওয়জীরাবাদ)। সেখান থেকে ১৮ কোশ গেলে ইমিয়াবাদ (অমীনাবাদ)। আরো ১৮ কোশ গেলে লাহোর।

লাহোর একটি রাজ্যের রাজধানী। উত্তরের পর্বতমালা থেকে নেমে আসা যে পাঁচটি নদী সিন্ধু নদকে জলসমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে তারই একটির তটে অবস্থিত এ শহরটি। এই পাঁচটি নদী-সিঞ্চিত পুরো অঞ্চলটিকে বলা হয়ে থাকে পঞ্জাব (পঞ্জ-আব বা পঞ্চনদীর দেশ)। প্রবাহ পথ পরিবর্তন ফলে নদীটি এখন সরে গেছে শহর থেকে সিকি কোশ দূরে। এ নদীটির (রাবী বা ইরাবতী) দুই তীরবর্তী অঞ্চল হামেশাই বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রবল বন্যার দরুন। শহরটি বড়সড়, লম্বা এক কোশেরও বেশি। বাড়িগুলিও আগ্রা ও দিল্লীর তুলনায় উঁচু। এসত্ত্বেও বেশির ভাগ বাড়িই পড়ে আছে ভাঙাচোরা অবস্থায়। বহু বাড়িই ধ্বসে পড়েছে অত্যধিক বর্ষার দরুন। সম্রাটের প্রাসাদটিকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর বলেই। তবে আগের মতো নেই সেটি আর নদীকূলে।* নদীটি সিকি কোশের মতো পিছিয়ে যাবার দরুনই এ অবস্থা। মদিরা সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা হবেনা আপনার লাহোরে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, লাহোর ও তার উত্তর দিকে থাকা কাশ্মীর রাজ্য পার হবার পর মেয়েদের শরীরের কোন উপাঙ্গেই চুলের দেখা পাবেন না আপনি। প্রাকৃতিক ভাবেই এ থেকে বঞ্চিত তারা (প্রকৃতপক্ষে, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লোমনাশক ব্যবহারের ব্যাপক প্রবণতাই এর কারণ)। পুরুষদেরও সামান্য যতোটুকু যা দেখা যায় তা শুধু ওই থুতনিতেই।

লাহোর থেকে বারো কোশ পরে মেনাত-কান (অমানত খান)। তার পনেরো কোশ পরে ফতিয়াবাদ (ফতহপুর)। আরো পনেরো কোশ পরে সেরা-দকন (দেহখান)। তারপর পনেরো কোশ গেলে সেরা-বলৌর (ফিলৌর)। তার বারো কোশ পরে সেরা-দৌরাহী (দৌরাহী)। আরো সতেরো কোশ এগিয়ে গেলে সেরিন্দ (শিরহিন্দ) শহর। সেখান থেকে পনেরো কোশ গেলে সেরা-মোগল (মুঘল সরাই)। আরো চৌদ্দ কোশ গেলে সেরা-চাবাস (শাহাবাদ)। তারপর সতেরো কোশ গেলে দিরাউরিল (তরাওয়ারী)। তার চৌদ্দ কোশ পরে সেরা-ক্রিন্দল (করনাল)। আরো একুশ কোশ গেলে গুইনাউর (গন্নায়ুর)। তারপর ২১ কোশ এগোলে দিহলী (দিল্লী)।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মতো। লাহোর থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে আগ্রা পর্যন্ত পুরো সড়কটিই একটানা ছায়াবীথিকা। তার দুপাশ বরাবর লাগানো হয়েছে সুন্দর সুন্দর সব গাছ। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখার মত সে দৃশ্য।

তবে কতক স্থানে অবহেলার দরুন নষ্ট হয়ে গেছে গাছগুলি, আবার যে যত্ন ক'রে নতুন গাছ লাগাবে সে আগ্রহ দেখায়নি কেউ।

দিল্লী যমুনা নদীর কাছে থাকা একটি বড় শহর। নদীটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে তারপর, হয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্ববাহিনী। আগ্রা ও কদিয়ু (খজোয়া বা খজুহা) পার হয়ে ঠাঁই নিয়েছে গিয়ে গঙ্গার বুকে। দিল্লী শহরটি বলতে গেলে এখন পুরো ধ্বংসের মুখে। প্রায় সমস্ত বাড়ি ঘরই পড়েছে ধ্বসে। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যতোটা যা মাথা খাড়া ক'রে আছে তার পরিমাণও অবশ্য কম নয়। তবে, এ টি'কে থাকা যেন শুধু গরীবদের আপন কোলে ঠাঁই দেয়ার জন্যই। ভারতের অন্যান্য শহরের মতোই সরু সরু রাস্তা, বাঁশের তৈরি বাড়িই এখন বেশি। দরবারের আমীরদের মধ্যে তিন-চার জন মাত্র বাস করেন এখানে। বিরাট ঘেরা-ওর মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে থাকেন তারা। দরবারে থাকা শ্রদ্ধেয় জেসুইট ফাদারও বাস করতেন এখানেই। দিল্লীর এই ছন্নছাড়া চেহারা হয়েছে শাহ-জহান তার নামানুসারে নতুন শহর জহানাবাদ গড়ার পর থেকেই। এখানকার জলবায়ু আগ্রার তুলনায় কিছুটা কমনীয় বলে এখানে বাস করাই বেশি পছন্দ করতেন তিনি।

জহানাবাদও দিল্লীর মতো অতি বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা শহর। একটি সাধারণ ধরনের দেয়াল দিয়ে শহর দুটি পৃথক করা। ব্যক্তিগত বাড়িগুলির প্রতিটিই অনেকখানি খোলামেলা ঘেরা জমিনের মাঝে গড়া। ফলে মহিলারা যেখানে থাকেন, তার কাছাকাছি কারো যাবার উপায় নেই সহজে। অভিজাতদের অধিকাংশই বাস করেন না কিন্তু শহর মধ্যে। জলের কাছাকাছি থাকার লক্ষ্য নিয়ে তাদের বাড়িগুলি গড়েছেন তারা বাইরে, নদীকূলে। দিল্লীর দিক থেকে জহানাবাদে প্রবেশ কেলা চোখে পড়বে আপনার একটি সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ। দুপাশে তার সারি সারি খিলান। তার নিচে ক'রে চলেছে সওদাগরেরা বেচা-কেনা। মাথার ওপর দিকটা অনেকটা মঞ্চের মতো। (বর্তমানে এটি ফৈজ বাজার নামে পরিচিত)। রাস্তাটি গিয়ে শেষ হয়েছে এক বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ এলাকায়। সম্রাটের প্রাসাদটি এখানেই। রয়েছে আরো একটি বেশ সরল ও চওড়া রাস্তা। সেটিও গিয়ে শেষ হয়েছে এই একই চতুষ্কোণ এলাকায়, রাজ-প্রাসাদেরই আরেকটি ফটকে। যে সব বিশিষ্ট সওদাগরেরা পণ্য বেচার জন্য দোকান করেন না, তারাই মুখ্যতঃ বসবাস করেন এ রাস্তাটিতে।

সম্রাটের প্রাসাদটির পরিধি অন্ততঃপক্ষে আধ কোশ। বাইরের দেয়ালটি

মসৃণভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি। রয়েছে দেয়ালের আড়াল থেকে গুলি করার মতো ফোকর সহ যুদ্ধমঞ্চ। দশ দশটি যুদ্ধমঞ্চের পর একটি ক'রে বুরুজ। চারদিককার পরিখাগুলি কাটা পাথর দিয়ে বাঁধানো ও জলে ভরা। নেই প্রধান ফটকটির কোন অভিনবত্বই। যে চত্বরটিতে অভিজাতদের হাতির পিঠে চড়ে প্রবেশ অধিকার রয়েছে সেই প্রথম চত্বরটির বেলাও বলা চলে এই একই কথা। [ফারগুসনের বর্ণনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তার মতে এই ফটকটি পৃথিবীর বুকে টিঁকে থাকা যে কোন প্রাসাদ ফটকের চেয়ে অনুপম।]

এই চত্বরটি থেকে, দুপাশে সুন্দর সুন্দর দরদালান থাকা একটি চওড়া সুদীর্ঘ পথ এগিয়ে গেছে ভেতরের দিকে। রয়েছে এ দরদালানগুলিতে সহিসদের থাকার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরী। দরদালানগুলির ভিত মাটি থেকে প্রায় দু'ফুট উঁচু। বাইরে কড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলিকে খেতে দেয়া হয় তাতেই গা ঘেঁষে। স্থানে স্থানে (দরদালানের ফাঁকে ফাঁকে) রয়েছে বড় বড় ফটক। এর কতক চলে গেছে হারেমের বিভিন্ন মহলের দিকে। কতক কাজীদের এজলাসের দিকে। প্রধান পথটির মাঝ বরাবর চলে গেছে একটি জলে ভরা খাল। তার দুদিক দিয়েই সুন্দর চলাচলের পথ। কিছু দূর অন্তর অন্তর সমান দূরত্ব বজায় রেখে একটি ক'রে ছোট জলাধার। এই দীর্ঘ পথটি শেষ হয়েছে গিয়ে একটি বড় চত্বরে। এখানে প্রহরা দিয়ে চলেন ওমরাহরা (প্রকৃতপক্ষে উমরা, যা আমীরের আরবী বহুবচন)। তার মানে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অভিজাতরা। তুর্কীর বাচা (পাশা) ও পারস্যের খানদের সমতুল এরা। তাদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে এই চত্বরটির চারিদিকে অনেকগুলি নিচু কুঠুরী। ঘোড়াগুলিকে বেঁধে রাখা হয় যার যার কুঠুরীর দরজার গোড়ায়।

এই দ্বিতীয় চত্বরটি থেকে তৃতীয় চত্বরে যেতে হয় একটি বড় ফটক দিয়ে। তার একপাশে মাটি থেকে মাত্র দু'ই কি তিন ফুট উঁচু ক'রে গড়া একটি ছোট কক্ষ বর্তমান। এটিই হল রাজকীয় তোষাখানা (বা পোশাকখানা)। সম্রাট যদি কোন বিদেশী বা তার কোন প্রজাকে সম্মানিত করতে চান তবে এখান থেকে সে পায় সম্মানী পোশাক বা খিলাত। একই ফটকের কাছে সামান্য আর একটু এগিয়েই রয়েছে ঢাক, তুরী, সানাই প্রভৃতি রাখার স্থান (নহবত-খানা বা নকার বা নকারা খানা)। সম্রাট যখন সিংহাসনে আসীন হন ঠিক তার আগে এবং আবার সিংহাসন ছেড়ে বিদায় নেয়ার পূর্বে ওমরাহদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য বাজানো হয় এগুলি স্বল্পক্ষণের জন্য। তৃতীয় চত্বরটিতে উপস্থিত হলে ঠিক

সুমুখেই দেখা যাবে দীওয়ান। এখানেই দর্শন দিয়ে থাকেন সম্রাট। এটি একটি সুবিশাল মহাকক্ষ। জমিন থেকে চার ফুটের মতো উঁচু ভিতের ওপর গড়া। তিনটি দিকই পুরোপুরি খোলা। মার্বেল পাথরের ৩২টি স্তম্ভ ধারণ ক'রে রয়েছে সমসংখ্যক খিলানকে। প্রত্যিটি স্তম্ভ তার বেদী ও আংশিক নক্সা সহ প্রায় চার ফুট চতুষ্কোণ। এ ভবনটির নির্মাণ কাজ যখন শুরু করেন তখন শাহ্-জহানের পরিকল্পনা ছিল মোজাইকের দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মদ্বারা আগাগোড়া সুশোভিত করবেন এটিকে। ঠিক যেমনটি করা হয়েছে ইটালীর গ্রাণ্ড ডিউকের ভজনালয়ে। কিন্তু দু তিনটি স্তম্ভের গায়ে পরীক্ষামূলকভাবে দু-তিন ফুট মোজেইক করার পর তিনি অনুভব করলেন এরূপ বিস্তৃত নক্সাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যত পাথরের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করা হয়ে পড়বে রীতিমতো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া দরকার সেজন্য অতি বিপুল পরিমাণ অর্থও। তাই বাধ্য হলেন তিনি সে পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে। খুশী রইলেন বিভিন্ন রকম ফুলের নক্সা দিয়ে তাকে সুশোভিত করেই শুধু। [এই মহাকক্ষটির অন্য এক নাম চিহল সিতুন বা চল্লিশ স্তম্ভের মহাকক্ষ]।

সম্রাট যখন দর্শন দান ও ন্যায়-বিতরণের জন্য আসেন তখন তার সিংহাসনটি পেতে দেয়া হয় রঙ্গালয়ের আদলে মহাকক্ষের ঠিক মাঝখানে দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে। এটি চারটি স্তম্ভ, চাঁদোয়া, পিছনের হেলান দেয়ার জায়গা, একটি গদী ও আচ্ছাদনী সহ ক্যাম্প খাট মাপের ছোট্ট একখানি চৌকি। এর সবকিছুই হীরকমণ্ডিত। [মানুচির বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের কিছু পার্থক্য বর্তমান। এ সম্পর্কে এই সংকলকের 'মানুচির দেখা ভারত' দেখুন।]

সম্রাট যখন এটির ওপর বসেন তখন অবশ্য সোনার সুতা দিয়ে বুটি তোলা কিংখাবের একটি চাদর বা তুলার আস্তরণ দেয়া দামী কোন বস্ত্র বিছিয়ে দেয়া হয় তার ওপর। দু'ফুট চওড়া তিনটি সোপান বেয়ে তিনি ওঠেন সেটিতে। খাটের একপাশে খাটো বর্শার মাপের একটি দণ্ডের মাথায় আটকানো রয়েছে একটি ছত্র (এটি প্রকৃতপক্ষে আফতাবগীর বা রোদ নিবারণী)। খাটের প্রত্যিটি স্তম্ভের সাথে ঝোলান রয়েছে সম্রাটের এক একটি অস্ত্র। একটিতে তার ঢাল, একটিতে তরবারি, আরেকটিতে তার ধনুক, তীর ও তূণীর এবং আরেকটিতে ঐ জাতীয় অন্য কোন অস্ত্র।

সিংহাসনের ঠিক নিচে, মহাকক্ষের কুড়ি ফুট বর্গাকার একটি এলাকা ছোট ছোট পিলপে সংলগ্ন রেলিং দিয়ে ঘেরা। কখনো কখনো রূপার পাত দিয়ে মোড়া

থাকে এগুলি, কখনো বা সোনার পাত দিয়ে। এই ঘেরা স্থানটির চার কোণে বসেন রাজ্যের চার কর্মসচিব। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের মামলাতেই পালন ক'রে থাকেন এরা উকিলের ভূমিকা। এই রেলিংয়ের চারদিকে উপস্থিত থাকেন কতক আমীরও। সঙ্গীতের আসরটিও বসে এখানেই। সম্রাট যতক্ষণ দীওয়ানে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ ধরে চলে এ সংগীত। তা এত মধুর ও মনোরম এবং এত মৃদু স্বরে বাজানো হয় যে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে না দরবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে। সম্রাট সিংহাসনে আসীন হলে তার পাশে এসে দাঁড়ান জনাকয়েক বড় আমীর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার নিজের সন্তানেরা। বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে দরবারে হাজির হন এসে নবাব (জাফর খান)। তুর্কীর প্রধান ওয়জীরের মতো, তিনিই এখানকার প্রথম স্থানাধিকারী মন্ত্রী। তিনি যে দপ্তর পরিচালনা করেন সেখানে ঘটে থাকা ঘটনাবলীর এক বিবরণী পেশ করেন তিনি এ সময়ে। তার দপ্তরটি প্রথম চত্বরে প্রবেশ পথের কাছেই। তিনি বলা শেষ করলেই উঠে পড়েন সম্রাট। এখানে উল্লেখযোগ্য, সম্রাট যতক্ষণ দরবারে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ কাউকেই অনুমতি দেয়া হয় না দরবার ত্যাগ করার, তা তিনি যেই হোন না কেন। তবে, সর্বজনমান্য এ বিধিটি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন সম্রাট অনুগ্রহ ক'রে। কীভাবে ঘটল এ ব্যাপারটি অল্প কথায় শোনাই তা।

দীওয়ানে সম্রাট বসে আছেন সেদিন। আমিও উপস্থিত সেখানে। কিছুক্ষণ পরে প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমার এক জরুরী কাজের জন্য সে-স্থান ত্যাগ করা। কাজটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে স্থগিত রাখা সম্ভব নয় কিছুতেই। যেই বেরিয়ে আসছি রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক হাত দিয়ে ধরে ফেলল আমাকে, রুক্ষস্বরে জানাল, এখন যেতে পারবেন না আপনি। কিছুক্ষণ যুক্তিতর্ক করলাম তার সাথে, কিন্তু যখন দেখলাম সে মারমুখো হয়ে উঠছে, দিলাম আমার কঞ্জর (খঞ্জর/ছোরা)-এ হাত। যদি না আমার ভাবগতিক দেখে তিন-চারজন রক্ষী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধরে ফেলত আমায় তাহলে রাগের মাথায় নিশ্চয় ক'রে বসতাম সেটি দিয়ে তাকে আঘাত। সুখের বিষয়, এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন নবাব। সম্পর্কে তিনি সম্রাটের মামা। বিতণ্ডার কারণ শুনে তিনি আমাকে চলে যেতে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন রক্ষী-নায়ককে। তারপর যথাবিধি ঘটনাটি তুললেন সম্রাটের কাছে। সন্ধ্যাবেলায় লোক পাঠিয়ে নবাব আমাকে খবর দিলেন : শাহানশাহ আদেশ দিয়েছেন, তিনি দীওয়ানে থাকাকালে আমি প্রয়োজন মতো পারব

সেখানে যেতে কিংবা সেখান থেকে চলে আসতে। পরদিন নবাবের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ধন্যবাদ জানালাম এজন্য।

দরবার মহাকক্ষটির ঠিক মাঝামাঝি রয়েছে একটি সরু নালি। ইঞ্চি ছয়েক হবে চওড়ায়। সম্রাট যখন সিংহাসনে বসে থাকেন, তখন দরবারে উপস্থিত সমস্ত অচেনা ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই নালিটির এপারে। কাছে যাবার জন্য না ডাকা হলে কাউকেই পার হতে দেয়া হয় না সেটি, এমনকি রাজদূতদের বেলাও ব্যতিক্রম ঘটান হয় না এ নিয়মের। যখন কোন রাজদূত ওই নালিটির কাছে হাজির হন, অনুষ্ঠান অধিকর্তা তখন সম্রাটের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করেন যে অমুক রাজদূত কথা বলতে চান শাহানশাহের সাথে। একজন রাজ্য-সচিব তখন সেকথা আবার শোনান সম্রাটকে। তিনি যে তা শুনতে পেয়েছেন তার হাবভাব দেখে প্রায়ই মনে হয় না তা। কিন্তু কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর চোখ তুলে রাজদূতের দিকে তাকাতে দেখা যায় তাকে। ওই সচিবের মাধ্যমে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, কাছে এগিয়ে আসতে পারেন তিনি।

দীওয়ান মহাকক্ষ থেকে বাঁদিকে গেলে একটি অলিন্দ। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীটিকে (যমুনা)। এই অলিন্দ হয়ে একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করেন সম্রাট। তারপর সেখান থেকে চলে যান আপন হারেমে। এই ছোট কক্ষটিতেই প্রথম আমি সুযোগ পাই সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। অন্য কোথাও শোনাব সে বৃত্তান্ত।

দীওয়ান মহাকক্ষটি যে চত্বরে, তারই বাঁদিকে রয়েছে সুন্দরভাবে তৈরি ছোট একটি মসজিদ। এর গম্বুজটি পুরোপুরি সীসা দিয়ে মোড়া। এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে তা করা হয়েছে যে অনেকেই মনে করে, নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি সেটি। শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিন এখানেই প্রার্থনা জানাতে আসেন সম্রাট। সেদিন যান তিনি বড় মসজিদে। অতি জাঁকালো ক'রে তৈরি সেটি। শহরের অন্যান্য বাড়ির তুলনায় অনেক উঁচু ভিতের ওপর গড়া, পৌঁছতে হয় অনেকগুলি সোপান বেয়ে। সম্রাট যেদিন এ মসজিদটিতে আসেন সেদিন পাঁচ-ছ ফুট উঁচু একটি জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয় এই সোপানশ্রেণীকে। পাছে কোন হাতি সম্রাটের দিকে তেড়ে এসে তার কোন ক্ষতি ঘটায় এজন্যই এ সতর্কতা। এছাড়া মসজিদটিকে যেরূপ শ্রদ্ধা করা হয় সেজন্যও।

চত্বরটির ডানদিক জুড়ে টানা বারান্দার মত অনেকগুলি দরদালান। এর মেঝে মাটি থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি উঁচুতে। পুরো এলাকাটিই সম্রাটের আস্তাবল।

বেশ কয়েকটি দরজা রয়েছে ভেতরে ঢোকার জন্য। আস্তাবলটি সব সময়েই ভরা থাকে অতি সরেস জাতের ঘোড়ায়। যেটি সবচেয়ে সস্তা সেটির দামও তিন হাজার একু (ছ' হাজার টাকা)। কতকের দাম দশ হাজার একু পর্যন্ত। প্রতিটি দরজার সামনে ঝোলানো রয়েছে আমাদের দেশের ওঝার বেতের ধরনে ফালি করা বাঁশ দিয়ে তৈরি এক ধরনের পর্দা। তবে যেভাবে আমরা ছোট ছোট ওঝারের সঙ্গে ওঝার দিয়ে বুনোট করি, নয় মোটেই সেভাবে বুনোট করা। ফুলের আকারে পাকানো রেশম দিয়ে বাঁশের কাঠিগুলিকে বুনোট ক'রে ক'রে তৈরি। এ ধরনের কাজ যেমন অতি বিস্তারিত ও শ্রমসাধ্য তেমনি প্রচুর ধৈর্য-সাপেক্ষ। ঘোড়াগুলিকে যা'তে মশা ও মাছি জ্বালাতন না ক'রে তারই প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা হয় এ পর্দাগুলিকে। তবে পুরো কাজ হয় না এতে। এক একটি ঘোড়া পিছু রাখতে হয় এজন্য দু-জন ক'রে সহিস। এদের একজন সাধারণতঃ বাতাস ক'রে চলে ঘোড়াটিকে। ফটকগুলির মতো দরদালানগুলির সামনের খোলা অংশগুলিতেও এরকম পর্দা ঝোলানো। এগুলি প্রয়োজন মতো গোটানো কি নামানো চলে। পুরো মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকা। সন্ধ্যাবেলা ঘোড়াদের বিছানা বিছিয়ে দেয়ার জন্য সরিয়ে নেয়া হয় সেগুলিকে। বিছানারূপে ব্যবহার করা হয়, রোদে শুকিয়ে ও তারপর গুঁড়িয়ে নেয়া ঘোড়ার মল (পারস্যেও এই একই প্রথা চলিত)। উজবেগ অঞ্চল, আ্যারাবীয়া, পারস্য যেখান থেকেই আমদানি হয়ে থাকুক না কেন, ভারতে আসার পর ঘোড়াগুলিকে পুরোপুরি পালটাতে হয় তাদের খাদ্যাভ্যাস। ভারতে না দেয়া হয় তাদের খড, না দেয়া হয় ওট ব জই। সকালবেলা খেতে দেয়া হয় প্রতিটি ঘোড়াকে আমাদের পেনি রোলের আকারের দু-তিন ডেলা ক'রে ঘি মাখানো ময়দা। এ ধরনের খাদ্যের প্রতি রুচি গড়ে তোলা তাদের পক্ষে রীতিমত কঠিন। ফলে প্রায়ই চার-পাঁচ মাস সময় নেয় তারা এর সঙ্গে সড়গড় হয়ে উঠতে। সহিস তাই জোর ক'রে ঘোড়াকে হাঁ করিয়ে জিভ চেপে ধরে গলার ভেতর ঢুকিয়ে দেয় সেগুলিকে। আখ ও জোয়ারের মরশুমে তার কিছুটা খেতে দেয়া হয় দুপুরের দিকে। বিকালে, সূর্যাস্তের এক বা দু ঘন্টা পূর্বে দেয়া হয় মটর-কলাই যাঁতায় পিষে জলে ভিজিয়ে তাই খেতে। সম্রাটের অন্যান্য আস্তাবলগুলিতে কিছু কিছু সরেস ঘোড়া থাকলেও আস্তাবলগুলি যেমন-তেমনভাবে গড়া, পরিবেশও ভাল নয় কিছু। তাই মোটেই বর্ণনার যোগ্য নয় সেগুলি।

যমুনা একটি সুন্দর নদী। বড় বড় নৌকা চলাচল করে এর বুকে। আগ্রা

অতিক্রম করার পর, এলাহাবাদের কাছে লীন হয়ে গেছে সে গঙ্গার জলধারার সঙ্গে। প্রমোদ ভ্রমণের জন্য সম্রাট অনেকগুলি বজরা রেখেছেন জহানাবাদে। দেশীয় রীতিতে জাঁকালো ক'রে সাজানো সেগুলি।

সাত ॥ পূর্ব-পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতা। দিল্লী থেকে আগ্রা যাবার পথ-পরিচয়।

দিহলী (দিল্লী) থেকে আট কোশ এগিয়ে গেলে বদেলপুর (সম্ভবতঃ বল্লভগড়)। সেখান থেকে আঠারো কোশ গেলে পেলুয়েল-কি-সেরা (পলওয়ল)। তার পনেরো কোশ পরে কোট-কি-সেরা (কোশী)। আরো ষোল কোশ পরে চেকি-সেরা (শেইখ-কি-সরাই, প্রকৃতপক্ষে শাহ-কি-সরাই বা শাহগঞ্জ সরাই)।

চেকি-সেরায় বর্তমানে রয়েছে ভারতের সেরা মন্দিরগুলির একটি। আছে তার সঙ্গে বানরদেরও একটি বাসস্থলী। আঞ্চলিক এবং প্রতিবেশী রাজ্য-জাত উভয় প্রকার বানরের জন্যই। বেণিয়ারা খাদ্য যোগায় তাদের। এই মন্দিরটির নাম মথুরা (আগ্রার প্রায় তিরিশ মাইল আগে, যমুনার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত এ শহরটি)। এখানকার চাইতে পূর্বে এ মন্দিরটিকে অনেক বেশি কদর করত বিগ্রহ পূজকরা। কারণ আর কিছুই নয়। তখন মন্দিরটির গা ঘেঁষে বয়ে চলত যমুনা। স্থানীয় এবং তীর্থ করতে পূজাদিতে দূরদেশ থেকে আগত বেণিয়ারা তখন মন্দিরে প্রবেশের আগে সুযোগ পেত নদীতে স্নান ক'রে নেয়ার। পেত মন্দির থেকে ফেরার পর, রান্নাবান্নার আগেও স্নান ক'রে নেয়ার সুযোগ। স্নান না ক'রে কখনো করে না তারা রান্নাবান্না। এ ছাড়াও তাদের বিশ্বাস, স্রোতস্বতী জলধারায় স্নান করলে বেশি ভালোভাবে ধুয়েমুছে যায় পাপ-তাপ। কিন্তু বছর কতক হল নদীটি নতুন গতিপথ নিয়ে সরে গেছে উত্তর দিকে। বয়ে চলেছে মন্দিরটি থেকে কম করে কোশখানেক দূর দিয়ে। এর ফলেই এখন আর আগেকার মতো তত তীর্থযাত্রী আসেনা এখানে।

চেকি-সেরা ছেড়ে পাঁচ কোশ এগিয়ে গেলে গুদকী-সেরা। তারপর ছ'কোশ

এগিয়ে গেলেই আগ্রা। (দ্বিতীয় বারের ভ্রমণ কালে মথুরা-আগ্রা দূরত্ব ১৮ কোশ বলে জানিয়েছেন ট্যাভারনিয়ার। এ দুই স্থানের দূরত্ব মোটামুটি ওই রূপই। সুতরাং এখানে বর্ণনা কালে একটি বিরাম-স্থলী বাদ দিয়েছেন তিনি)

আগ্রা বালুকাকীর্ণ মৃত্তিকায় ২৭°৩১´ দেশান্তরে অবস্থিত (প্রকৃতপক্ষে ২৭°১০´৬´ দেশান্তরে)। এজন্যেই গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যধিক গরম। এটিই ভারতের সব থেকে বড় শহর। সম্রাটের বাসস্থান এখানেই ছিল আগে। অভিজাতদের আবাসগুলি সুন্দর ও মজবুত ক'রে তৈরি। কিন্তু সাধারণ বাসিন্দাদের বাড়িগুলির বেলা মোটেই বলা চলেনা সেকথা, ভারতের অন্যান্য শহরগুলিতে যেমনটি তার চেহারা, এখানেও ঠিক তাই। প্রতিটি বাড়ি ছাড়া ছাড়া, অতি উঁচু দেয়াল দিয়ে এমন ভাবে ঘেরা যাতে বাইরের কেউ দেখার সুযোগ না পায় অন্তঃপুরচারিণীদের। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমাদের ইওরোপের শহরগুলির মতো এখানকার শহরগুলিতে পথ চলা কালে চোখে পড়ে না দৃষ্টি-উল্লাসকর কোন কিছুই। আগ্রা বালুকাকীর্ণ অঞ্চল। তবে গ্রীষ্মের উগ্রতা অত্যধিক এখানে। আংশিক এই কারণেই এ শহরটি বর্জন ক'রে জহানাবাদে আপন রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছেন শাহ-জহান।

উল্লেখযোগ্য বলতে যা কিছু রয়েছে আগ্রায় তা হল সম্রাটের প্রাসাদপুরী এবং শহরের ভেতরে ও বাইরে থাকা কতক সুন্দর সমাধিসৌধ। প্রাসাদপুরীটি বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এবং জোড়া দেয়াল ঘেরা। দেয়ালের কতকস্থানে বানানো হয়েছে মঞ্চ, তার ওপরে দরবারের বিশেষ কতক কর্মচারীর জন্য ছোট ছোট বাসগৃহ। প্রাসাদপুরীর সম্মুখ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা নদী। তবে ঘেরা দেয়াল ও নদীর মাঝে রয়েছে এক বিরাট চতুষ্কোণ বাগিচা। এখানে হাতির লড়াই উপভোগ করেন সম্রাট। লড়াই-অঙ্গনটি ইচ্ছা ক'রেই নির্বাচন করা হয়েছে নদীকূলে এরূপ একটি জায়গায়। যুদ্ধে জয়ী হলে হাতিগুলি এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে তাদের নদীজলে নামতে বাধ্য করা না হলে সম্ভব হয় না দীর্ঘ কালের মধ্যে শান্ত ক'রে তোলা। হাতিকে জলে নামাতে নিতে হয় এ সময়ে যথেষ্ট চাতুরীর আশ্রয়। লম্বা বর্শার ডগায় বিস্ফোরক ও ছোট ছোট বোমা ঝুলিয়ে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে তার সাহায্যে তাড়া ক'রে জলে নামানো হয় তখন তাকে। দু-তিন ফুট গভীর জলের মধ্যে নেমে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত বনে যায় হাতি।

শহরের দিকেও প্রাসাদপুরী ও তার প্রথম ফটকটির সুমুখে রয়েছে বিরাট এক চতুষ্কোণ বাগিচা। বলার মতো তেমন কোন অভিনবত্ব নেই এটির। কতক

সৈনিক পাহারা দেয় সেটিকে। আগ্রা ছেড়ে জহানাবাদে বাস শুরু করার আগে সম্রাট যখনই প্রাসাদ ছেড়ে রাজ্য ভ্রমণে বার হতেন, প্রাসাদের ভার অর্পণ ক'রে যেতেন অতি বিশ্বস্ত কোন আমীরের ওপর। তার ধন-সম্পদও থাকত এখানেই। সম্রাট ফিরে না আসা পর্যন্ত দিন-রাতের মধ্যে একটু সময়ের জন্যও আমীর কোথাও যেতেন না প্রাসাদের এই ফটক ছেড়ে। বাস করতেন এই ফটকের কাছে থাকা একটি গৃহেই। সম্রাটের এরূপ এক অনুপস্থিতি কালেই দেয়া হয়েছিল আমাকে আগ্রার এই প্রাসাদপুরীটি দর্শনের সুযোগ। সম্রাট জহানাবাদ যাত্রা করার দরুন দরবারের সকলেই সঙ্গী হয়েছিলেন তার। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত। প্রাসাদপুরীর দায়িত্ব যে আমীরের ওপর দিয়ে যাওয়া হয় তিনি ছিলেন ডাচদের এবং সাধারণ ভাবে সব ফিরিঙ্গিরই একজন বড় বন্ধু।

প্রাসাদ-রক্ষকের বাসস্থানটি যেখানে, সেই প্রথম ফটকটি একটি দীর্ঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন খিলান পথ। সেটি পার হলে প্যারিসের রাজপ্রাসাদ বা লুক্সেমবার্গের মতই উপস্থিত হবেন আপনি দরদালান ঘেরা বিশাল এই চত্বরে। একেবারে বিপরীত দিকে থাকা দরদালানগুলিই অন্যগুলির তুলনায় চওড়া ও উঁচু। তিন সারি স্তম্ভের ওপর খাড়া। অন্য যে তিন দিকের দরদালানগুলি তুলনামূলক ভাবে নিচু ও সরু সেখানে রক্ষীদের জন্য কতক ছোট ছোট কুঠুরী বর্তমান। চওড়া দরদালানটির দেয়ালের মাঝামাঝি রয়েছে একটি কুলঙ্গী। হারেম থেকে একটি লুকানো ছোট সিঁড়ি বেয়ে সম্রাট হাজির হতে পারেন এ কুলঙ্গীটিতে। তিনি যখন এখানে এসে বসেন তখন ভ্রম হবে তাকে শিল্পীর খোদাই মূর্তি বলে। থাকে না এ সময় তার সঙ্গে কোন রক্ষী। বা ডান, সামনা পিছন কোনদিক থেকে কারো তার কাছাকাছি হবার উপায় নেই বলে নেই ভয় করারও কিছু। প্রখর গ্রীষ্মকালে তাকে হাওয়া করার জন্য সঙ্গে রাখেন একজন খোজাকে বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের কোন বংশধরকে। দরবারের আমীররা ঠাঁই নেন এই কুলঙ্গীর নিচে দরদালান মধ্যে।

চত্বরটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বাঁদিক ঘেঁসে দ্বিতীয় ফটকটি। এটি দিয়ে পৌঁছান যায় আরেকটি বিশাল চত্বরে। এটিও দরদালান দিয়ে ঘেরা। রয়েছে সেখানেও কতক প্রাসাদকর্মচারীর জন্য ছোট ছোট ঘর। এই দ্বিতীয় চত্বরটি পেরিয়ে উপস্থিত হবেন তৃতীয় চত্বরে। সম্রাটের বাসমহলটি এখানেই। এই চত্বরের ডানদিকে থাকা বড় দরদালানটির পুরো খিলান ছাতটিকে রূপা দিয়ে মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন শাহ-জহান। এ কাজ বাস্তবে পরিণত করার কথা ছিল

অগাষ্টিন ছ বোরদু নামে একজন ফরাসীর। কিন্তু অগাষ্টিনের যোগ্যতা সম্পর্কে আশংকা থাকার দরুন কোচিন থেকে ফেরার কালে বিষ প্রয়োগ করা হল তার ওপর। আর পর্তুগীজদের সাথে এ ব্যাপার নিয়ে গোয়ায় কথাবার্তা চালানোর মত যোগ্যতর কোন ব্যক্তি তার রাজ্য মধ্যে না থাকায় সম্রাট পরিত্যাগ করলেন সে পরিকল্পনা। এই দরদালানটিকে রঞ্জিত করা হয়েছে শেষঅব্দি অতি মিহি সোনার পাত ও আকাশী নীল রঙ দিয়ে। মেঝেতে বিছানো হয়েছে একখান কার্পেট। দরদালানে থাকা কতক দরজা দিয়ে যাওয়া যায় কতক খুব ছোট বর্গাকার কুঠরী মধ্যে। এর দু-তিনটি মাত্র খুলে দেখান হয়েছিল আমাদের, জানানো হয়েছিল বাকিগুলিও সব এই একই রকমের। চত্বরের অন্য তিন দিকে সাধারণ ঘেরদেয়াল ছাড়া কিছুই নেই আর। যে দিকটিতে নদী সে দিকটিতে রয়েছে একটি সামনের দিকে এগোন দাওয়ান বা উঁচু অলিন্দ। হাতিদের লড়াই দৃশ্য বা নদীর বুকে আপন বজরাগুলি চলাচলের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য এখানে এসে বসেন সম্রাট। এই দাওয়ান বা অলিন্দটির সামনেই রয়েছে একটি দরদালান, ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটি প্রবেশ কক্ষ হিসাবে। শাহ-জহান চেয়েছিলেন এটিকে আগাগোড়া চুনি ও পান্না দিয়ে শিল্পমণ্ডিত করতে। সবুজ আঙুরগুলি ধীরে ধীরে লাল হয়ে চলেছে এরূপ এক প্রাকৃতির দৃশ্য রূপায়িত করার আকাঙ্খা ছিল তার। পৃথিবী জুড়ে সাড়া জাগিয়েছিল তার এই পরিকল্পনাটি কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ যোগানো তার পক্ষে সম্ভব তার চেয়েও বেশি অর্থের প্রয়োজন এজন্য। তাই কাজ শুরু করেও রেখে দিলেন তাকে অপূর্ণ। সোনা দিয়ে রূপায়িত করা হয়েছে শুধু পত্র সহ দু-তিন গুচ্ছ আঙুরলতা। করা হল না মীনার কাজ ক'রে সেগুলিকে প্রাকৃতিক রঙে রূপান্তরিত। বাকি থেকে গেল চুনি, পান্না আর গারনেট দিয়ে থোকা থোকা আঙুর তৈরিও। চত্বরটির মাঝামাঝি জায়গায় গড়া হয়েছে স্নানের জন্য একটি বড় জলাধার। চল্লিশ ফুট ব্যাসের একটি অখণ্ড বালিপাথর কুঁদে বানানো সেটি। বাইরের ও ভেতরের ওঠ-নামার সোপানগুলি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ওই পাথরটির গা কুঁদেই। [এই স্নানাধারটি জহাঙ্গীরের তৈরি। রয়েছে বর্তমানে দীওয়ান-ই-আম-এর বিপরীত দিকের চত্বরে। এটি উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট, গভীরতায় চার ফুট, ব্যাস ৮ ফুট ও পরিধি পঁচিশ ফুট। গায়ে ফার্সী অক্ষরে খোদাই করা তারিখ এটির নির্মাণ কাল জানিয়ে দেয় ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ যে বছর জহাঙ্গীর বিয়ে করেছিলেন নূরজাহানকে, সে বছরে তৈরি।]

আগ্রা শহরের ভেতরে ও বাইরে থাকা সমাধি-সৌধগুলির মধ্যে কতক সত্যিই খুব সুন্দর। সম্রাটের হারেমের প্রতিটি খোজারই জীবনের পরম আকাঙ্খা হল নিজের জন্য। এক একটি অনুপম-দর্শন সমাধিসৌধ গড়ে যাওয়া। মোটা টাকা সঞ্চয় হলেই অধীর হয়ে ওঠে তারা মূল্যবান উপহার সামগ্রী সহ মক্কায় গিয়ে তীর্থ করার জন্য। কিন্তু মুঘল সম্রাট চান না, তার রাজ্য থেকে বাইরে চলে যাক এ টাকা। তাই অতি কদাচিৎ মক্কায় যাবার অনুমতি মেলে তাদের। ফলে, জমানো টাকা কিভাবে খরচ করবেন তা ভেবে না পেয়ে তার বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত খরচ করে তারা সমাধি স্থান ক্রয় ও তার বুকে সমাধি সৌধ নির্মাণে।

আগ্রার বুকে যত সমাধি-সৌধ রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে অনিন্দ্যদর্শন হল শাহ-জহানের পত্নী (অরজুমন্দ বানু বেগম বা মমতাজ মহল)-র স্মারকটি। যাতে সমগ্র পৃথিবী এটিকে দেখে, তার দৃষ্টিনন্দন রূপের প্রশংসা করে সে জন্য ইচ্ছে ক'রেই সেটিকে গড়েছেন তিনি সমস্ত বিদেশীদের আগমন স্থল তাজ-ই-মকানে। তাজ-ই-মকান একটি বড বাজার। ছটি চত্বর রয়েছে সেখানে। সবকটিই দরদালান ঘেরা। রয়েছে সেখানে সওদাগরদের ব্যবহারের জন্য সারি সারি কক্ষ। অকল্পনীয় পরিমাণে তুলা বিক্রী হয় এখানে। এই বেগম বা প্রধানা মহিষীর স্মারক-সৌধটি শহরের পূব প্রান্তে নদীকূলের কাছে দেয়াল ঘেরা এক বিশাল চতুষ্কোণ ভূমির ওপর। দেয়ালের ওপর রয়েছে একটি ছোট অলিন্দ, ঠিক যেমনটি দেখা যায় ইওরোপের বহু শহরের দেয়ালের ওপর। ঘের দেয়ালের ভেতরে থাকা চতুষ্ক এলাকাটি আমাদের পারটেয়ার বা ঘাস ও ফুলবাগিচার আদলে বহু টুকরায় ভাগ ক'রে রূপায়িত করা হয়েছে মোটামুটি ভাবে এক উদ্যানে। তবে আমরা যেখানে এজন্য নুড়ি-পাথর ব্যবহার করি, এখানে করা হয়েছে তার বদলে সাদা ও কালো মার্বেল। একটি বড় ফটক দিয়ে ঢুকতে হয় এই উদ্যানে। ঢুকে বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়বে মক্কার দিকে মুখ ক'রে বানানো একটি সুন্দর মণ্ডপ। রয়েছে তার ভেতর তিন-চারটি কুলঙ্গী। দিনের বিভিন্ন নির্ধারিত সময়ে মুফতী এসে প্রার্থনা জানিয়ে যান এখানে। উদ্যানের মাঝ এলাকা থেকে আরো সামান্য একটু এগিয়ে গেলে, নদীর দিকটিতে দেখা যাবে মিনার সহ একের ওপর আর তিনটি বিরাট মঞ্চ। চারকোণায় চারটি এরকম। চলে গেছে তার ভেতর সিঁড়ি। নমাজের সময় হয়ে এলে আজান দেয়া হয় এখান থেকে। মূল সমাধি-ভবনের ওপর একটি গম্বুজ। প্যারিসের ভাল্ ড্ গ্রেসের চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দর নয় এটি। ভেতর ও বার দুই-ই তার শ্বেত মর্মর দিয়ে গড়া,

মাঝে শুধু যা ব্যবহার করা হয়েছে ইট। এই গম্বুজের তলে বর্তমান একটি ফাঁকা সমাধি। কেননা, বেগমের মরদেহ শায়িত রয়েছে প্রথম বেদীটির নিচে থাকা একটি গর্ভগৃহ মধ্যে। সেখানে থাকা সমাধিটির চারপাশে যে ধরনের ব্যবস্থাদি রয়েছে, ওপরের ফাঁকা সমাধিটির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। মাঝে মাঝে বদলে দেয়া হয় সেখানকার কার্পেটটি, ঝাড়লণ্ঠন ও ওইজাতীয় অন্যান্য সামগ্রীগুলিকে। কতক মোল্লা সর্বদা প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন সেখানে। এই মহান শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনটির শুরু ও শেষ, সুযোগ হয়েছে আমার দুই-ই প্রত্যক্ষ করার। এজন্য সময় লেগেছে বাইশ বছর। কুড়ি হাজার লোক কাজ করেছে একটানা। এ থেকেই বুঝতে পারবেন কি বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে এটি গড়তে। শোনা যায়, ভারা প্রভৃতির জন্যই নাকি খরচ হয়েছে মূল কাজের চেয়ে বেশি। কেননা, কাঠের অভাবে ভারা এবং খিলান প্রভৃতি তৈরির ঠেক সব কিছুর জন্যই ব্যবহার করতে হয়েছে ইট। ফলে যেমন প্রয়োজন হয়েছে অধিক শ্রমের তেমনি অধিক অর্থের। নদীর অপর পাড়ে আপন সমাধি সৌধ গড়ার কাজও শুরু করেছিলেন শাহ-জহান। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার ফলে আটকে গেল তা। এখন যিনি সিংহাসনে সেই ঔরঙ্গজেবের কোন আগ্রহই দেখা যাচ্ছে না সেটি শেষ করার দিকে। একজন খোজা তার অধীনস্থ ২০০০ রক্ষী নিয়ে দেখা শোনা ক'রে থাকেন বেগমের এই সমাধি-সৌধ ও তার কাছে থাকা তাজ-ই-মকান বাজার এলাকাটির।

শহরের একপাশে সম্রাট আকবরের সমাধি-সৌধটি। খোজাদের সমাধি-স্মারকগুলি সাধারণতঃ চারকোণে চারটি ছোট প্রকোষ্ঠ থাকা একটি ক'রে একক বেদী।

দিল্লীর দিক থেকে আগ্রায় এলে দেখা পাবেন আপনি একটি বড় বাজারের। তার কাছেই একটি বাগিচায় সমাধিস্থ রয়েছে শাহ-জহানের পিতা শাহ জহাঙ্গীরের মরদেহ (এটি ভুল তথ্য, জহাঙ্গীরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে লাহোরের শাহদরে)। এই বাগিচাটির ফটকে টাঙানো রয়েছে তার সমাধির একটি চিত্ররূপ। তাতে দেখা যায়, সমাধিটি একটি বিরাট কালো আচ্ছাদনীর দ্বারা আবৃত। রয়েছে তার ওপর অনেকগুলি জ্বলন্ত সাদা মোমবাতি। তার প্রান্ত সীমানায় দাঁড়িয়ে আছেন দুজন যেসুইট ধর্ম যাজক। মূর্তি বা প্রতিকৃতিকে ঘৃণার চোখে দেখে মুসলমানেরা। এক্ষেত্রে শাহ-জাহান কী ক'রে এই চিত্ররূপটি টাঙানোর অনুমতি দিলেন অবাক হতে হয় তা ভেবে। এর একমাত্র সম্ভবপর ব্যাখ্যা এই যে, সম্রাট ও তার পিতা

সম্রাট জহাঙ্গীর দুজনেই গণিত ও জ্যোতিষের কতক তত্ব শিক্ষা করেছিলেন যেসুইটদের কাছে। সুতরাং এটি হয়তো তারই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু পরিচয় মেলে না এ ধরনের উদারতার। 'কটজিয়া (খওয়াজা) নামের এক আর্মেনিয়ানকে খুব ভালবাসতেন সম্রাট। নিয়োগ করেছিলেন তাকে বেশ লোভনীয় মর্যাদাকর পদে। একবার তিনি অসুস্থ হলে সম্রাট দেখতে গেলেন তাকে। তার আবাসের একেবারে কাছেই থাকতেন যেসুইটরা। সম্রাট যখন ওই আর্মেনিয়ানের আবাসে পৌঁছলেন, ঠিক তখনই শুরু করলেন তারা ঘণ্টাধ্বনি। সম্রাট বেজায় বিরক্ত হলেন এই গোলমালের দরুন। অসুস্থ লোকের পক্ষে এরূপ গোলমাল সহ্য করা অস্বস্তিকর মনে ক'রে জ্বলে উঠলেন রাগে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করলেন ঘণ্টাটি নিয়ে এসে তার হাতির গলায় ঝুলিয়ে দেয়ার জন্য। অবিলম্বে পালন করা হল সে আদেশ। কিছু দিন পর হাতির গলায় সেই ভারি ঘণ্টাটি দেখে, ওইরূপ ওজনদার একটি ঘণ্টা গলায় বয়ে বেড়াবার দরুন তার কোন ক্ষতি ঘটতে পারে ভেবে নির্দেশ দিলেন সম্রাট সেটি খুলে নিয়ে কোতোয়ালের সেরেস্তায় রেখে দিতে। সেই থেকে সেখানেই পড়ে আছে ঘণ্টাটি। এই আর্মেনিয়ান লালিত-পালিত হয়েছেন শাহ-জহানের সাথে একই সঙ্গে। তিনি যেমন অতি চতুর, তেমনি একজন সুদক্ষ কবি। সম্রাট অতি সুনজরে দেখতেন তাকে। দিয়েছিলেন তাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তার পদ। এসত্ত্বে নানা লোভ এবং ভয় দেখিয়েও পারেননি কিন্তু তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে।

আট ॥ আগ্রা থেকে বাঙলা সুবার পাটনা ও ঢাকা যাবার পথ-পরিচয়

রওনা হলাম আগ্রা থেকে বাঙলায়। দিনটি ১৬৬৫ অব্দের ২৫শে নভেম্বর। মাত্র তিন কোশ পথ পাড়ি দেয়ার পর সেদিন ঠাঁই নিলাম এক দীনহীন সরাইখানায়। নকোশ এগিয়ে পরদিন এলাম বিরুজাবাদ (ফিরোজাবাদ)। ছোট শহর একটি। ২৭শে নভেম্বর পার হলাম নকোশ পথ, এলাম সেরাইল মোরলীদেস-এ (সরাই মুরলীদাস)। পরদিন চললাম ১৪ কোশ পথ, এলাম এভজ (ইটাওয়া)। ২৯ তারিখ এগোলাম বারো কোশ। ঠাঁই নিলাম হই-

মলে (অজিতমল)। পরদিন এলাম ১৩ কোশ পেরিয়ে সেকনদেরায় (সিকন্দ্রা)। তার পরদিন, পয়লা ডিসেম্বর এলাম ১৪ কোশ পথ চলে সংকোয়াল (সকলা জমওয়ারা)।

সেদিন সুযোগ হল ১১০টি শকটের একটি মিছিল দেখার। প্রতিটি ছটি ক'রে ষাঁড়-বাহিত। আর প্রতিটিই বয়ে নিয়ে চলেছে পঞ্চাশ হাজার ক'রে রূপার মুদ্রা। এ টাকা হল বাঙলা সুবার রাজস্ব। যার পরিমাণ সব খরচ-খরচা মিটিয়ে বাঙলার শাসনকর্তার কোষাগারে যথেষ্ট রাখার পরও পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা।

সংকোয়ালের এক কোশ আগে পার হলাম সেনগব নদী। মাত্র আধ কোশ দূরে মিশেছে গিয়ে সে যমুনায়। নদীর 'পরে রয়েছে একটি পাথরের সেতু। বাঙলা অঞ্চল থেকে যদি আপনি সিরোঞ্জ ও সুরাট যেতে চান ও করতে চান সেজন্য দশদিনের পথ সংক্ষেপ, তবে আগ্রা পর্যন্ত না এগিয়ে থেমে যেতে হবে আপনাকে এখানেই, এই সেতুর কাছে। তারপর নৌকায় ক'রে পার হতে হবে যমুনা। এসত্ত্বেও আগ্রা হয়েই যায় সবাই। তার একটি কারণ, এই সংক্ষিপ্ত পথ ধরে গেলে পাঁচ থেকে ছদিন যেতে হবে আপনাকে এবড়ো খেবড়ো পাথুরে রাস্তা ধরে। আরেকটি কারণ, এক্ষেত্রে যেতে হবে আপনাকে এক রাজার রাজ্য এলাকার মধ্য দিয়ে, আর রয়েছে সেখানে লুণ্ঠিত হবার ভয়।

দোসরা ডিসেম্বর ১২ কোশ চলে পৌঁছলাম চেরৌরাবাদের সরাইখানায় (কোরা জহানাবাদ)। মাঝপথে পার হলাম জহানাবাদ। ছোট শহর একটি। শহর থেকে সিকি কোশ এগোবার পর পার হতে হয় একটি জনার-ক্ষেত। হল সেখানে একটি গণ্ডার দেখার সুযোগ। খেয়ে চলছিল ন-দশ বছরের একটি ছেলের দেয়া এক গোছা জনারের শীষ (পোষমানানো গণ্ডার)। আমি কাছে এগিয়ে গেলে ছেলেটি আমার হাতেও এগিয়ে দিল এক গোছা জনারের শীষ। তাই দেখে গণ্ডারটিও সাথে সাথে চার পাঁচবার মুখ হাঁ করে এগিয়ে এল আমার দিকে সেগুলি খাবার জন্য। দিলাম তখন তা থেকে কিছুটা তার মুখে ঢুকিয়ে। সেগুলি শেষ ক'রে আবার হাঁ করে চললো সে যদি আমি বাকিগুলিও খেতে দিই সেই আশায়।

পরদিন এগোলাম দশ কোশ। এলাম সেরাইল চগিদা (সরাই শাহজাদা)। চার তারিখ ১৩ কোশ এগিয়ে পৌঁছলাম সেরাইল অটকান (হটগাও)। পাঁচ তারিখ ন' কোশ চলে এলাম ঔরঙ্গাবাদে। বড় শহর এটি। অন্য নামে পরিচিত ছিল আগে (খজুহা)। সমগ্র বাঙলার শাসনকর্তা, ভাই সুলতান সুজার সাথে

এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল বর্তমানে সিংহাসনে আসীন ঔরঙজেবের। এ যুদ্ধে জয়ী হবার পর শহরটির নাম বদলে দিলেন তিনি, করলেন আপন নামে তার নামকরণ। তৈরি করলেন একটি বাগান সহ কতক সুন্দর সুন্দর বাড়ি, একটি ছোট মসজিদ।

ছয় তারিখে ন' কোশ পথ পেরিয়ে এলাম অলিঞ্চান (আলমচাঁদ)। এর প্রায় দু' কোশ আগে পেলাম গঙ্গা নদী দর্শনের সুযোগ। আমার সাথে ছিলেন সম্রাটের চিকিৎসক মঁসিয়ে বার্নিয়ার ও রচেপট নামের আরেক ভদ্রলোক। যে নদীটির এত নামডাক তার চেহারা দেখে তারা দুজনেই হয়ে গেলেন রীতিমতো অবাক। লুভর-এর সামনেকার সিন নদীর চেয়ে বেশি চওড়া নয় মোটেই। সেখানে সিন নদী অন্ততঃপক্ষে বেলগ্রেডের কাছ দিয়ে প্রবাহিত দানিয়ুবের সমান চওড়া। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগে, মার্চ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এত কম জল থাকে গঙ্গায় যে সম্ভব হয় না তখন আর নৌকা চলাচল। গঙ্গাকূলে পেঁছে আমরা মদিরা পান করলাম তার জলের সঙ্গে মিশিয়ে। ফলে দেখা দিল আমাদের প্রত্যেকেরই পেটে কিছু না কিছু গণ্ডগোল। তবে, যারা নির্ভেজাল গঙ্গাজল পান করেছিল আমাদের সেই সব পাইকপেয়াদা পরিচারকরা ভুগলো আমাদের চেয়েও বেশি। যেসব ডাচ ভদ্রলোকের গঙ্গাকূলে বাড়ি রয়েছে তারা কখনো না ফুটিয়ে খান না এর জল। দেশজ স্থানীয় অধিবাসীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। শিশু থেকেই ব্যবহার ক'রে ক'রে এ-জলের সঙ্গে তারা সড়গড়। সম্রাট নিজে এবং তার সভাসদেরা কেউই আর কোন নদীজল খান না এটি ছাড়া। প্রতিদিন চোখে পড়বে, বিরাট এক উট বাহিনী আর কোন কাজ না ক'রে তাদের জন্য গঙ্গা থেকে জল বয়ে চলেছে শুধু।

আট কোশ পার হয়ে ৭ তারিখে এলাম হলাবাস (এলাহাবাদ)। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বড় শহর এটি। জোড়া পরিখা ঘেরা, কাটা পাথরে তৈরি একটি সুন্দর দুর্গ রয়েছে এখানে। শাসনকর্তা বাস করেন এই দুর্গটিতেই। তিনি ভারতের সব থেকে ক্ষমতাশালী আমীরদের একজন। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলে পুষে চলেছেন জনাকয়েক পারসিক চিকিৎসক। রেখেছেন বুর্গের (Bourges) মঁসিয়ে ক্লদ মইলি (Claude Maille)-কেও। তিনি চিকিৎসক ও শল্যবিদ দুইই। দিলেন তিনি আমাদের গঙ্গাজল একেবারেই পান না করার উপদেশ। বললেন, এ জল খেলেই ভুগতে হবে পেটের রোগে। এর চেয়ে কুয়োর জল ব্যবহার অনেক নিরাপদ।

পরের দিন সকাল থেকে ভরদুপুর পর্যন্ত গঙ্গার কূলে হা পিত্যেশ বসে থাকার পর

ঘঁসিয়ে মহইলি এনে দিলেন শাসনকর্তার কাছ থেকে নদী পার হওয়ার অনুমতিপত্র। চড়লাম তখন এক বড নৌকায়, এলাম গঙ্গার অন্য পাড়ে। নদীর দু'কূলেই রয়েছেন একজন ক'রে দারোগা, অনুমতিপত্র ছাড়া উপায় নেই কারো এপার-ওপার হবার। কি কি ধরনের পণ্য সঙ্গে নিযে যাওয়া হচ্ছে নজর রাখেন তার ওপরেও। প্রতিটি শকটের জন্য আদায় করা হয় এখানে চার টাকা, বহলের জন্য একটাকা। নৌকার জন্যও দিতে হয় এছাড়া আবার আলাদা।

এদিন ১৬ কোশ পার হয়ে বিশ্রাম নিলাম এসে সৌদৌল সেরাইল-এ (সয়াদুল্লা-কি সরাই)। পরদিন, ৯ তারিখে, এগোলাম দশ কোশ পথ, এলাম যকদিল সেরায় (জগদীশ সরাই)। ১০ তারিখ পার হলাম দশ কোশ পথ, থামলাম বৌরকী সেরায় (অহীবনস কি সরাই)। পরদিনও চললাম দশ কোশ, পৌছলাম এসে বনরৌ (বনারস)-এ।

বনারস একটি বড় ও গায়ে গতরে বেশ মজবুত শহর। বেশির ভাগ বাড়িই হয় ইট নয়তো কাটা পাথর দিয়ে গড়া। ভারতের অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় বহুতল বাড়িও এখানেই বেশি। কিন্তু রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ যে ভোগ করতে হয় সেজন্য বেশ অসুবিধা ও অস্বস্তি। যাত্রীদের জন্য গুটিকয়েক সরাইখানা রয়েছে এখানে। একটি তার খুবই বড় ও ভালভাবে তৈরি। তার প্রাঙ্গণ মধ্যে রয়েছে দুটি মণ্ডপ। বেচা হয় সেখানে সুতী ও রেশমী বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী। বস্ত্র বিক্রেতাদের অধিকাংশই ওই বিশেষ শিল্পটির কারিগর। ফলে, বিদেশীরা এখানে সুযোগ পায় প্রস্তুতকারকের কাছ থেকেই সরাসরি মাল কেনার। বাজারে বেচার জন্য নিয়ে আসার আগে এগুলি উপস্থিত করতে হয় তাদের (মান নিয়ন্ত্রণের) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে। তিনি প্রতি খণ্ড বস্ত্রের ওপরে এঁকে দেন রাজকীয় মোহর ছাপ। এ নিয়ম অমান্য করলে করা হয় তাদের জরিমানা ও বেত্রাঘাত। শহরটি গড়ে উঠেছে গঙ্গার উত্তর তীরে। শহর পার হয়ে গঙ্গা আরো দু কোশ এগিয়ে যাবার পর পশ্চিম থেকে আসা একটি বড নদী যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে (সম্ভবতঃ ব া নদী, তবে বর্তমানে এ নদীটি আদপেই বড় নয়)। বিগ্রহ পূজকদের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির একটি এই বনারসে। পরে, এ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে বেণিয়াদের ধর্মীয় রীতি-নীতি বর্ণনার বেলা শোনাব তার কথা।

শহর থেকে পাঁচশো পায়ের মত উত্তর-পশ্চিমে গেলে মিলবে একটি মসজিদের দর্শন। রয়েছে সেখানে মুসলমানদের কতক সমাধি-স্মারক। তার মধ্যে

কয়েকটির গড়ন নক্সা সত্যিই অতি সুন্দর। যে কটি সব থেকে সুন্দর সেগুলি গড়া হয়েছে এক একটি দেয়াল ঘেরা বাগানের মাঝে। দেয়ালের গায়ে আধ ফুট বর্গাকার সব ফোকর। সেই ফোকর দিয়েই পথচারীরা দেখে সেগুলিকে। যেটি সবচেয়ে বিশিষ্ট সেটি একটি বড় চতুষ্কোণ বেদীর মত, প্রতিটি দিক চল্লিশ পায়ের মত দীঘল। বেদীর ঠিক মাঝখানে একটি অখণ্ড পাথর কেটে গড়া ৩২ থেকে ৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভ। তিনজন লোক হাত বাড়িয়েও তার বেড় পাবে কিনা সন্দেহ। বালিপাথর কুঁদে গড়া। সেটি এত কঠিন পাথর যে ছুরি দিয়ে চেষ্টা করেও আঁচড়ের দাগ ফোটাতে পারলাম না তার গায়ে। পিরামিডের আকারে ক্রমশঃ সুচালো হয়ে উঠে গেছে ওপরে। শীর্ষভাগে রয়েছে একটি বড় গোলক। গোলকের নিচের দিকে স্তম্ভটি বড় বড় পুঁতির একটি মালা দিয়ে ঘেরা। এই সমাধি স্মারকটির সবকটি দিক খোদাই করা প্রাণী-মূর্তি দিয়ে আগাগোড়া অলংকৃত। এখন এটিকে যতটা উঁচু দেখা যায় আগে ছিল তার চেয়েও বেশি উঁচু। যারা এই স্মারকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাদের মধ্যে জনাকয়েক বৃদ্ধ আমায় জানালেন যে তিরিশ ফুটের বেশি দেবে গেছে এটি গত পঞ্চাশ বছরে। তারা আরো জানালেন, এ সমাধি-স্মারকটি ভূটানের একজন রাজার। বিজয় অভিযানে এসেছিলেন তিনি এ রাজ্যে, মারা যান এখানেই তারপর। তৈমুর-লঙের বংশধরেরা (মুঘলরা) পরে এ রাজ্য জয় ক'রে নেন তার কাছ থেকে। এই ভূটান রাজ্যটি থেকেই আসে এদেশে কস্তুরী। পরে এ বইয়ের তৃতীয় ভাগে সেকথা শোনাব আপনাদের।

বনারসেই কাটিয়ে দিলাম ১২ ও ১৩ এ দুটি দিন। অঝোর ধারায় আকাশ ঝরে চলার জন্য বাধ্য হয়েই একরকম। তবে জলস্ফীতির ভয়ে মোটেই হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলাম না তারপর। ১৩ তারিখ বিকালেই শাসনকর্তার অনুমতি-পত্র দাখিল ক'রে পার হলাম গঙ্গানদী। নৌকায় চড়ার আগে প্রত্যেক যাত্রীর তল্পিতল্পা তল্লাসী করা হয় এখানে। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রীর ওপর নেই কোন শুল্ক। দিতে হয় তা শুধু পণ্য-সামগ্রীর ওপরেই।

সেদিন দু' কোশ পথ পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয় নিলাম বতেরপুরে (বহাদুরপুর)। পরদিন, চৌদ্দ তারিখে, ভাঙলাম ৮ কোশ পথ, এলাম সত্রজী-সেরা (সরাই সীরসী)। পনের তারিখ ছ কোশ এগিয়ে, এলাম মোনিয়ারকী সেরা (মোহনিয়া কি সেরা)। এদিন সকালে যাত্রা শুরুর পর দু' কোশ এগোতেই দর্শন পেলাম কর্ণসর-সউ (কর্মনাশা) নদীর। সেটি পার হয়ে আবার কোশ

তিনেক এগোতেই দেখা পেলাম আরেকটি নদীর। নাম তার সাওদ-সউ (দুর্গাবতী)। পার হলাম দুটি নদীই চরার কাছ দিয়ে পায়ে হেঁটে।

পরদিন, ষোল' তারিখ ভাঙলাম আবার আট কোশ পথ, ঠাঁই নিলাম গোরমাবাদে (খুরমাবাদ বা অধুনা জহানাবাদ)। এ শহরটি গউদেরা-সউ (কুদ্রা) নদীকূলে। পারাপার করার জন্য রয়েছে তার বুকে একটি পাথরের সেতু।

চার কোশ পথ ভেঙে ১৭ তারিখ হাজির হলাম সসেরন (সসারাম)। পাহাড়ের গোড়ায় বিরাজিত এ শহরটি। কাছেই রয়েছে বিশাল এক দীঘি। মাঝে তার ছোট একটি দ্বীপ। রয়েছে তার বুকে অতি সুন্দর-দর্শন একটি মসজিদ। এবং তার ভেতর সলীম খান নামের এক নবাবের সমাধি। এখানকার সুবাদার থাকাকালে নির্মাণ করেন এটিকে তিনি। দ্বীপটিতে যাতায়াতের জন্য গড়া হয়েছে একটি চমকদার পাথরের সেতু। তার দুদিককার আল, চলাচলের পথ সবকিছুই বড় আকারে কাটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। দীঘিটির একপাশে একটি বড় বাগান। রয়েছে তার মাঝে আরেকটি সুদৃশ্য সমাধি-স্মারক। এটি এই নবাব সলীম খানেরই পুত্রের। পিতার পর তিনিই হয়েছিলেন এ প্রদেশের সুবাদার। সোমেলপুরের (হীরা) খনিতে যেতে চাইলে (রোহতাসের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূবে, পালমৌ জেলায়) পাটনা যাবার মূল সড়কটি ছেড়ে একবারবর্গ (আকবরপুর, যে পাহাড়টির ওপরে রোহতাস দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান সেই পাহাড়ের গোড়ায় একটি গ্রাম) ও বিখ্যাত রোহতাস দুর্গের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে এগোতে হবে নাকবরাবর দক্ষিণমুখো।

আঠারোই ডিসেম্বর নৌকার শরণ নিয়ে পার হলাম সোন-সউ (শোণ) নদী। দক্ষিণের পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়ে (পশ্চিমের অমরকন্টক থেকে) প্রবাহিত হয়েছে সে এদিকপানে। এটি পার হয়ে অপর তটে এলে সঙ্গের মালপত্রের জন্য গুণতে হয় নির্ধারিত পরিমাণ শুল্ক। পাড়ি দিলাম এদিন মোট ন কোশ পথ। রইলাম এসে দাউদ নগর সেরায় (গয়া জেলায় অবস্থিত)। সুন্দর-দর্শন একটি সমাধি সৌধ দেখলাম এখানে। পরদিন দশ ক্রোশ পথ চলে বিশ্রাম নিলাম হলওয়া সেরায় (অরওয়াল)। ২০ তারিখ এলাম ন কোশ পেরিয়ে আগা সেরায়। এদিন সকালে পথে দেখলাম ছোটবড় মিলিয়ে ১৩০টি হাতির একটি বাহিনী। নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলি মুঘল সম্রাটের কাছে দিল্লীতে। ২১ তারিখ দশ কোশ পথ চলে পৌঁছলাম পাটনায়।

ভারতের অন্যতম বড় শহর এই পাটনা। গঙ্গার কূলে, তার পশ্চিম দিকে

অবস্থিত (দক্ষিণকূলে)। দৈর্ঘ্যে দু-কোশের কম নয়। বাড়িঘর ভারতের অন্যান্য অধিকাংশ শহরের চেয়ে উন্নত নয় একটুও। সবই প্রায় বাঁশ আর খড়ের ছাউনি। সোরার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য এখানে একটি ঘাঁটি রয়েছে ডাচ কোম্পানীর। ছাপরা নামের একটি বড় গ্রামে শোধন করা হয় এগুলি। পাটনা থেকে দশ কোশ এগিয়ে গঙ্গার ডান কূলে এ গ্রামটি।

মঁসিয়ে বার্নিয়ারের সঙ্গে পাটনায় পৌঁছে পড়ে গেলাম একেবারে ছাপরাগামী কজন ডাচের মুখোমুখি। পথে গাড়ি থামিয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন তারা। আনন্দের পরিবেশ নিটোল করার জন্য খোলা হল দু বোতল শিরাজী মদিরা সেই খোলামেলা পথের ওপরেই। তা শেষ হবার পর বিদায় নিলাম পরস্পরের কাছ থেকে। এখানে উল্লেখনীয়, মদের ওপর এ প্রদেশটিতে তেমন কোন বিরূপতা কি কড়াকড়ি নেই। এখানে সকলেই বাহ্য লৌকিকতার ধার না ধেরে যাপন করে খোলামেলা জীবন, উপভোগ করে পূর্ণ স্বাধীনতা।

আটদিন রইলাম পাটনায়। ঘটল একটি তাৎপর্যকর ঘটনা সেখানে এসময়ে। ঘটনাটি জানিয়ে দেয়, অস্বাভাবিক ধরনের অপরাধকেও বিনা দণ্ডে পার পেতে দেয় না মুসলমানেরা। এক মিঙবাশী বা হাজার সেনার নায়ক লাঞ্ছিত করল তার অধীনস্থ একটি তরুণকে : নিদারুণ ক্ষুব্ধ হল ছেলেটি, সংকল্প করল প্রতিশোধ নেয়ার। রইল তক্কে তক্কে সেজন্যে। একদিন শিকার করতে গেল মিঙবাশী, সঙ্গে ওই ছেলেটি। শিকার করতে করতে অন্যান্য অনুচরদের থেকে প্রায় সিকি কোশ এগিয়ে গেল দুজনে। সুযোগ পেয়ে নিল প্রতিশোধ ছেলেটি, আচমকা তরবারীর ঘায়ে করল তাকে দু-খান। তারপর কি কারণে সে মনিবকে হত্যা করেছে চীৎকার ক'রে সাধারণের কাছে তা প্রচার করতে করতে দ্রুতগতিতে ফিরে এল শহরে। করল শাসনকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ। তিনি রাখলেন তাকে আটক ক'রে জেলে। কিন্তু ছ মাস পর দিলেন ছেড়ে। মৃতের আত্মীয়রা যথাসাধ্য চেষ্টা করল যাতে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় ছেলেটিকে। কিন্তু জনসাধারণের চাপে সে আদেশ দিতে সাহসী হলেন না শাসনকর্তা। তারা মত দিল, উচিত কাজই করেছে ছেলেটি।

ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ দুপুর নাগাদ চাপলাম নৌকায়। করলাম পাটনা থেকে ঢাকায় যাত্রা। বর্ষার পর নদী যেমন ভরাট থাকে তেমনটি থাকলে অনেক আগেই নিতে হত নৌকার শরণ। এলাহাবাদ থেকে যদি বা না, বনারস থেকে তো বটেই। এদিন পার হলাম পনেরো কোশ পথ, রাতে ঠাঁই নিলাম বেকনকৌর (বৈকুণ্ঠপুর)-এ।

বেকনকৌরের পাঁচ কোশের মতো আগে দেখা পেলাম পম্পন-সউ (পুনপুন বা ফতোয়া নালা) নদীর। দক্ষিণ থেকে বয়ে এসে (গয়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলে জন্ম নিয়েছে নদীটি).লীন হয়েছে গঙ্গায়। পরদিন ১৭ কোশ পথ নদী পাড়ি দিয়ে থামলাম সেরা শ্‌'ইরিয়া-য়। ৩১ তারিখ, চার কোশ বা তার কাছাকাছি এগিয়ে যাবার পর দেখা পেলাম দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা কাওয়া (কেউল) নদীটির। তিন কোশ পর পার হলাম উত্তর থেকে বয়ে আসা চনোন (তিলজুগা) নদী সঙ্গম। তার চার কোশ পর এলাম দক্ষিণ থেকে ছুটে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়া এরগুগা (করগরিয়া খাল) নদী-মোহনায়। আরো ছ কোশ এগোবার পর এলাম ওই একই দিক থেকে বয়ে এসে গঙ্গায় লীন হয়ে যাওয়া অ্যাকোয়েরা (ভাগমতী খাল ?) নদী সঙ্গমে। সারাদিন গঙ্গার বুকে ভেসে চলতে চলতে দেখে চললাম সুউচ্চ পাহাড মালার ছায়াময় দূর দৃশ্য দক্ষিণ দিকে। পাহাডগুলির কোনটি দশ কোনটি বা পনের কোশ দূরে। ১৮ কোশ পাডি দিয়ে পৌছলাম এসে মুঙ্গের শহরে।

এল নতুন বছরের প্রথম সকাল। ১৬৬৬-র পয়লা জানুয়ারী। দু ঘন্টার মতো নৌকা এগিয়ে চলার পর পেলাম উত্তর থেকে বয়ে এসে গঙ্গার জলধারার সঙ্গে মিশে যাওয়া গণ্ডক (বুডা গণ্ডক) নদীর দেখা। বড়সড নদী এটি, নৌ-চলাচল যোগ্য। আট কোশ পথ পাডি দেয়ার পর বিকালে এসে থামলাম জনজিরায়। গঙ্গা এখানে এত বেশি মোচড় খেয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়েছে যে জলপথের হিসাব ধরলে পাড়ি দিয়েছি এদিন পুরো ২২ কোশ। দু তারিখে যাত্রা শুরুর পর সকাল ৬টা থেকে ১১টা মধ্যে দেখার সুযোগ হল তিন তিনটি নদীর গঙ্গা-সঙ্গম। তিনটিই গঙ্গায় লীন হয়েছে উত্তরদিক থেকে বয়ে এসে। প্রথমটির নাম রোনোভা, দ্বিতীয়টির তাই, ও তৃতীয়টির চন্নন (তিনটিই সম্ভবতঃ খাল)। ১৮ কোশ পথ পিছনে রেখে রাতের ঘুম দিলাম এসে বকেলপুরে (ভাগলপুর)।

পরদিন, তিন তারিখ, আমাদের নৌকা চার ঘন্টা গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটার পর এলাম আমরা উত্তর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়া কতরী নদীর মুখে (সম্ভবতঃ কোশী)। ১৩ কোশ পথ পাড়ি দিয়ে রাত কাটাবার জন্য নৌকা বাঁধা হল পনগনগেল (আধুনিক সকড়িগলি ঘাট বা তার কাছে) নামের একটি গ্রামের ঘাটে (স্থলপথে এই দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে ৫০ মাইলের মত)। গঙ্গার কূলে এসে শেষ হওয়া একটি পাহাড়মালার পরেই এ গ্রামটি। চার তারিখ পনগনগেল ছেড়ে ঘন্টাখানেকের পথ এগোতেই দেখা পেলাম মর্জা নদীর (সম্ভবতঃ কালিন্দ্রী)।

উত্তর দিক থেকে বয়ে এসে মিশেছে গঙ্গায়। ছ কোশ পথ পার হলাম সেদিন। রাত কাটালাম রাজমহাল-এ (এককালের রাজধানী শহর)।

গঙ্গার ডানকূলে এ শহরটি। স্থলপথ ধরে এলে দেখা যাবে এক বা দু কোশ আগে থাকতে শহর পর্যন্ত পুরো সড়কপথটি ইট দিয়ে বাঁধানো। বাঙলার সুবাদাররা বাস করতেন এখানেই আগে (১৫৯২ থেকে)। কারণ, যেমন অতি চমৎকার শিকার এলাকা এ অঞ্চলটি তেমনি হত সেকালে এখানে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য (১৮৬৩-এর পূর্ব পর্যন্ত ছিল এখানে গণ্ডারের অস্তিত্ব)। কিন্তু পরে, গঙ্গানদী ক'রে বসল তার গতির পরিবর্তন। সরে গেল শহর থেকে পুরো আধকোশ দূরে। এছাড়া দেখা দিল আরাকানের রাজাকে ঠেকানোর প্রয়োজন। জরুরী হয়ে পড়ল পর্তুগীজ জলদস্যুদেরও দমন। তারা ইতিমধ্যে কায়েম হয়ে বসেছে গঙ্গার মোহনা-অঞ্চলে। হানা দিয়ে চলেছে সেখান থেকে আঞ্চলিক অধিবাসী এমনকি ঢাকার অধিবাসীদের ওপরেও। সকলেই তাদের উৎপীড়নে সন্ত্রস্ত। এ সবের দরুন, আঞ্চলিক রাজধানী সরিয়ে নেয়া হল রাজমহাল থেকে ঢাকায়। সুবাদারের পিছু পিছু গেলেন রাজমহাল ছেড়ে ব্যবসায়ীরাও সেখানে। বর্তমানে ঢাকা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র। (এ পরিবর্তন করা হয় সম্রাট জহাঙ্গীরের আমলে)।

ছয় তারিখে রাজমহাল থেকে যাত্রা ক'রে ছ' কোশ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম এসে দোনাপুর নামের একটি বড় শহরে। এখানেই ছাড়াছাড়ি হল মঁসিয়ে বার্নিয়ারের সাথে। তিনি গেলেন সেখান থেকে কাশিমবাজার। তারপর স্থল-পথ ধরে সেখান থেকে হুগলী। কেননা, ভাঁটার সময় নদীর জল নেমে গেলে সৌতিকুই (সূতি, মুর্শিদাবাদ) শহরের কাছে দেখা দেয় এক বিশাল চর। ফলে নৌকায় যাতায়াত হয়ে পড়ে একেবারেই অসম্ভব। আমি সেদিন আরো এগিয়ে, রাত কাটালাম রাজমহাল থেকে বারো কোশ পরে তউতিপুরে (তরতিপুর)। ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলায় নদীকূলের দিকে তাকাতে দেখি বালির ওপর শুয়ে ঘুম দিচ্ছে এক ঝাঁক কুমীর। ৭ তারিখে পাড়ি দিলাম ২৫ কোশ পথ, এলাম একরাত (হজরাহাট)।

ঢাকা তখনও স্থলপথে ৪৫ কোশ দূরে। সারা দিন এত অগুণতি কুমীর চোখে পড়ল যে মনের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠল তাদের ওপর গুলি চালিয়ে একটি চলতি ধারণা যাচাই ক'রে দেখার সাধ। বন্দুকের গুলি নাকি কোন ক্ষতি করতে পারে না এদের। করলাম একটিকে গুলি। তার চোয়ালে গিয়ে বাজল গুলিটি।

রইল রক্ত। কিন্তু যেখানে ছিল, রইল না আর সেখানে কুমীরটি, ডুব দিয়ে অদৃশ্য হল সাথে সাথে। পরদিন আবার দেখলাম, অগুণতি কুমীর শুয়ে আছে নদীর কূলে। দুবার গুলি চালালাম দুটির ওপর। প্রত্যেকটির ওপর তিন তিনটে ক'রে গুলি। জখম হওয়ামাত্র ছটফট করতে করতে উলটে চিত হয়ে মুখ হাঁ করে গেল দুটিই সঙ্গে সঙ্গে মারা। এদিন ১৭ কোশ পেরিয়ে রাত কাটালাম এসে দৌলৌদিয়ায়।

পরদিন, ৯ই জানুয়ারী বেলা দুটো নাগাদ এসে পড়লাম উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা চন্দিভোর নামের একটি নদীর মোহনার কাছে। ১৬ কোশ পথ পাড়ি দিয়ে থামলাম দাসপুরে। দশ তারিখে এগিযে গেলাম ১৪ কোশ। নদীকূলের কাছাকাছি কোন গ্রাম না থাকায় ঘুমালাম নদীকূলেই। পরদিন বিকাল নাগাদ যেখানে এলাম সেখান থেকে ত্রিমুখী হযে এগিয়ে গেছে গঙ্গা। একটি শাখা চলে গেছে ঢাকার দিকে। তারই প্রবেশমুখের কাছে যাত্রাপুর নামের একটি বড় গ্রামে কাটালাম সে রাত। পাড়ি দিলাম সেদিন কুড়ি কোশ পথ। যাদের সঙ্গে মালপত্র নেই, তারা সাধারণত: ঢাকা যাবার জন্য পায়ে হাঁটা পথ ধরে এই যাত্রাপুর থেকে। পথ বেশ সংক্ষেপ হয়ে যায় এর ফলে। নদী এখান থেকে এত বাঁক খেয়ে খেয়ে এগিয়েছে যে জলপথ বেশ দীর্ঘ সে তুলনায়। ১২ তারিখ দুপুর নাগাদ আমাদের নৌকা পাশ কাটাল বাগমারা নামের একটি বড় শহরকে। সেদিন এগারো কোশ পাড়ি দিয়ে রাত কাটালাম এসে কাসিয়াটা (কাশিহাট) নামের আরেকটি বড় শহরে।

তের তারিখ দুপুরবেলা এসে গেলাম উত্তর-পূব দিক থেকে স্রোতস্বিনী লকিয়া (লখ্যা) নদীর মোহনার কাছে। ঢাকা তখন আর মাত্র দু' কোশ দূরে। দুটি নদীর মিলন-ভূমির ঠিক বিপরীত দিকে একটি দুর্গ। তার প্রতিটি দিকেই বসানো রয়েছে গুটিকয়েক ক'রে কামান। আধকোশ পরে দেখা পেলাম পাগলু (পাগলা) নামের আরেকটি নদীর। রয়েছে এর বুকে একটি সুনির্মিত ইটের সেতু। মীর জুমলার নির্দেশে গড়া হয় এটিকে। উত্তর-পূব থেকে বয়ে এসেছে এ নদীটি। আরো আধ কোশ এগোবার পর দেখা পেলাম কদমতলি নামের আরেকটি নদীর। উত্তর দিক থেকে এসে মিশেছে এটি। রয়েছে এটির ওপরেও একটি ইটের সেতু। নদীর দুই তীরেই দেখা গেল কয়েকটি ক'রে মিনার। যারা রাজপথে দস্যুগিরি ক'রে বেড়াত এমন বহু লোকের কাটা মুণ্ড ঝোলানো রয়েছে এগুলিতে

এদিন ন কোশ পাড়ি দিয়ে বিকাল নাগাদ পৌছলাম এসে ঢাকায়। ঢাকা

একটি বড় শহর। তবে এ কথাটি যথার্থ একমাত্র যা দৈর্ঘ্যের দিক থেকেই। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য গঙ্গার কাছ ঘেঁষে বাড়ি করা (এ শহরটি গড়ে উঠেছে বুড়ী গঙ্গার উত্তর কূলে। এটি পদ্মার সঙ্গে অভিন্ন ছিল আগে)। ফলে শহরটি দুকোশ ছাড়িয়ে গেছে লম্বায়। শেষে যে ইটের সেতুটির কথা শোনানো হয়েছে সেটি থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত একটানা বাড়ির পর বাড়ি। প্রতিটিই ছাড়া ছাড়া। বাসিন্দাদের অধিকাংশই কাঠের কারিগর, বানায় তারা গ্যালী ও অন্যান্য ধরনের জাহাজ। এই বাড়িগুলি সঠিকভাবে বলতে গেলে বাঁশ ও কঞ্চির গায়ে কাদা লিপে তৈরি দীনহীন কুঁড়ে। ঢাকার বাড়িগুলিও এর চেয়ে ভাল নয় তেমন কিছু। সুবাদারের আবাসটি উঁচু দেয়ালঘেরা হলেও, তার মাঝে খাড়া বাড়িটি নেহাৎই হত দরিদ্র, তৈরি করা হয়েছে কেবল কাঠ দিয়ে। তিনি বাস করেন সাধারণতঃ তাঁবুতেই। † এই দেয়াল ঘেরা চত্বর মধ্যেই। ঢাকার এই সব ধরনের বাড়িতে পণ্যসামগ্রী যথেষ্ট নিরাপদভাবে রাখা যায় না দেখে ডাচরা তৈরি করেছে এখানে একটি বেশ সুদৃশ্য ও মজবুত বাড়ি। ইংরাজরা যেটি তৈরি করেছে সেটিও মোটামুটি ভাল। শ্রদ্ধেয় অগাষ্টিন ফাদারদের গড়া চার্চটিও পুরোপুরি ইটের। এটির কারিগরির দিকটিও প্রশংসা পাবার মতো।

ঢাকায় যখন শেষবার আসি, নবাব শায়েস্তা খান তখন বাঙলার সুবাদার। চলেছে আরাকান-রাজের সঙ্গে যুদ্ধ। রাজার নৌ-বাহিনীতে অন্যান্য ধরনের ছোট নৌকা ছাড়াও রয়েছে দুশোর মতো গ্যালী। এই গ্যালীগুলি বঙ্গোপসাগরে টহল দিয়ে বেড়ায়, ঢোকে গঙ্গায়ও। জোয়ারের ভরা নদীর সময়ে হানা দেয় ঢাকা পেরিয়ে আরো ভেতর পর্যন্ত।

বর্তমান সম্রাট আপন সাম্রাজ্যের সব থেকে চতুর ব্যক্তি ঔরঙজেবের মামা শায়েস্তা খান আরাকান রাজের নৌ-বাহিনীকে দুর্বল ক'রে তোলার জন্য নিলেন ঘুষের আশ্রয়। এভাবে তার বহু সদস্য কর্মচারীকে হাত করলেন তিনি। পর্তুগীজরা রাজার যে সব গ্যালী পরিচালনা করত তার মধ্যে চল্লিশখানি তার সঙ্গে যোগ দিল অল্পকালের মধ্যেই। এই নতুন মিত্রদের নিজের কাছে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখার জন্য প্রত্যেক পর্তুগীজ সদস্য নৌ-সেনাকে প্রচুর মাইনে দেবার ব্যবস্থা নেয়া হল, দেয়া হল সাধারণ নৌ সেনাদেরও সেই অনুপাতে মাইনে। তবে, স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য ধার্য করা হল চলিত সাধারণ মাইনের মাত্র দুগুণ। দাঁড় ও বৈঠার সাহায্যে এই গ্যালীগুলিকে যেরূপ গতিতে চালানো হয় তা সত্যিই অবাক হয়ে দেখার মতো। এর এক-একটি এত লম্বা যে এক এক পাশে রয়েছে

পঞ্চাশটি পর্যন্ত দাঁড়। তবে কোন দাঁড় টানার জন্যই নেই দুজনের বেশি লোক। কতক গ্যালী আবার জাঁকালো ভাবে রঙচঙ করা, বাদ পড়েনি সোনা আর নীল রঙ-ও। (ডাচদের সহায়তা এবং আংশিকভাবে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহযোগিতা হাসিল ক'রে ১৬৬৬ অব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন শায়েস্তা খান)।

এ ধরনের কতক গ্যালী রয়েছে ডাচদেরও। এগুলিকে ব্যবহার করে তারা পণ্য-সামগ্রী আনা-নেয়ার কাজে। এ জন্য অনেক সময় বাইরে থেকেও ভাড়া করে কতক গ্যালী। ফলে বহু লোক অন্ন সংস্থানের সুযোগ পায় মাঝি-মাল্লার কাজ ক'রে।

যেদিন ঢাকায় পৌঁছলাম, তার পরদিন, ১৪ই জানুয়ারী গেলাম নবাবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সঙ্গে নিলাম তাকে দেয়ার জন্য কতক উপহারও। ঠাঁই নিয়েছিলাম এখানে এসে ডাচ ভবনে। বিকাল নাগাদ নবাব আমার কাছে সেখানে পাঠালেন কতক ফল উপহার। ডালিম, চীনা কমলালেবু, দুটি পারসিক তরমুজ ও তিন রকমের আপেল।

বেচার জন্য সঙ্গে নিয়ে আসা সামগ্রীগুলি তাকে দেখালাম পরদিন। তার ছেলে বা নবাবজাদাকেও দিলাম একটি সোনা দিয়ে কলাই করা আধার বিশিষ্ট ঘড়ি, রূপা দিয়ে কারুকাজ করা এক জোড়া পিস্তল ও একটি দূরবীন উপহার। পিতা ও তার দশ বছর-প্রায় বয়সের ছেলে দুজনের জন্য ব্যয় করলাম এভাবে পাঁচ হাজার লিভরেরও বেশি (৩৩৩৪ টাকা)।

কেনার জন্য নবাব যে সব সামগ্রী বাছলেন সেগুলির দর-দাম নিয়ে রাজী-নামায় পৌঁছলাম আমরা ১৬ তারিখে। গেলাম তারপর কাশিমবাজারের ওপর ওই পরিমাণ টাকার হুণ্ডী নেয়ার জন্য তার ওয়াজীরের কাছে। ঢাকাতেই যে পাওনা মিটিয়ে দেয়ার জন্য রাজী ছিলেন না তিনি, তা নয়। কিন্তু ডাচরা ছিলেন এ অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ। তারা আমায় সাবধান ক'রে দিলে, আমি যেন এখান থেকে কাশিমবাজারে কাঁচা টাকা বয়ে নিয়ে যাবার ঝুঁকি না নেই। সেখানে যাবার সড়ক অতি খারাপ, পথে অসংখ্য জলা আর জঙ্গল। তাই গঙ্গার জলপথ ধরে নৌকায় ছাড়া নেই সেখানে যাবার আর কোন উপায়। কিন্তু ঐ পথেও রয়েছে আবার বিপদ। এজন্য যে ধরনের ছোট ছোট নৌকা ব্যবহার করা হয়, একটু জোর হাওয়া দেখা দিলেই উল্টে যায় অনেক সময়ে সেগুলি। আবার টাকা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে পেলে

মাঝিদের পক্ষেও অসম্ভব নয় ইচ্ছা ক'রে তা ডুবিয়ে দেয়া এবং পরে সুবিধামতো টাকার থলিগুলিকে উদ্ধার ক'রে তা আত্মসাৎ করা।

নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম কুড়ি তারিখে। তিনি জানালেন আবার এ দেশে আসার ও তার সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ। দিলেন আমাকে তার ঘরোয়া বিভাগের অন্তর্গত ব্যক্তি রূপে বর্ণনা ক'রে তদনুরূপ এক ছাড়পত্র। যখন তিনি আহমদাবাদের সুবাদার ছিলেন, গিয়েছিলেন রাজা শিবজী অধিকার ক'রে নেয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অভিযানে, তখন সেই সেনাছাউনিতে তার সাথে দেখা করতে গেলে ঐ সময়েও তিনি দিয়েছিলেন আমাকে এই একই ধরনের ছাড়পত্র। এ ছাড়পত্রগুলি সুযোগ দিয়েছিল আমায় মুঘল-সম্রাটের গৃহস্থালী বিভাগের একজন হিসাবে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধে ভ্রমণ করার।

পরদিন ডাচরা আমার সম্মানে করল এক ভূরি ভোজের আয়োজন। তাতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ইংরাজ এবং একজন অগষ্টিন ফ্রাইয়ার সহ কতক পর্তুগীজকেও। ২২ তারিখে গেলাম আমি ইংরাজদের সাথে দেখা করার জন্য। তাদের কোম্পানীর প্রধান বা সভাপতি তখন মিঃ প্রাট (টমাস প্রাট)। গেলাম তারপর শ্রদ্ধেয় পর্তুগীজ ফাদার ও আরো কতক ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করতে। ২৩ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত কদিন ব্যস্ত রইলাম এগারো হাজার টাকা লগ্নী ক'রে কতক পণ্যসামগ্রী কেনাকাটায়। সেগুলি নৌকাতে বোঝাইয়ের পালা চুকিয়ে বিদায় নিতে গেলাম সকলের কাছে। ২৯ তারিখ বিকালের দিকেই যাত্রা করলাম ঢাকা থেকে। ডাচরাও সকলে তাদের অস্ত্রসজ্জিত ছোট ছোট নৌকায় চেপে সঙ্গী হলেন আমার। এগিয়ে দিলেন আমাকে দু-কোশ পর্যন্ত। করা হল স্প্যানিশ মদিরারও সদ্ব্যবহার এই বিদায় লগ্নকে রঙীন ক'রে তোলার জন্য। ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কাটল নদীর বুকেই। ঐদিন নেমে গেলাম আমি হজরাহাটে। অনুচরেরা এগিয়ে চলল নৌকা ভরা পণ্য সামগ্রী নিয়ে। নতুন একখানি নৌকা ভাড়া ক'রে ধরলাম আমি ভিন্নপথ। হাজির হলাম মিরদাপুর নামের একটি বড়সড় গ্রামে।

বারোই ফেব্রুয়ারী সেখান থেকে নিজের জন্য ভাড়া করলাম একটি ঘোড়া। কিন্তু তল্পীতল্পা বয়ে নেয়ার মতো দ্বিতীয় কোন ঘোড়া জোটানো গেল না অনেক চেষ্টা করেও। বাধ্য হয়ে দুজন স্ত্রীলোককে নিয়োগ করলাম সে কাজে। সেদিনই সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে গেলাম কাশিমবাজার। বাঙলার ডাচ বসতিগুলির নিয়ামক মঁসিয়ে অরনোল্ড ভন ওয়াচটেনডঙ্ক জানালেন সেখানে আমায় আন্তরিক সংবর্ধনা।

অনুরোধ করলেন তারই আতিথ্য গ্রহণের জন্য। আমার আগমনকে উপভোগ্য ক'রে তোলার জন্য এক আনন্দ-মিলনের আয়োজন করলেন পরদিন সেখানকার ডাচ অধিবাসীরা। কাটালাম সেদিনটি তাদের সঙ্গেই। ১৪ তারিখ মঁসিয়ে ওয়াচটেনডঙ্ক ফিরে গেলেন ব'ঙলায় ডাচদের প্রধান বসতি হুগলীতে। যে অনুচরদের নৌকায় পণ্যসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে চলার দায়িত্ব দিয়েছিলাম তাদেরই একজন হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হল এদিন আমার কাছে কাশিমবাজারে। জানালে, গত দুদিন ব্যাত্যা বয়ে চলার দরুন এবং গত রাতে তা আরো প্রবল আকার নেয়ার ফলে ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে নৌক'গুলি।

পরদিন, পনের তারিখ, মুর্শিদাব'দ (এ সময়ে মকসুসাবাদ বা মকসুদাবাদ রূপেও অভিহিত করা হত) যাবার জন্য একটি পালকী দিলে ডাচরা। কাশিম-বাজার থেকে মাত্র তিন কোশ দূরে এই বড় শহরটি। শায়েস্তা খানের প্রধান কোষাধ্যক্ষ থাকেন এখানেই। হুণ্ডিটি উপস্থিত করলাম তার কাছে। সেটি পড়ে দেখার পর তিনি জানালেন হুণ্ডিটি খাঁটি হলেও নবাবের কাছ থেকে গত সন্ধ্যায় নির্দেশ এসেছে, যদি ইতিমধ্যে দেয়া না হয়ে থাকে তবে যেন আটকে দেয়া হয় এ হুণ্ডির টাকা। কেন যে শায়েস্তা খান এ পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ভ'ঙলেন না তিনি আমার কাছে। বেজায় অবাক হয়ে ফিরে এলাম আপন আস্তানায়। ১৬ তারিখ নবাবের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চাইলাম এর কারণ। তারপর, ১৭ তারিখ বিকাল নাগাদ ১৪ দাঁড়ের একটি নৌকায় ক'রে রওনা দিলাম হুগলী। নৌকাটি ডাচরাই দিলেন আমায় সাময়িক ব্যবহারের জন্য। সে রাত এবং পরের রাতটিও ঘুমোলাম সেই নদীর বুকেই নৌকায়।

১৯ তারিখ বিকাল নাগাদ পার হলাম একটি বড় শহর। নাম তার নদীয়া। গঙ্গা নদীতে জোয়ারের জল পৌঁছায় বড় জোর এই সীমা পর্যন্তই। দেখা দিল প্রবল ব্যাত্যা এর পর। নদীর জল এমন ফুঁসে উঠল যে নৌকা টেনে ড'ঙায় তুলে নিয়ে বাধ্য হলাম তিন চার ঘন্টা চুপ হয়ে অপেক্ষা ক'রে চলতে।

২০ তারিখে পৌঁছলাম এসে হুগলী। কাটিয়ে দিলাম সেখানেই ২রা মার্চ পর্যন্ত। ডাচরা খুব আদর যত্ন করল আমায় এ-ক'দিন। যতরকমভাবে আনন্দ উপভোগের আয়োজন করা সম্ভব এ দেশে করল সবই তা। বারকয়েক নদীর বুকে প্রমোদ ভ্রমণে বার হলাম আমরা। ইওরোপের সজী ক্ষেতগুলিতে যত-রকমের তরিতরকারী উৎপন্ন হয় তার সবগুলিই এ সময়ে পরিবেশন করা হল নানাপদ তা দিয়ে রান্না ক'রে। খাওয়ানো হল কয়েকরকমের স্যালাড, বাঁধাকপি,

অ্যাসপরাগাস, মটরশুঁটি, এবং বিশেষভাবে জাপান থেকে আনা হয় যে ধরনের শিমের বীজ—তাই। ডাচরা তাদের এখানকার ক্ষেতে-খামারে ইওরোপে থাকা সব রকমের শাক, তরি-তরকারী ও ডাল ফলাতে উৎসাহী হয়ে অতি যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে এখানে আবাদ ক'রে চলেছেন সেসব। তবে পারেননি এসত্ত্বেও আর্টিচোক উৎপাদন করতে এখনো।

দোসরা মার্চ হুগলী থেকে বিদায় নিয়ে এই এলাম আবার কাশিমবাজারে। পরের দিনই গেলাম মুর্শিদাবাদ। কোষাধ্যক্ষের কাছে খোঁজ নিলাম, টাকা দেয়ার ব্যাপারে নতুন কোন নির্দেশ এসেছে কিনা নবাবের কাছ থেকে। আগেই জানিয়েছি, হুণ্ডির টাকা না দেয়ার কারণ জানতে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম নবাবের কাছে এক চিঠি। ডাচ ফ্যাক্টরীগুলির পরিচালকও লিখেছিলেন এক চিঠি ওই সঙ্গে। তিনি তাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমি নবাবের অতি পরিচিত লোক। এর পূর্বে আহমদাবাদে, দাক্ষিণাত্যের সেনা-শিবিরে এবং আরো অনেক স্থানে তিনি অনেক কিছু কেনাকাটা করেছেন আমার কাছ থেকে। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমার সুসঙ্গত ব্যবহার প্রাপ্য। তাছাড়া তার মনে রাখা উচিত, আমি-ই হলাম একমাত্র সওদাগর যিনি ইওরোপের সেরা দুর্লভ সামগ্রীসমূহ নিয়ে আসেন ভারতবর্ষে। এক্ষেত্রে, যেহেতু তিনি নিজেই আমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছেন আমাকে সুতরাং আমাকে ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ফিরে যেতে দেয়া তার পক্ষে উচিত হবে না আদৌ। এরূপ করলে, আমার মত একজন সুনামী ব্যক্তি অন্যদের এই ব্যবহারের কথা জানিয়ে দুর্লভ সামগ্রী নিয়ে এদেশে আসার ব্যাপারে অনীহ ক'রে তুলতে পারি তাদের সহজেই। কিন্তু না আমার, না পরিচালকের চিঠি, কোনটিই সমর্থ হল না বাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে। তিনি যে নতুন আদেশ পাঠিয়েছেন তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। এতে বলা হয়েছে, যে পরিমাণ টাকার হুণ্ডি আমাকে তিনি দিয়েছেন তা থেকে যেন কুড়ি হাজার টাকা কেটে রেখে মিটিয়ে দেয়া হয় বাকিটা। নবাব আরো জানিয়েছেন, যদি এ টাকা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতে রাজী না হই তাহলে জিনিষগুলি ফেরত নিয়ে আসতে পারি তার কাছে গিয়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির মূলে যে কাদের হাত রয়েছে তা বুঝতে আর অসুবিধা হল না আমার।

বর্তমান সম্রাট ঔরঙজেব দুজন পারসিক ও একজন বেণিয়ার পরামর্শে সওদাগরদের পক্ষে অতি ক্ষতিকর একটি বিধি চালু করেছেন কিছুদিন হল। এই বিধিটি হল, বিনিই ইওরোপ বা অন্যান্য অঞ্চল থেকে দ্রব্যাদি বিক্রী করতে

এদেশে প্রবেশ করবেন তিনিই বাধ্য থাকবেন সেগুলি নিয়ে সবার আগে দরবারে উপস্থিত হবার জন্য। স্থলপথ কিংবা জলপথ যেখান দিয়েই তারা আসুন না কেন, স্থানীয় শাসনকর্তা ওইরকম একখানি আদেশপত্র ধরিয়ে দেন ব্যবসায়ীর হাতে, এবং সেচ্ছায়-ই হোক অনিচ্ছায়ই হোক বাধ্য করেন তাঁদের দরবারে হাজির হতে। এবার, ১৬৬৫-তে সুরাট আসতেই সেখানকার শাসনকর্তা আমার হাতেও ধরিয়ে দিলেন এরকম একটি আদেশনামা। পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী বা জহানাবাদে সম্রাটের কাছে। সম্রাট এদিকে দুজন পারসিক ও একজন বেণিয়ার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন তার কাছে বেচার জন্য নিয়ে আসা রত্নসামগ্রীগুলি যাচাই ক'রে দেখার জন্য। পারসিক দুজনের একজনার নাম নবাব আকিল খান (আকিল খান মীর আসকারী)। তিনি ছিলেন ঔরঙ্গজেবের ওয়জীর। মারা যান ১৬৯৫-এ। সম্রাটের মূল্যবান রত্নাদির ভার ছিল তারই ওপরে। অন্য জনের নাম মীর্জা মুযজুম। প্রতিটি রত্নের ওপর কর ধার্য করাই ছিল তার কাজ। আর নিহাল চাঁদ নামের বেণিয়াটির ওপর ভার ছিল রত্নগুলি ঝুট কি আসল, তাতে কোন রকম খুঁত আছে কিনা এসব পরখ ক'রে দেখার দায়িত্ব।

বিদেশী রত্ন ব্যবসায়ীরা কোন কিছু বিক্রীর জন্য সম্রাটের কাছে উপস্থিত করার আগে সেগুলি দেখে নেয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন এ তিন জন। যদিও এজন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন কিছু না নেয়ার জন্য অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন তারা, তবু বণিকদের লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে নেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না তাদের। যথেষ্ট লাভ করার মতো কোন সুন্দর জিনিস কেউ নিয়ে এলে বাধ্য করতেন কম দামে সেটিকে বেচে দিতে তাদের কাছে। বণিক তাতে রাজী না হলে সম্রাটের কাছে তা উপস্থিত করার বেলা শয়তানি ক'রে তার দাম ধার্য ক'রে বসতেন এরা প্রকৃত দামের আধা। এছাড়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবেরও রত্নের প্রতি ঝোঁক নেই কোন, সোনা-রূপাই পছন্দ করতেন বেশি। সম্রাটের (ওজন) উৎসবের দিন দরবারের রাজা ও আমীররা জাঁকালো উপহার দিয়ে থাকেন তাকে। যদি এজন্য তারা রত্নাদি সংগ্রহে ব্যর্থ হন, দেন তবে সোনা-মোহর। সোনা-মোহরের চেয়ে রত্নাদি অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ উপহার হলেও আগেই বলেছি সম্রাট রত্নাদির চেয়ে সোনা-রূপাকেই মূল্য দেন বেশি। এই উৎসবানুষ্ঠানের আগে আগে তাই অসংখ্য হীরা, চুনী, পান্না রাজ-রত্নাগার-অধ্যক্ষ বিক্রীর জন্য জমা দেন নির্দিষ্ট কতক ব্যবসায়ীর কাছে। রাজা ও আমীররা তার জিনিস কিনেই তাকে উপহার দেন আবার। এই পন্থায়

সম্রাটের রত্ন দি যেমন আবার সম্রাটের কাছেই ফিরে আসে, তেমনি মাঝ থেকে পেয়ে যান তিনি তার কাম্য সোনা-রূপা বা অর্থ।

রত্ন-ব্যবসায়ীদের ভোগ করতে হয় আরো একটি অসুবিধা। সম্রাট কোন রত্নপাথর দেখার পর সেটিকে আর জেনেশুনে কিনতে চান না কোন রাজ বা আমীরই। তাছাড়া সম্রাট নিযুক্ত ওই তিন মূল্য নির্ধারক রত্নাদি যাচাই-বিচার করেন তাদের বাসভবনে বসেই। ব্যবসায়ীকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয় সেগুলি তাদের আবাসে। সেখানে সেগুলি পরখ ক'রে দেখার জন্য রয়েছে কযেকজন বেনিয়া। এদের কেউ বা হীরা, কেউ বা চুণী, কেউ বা পান্না, কেউ বা মুক্তা বিশেষজ্ঞ। পরখ করার সময়ে এরা প্রতিটি রত্নের ওজন, উৎকর্ষতার মান, দোষত্রুটি, রঙ ইত্যাদি রাখেন সব কিছুই লিখে। তারপর কোন ব্যবসায়ী যদি সেগুলি নিয়ে রাজা, শাহজাদা বা সুবাদারদের কাছে যান, এরা যুগিয়ে দেন তাদের তিনি নিয়ে আসা যাবতীয় সামগ্রীর খুটিনাটি বিবরণ ও মূল্য। আর মূল্য জানাবার বেলা দুরভিসন্ধিমূলক ভাবেই জানান তা প্রকৃত মূল্যের অর্ধেক ক'রে। এই বেনিয়ারা ইহুদীদের চেয়েও হাজার গুণ নিকৃষ্ট। যে কোন ধরনের ছলাকলা ও বাকচাতুরীতে তাদের চেয়েও অধিক কৌশলী। বিশেষ ক'রে যখন তারা কারো ওপরে শোধ নিতে চায় তখন তো কথাই নেই।

আমি যখন জহানাবাদ পৌঁছলাম উপরোক্ত তিন মান-নির্ধারকের একজন এলেন আমার কাছে। জানালেন, আমি যে সব সামগ্রী নিয়ে এসেছি সেগুলি সম্রাটকে দেখাবার আগে তাকে যাচাই ক'রে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সম্রাট। এদের বিশেষ নজর ছিল আমার নিয়ে আসা সামগ্রীগুলির ওপর। মতলবে ছিলেন, সম্রাট জহানাবাদে উপস্থিত না থাকলে, সেগুলি নিজেরা কিনে নিয়ে পরে সুবিধামতো সম্রাট ও অন্যান্যদের কাছে বেচে লাভ ওঠানোর জন্য। তবে, তাদের এ ধরনের চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হত, কেননা, আমি কিছুতেই রাজী হতাম না তাতে।

যাই হোক, পরের দিন তাদের তিনজনেই একের পর আর দেখা করতে এলেন আমার সাথে। অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে এনেছিলাম আমি ন্যাসপাতি আকারের নটি বড়ো মুক্তা দিয়ে তৈরি একটি দর্শনীয় পুষ্প স্তবক। এই মুক্তাগুলির মধ্যে যেটি সবথেকে বড় তার ওজন তিরিশ ক্যারাট, আর যেটি সব থেকে ছোট তার ওজন ষোল ক্যারাট। ছিল ন্যাসপাতি আকারের আরো একটি বড় মুক্তা। পঞ্চান্ন ক্যারাট ওজন তার। এরা কিনে নিতে চাইলেন বিশেষ ভাবে এদুটি

আমার কাছ থেকে। কিন্তু মোটেই আগ্রহ দেখালাম না আমি। স্তবকটি নিলেন শেষ অবধি সম্রাট ই। বড় মুক্তাটির বেলা যখন তারা দেখল আমি কিছুতেই সেটি তাদের কাছে বেচতে রাজী নই, আমার নিয়ে আসা সামগ্রীগুলি সম্রাটকে দেখানোর আগে দেখাই যাতে তার মামা (এবং ওয়জীর) জাফর খানকে, তখন সুকৌশলে তার ব্যবস্থা করলেন। তিনি দেখার পর ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না সেটি আর। বললেন, সেটির কথা যেন সম্রাটকে না জানাই আমি। সম্রাটের সমতুল দাম দিয়েই এটি নেবেন তিনি আমার কাছে থেকে। প্রকৃতপক্ষে, এটি নিতে চাইছিলেন তিনি সম্রাটকে উপহার দেবার জন্যই।

আমার নিয়ে আসা সামগ্রীগুলি থেকে সম্রাট তার পছন্দমতো যা কিছু কিনে নেবার পর, বাকিগুলি থেকে কিনে নিলেন কয়েকটি জাফর খানও। এছাড়া সেই বড় মুক্তাটি তো আগেই বাছাই করেছেন তিনি। কিন্তু দিনকয়েক পর যখন তার কাছ থেকে রাজীনামা মত আমার প্রাপ্য আনতে গেলাম, তিনি মুক্তাটির বেলা দিতে চাইলেন স্বীকৃত দামের চেয়ে দশ হাজার টাকা কম। ওই দুই পারসিক ও বেণিয়াটি আমার প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে ইতিমধ্যে তাকে জানিয়েছে, যদি এটি তাদের কিনে নেয়ার ইচ্ছা থাকত তবে আমি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এটিকে নিয়ে নিতে পারত তারা তার স্বীকৃত দামের চেয়ে আট থেকে দশ হাজার টাকা কমে। তাদের কথা সর্বৈব মিথ্যা হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন জাফর খান। বললেন, যদি নতুন বলা দামে সেটি বেচতে রাজী না থাকি তাহলে ফিরিয়ে নিতে পারি সেটি। তাই করলাম শেষপর্যন্ত আমি। তার একটি বিশেষ কারণ, কিছু উল্লেখযোগ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে চাইছিলাম আমি শায়েস্তা খানের জন্য। যদি জহানাবাদে আসতে আমাকে বাধ্য করা না হত তাহলে সবার আগে যেতাম আমি তার কাছেই। এ নিয়ে সুরাটের শাসনকর্তার সঙ্গে করেছিলাম সে সময়ে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক। তার আদেশ নাকচের জন্য চার মাসেরও ওপর বৃথা চেষ্টার পর অনন্যোপায় হয়েই রওনা হয়েছিলাম শেষ অবধি সম্রাটের কাছে আসার জন্য। পাছে আমি অন্য কোথাও চলে যাই এই আশঙ্কায় তারা জালোর পর্যন্ত পনের জন অশ্বারোহী দিয়েছিলেন সে-সময়ে আমার সঙ্গে।

দিল্লী থেকে যাত্রা করলাম এরপর আমি বাঙলায়। মান-নির্ধারক তিনজন তো ছিলেন চটে লাল হয়েই। জাফর খানও যে আবার প্ররোচিত ক'রে তুললেন তাদের, নেই এতেও কোন সন্দেহ। মুক্তাটি না পেয়ে তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন

আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। ফলে শায়েস্তা খানকে তারা লিখলেন, আমি কতক রত্নসামগ্রী নিয়ে চলেছি তাকে দেখানোর জন্য, এবং আছে তার মধ্যে অতি সুন্দর একটি মুক্তাও। ওই মুক্তাটি বিক্রী করেছিলাম আমি জাফর খানের কাছে। যখন তিনি ধরতে পারলেন যে সেটির জন্য তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা বেশি নেয়ার চেষ্টা করছি তখন ফিরিয়ে দিলেন সেটিকে। অন্যান্য সামগ্রী-গুলির দাম সম্পর্কেও এই রকম লিখলেন তারা। আমি সামগ্রীগুলি শায়েস্তা খানের কাছে বেচে হুণ্ডি নিয়ে চলে আসার পর পেলেন তিনি তাদের সেই চিঠি। ফলে তিনি আমার প্রাপ্য থেকে চাইছেন এভাবে কুড়ি হাজার টাকা কেটে রাখতে এখন। শেষ পর্যন্ত একে কমিয়ে কেটে রাখতে চাইলেন তিনি দশ হাজার টাকা। অনন্যোপায় হয়ে সন্তুষ্ট থাকলাম সেই টাকা নিয়েই।

শায়েস্তা খান (ও তার ছেলেকে) উপহার দেয়ার কথা বলেছি আগেই। এ ছাড়াও এ যাত্রা উপহার দিতে হয়েছিল সম্রাটকে, নবাব জাফর খানকে, ঔরঙজেবের বোন প্রধান বেগমের খোজাকে, প্রধান কোষাধ্যক্ষকে, এবং কোষাগারের কর্মীদের। এখানে উল্লেখযোগ্য, সম্রাটের সঙ্গে কেউ দেখা করতে চাইলে সবার আগে জিগ্যেস করা হয় সম্রাটকে তিনি যে সব সামগ্রী উপহার দেবেন সেগুলি কোথায়? যাচাই ক'রে দেখা হয় সেগুলি তাকে উপহার দেয়ার যোগ্য কিনা? শূন্য হাতে তার সম্মুখে উপস্থিত হবার দুঃসাহস রাখেন না কেউই। আর, তার সাক্ষাৎলাভের সম্মানটি অর্জন করতে হয় না মোটেই কিছু কম খরচ। জহানাবাদ পৌঁছবার পর ১৬৬৫-র ১২ই সেপ্টেম্বর গেলাম আমি তার সঙ্গে দেখা করতে। এজন্য তাকে যা-যা উপহার দিতে হল সে খাতে খরচ হল আমার সর্ব-সাকুল্যে ১২,২১৯ লিভর (৮,০৭৯১/৩ টাকা)। সম্রাটের মামা (ও ওয়াজীর) জাফর খানকে উপহার দিতে ব্যয় হল আমার ৩,৭৫০ লিভর (২৩০০ টাকা)। প্রধান কোষাধ্যক্ষকে উপহার দিতে ৭২০ লিভর (৪৮০ টাকা)। সম্রাটের কোষাগারের কর্মীদের ও যারা কোষাগার থেকে টাকার থলি বয়ে আনল তাদের দিতে হল ২০০ টাকা বা ৩০০ লিভর। সম্রাটের বোন প্রধান বেগমের খোজাকে উপহার দিতে ব্যয় হয় ২৬০ লিভর (১৭৩১/৩ টাকা)। এছাড়াও দিতে হয়েছে দুই খান-এর (জাফর খান ও শায়েস্তা খান) বাসভবনের নায়েবদের। প্রাসাদের বিভিন্ন ফটকের রক্ষী-প্রধানদের। এবং যারা দুবার সম্রাটের ও তার বোনের তরফ থেকে ও একবার জাফর খানের তরফ থেকে সম্মানী পোশাক বা খিলাত বয়ে এনেছে তাদের। এজন্য সর্বসাকুল্যে ব্যয়

করতে হয়েছে আমাকে ২৩১৮৭ লিভর (১৫,৪৫৮ টাকা)। (এক্ষেত্রে ব্যবসাতেও এরূপ লাভ হওয়া দরকার যা থেকে পুষিয়ে যায় এই খরচ-খরচা)।

এ এক অতি-নির্মম বাস্তব। প্রকৃতপক্ষে, তুরস্ক, পারস্য ও ভারতের রাজারাজড়াদের দরবারের সঙ্গে ব্যবসা করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, যথেষ্ট উপহার-সামগ্রীর সংস্থান না ক'রে আদপেই ঝোঁকা উচিত নয় সেদিকে। এ ছাড়াও, তাদের বিশ্বাসভাজন বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্যও চাই সর্বদা উদার হস্তে অর্থ-বিতরণ।

নয় ॥ সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথ-পরিচয়

গোলকুণ্ডায় গিয়েছি আমি বারকয়েক। এবং বিভিন্ন পথ ধরে। কখনো সাগর পথে হরমুজ থেকে মসুলিপত্তম এসে সেখান থেকে। কখনো আগ্রা থেকে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট প্রবেশপথ সুরাটে এসে সেখান হতে। এখানে বর্ণনা দিচ্ছি শেষোক্ত পথটিরই। ওই সঙ্গে আগ্রা থেকে দৌলতাবাদ হয়ে যে পথটি গেছে শোনাব সেটির কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবে। আর শোনাব সেই সাথে অন্যান্য বারের কথা বাদ দিয়ে শুধু ১৬৪৫ ও ১৬৫৩-র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

১৬৪৫-এর ১৯ জানুয়ারী করলাম সে-যাত্রায় সুরাট ত্যাগ। তিন কোশ এগিয়ে প্রথম তাঁবু ফেললাম কমবাড়ি (খুমবারিয়া)-তে। এরপর ন-কোশ এগিয়ে বরনোলি (কতক মানচিত্রে বরদোলি বা পনোলি রূপে উক্ত)। তারপর ১২ কোশ পার হয়ে বিয়ার-এ (ভিয়ারা-য়)। পরে ১৬ কোশ পার হয়ে এলাম নবপুর (নারায়ণপুর)। আগেই জানিয়েছি, সারা পৃথিবীতে একমাত্র এখানেই জন্মে কস্তুরী-সুবাস থাকা সেরা চাল। এখান থেকে ১৮ কোশ এগিয়ে গেলে রিঙ্কুলা। আরো ৮ কোশ গেলে পিপেলনার (পিম্পলনের)। তার ১৭ কোশ পর নিমপুর (নামপুর)। আরো ১৪ কোশ পর পত্তন (পতনা) সেখান থেকে ১৪ কোশ এগোলে সকৌরা (সকোরা)। তার দশ কোশ পর বাকেলা (ওরকলা)। আরো দশ কোশ পরে দিসগাঁও (দেবগাঁও)। সেখান থেকে দশ কোশ এগিয়ে দৌলতাবাদ।

দৌলতাবাদ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সেরা দুর্গ। চারিদিকে খাড়া ঢাল থাকা একটি পাহাড়ের ওপর এটি তৈরি। প্রবেশ পথটি এতই সংকীর্ণ যে একটি ঘোড়া বা উটের বেশি যেতে পারে না একবারে। শহরটি পাহাড়েরই গোড়ায়। সুদৃঢ় দেয়াল ঘেরা। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীন হলে মুঘলদের হাতছাড়া হয়ে যায় এ শহর ও দুর্গটি। তারপর, জহাঙ্গীরের আমলে আবার দখলে আনা হল এটিকে কূট-কৌশলের নীতি অনুসরণ ক'রে। পরে যিনি শাহ-জহান নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন সেই সুলতান খুররমকে এজন্য সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন পিতা জহাঙ্গীর। তার সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন শায়েস্তা খানের শ্বশুর আসদ খান। তিনি শাহজাদাকে কোন কিছু বলার দরুন শাহজাদা এত চটে গেলেন যে বললেন দোর গোড়ায় রাখা তার পাপোষ বা চটি তুলে এনে তা দিয়ে তার মাথায় পাঁচ-ছ-ঘা মারার হুকুম। ভারতবর্ষে এটিই হল চরম অসম্মান। 'এরপর কারো পক্ষে সম্ভব নয় আর লোক সমাজে মুখ দেখানো। পুরোটাই কিন্তু সাজানো আসলে।' লোকচক্ষু ফাঁকি দেয়ার জন্য, বিশেষ ক'রে শাহজাদার সৈন্যবাহিনী মধ্যে যদি বিজাপুরের রাজার কোন গুপ্তচর থাকে তাদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যই করা হয়েছিল এটি। এর ফলে চারদিকে ক্রমশ রটে গেল আসদ আলীকে এভাবে অসম্মান করার খবর। পৌঁছল তা বিজাপুরের রাজার কানেও। এ ঘটনার পর আসদ আলী হাজির হলেন বিজাপুরের রাজার কাছে তার আশ্রয়ের জন্য। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি না থাকার দরুন তাদের কূট কৌশল ধরতে পারলেন না রাজা। আসদ খানকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানালেন তিনি, দিলেন আপন ছত্রছায়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি। রাজা তাকে কোনরকম সন্দেহ না ক'রে ভালভাবে গ্রহণ করেছেন দেখে আসদ খান সুযোগ বুঝে এক-সময়ে চেয়ে বসলেন তার কাছে অধিক নিরাপত্তার জন্য সপরিবারে দুর্গ মধ্যে আশ্রয়। সপরিবারে বলতে তার বারোজন পত্নী এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য পরিজন ও চাকরবাকর। রাজা দিলেন সে অনুমতি।

আসদ খান ৮।১০টি উট নিয়ে প্রবেশ করলেন দুর্গে। প্রতিটি উটের পিঠে দুটি ক'রে কজাওয়াস বা ঘেরা ডুলি। যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায় সেজন্য এগুলিতেই মেয়েদের বয়ে নিয়ে যাওয়া চলিত রীতি। কিন্তু মেয়েদের বদলে দুর্গ মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল এগুলিতে ক'রে সৈনিকদের। প্রত্যেক শুতরি বা উট চালকও ছিলেন আসলে একজন ক'রে সৈনিক। ফলে দুর্গ মধ্যে থাকা অ-প্রস্তুত সেনাদের অনায়াসে হত্যা ক'রে দখল ক'রে নিল তারা সেটিকে। সেই

থেকে রয়েছে সেটি মুঘলদেরই অধিকারে। অনেকগুলি উন্নত ধরনের কামান আছে বর্তমানে এ দুর্গটি মধ্যে। গোলন্দাজরা সাধারণতঃ ইংরাজ বা ডাচ। দুর্গটির চেয়েও উঁচু আরো একটি ছোট পাহাড় সেখানে থাকলেও দুর্গটিকে পার না হলে সেখানে যাওয়া বেশ দুঃসাধ্য।

দৌলতাবাদ থেকে ঔরঙ্গাবাদ চার কোশ।

আগে ছিল এটি সাধারণ এক গ্রাম। ঔরঙ্গজেবই শহরে রূপান্বিত করেছেন একে। তবে দেয়াল ঘেরা নয়। দু-কোশ আয়তনের একটি হ্রদ রয়েছে এখানে। গ্রামটি ছিল তারই কূলে। জলের সুবিধা থাকার দরুন এবং ঔরঙ্গজেবের প্রথমা পত্নী তথা তার সন্তানদের জননী এখানে মারা যাবার দরুন তার স্মৃতি রক্ষার্থেই পরিণত করা হয়েছে এটিকে শহরে। হ্রদটির পশ্চিম কিনারায় সমাহিত করা হয়েছে তাকে। সম্রাট তৈরি করিয়েছেন সেখানে অনুপম সমাধি-সৌধসহ একটি মসজিদ। গড়েছেন একটি ভাল সরাইখানাও। বিরাট অর্থব্যয় হয়েছে এই মসজিদ ও সৌধটি তৈরি করতে। পুরোটাই তার শ্বেত মর্মর দিয়ে আবৃত। আনাতে হয়েছে তা লাহোর থেকে শকটে (মনে হয় এ তথ্যটি ভুল। সম্ভবতঃ আনানো হয়েছে এগুলি রাজপুতানার আলওয়র, যোধপুর বা জয়পুর অঞ্চল থেকে। তাজমহলের শ্বেত মর্মরগুলি আনানো হয়েছিল মকরানার খনিগুলি থেকে। ঔরঙ্গজেবের তৈরি এই স্মৃতি সৌধটি তাজমহলেরই একটি ছোটখাটো সংস্করণ। যার মরদেহ এখানে সমাহিত রয়েছে সেই জইনাবাদী ঔরঙ্গজেবের পত্নী নন, রক্ষিতা)। শকটে এ পথ পাড়ি দিয়ে পাথরগুলিকে এখানে নিয়ে আসতে লেগেছে চার মাস ক'রে সময়। একদিন সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথে ঔরঙ্গাবাদ থেকে পাঁচ বিরাম-স্থলী পরে দেখার সুযোগ হল আমার ৩০০ শকট বোঝাই এ ধরনের মর্মর। যে শকটগুলি সব থেকে ছোট সেগুলিতে যোতা হয়েছিল ১২টি ক'রে ষাঁড়।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে পিপেলি (পিপরী) ৮ কোশ। পিপেলি থেকে ঔরের (অমবাদ?) ১২ কোশ। ঔরের থেকে গুইসেমনের (গণপুরগভী) ১০ কোশ। গুইসেমনের থেকে অন্তি (অষ্টা) ১২ কোশ। অন্তি থেকে সকুয়ের ১৬ কোশ। সকুয়ের থেকে লেসোনা (লসোনা) ১৬ কোশ। লেসোনা থেকে নাদৌর (নান্দের) ১২ কোশ।

নাদৌরের কাছে পার হলাম একটি নদী। গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে এ নদীটি। শকট প্রতি চার টাকা ক'রে দিতে হয় এখানে। এছাড়াও দরকার হয় শাসন-কর্তার অনুমতি পত্র। নাদৌর থেকে ন কোশ গেলে পতোজ্ঞা (পত্তজ) ৮

পতোত্ত্বা থেকে দশ কোশ গেলে ককেরি (করখেলী)। ককেরী থেকে দশ কোশ পরে সতপুর (সাত্তাপুর)। সতপুর থেকে ১২ কোশ পর সিত্তানাগ। সিত্তানাগ থেকে দশ কোশ পর সত্তনগর (সতুলনগর)। এই সত্তনগর থেকেই শুরু হল গোলকুণ্ডা অধিপতির রাজ-এলাকা। সত্তনগর থেকে ষোল কোশ এগোলে মেলুয়ারি। মেলুয়ারি থেকে বারো কোশ এগোলে গিরবল্লি। গিরবল্লি থেকে চৌদ্দ কোশ এগোলে গোলকুণ্ডা। সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা পর্যন্ত এই সড়কপথের দূরত্ব ৩২৪ কোশ। এপথ ধরে সেখানে পৌঁছতে লাগল আমার মোট ২৭ দিন। ১৬৫৩ অব্দে লেগেছিল আরো পাঁচদিন বেশি। সেবার ৬ই মার্চ সুরাট থেকে রওনা হয়ে পিপেলনার (পিম্পলনার) পৌঁছলাম ১১ তারিখে। ধরলাম তারপর ভিন্ন এক সড়কপথ। বারো তারিখে সেই নতুন সড়ক ধরে এলাম বীরগাম (বীরগাঁও)। তেরো তারিখে ওমবেরাত (উমাপুরাণ বা উমিয়ানা)। চৌদ্দ তারিখে এর্নিকি তেনিকি (অনকাই-তনকাই)। এটি একটি সুদৃঢ় দুর্গ। দুই ভারতীয় রাজকুমারীর নামানুসারে স্থানটির এই নাম। চারিদিকে খাড়া ঢাল থাকা এক পাহাড়শীর্ষে এ দুর্গটি। ওপরে চড়ার জন্য শুধু ব পূবদিকেই একটি সরু পথ। দুর্গের ঘের-দেয়াল মধ্যে একটি জলাধার বর্তমান। রয়েছে ৫ শো লোকের অন্নসংস্থানের মতো চাষ-আবাদের ব্যবস্থাও। কিন্তু এটিতে সেনাদল রাখার জন্য সম্রাট আগ্রহী না থাকায় ধ্বংস হয়ে চলেছে পড়ে থেকে থেকে।

১৫ই মার্চ এলাম গেরোলে। ১৬ তারিখে লাজোর। একটি নদী বয়ে চলেছে এর পাশ দিয়ে। এর পূব কূলে, এক কামানের গোলা দূরে রয়েছে এদেশের সব থেকে বৃহদাকার মন্দিরগুলির একটি। প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে প্রত্যহ সেখানে। ১৭ তারিখে এলাম ঔরঙ্গাবাদ। ১৮ তারিখে পিপেলগান (পিপরী)। ১৯ তারিখে এমবের (অম্বাদ), ২০ তারিখে দেওগান (দেবগাঁও), ২১ তারিখে পতরিস (পথরী), ২২ তারিখে বরগান (বুদ্দগাঁও), ২৩ তারিখে পালম। ২৪ তারিখে কণ্ডিয়ার (কন্ধার)। এটি একটি শক্তিশালী দুর্গ। তবে, একটি পাহাড়ের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় এর একাংশ। ২৫ তারিখে গরগান। ২৬ তারিখে নগৌনি (নোগাঁও)। ২৭ তারিখে ইন্দোত (ইন্দুর)। ২৮ তারিখে ইন্দেলভই (যেদলভোই)। ২৯ তারিখে রেগিভলি। এ দুটি স্থানের মধ্য-এলাকা দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী। এটিই গোলকুণ্ডা রাজ্য ও মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্য সীমানা। ৩০ তারিখে সম্প-কি-পেত (মসুসপেত)।

৩১ তারিখে মিরেলমোল'-কি-পেত (মীর জুমলা কি পেত)। এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে গোলকুণ্ডা।

আগ্রা থেকে গোলকুণ্ডা যেতে হলে প্রথমে উপস্থিত হতে হবে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা সড়কপথ ধরে) বুরহানপুর। তারপর বুরহানপুর থেকে দৌলতাবাদ। পাঁচ-ছয় বিরাম পর্বের বেশি নয় এ দূরত্ব। এরপর দৌলতাবাদ থেকে ওপরে বলা (যে-কোন) পথ ধরে গোলকুণ্ডা।

আরো একটি পথ ধরে সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যেতে পারেন আপনি। এ পথটি গেছে গোয়া ও বিজাপুর হয়ে। গোয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলার বেলা শোনাব তার কথা।

দশ || গোলকুণ্ডা : অতীত ও বর্তমান

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে গোলকুণ্ডা রাজ্যটি উর্বর ও সচ্ছল এলাকা। উৎপাদিত হয় এখানে সুপ্রচুর চাল, গম, গবাদি পশু, ভেড়া, মুরগি এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের আরো বহু সামগ্রী। অসংখ্য জলাধার থাকার জন্য মেলে প্রচুর পরিমাণে ভাল ভাল মাছও। অতি বিশেষভাবে একজাতের সুগন্ধী মাছ যার রয়েছে শুধু শিরদাঁড়ায় একটি কাঁটা, আর খেতেও ভারি চমৎকার (খুব সম্ভব চিলওয়া বা চলওয়া মাছ)। সারা অঞ্চলময় ছড়ানো এই জলাধারগুলি সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের শিল্প ক্ষমতা অপেক্ষা রয়েছে প্রকৃতির অবদানই বেশি। এগুলি সাধারণতঃ কিছুটা উঁচু এলাকায় অবস্থিত। দিয়ে নিলেই হল জল আটকানোর জন্য ঢালের দিকটিতে শুধু যা একটি বাঁধ। এই বাঁধগুলি কখনো কখনো আধ কোশ পর্যন্ত লম্বা। বর্ষাকাল পার হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে জলধারগুলিকে খুলে দিলেই হল ক্ষেতে চাষের জল যোগানোর জন্যে। জমির মালিকেরা বিভিন্ন দিকে খাল কেটে নিয়ে যায় সেই জল আপন আপন ক্ষেতে।

এ রাজ্যের রাজধানী শহরটির প্রকৃত নাম ভাগনগর। কিন্তু দুর্গটির নামানুসারে সকলেই উল্লেখ করে একে গোলকুণ্ডা বলে। দুর্গটি এ শহর থেকে মাত্র দু-কোশ দূরে। রাজা বাস করেন সেখানেই। দু-কোশের মতো পরিধি জুড়ে

এ দুর্গটি। বড় সেনাদলের প্রয়োজন হয় একে প্রহরা দিতে। এই দুর্গরূপী শহর মধ্যেই রাজা রেখেছেন প্রকৃতপক্ষে তার যাবতীয় ধনরত্ন। ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ভাগনগর লুটপাট করার পর থেকেই সেখানকার রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে এটিকেই তিনি পরিণত করেছেন রাজ আবাসে। যথাস্থানে শোনাব সেই অভিযান কাহিনী।

আগেই জানিয়েছি, যে শহরটির নাম ভাগনগর সাধারণ লোকে তাকেই বলে গোলকুণ্ডা। বর্তমান রাজার প্রপিতামহ তার এক অতি প্রিয়তমা মহিষীর অনুরোধে তৈরি করেন এ শহরটিকে। ওই মহিষীর নাম ছিল নগর (প্রকৃত পক্ষে ভাগমতী। ইনি কুতব শাহ মহম্মদ কুলীর মহিষী ছিলেন না, ছিলেন প্রিয় রক্ষিতা। তারই নামানুসারে শহরটির নামকরণ করেন কুতব শাহ। এটি গড়া হয়েছিল, ১৫৮৯ অব্দে। গোলকুণ্ডা দুর্গটি এখান থেকে সাত মাইল দূরে)। আগে ছিল এটি একটি প্রমোদকানন। রাজার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর উদ্যান ছিল এখানে। তার পত্নী প্রায়ই তাকে বলতেন, কাছে নদী আছে বলে এ স্থানটি একটি শহর ও রাজআবাস গড়ার যোগ্য ঠাঁই। শেষ পর্যন্ত রাজা একটি শহর প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রিয়তমা পত্নীর নামানুসারে নাম দিলেন তার ভাগনগর। ১৬°৫৮' অক্ষাংশে এ শহরটি (প্রকৃতপক্ষে ১৭° ২' অক্ষাংশ ও ৭৮°২৭' দেশান্তরে)। আশেপাশের অঞ্চল পুরো সমতল। অথচ শহরটির গা ঘেঁসে আমাদের ফনটেনব্লু-র মতো অসংখ্য টিলা পাহাড়। শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিককার দেয়াল ছুঁয়ে বয়ে চলেছে একটি বড় নদী। মসুলিপত্তমের কাছ দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে। ভাগনগরের কাছে এ নদীটি পার হবার জন্য রয়েছে একটি চমৎকার পাথরের সেতু। প্যারিসের কাছে থাকা পন্ট নেউফের তুলনায় কোন অংশে কম সুদর্শন নয় এটি (১৫৯৩-এ কুতব শাহের তৈরি পুরানা পুল)। শহরটি আকারে প্রায় অরলিন্সের মতোই। যেমন মজবুত ক'রে তৈরি, তেমনি খোলামেলা। অনেকগুলি সুন্দর ও চওড়া রাজপথ, ভারত ও পারস্যের সব কটি শহরের চেয়ে বেশি। তবে বাঁধানো নয়, ধুলো-বালিতে ভরা। ফলে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় গরমকালে।

সেতুটির গোড়ায় পৌঁছবার আগে পার হতে হয় কোশখানেকের মতো লম্বা এক বিস্তীর্ণ শহরতলি এলাকা। এর নাম ঔরঙ্গাবাদ (কারওয়ান শহরতলি)। বড় ব্যবসায়ী, দালাল, এবং শিল্পী-কারিগরেরা বাস করে এখানেই। সাধারণ অধিবাসীদেরও বাস এলাকা এটিই। মূল শহর মধ্যে বাস করে শুধু বিশিষ্ট গুণী ও

অভিজাতরা, রাজ-ভবনের পদস্থ কর্মচারীরা, ওমরাও ও কাজীরা এবং সেনা-বাহিনীর লোকেরা। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেন-দেনের জন্য বণিক ও দালালরা সকাল ১০ বা ১১টা থেকে বিকাল ৪ বা ৫টা পর্যন্ত আসে শহর মধ্যে। তারপর ফিরে যায় রাত কাটানোর জন্য শহরতলিতে যে যার বাড়ি। এই শহরতলিতে রয়েছে দু-তিনটি সুন্দর মসজিদ। আগন্তুকদের রাত-কাটানোর সমস্যার সমাধান করে এরাই। রয়েছে কাছে পিঠে কয়েকটি মন্দিরও। শহর থেকে দুর্গে যাবার পথ চলে গেছে ওই শহরতলিটির মধ্য দিয়েই।

সেতুটি পার হলেই সোজাসুজি পড়বেন আপনি একটি চওড়া রাস্তায়। এ রাস্তাটিই চলে গেছে দুর্গে, রাজ-প্রাসাদের দিকে। ডানদিকে দেখা যাবে দরবারের কতক আমীরের বাড়ি, চার-পাঁচটি সবাই। প্রতিটি সবাই দোতলা। প্রতি তলায় রয়েছে একটি ক'রে মহাকক্ষ ও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। বেশ ঠাণ্ডা সেগুলি। রাস্তার শেষপ্রান্তে দেখা যাবে একটি বিশাল চতুষ্ক-ক্ষেত্র। তার কাছেই রাজ-আবাসের একটি দেয়াল। মাঝে তার একটি অলিন্দ। জনসাধারণকে দর্শন দেয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলে এখানে এসে বসেন রাজা। প্রাসাদের মূল ফটকটি এই চতুষ্ক-ক্ষেত্রের দিকে নয়, অন্য দিকে। সেই ফটক দিয়ে ভেতরে গেলে প্রথমেই দেখতে পাবেন দরদালান ঘেরা বিশাল এক অঙ্গন। প্রাসাদ-রক্ষীরা প্রহরা দিয়ে চলে এই দরদালানে দাঁড়িয়ে। এটি পার হয়ে গেলে পাবেন আপনি একই রকমের দরদালান ঘেরা আরেকটি অঙ্গন। রয়েছে সেখানে সমতল ছাত সহ কয়েক সারি সুন্দর কক্ষমালা। এগুলির ওপরে এবং প্রাসাদের ওপরে রাখা হয় হাতিগুলিকে। রয়েছে সেখানে সুন্দর সুন্দর বাগান এবং বড় বড় গাছও। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে সৌধমালার খিলানগুলি কি ক'রে বয়ে চলেছে এই বিশাল ভার। দেখলে যে কোন লোকের মনে হবে, হ্যাঁ, সত্যিই এক রাজ-প্রাসাদ বটে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে, শহরটি মধ্যে নির্মাণ ক'রে চলা হচ্ছিল একটি মন্দির (মক্কা মসজিদ)। সম্পূর্ণ হলে এটি হয়ে উঠত সারা ভারতের সেরা দ্রষ্টব্য। পাথরগুলির আকার রীতিমতো অবাক হয়ে দেখার মতো। প্রার্থনা জানানোর গর্ভস্থানটি এরূপ বিরাট আকারের একটি পাথর খুঁদে তৈরি করা হচ্ছিল যেটি আনতে ৫০০ থেকে ৬০০ লোকের একটানা ভাবে কাজ করতে হয়েছে পুরো পাঁচ বছর। আর, তার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে, যে ধরনের বাহনে ক'রে আনা হয়েছে তাতে এটিকে তুলে এই মন্দির পর্যন্ত নিয়ে আসতে। তাদের কাছে

শুনেছি, ১২০০টি ষাঁড় নাকি নিয়োগ করতে হয়েছিল এটিকে টানার জন্য। কেন এটি এখনো অসমাপ্ত পড়ে আছে পরে জানাব সেকথা। যদি সুসম্পূর্ণ করা হত তবে শুধু ভারতের নয় সারা এশিয়ার মহৎ স্থাপত্যকীর্তি রূপে পরিগণিত হতে পারত এটি।

শহরের যে দিকটি দিয়ে মসুলিপত্তম যাবার পথ, রয়েছে সেদিকে দুটি বিশাল জলাধার। প্রত্যেকটির পরিধি প্রায় এক কোশের মতো (হুসেন সাগর ও মীর আলম। প্রথমটির আয়তন ৮ বর্গমাইল। দ্বিতীয়টির পরিধি ৮ মাইল)। রাজার প্রমোদ ভ্রমণের জন্য রয়েছে তার বুকে কতক সুঅলংকৃত নৌকা। তীরে তার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর আবাস। দরবারের প্রধান কর্মচারীদের।

শহর থেকে তিন কোশ এগিয়ে দেখা পাওয়া যাবে একটি অতি সুন্দর-দর্শন মসজিদের। তারই প্রাঙ্গণ মাঝে রয়েছে গোলকুণ্ডার রাজাদের সমাধি-স্মারক। সমাগত দরিদ্রদের প্রতি দিন বিকাল চারটের সময় বিতরণ করা হয় এখানে পোলাও ও রুটি। সত্যিকারের দৃষ্টি-নন্দন কিছু দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, কোন উৎসবের দিনে এই সমাধি-স্মারকগুলি দর্শন করতে যাওয়া-ই উচিত হবে আপনার। ওই বিশেষ দিনগুলিতে মূল্যবান কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয় এগুলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি।

শহরটির শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটুকু যা লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে আমার ত শোনানো যাক একটুখানি। কোন বহিরাগত শহর-দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলে প্রথমেই সতর্কভাবে পরখ ক'রে দেখা হয় তার মালপত্র। দেখা হয়, যেসব সামগ্রী এ রাজ্যের শুল্ক-আয়ের প্রধান উৎস, যেমন লবণ, তামাক ইত্যাদি তা তার সঙ্গে আছে কিনা। এমন কি প্রবেশ অনুমতি দিতে এক বা দুদিন দেরি করাও হয় অনেক সময়ে। এ ব্যাপারে, ফটকের দায়িত্বে থাকা সাধারণ রক্ষীরা বিষয়টি প্রথমে উপস্থিত করেন তাদের বিভাগীয় প্রধানের কাছে। তিনি আবার লোক পাঠান দারোঘ-এর কাছে। প্রায়ই দেখা যায়, দারোঘ রয়েছেন কর্মব্যস্ত কিংবা গেছেন কর্মোপলক্ষে শহরের বাইরে। কখনো বা দেখা যায়, যে সৈনিকটিকে পাঠানো হয়েছে সে উপযুক্ত উপরি আদায়ের জন্য তার কাছে না গিয়েই বলছে দেখা পাওয়া গেল না তার। ফলে এসব ঝঞ্ঝাট পার হতে স্বভাবতই এক বা দুদিন দেরি হয়ে যায় নবাগতদের।

প্রাসাদের ঘের-দেয়ালের লাগোয়া উঁচু অলিন্দটি থেকে পুরো দেখা যায় সমুখের চতুষ্ক-ক্ষেত্রটিকে। আর আগেই বলেছি, রাজা এখান থেকেই দর্শন বা ন্যায়-

বিতরণ ক'রে থাকেন সাধারণকে। উৎসুক জনসাধারণ বা দর্শনপ্রার্থীরা সাধারণতঃ এসে ঠাঁই নেয় অলিন্দটির সামনাসামনি ওই চত্বরে। অলিন্দের ঠিক সুমুখ ভাগটি প্রাসাদ-দেয়াল পর্যন্ত দীর্ঘ তিন সারি দড়ি সংলগ্ন খোঁটা দিয়ে ঘেরা। রাজা আহ্বান না করলে কাউকেই তার কাছাকাছি হতে দেয়া হয় না ওই ঘের ডিঙিয়ে। দর্শন ও ন্যায়বিতরণের বিশেষ দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে অবশ্য সেখানে থাকে না ওই ঘেরগুলি। রাজার সুমুখে হাজির হবার জন্য একটি পথ রাখা হয়ে থাকে অলিন্দের কাছটিতে। তার দুপাশে দুজন সৈনিক একটি লম্বা দড়ির দুপ্রান্ত ধরে সেটি দিয়ে আগলে রাখে পথটিকে। কাছে আসার জন্য রাজা কাউকে আহ্বান জানালে দড়ি নামিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় পথ। একজন রাজ্য সচিব অলিন্দের নিচে চত্বর মধ্যে দাঁড়িয়ে আবেদন গ্রহণ ক'রে চলেন সাধারণের কাছ থেকে। পাঁচ-ছটি আবেদন জমা পড়লেই তা ভরে দেন অলিন্দ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া একটি থলির পেটে। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন খোজা সেটিকে দড়ি ধরে টেনে ওপরে তুলে নেয় তখন, পেশ করে রাজার কাছে।

প্রধান আমীররা পালা ক'রে প্রাসাদ পাহারা দেন প্রত্যেকে এক এক সপ্তাহ। এই পালা শুরু হয় সোমবার থেকে। আমীরদের মধ্যে কেউ কেউ পাঁচ থেকে ছ হাজার পর্যন্ত অশ্বারোহীর নায়ক। থাকে শহরের প্রান্ত ঘিরে তাঁবু গেড়ে সেখানেই। যখন প্রহরার পালা পড়ে তখন তাতে যোগ দিতে যায় নিজ নিজ আবাস থেকে। তবে যাত্রা শুরুর আগে একস্থানে জড়ো হয়ে সারিবদ্ধ ভাবে কদম ফেলে সেতু পার হয়ে এগিয়ে চলে প্রাসাদের দিকে। জমায়েত হয় গিয়ে অলিন্দের সামনে থাকা চত্বরে। যাবার বেলা সেনা মিছিলের পুরোভাগে থাকে ১০ থেকে ১২টি পর্যন্ত হাতি। এর সংখ্যা নির্ভর করে আমীরের পদমর্যাদার ওপর। কতকের পিঠে থাকে হাওদা বসানো। অন্যদের পিঠে শুধু যা লোক, বয়ে নিয়ে চলে পতাকার মতো কিছু একটা।

হাতির পিছে থাকে উট। জোড়ায় জোড়ায়। তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত কখনো। প্রত্যেকের পিঠে জিনের ওপর একটি ক'রে ছোট সরু কামান (কালভেরিন)। পুচ্ছবন্ধের কাছে মশাল হাতে একজন ক'রে গোলন্দাজ। পরনে তার অনেকটা পাতলুনের মতো পা থেকে মাথা পর্যন্ত দীর্ঘ চামড়ার পোশাক।

এরপর থাকে শকট। এগুলিকে ঘিরে হেঁটে এগিয়ে চলে কর্মীর দল। পিছে ভারবাহী ঘোড়ার সারি। তারপর দেখা যায় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা আমীরকে। তার ঠিক আগে আগে দশ-বারো জন নর্তকী। এরা সাধারণত সেতুর

শেষপ্রান্তে অপেক্ষা ক'রে চলে আমীরের আগমনের। আমীর সসৈন্যে সেতুপার হয়ে এলে তার পুরোভাগে নেচে-কুঁদে এগিয়ে চলে সেই চতুষ্ক পর্যন্ত। আমীরের পর সারবন্দী হয়ে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এই শোভাযাত্রা বেশ একটি দেখার মতো জিনিস। এমন এক ধরনের জাঁক-জমকের ভাব আছে যা দেখতে বেশ মজা লাগতো আমার। যখনই আমি একটানা তিন চারমাস ভাগনগরে থাকতাম, রাজপথের ধারে থাকা আমার বাসস্থান থেকে উপভোগ করতাম প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে প্রহরার পালাবদলের সময় অনুষ্ঠিত এই শোভাযাত্রার দৃশ্য।

এই সব সৈন্যদের পরনে রয়েছে সর্বসাকুল্যে তিন কি চার এল (গজ) কাপড়। এ দিয়ে ঢাকে তারা শুধু যা তাদের নিম্নাঙ্গটি। মাথার চুলগুলি সব লম্বা, তানুর ওপর চূড়া ক'রে বেঁধে রাখে মেয়েদের মতো। মাথার উষ্ণীষ বলতে মাত্র এক টুকরো তেকোণা কাপড়। তার একটি কোণ থাকে মাথার মাঝখানটিতে, বাকি দুটি কোণ ঘাড়ের কাছে একসঙ্গে গিট দিয়ে বাঁধা। পারসিকদের মতো বাঁকানো তলোয়ার ব্যবহার করে না এরা। ব্যবহার করে সুইজারল্যাণ্ডবাসীদের মতো চওড়া ধরনের তলোয়ার, যা কাটা ও বেঁধা দুটিতেই সমান কুশলী। কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয় এটিকে। পলতে বন্দুকের নলীটিও এদের আমাদের তুলনায় মজবুত। এতে ব্যবহৃত লোহা আমাদের তুলনায় উচ্চ মানের ও অধিক বিশুদ্ধ। ফলে নলীগুলি ফাটে না মোটেই। অশ্বারোহীদের কাছে থাকে সাধারণত ধনুক তীর, ঢাল এবং গদা। পরণে শিরস্ত্রাণ এবং বর্ম। বর্মটি কাঁধের ওপর দিয়ে শিরস্ত্রাণের পিছন দিকে আটকানো।

শহর, শহরতলি এবং দ্বিতীয় এক শহর তুল্য দুর্গ এলাকা মধ্যে অসংখ্য রূপোপজীবী। অনুমান করা হয়, দারোঘ এর খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে কম করেও কুড়ি হাজার নাম। নাম নথিভুক্ত না ক'রে কাউকেই নামতে দেয়া হয় না এ জীবিকায়। রাজা কোন কর নেন না এদের কাছে। শুধু প্রত্যেক শুক্রবারে মালিকান সহ এদের কতককে উপস্থিত হতে হয় অলিন্দের সুমুখে থাকা চতুষ্কটিতে। রাজা উপস্থিত থাকলে দেখাতে হয় তাকে নাচ।

সায়াহ্নের স্নিগ্ধ পরিবেশ ঘনিয়ে এলে দেখতে পাবেন দাঁড়িয়ে আছে এরা আপন আপন গৃহের দোরগোড়ায়। এই গৃহগুলির অধিকাংশই ছোট ছোট কুঁড়েঘর। রাত নেমে এলে আমন্ত্রণের সংকেত স্বরূপ প্রতিটি কুঁড়েতে জ্বালানো হয় একটি ক'রে মোম বা দীপশিখা। যে সব দোকানে তাড়ি বেচা হয় সেগুলিও খোলা হয় এ সময়ে। এক ধরনের গাছ থেকে মেলা পানীয় এটি, আমাদের নতুন

মদের মতোই মিষ্টি। প্রায় পাঁচ-ছ কোশ দূর অঞ্চল থেকে চামড়ার থলিতে পুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনা হয় এ পানীয়। পিঠের দু পাশে দুটি থলি নিয়ে জোর কদমেই হাঁটে ঘোড়াগুলো। আর দৈনিক এরকম পাঁচ থেকে ছ শো ঘোড়া প্রবেশ করে শহরে। এর ওপর আরোপিত শুল্ক থেকে মোটা আয় হয় রাজ্যের। প্রধানতঃ এই কারণেই রূপোপজীবীর পেশা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এত রমণীকে। কেননা, এদের জন্যেই তাড়ির এত চাহিদা। আর সেই কারণে এর দোকানগুলিও এদের বসতির ধারে কাছে।

এই মোহিনীর দল এত তন্বী, এদের দেহ এত অনায়াস ভঙ্গিম যে অবাক হয়ে যেতে হয় তা দেখলে। রাজা একবার মসুলিপত্তম গেলে এদের নজনের একটি দল হাতির আকার ধারণ ক'রে শহর মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। চা'রজনে হয়েছিল হাতির চার পা, চারজনে দেহ ও একজন শুঁড়।

কি মেয়ে কি পুরুষ গোলকুণ্ডার সব অধিবাসীদের দেহই সমানুপাতিক ও সুগঠিত। গায়ের রঙও ফরসা। তবে কৃষক শ্রেণীর জনসাধারণের গায়ের রঙ কিছুটা কালচে।

গোলকুণ্ডার বর্তমান রাজার নাম আবদুল্লা কুতব শাহ। জহাঙ্গীরের পিতা আকবর যখন দিল্লীর সম্রাট, মুঘল অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল তখন দক্ষিণে নরবেদার (প্রকৃতপক্ষে বেদার বা বিদার) পর্যন্ত। সে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটি দক্ষিণ থেকে বয়ে এসে মিলিত হয়েছে গঙ্গা নদীর সঙ্গে। এ নদীটিই ছিল সে সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য ও নরসিংহ রাজ্যের (বিজয় নগর) মধ্য সীমানা (এ নদীটি গোদাবরী। এটি গঙ্গায় মিশেছে বলে মনে করা হত এককালে। কিন্তু আসলে এটি মিশেছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে)। নরসিংহ রাজ্য বিস্তৃত ছিল তখন এই নদীকূল থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত। ওই অঞ্চলের অন্যান্য রাজারা ছিলেন তারই অধীন। ভারতে যারা তৈমুরলঙের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করেন তাদের সাথে নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ চলত এই রাজা ও তার পূর্বপুরুষদের। এরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে আকবরের সাথে যুদ্ধ কালে এখানকার শেষ রাজা চার সেনাপতি চালিত চারটি আঞ্চলিক বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রণাঙ্গনে। এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী ছিল যে অংশ নিয়ে বর্তমান গোলকুণ্ডা রাজ্য গঠিত সেই অঞ্চলটি। দ্বিতীয় ছিল বিজাপুর অঞ্চল। তৃতীয় দৌলতাবাদ প্রদেশ এলাকা। চতুর্থ বুরহানপুর এলাকা। নরসিংহের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে এই চার অঞ্চলের সেনাপতিরা আপন আপন অঞ্চলে

প্রতিষ্ঠা করলেন আপন আপন আধিপত্য। রাজা নিজে বিগ্রহপূজক হলেও এই সেনাপতিরা চারজনেই ছিলেন মুসলমান। যিনি গোলকুণ্ডায় রাজ্যস্থাপনা করেন তিনি ছিলেন আলীর সম্প্রদায়ভুক্ত (অর্থাৎ শীয়া)। [আকবরের আমলে ঘটেনি এ ঘটনা। ঘটেছিল মাহমুদ শাহ বহমনীর আমলে (১৪৮২—১৫.৮)। এ সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে জন্ম দিল পাঁচটি রাজ্যের। ইমাদশাহী বংশের বেরার, নিজামশাহী বংশের আহমদনগর, আদিলশাহী বংশের বিজাপুর, বরীদশাহী বংশের বিদার ও কুতবশাহী বংশের গোলকুণ্ডা।]

গোলকুণ্ডার রাজাই যে সব থেকে শক্তিশালী ছিলেন আগেই বলেছি সেকথা। নরসিংহ রাজ্যের শেষ রাজার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই মুঘলদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি বিপুলভাবে। এরপর আর কোন অন্তরায় রইল না তার স্বাধীন স্থিতির। পরবর্তীকালে আকবরের পুত্র জহাঙ্গীর জয় করলেন বুরহানপুরের নতুন রাজার রাজ্য। জহাঙ্গীরের পুত্র শাহ-জহান অধিকার করলেন দৌলতাবাদের রাজার রাজ্য। শাহ-জহানের পুত্র ঔরঙজেব দখলে নিয়ে এলেন বিজাপুরের একাংশ। কি জহাঙ্গীর, কি শাহ-জহান কেউই করলেন না গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ। মুঘলদের বার্ষিক দুই লক্ষ প্যাগোডা (বা মন্দির ছাপ মোহর) কর দেবেন এ শর্তে অটুট রাখা হল তার অস্তিত্ব। এই প্যাগোডার প্রতিটি আমাদের ৬ থেকে ৭½ লিভরের (=৪ থেকে ৫ টাকার) সমান সাধারণত। গঙ্গার দক্ষিণ দিককার এই বিশাল ভূ-অঞ্চলের সব থেকে শক্তিশালী রাজা বর্তমানে ভেলো (ভেল্লোর=বিজয়নগর) অধিপতি। কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত তার অধিকার। নরসিংহ রাজ্যের একাংশও তার রাজ্য মধ্যে এখন। কিন্তু তার রাজ্যের সঙ্গে বাইরের ব্যবসা-বাণিজ্য নেই বলে সেরূপ খ্যাত নন তিনি, বিদেশীরা যায় না বড় একটা সেখানে।

[* বুরহানপুর বা খান্দেশের ক্ষেত্রে পুরো ঠিক নয় এ বিবরণ। ১৩৮৮ থেকে ১৬০১ পর্যন্ত ফারুকী বংশের ১১ জন রাজা রাজত্ব করেন এখানে। তারপর আকবর অধিকার ক'রে নেন অসীরগড়। দৌলতাবাদ বা দেবগিরি রাজ্য অধিকার করেন শাহ-জহানের সেনাপতি মহব্বৎ খান ১৬৩৩ অব্দে। ১৬৮৬ পর্যন্ত ঔরঙজেব বিজাপুর রাজ্য পুরোপুরি অধিকার ক'রে না নিলেও, এর তিরিশ বছর আগেই আনেন তার একাংশ আপন দখলে।]

গোলকুণ্ডার বর্তমান রাজার নেই কোন পুত্র। শুধু বা তিন কন্যা। বিয়ে হয়ে গেছে তিন জনেরই।

জ্যেষ্ঠ কন্যার সাথে বিয়ে হয়েছে মক্কার প্রধান শেইখের এক আত্মীয়ের। গোলকুণ্ডা রাজ্যে তিনি বিরাট যশস্বী হয়ে উঠেছেন, তিনিই বলতে গেলে বর্তমানে এখানকার সর্বেসর্বা, শাসন করেন এ রাজ্য। যে সময়ে ঔরঙজেব ও তার পুত্র ভাগনগর অভিযান ক'রে প্রবেশ করেন শহর মধ্যে, রাজা গিয়ে আশ্রয় নেন গোলকুণ্ডা দুর্গে। তারপর মুঘলদের হাতে দুর্গের চাবি তুলে দিয়ে আত্ম-সমর্পণে উদ্যোগী হলে ইনিই বাধা দিলেন রাজাকে। বললেন, রাজা ঐরূপ করলে তিনিই হত্যা করবেন তাকে। তার এই সাহসিক পদক্ষেপের ফলে অটুট রইল রাজ্য। সেই থেকে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তিনি, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই শুরু করলেন রাজা তার পরামর্শ নিতে। • অতএব, শুধু রাজার জামাই হিসাবে নয়, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই বর্তমানে তিনি দরবারের সব থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি। ভাগনগরের বিশাল মন্দিরটি (মক্কা মসজিদ) অসমাপ্ত ফেলে রাখতে বাধ্য করেছেন তিনিই। ভয় দেখিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করলে বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে এ রাজ্যকে।

রাজার দ্বিতীয় কন্যাকে অর্পণ করা হয়েছে ঔরঙজেবের প্রথম পুত্র সুলতান মহম্মদের হাতে। এই বিয়ের পশ্চাৎ ইতিহাসটি এ রকম :

গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীর জুমলা। রাজ্যমধ্যে সুস্থিত হতে প্রচুর সাহায্য ক'রেছিলেন তিনি রাজাকে। একবার মীর জুমলা গেলেন বাঙলায়, সেখানকার কতক রাজাকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দেয়া সমস্যার সমাধান করতে (প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে, ১৬৬০ অব্দে, ঔরঙজেব তাকে পাঠান বাঙলা সুবার কতক বিদ্রোহী জমিদারকে এবং বিশেষভাবে আসাম ও আরাকান অঞ্চলের কতক বিদ্রোহী জমিদারকে দমনের জন্য)। মীর জুমলা এ সময়ে চলিত প্রথামতো আপন পত্নী ও সন্তানদের রাজার কাছে রেখে গেলেন আপন জামিন বা আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে। তার বহু কন্যা থাকলেও পুত্র ছিল মাত্র একটি (মহম্মদ আমিন)। অনেক অনুগামী ছিল তার, উন্নীত হয়েছিলেন দরবারের এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে। কৃতি ও সম্পদ দুইয়ের দরুনই মীর জুমলা হয়ে উঠেছিলেন বহু লোকের চক্ষুশূল। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল এবার তারা, সচেষ্ট হল তার প্রতি রাজাকে বিরূপ ক'রে তুলে তার পতন ডেকে আনতে। রাজাকে প্রভাবিত করতে সফল হলেন তারা। রাজা এদের ওপরেই ভার দিলেন তাকে বিষপ্রয়োগ ক'রে মারার জন্য। কিন্তু তিন চার বার চেষ্টা করেও তাতে ব্যর্থ হল তারা। ঘটনার কথা পৌঁছল এসে মীর জুমলার ছেলের

কানে। পিতাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখে জানালেন তিনি। পিতা মীর জুমলা তার প্রতি কি নির্দেশ পাঠালেন জানা নেই, কিন্তু সেই পত্র পেয়ে উপস্থিত হলেন তিনি রাজার কাছে। দৃঢ় ভাবে মুখোমুখি হলেন রাজার, স্মরণ করিয়ে দিলেন তার পিতা রাজার যে সেবা করেছেন এবং তার সাহায্য ছাড়া তিনি যে সিংহাসনে আসীন হতে পারতেন না সেই অতীত কথা। মেজাজ হারিয়ে মীর জুমলার পুত্র এরূপ রূঢ় ভঙ্গীতে এসব শোনালেন তাকে যে তার ঔদ্ধত্য দেখে রাগে জলে উঠলেন রাজা। উপস্থিত আমীররাও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ দু ঘা দিলেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা বন্দী করার আদেশ দিলেন তার মা ও বোনদের। করা হল তাই। মীর জুমলার কাছে এ খবর পৌঁছতেই বেজায় ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। সেনাবাহিনী তার হাতে থাকায় এবং তাদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হওয়ার দরুন সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন সেই বিশেষ সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাজার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। আগেই বলেছি, গাঙ্গেয় অঞ্চলের কতক রাজাকে বশ্যতায় আনার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল বাংলায়। শাহ-জহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা তখন বাংলার শাসনকর্তা। অতএব রাজার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিলেন তিনি তার সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত। দিলেন তার কাছে পত্র। লিখলেন, যদি তিনি তার সঙ্গে যোগ দেন তাহলে সমগ্র গোলকুণ্ডা রাজ্য জয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের প্রয়োজন তা শাহজাদাকে যুগিয়ে দেবেন তিনি। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন বিস্তৃতত্র ক'রে তোলার এ সুযোগ মোটেই উচিত নয় তার হাতছাড়া করা। কিন্তু সুলতান সুজা সাড়া দিলেন না এতে। জবাবে লিখলেন: যে লোক আপন রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তার কথার ওপর আদপে বিশ্বাস স্থাপনা করতে রাজী নন তিনি। কেননা, নিজের প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে অচেনা সুলতানকে তিনি দলে ভেড়াতে চাইছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন এ ক্ষেত্রে তিনি অতি সহজে তার সাথেও। এর পর ঔরঙ্গজেবের দিকে ঝুঁকলেন মীর জুমলা, দিলেন তার কাছে এই প্রস্তাব। তিনি তখন বুরহানপুরের প্রশাসক। ভাইয়ের মতো খুঁতখুতানি না দেখিয়ে রাজী হয়ে গেলেন তিনি মীর জুমলার প্রস্তাবে।

মীর জুমলা এবার আপন সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন ভাগনগরের দিকে। ঔরঙ্গজেবও দ্রুতগতিতে দাক্ষিণাত্য থেকে এগিয়ে এলেন তার বাহিনী নিয়ে। রাজা কোনরূপ প্রতিরোধ আয়োজন গড়ে তোলার আগেই উভয় বাহিনী মিলিতভাবে উপস্থিত হল ভাগনগরের ফটকের কাছে। কোনমতে গোলকুণ্ডা

দুর্গ মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন রাজা। ভাগনগর লুটপাট ও সেখানকার রাজপ্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী অপসারণের পর দুর্গ অবরোধ করলেন ঔরঙজেব। জটিল পরিস্থিতির নিদারুণ চাপের মধ্যে পড়ে রাজা ধরে নিলেন অতি অল্পকালের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। ঝঞ্ঝাময় পরিবেশকে শান্ত ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি তখন মীর জুমলার পত্নী ও সন্তানদের মুক্তি দিয়ে সসম্মানে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। ইওরোপের মতো ভারতেও নৈতিকতা ও উদারতা বর্তমান। এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ মেলে গোলকুণ্ডার রাজার কার্যকলাপ থেকে। দুর্গ অবরোধের দিন কয়েক পরেই ঔরঙজেব যখন হাতিতে চড়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে ব্যস্ত, এ সময়ে দুর্গের এক গোলন্দাজের লক্ষ্য সীমানার মধ্যে এলেন তিনি। রাজা তখন দাঁড়িয়ে আছেন বুরুজের ওপর। গোলন্দাজ তাকে জানাল: জাঁহাপনার আদেশ পেলেই আমি কামানের গোলার ঘায়ে উড়িয়ে দিতে পারি শাহজাদাকে। সঙ্গে সঙ্গে তোপ দাগার জন্য এগিয়ে গেল সে। কিন্তু রাজা তাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলে নিষেধ করলেন এরকমটি করতে। বললেন: রাজাদের জীবনের প্রতি সমীহ দেখান কর্তব্য। সুদক্ষ গোলন্দাজটি মান্য করল তার কথা। সে তখন তোপ দাগল তার সেনাপতিকে লক্ষ্য ক'রে। সে ছিল ঔরঙজেব থেকে কিছুটা এগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাল সে গোলার ঘায়ে (ঔরঙজেবের প্রধান বখশী মীর ফজল-উল্লা বুখারীর ছেলে মীর আসদ-উল্লা-বুখারী)। সমগ্র বাহিনী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তার মৃত্যুতে। যে আক্রমণ হানার জন্য এ সময় প্রস্তুত হচ্ছিল বন্ধ ক'রে দেয়া হল তা। চার হাজার অশ্বারোহীর এক চলমান বাহিনী নিয়ে গোলকুণ্ডার রাজার এক সেনাপতি আবদুল জব্বর বেগ খুব কাছেই ছিলেন এ সময়ে। তার কাছে খবর পৌঁছাল, সেনাপতির সহসা মৃত্যুতে শত্রু সেনাদল এখন বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এই পরম সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করার জন্য হলেন তিনি তৎপর। পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। হেরে গিয়ে পিছু হটতে সুরু করলে শত্রুসেনারা। তিনিও সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল বিক্রমে পিছু তাড়া করলেন চার-পাঁচ কোশ অব্দি।

এই সেনাপতির মৃত্যু হওয়ার সামান্য কয়েকদিন পূর্বে গোলকুণ্ডার রাজা বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্য করলেন, পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে আবার। টান ধরেছে দুর্গের খাদ্য সরবরাহে। উদ্যোগ করলেন তিনি তখন দুর্গের চাবি মুঘলদের হাতে তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য। আগেই বলেছি, এমন সময় জামাই

মীর আহমদ তা ছিনিয়ে নিলেন তার কাছ থেকে। গর্জে উঠে বললেন, তিনি যদি আবার এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হন তা হলে তাকে হত্যা করবে সে। এরপর কিছুদিন নিজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন সেনাদলের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে শেষমেশ বাধ্য হলেন ঔরংজেব অবরোধ তুলে নিতে। ইতিমধ্যে যেমন মুঘল বাহিনী বিপুল উদ্যমে বার বার দুর্গ আক্রমণ করল, রাজার সেনারাও তেমনি অপার বিক্রমে প্রতিরোধ করল তাদের। এদিকে মীর জুমলাও খোলাখুলি ভাবে মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে তখন আর চাইছিলেন না যে কোন চরম পদক্ষেপ নেয় ঔরংজেব। আসলে, তার মনের কোণে সঞ্চয় হয়ে ছিল রাজার জন্য কিছু স্নেহ ও ভালবাসা। কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে রচনা করলেন তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার পরিবেশ। গোলকুণ্ডার রাজা এক সময়ে যথেষ্ট উপকার করেছিলেন শাহ-জহানের। তিনি যখন বড় ভাইয়ের সাথে একত্রে পিতা সম্রাট জহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যুদ্ধে হেরে যান, তখন শুভ সুধ্যায়ীদের পরামর্শে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই গোলকুণ্ডার রাজার কাছে। রাজাও সমাদরের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাকে সে সময়ে। অন্যদিকে বড ভাই পড়লেন জহাঙ্গীরের হাতের মুঠোয়। খুবলে নেয়া হল তার দুই চোখ। (শাহ-জহানের এই বিদ্রোহ কাল ১৬২৩।) যাই হোক, এই সময় থেকে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল রাজা ও শাহ-জহান মধ্যে। শাহ-জহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কোন ছল কিংবা অজুহাতেই তিনি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কোনদিন। তাই মীর জুমলা জানতেন যে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছন মোটেই অসম্ভব হবে না দুই বন্ধুর মধ্যে। মুখ রক্ষার জন্য ঔরংজেব হটে যেতে ইচ্ছুক না থাকলেও এর ফলে সেও পাবে সসম্মানে বিদায় নেয়ার সুযোগ। অতএব গোপনে তিনি দুজনকেই জানালেন তার পরিকল্পনার কথা। রাজাকে তিনি প্রভাবিত করলেন যাতে তিনিই শাহ-জহানের কাছে চিঠি লেখেন প্রথমে। তার স্বার্থ রক্ষার ভার পুরোপুরি সম্রাটের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তার ও ঔরংজেবের মধ্যে মধ্যস্থতার ভার সবিনয়ে ছেড়ে দেন তার ওপরে। এবং কথা দেন, সম্রাট শান্তি চুক্তির শর্তাদির বয়ান যা-ই করুন না কেন তা-ই মেনে নিয়ে তিনি স্বাক্ষর দেবেন তাতে। সমান্তরালভাবে মীর জুমলা শাহ-জহানকেও প্রভাবিত করলেন যাতে তিনি রাজার ওই পত্রে সাড়া দিয়ে তার পক্ষ থেকে দেন ঔরংজেবের প্রথম পুত্র সুলতান মহম্মদের সঙ্গে রাজার দ্বিতীয় কন্যার বিয়ের প্রস্তাব। তবে শর্ত থাকবে, রাজার মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয় জামাই-ই

হবেন তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী। এ প্রস্তাবে রাজী হতে, তৈরি হল চুক্তি পত্র, তাতে স্বাক্ষর করলেন দুই রাজা। হল অতি ধুমধামের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত (এই রাজকুমারীর নাম পাদশাহ বিবি)।

মীর জুমলা এরপর ছেড়ে দিলেন গোলকুণ্ডার রাজার চাকুরি। চলে গেলেন বুরহানপুরে ঔরঙ্গজেবের কাছে। অল্পকাল পরেই শাহ-জহান উন্নীত করলেন তাকে রাজ্যের প্রথম ওয়াজীর ও প্রধান সেনাপতি বা খান-খানান পদে। সুলতান সুজাকে পরাস্ত ক'রে সিংহাসন লাভে ঔরঙ্গজেবকে প্রখর ভাবে সাহায্য করেন মীর জুমলা। তিনি ছিলেন অতি চতুর ও বুদ্ধিমান, সমরনীতি ও রাজনীতি দুটিতেই ছিলেন সমানভাবে সুদক্ষ। তার সঙ্গে বারকয়েক কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছে আমার। তার কাছে উপস্থাপিত অনুরোধগুলি রক্ষা করার জন্য তিনি যেরূপ দৃঢ়তা ও তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে সেজন্য যেরূপ দ্রুত নির্দেশ পাঠিয়েছেন তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। ঠিক যেন এ সময়ে এই একটি ছাড়া করার ছিল না তার আর কোন কিছু কাজ। [অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও সমান সুদক্ষ ছিলেন মীর জুমলা। থিভেনট জানিয়েছেন, ২০ মণ হীরক সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। গোলকুণ্ডার সেনা-প্রধান থাকাকালে বিজাপুরের সাথে যোগ দিয়ে বিশনগরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এ সম্পদ। বার্নিয়ার জানিয়েছেন, তিনি অসংখ্য উপায়ে অর্জন করেছিলেন অর্থ। গোলকুণ্ডার হীরক খনিগুলিকে তিনি একাই ইজারা নিয়েছিলেন নানা বেনামীতে। অকল্পনীয় পরিশ্রম সহকারে করা হত সেগুলি থেকে হীরক সংগ্রহ ও তার রূপবিন্যাস। ফলে মীর জুমলার ধন-সম্পদের কাহিনী বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল জনসাধারণের মধ্যে।]

গোলকুণ্ডার তৃতীয় রাজকন্যার বাগদান হয়েছিল মক্কার অপর এক শেইখ সুলতান সঈদের সঙ্গে। ব্যাপারটি এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে স্থির করা হয়েছিল বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু সেনা-প্রধান আবদুল জব্বর বেগ আরো ছজন আমীরকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন তার মত পরিবর্তন করানোর জন্য। করালেনও তা। ফলে ভেঙে গেল সে সম্বন্ধ। রাজকন্যার বিয়ে দেয়া হল রাজার এক সম্পর্কিত ভাই মীর্জা আবদুল হসনের সাথে। দুটি পুত্র হয়েছে তাদের। এর ফলে ঔরঙ্গজেবের ছেলে, রাজার দ্বিতীয় জামাই সুলতান মহম্মদের গোলকুণ্ডার সিংহাসনের ওপর দাবি নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি। তাকে অবশ্য এখন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ক'রে রেখেছেন ঔরঙ্গজেব। পিতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ক'রে জেঠা

সুলতান সুজাকে মদত দেয়ার জন্যই তার এই শাস্তি। মীর্জা আবদুল হসন যদি লম্পট না হতেন তাহলে অনেককাল আগেই হয়ে যেত এ বিয়ে। ওই কারণেই তার ওপর কোন আস্থা কি আকর্ষণ ছিল না রাজার। তবে বিয়ের পর মীর্জা কিন্তু পালটে গেছেন পুরোপুরি।

বর্তমানে গোলকুণ্ডার রাজা তেমন আর ভয় করেন না মুঘলদের। কেননা, তার রাজ্যের আয় পুরোটাই থেকে যায় রাজ্য মধ্যে এবং এর দরুন জমা করেছেন তিনি যুদ্ধ চালানোর মতো প্রচুর অর্থ। এছাড়া আলীর সম্প্রদায়ের প্রতি (শীয়া) তিনি গভীর ভাবে অনুরক্ত। এজন্য প্রতি বছর ভাগ্যের সন্ধানে যে অসংখ্য পারসিক ভারতবর্ষে আসে তারা মুঘল রাজ্য অপেক্ষা গোলকুণ্ডার রাজার কাছে আশ্রয় নেয়াটাই পছন্দ করে বেশি। বিজাপুরের রাজার বেলাও (দ্বিতীয় আলী) এই একই কথা। তার মহিষী, গোলকুণ্ডার রাজার বোন তাকেও সযত্নে অনুরক্ত ক'রে তুলেছেন আলীর সম্প্রদায়ের প্রতি। ফলে বহু পারসিক তার কাছেও যায় চাকুরি নেয়ার জন্য।

এগারো ।। গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তম যাবার পথ-পরিচয়

গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তমের দূরত্ব সোজাপথ ধরে গেলে ১০০ কোশের মতো। তবে যে হীরা খনি এলাকাকে পারসিক ভাষায় কৌলোর (আধুনিক নাম কোল্লুর বা কোলার) এবং ভারতীয় ভাষায় গনি (খনি, এটি প্রকৃতপক্ষে কান-ই বা Mine of-এর স্থানীয় রূপান্তর) বলা হয় সে অঞ্চল ঘুরে গেলে পার হতে হবে আপনাকে ১১২ কোশ। আমি যেতাম সাধারণত শেষোক্ত পথ ধরেই।

গোলকুণ্ডার চার কোশ পর তেনারা (অতেনারা)। এটি একটি চমৎকার জায়গা। বড় বাগান সহ চারটি অতি ভালো বাড়ি রয়েছে এখানে। তার মধ্যে যে বাড়িটি রাজপথের বাঁ দিকে সেটিই আবার সব থেকে সুদর্শন। সম্ভ্রান্ত পর্যটকেরা এখানেই ঠাঁই নিতে অভ্যস্ত। কোন পদস্থ ব্যক্তি যদি গৃহমধ্যে বাস করতে না চান, বাগানে তাঁবু খাটিয়ে পারেন সেখানে থাকতে। তবে পর্যটকেরা বাস করতে পারে ওই চারটি মধ্যে তিনটি বাড়িতেই বা। যে বাড়িটি সব থেকে

সেরা ও মনোরম সেটি রানীর জন্য সংরক্ষিত। যখন তিনি সেখানে থাকেন না তখন দর্শকরা ইচ্ছা করলে ঘুরে দেখতে পারে তার ভেতরটা। বাড়িটির লাগোয়া কতক ছোট ছোট কুঠুরী বর্তমান। গরিব পর্যটকদের জন্য উদ্দিষ্ট এগুলি। এখানে প্রতিদিন বিকালে রুটি, ভাত ও রান্না করা তরিতরকারী বিতরণ করা হয়ে থাকে তাদের। বিগ্রহ পূজকরা অপরের রান্না করা খাদ্য খায় না বলে তাদের রুটি তৈরির জন্য ময়দা ও সামান্য ঘি দেয়া হয়ে থাকে। কেকের মত রুটিগুলিকে সেঁকে নেয় তারা, তারপর তার তুপিঠে মাখিয়ে নেয় সেই ঘি।

তেনারার ১২ কোশ পর ইয়াতেনগর (হয়াতনগর)। তার ১২ কোশ পর পতেঙ্গি (পন্তঙ্গি)। তার ১৪ কোশ পর পেঙ্গেয়ুল (পঙ্গল)। আরো ১২ কোশ পর নগেলপর (নগলপাদ)। তার ১১ কোশ পর লকবরোন (লকুয়ারোন)। এখান থেকেই যেতে হয় কৌলৌর বা গনি।

লকবরোন থেকে কৌলৌর যাবার সড়ক পথটির অধিকাংশই পাথুরে। বিশেষ ক'রে কৌলৌরের দিকটি। এজন্য দু'তিন জায়গায় গাড়িটিকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে খুলে নিয়ে। কেননা, গাড়িটিকে চটপট খোলা যায় বলে সেটিই এক্ষেত্রে সহজ ও সরল পন্থা। পাথরের মাঝে মধ্যে যেখানেই একটু সরেস মাটি পেয়েছে সেখানেই মাথা তুলেছে একটি ক'রে অমলতাস গাছ। এখানে যে অমলতাস উৎপন্ন হয় তা ভারতের সেরা ও অতি শক্তিশালী রেচক ঔষধ। পথে যেতে যেতে এগুলি খাওয়ার ফলে আমার অনুচরদের ওপর তার যে প্রতিক্রিয়া ঘটল তা থেকেই প্রমাণ পেলাম এর। লম্বালম্বিভাবে কৌলৌর শহরের পাশ বরাবর চলে গেছে একটি বড় নদী (কৃষ্ণা)। মসুলিপত্তমের কাছ দিয়ে মিশেছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে।

কৌলৌর বা গনি থেকে ১২ কোশ গেলে কহকলি (কয়লাপুদি ?)। তার ৬ কোশ পর বেজৌর (বেজওয়াডা)। বেজৌরের কাছেই আবার পার হতে হয় ওই বড় নদীটিকে।

বেজৌরের ৬ কোশ পর ঔহির (উয়ুঁক)। তার ৪ কোশ পর নিলিমোর (পামরুক ?)। ঔহির ও নিলিমোরের প্রায় মধ্যপথে পড়বে একটি বড় নদী। নৌকা নেই বলে পার হতে হয় সেটিকে ভেলায় ক'রে। নিলিমোরের ৬ কোশ পরে মিলমোল (নিড়ুমোলু)। তার ৪ কোশ পরেই মসলিপত্তন (মসুলিপত্তম)।

মসুলিপত্তম বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা একটি শহর। বাড়িগুলি সব কাঠের এবং একটি থেকে অন্যটি ছাড়া ছাড়া। সমুদ্র কূলের এই স্থানটি একমাত্র এর বন্দরটির

জন্যই বিখ্যাত। সমগ্র বঙ্গোপসাগর কূলের সেরা বন্দর এটি। একমাত্র এখান থেকেই পেগু, শ্যাম, আরাকান, বাঙলা, কোচিন-চীন, মক্কা ও হরমুজ এবং ম্যাডাগাস্কার, সুমাত্রা ও ম্যানিলা দ্বীপ প্রভৃতি সব দেশে যাতায়াত করে জাহাজ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোন চাকা-অলা গাড়িই চলাচল করে না গোলকুণ্ডা ও মসুলি-পত্তমের মাঝে। উঁচু পাহাড়মালা, জলাধার, নদী এসবের জন্য সড়কপথ অতি বিচ্ছিন্ন। রয়েছে এছাড়া আবার অনেকগুলি সংকীর্ণ ও দুরারোহ গিরিপথ। চরম ঝঞ্ঝাট পোয়ানোর জন্য তৈরি থাকলে তবেই একটি ছোট শকটকে এপথ দিয়ে নেয়া সম্ভব। হীরা খনি এলাকায় একটি গাড়িকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু বারকয়েক সেটিকে খুলে টুকরো ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে পথে। গোলকুণ্ডা এবং কুমারিকা অন্তরীপ মধ্যবর্তী সড়কপথের পরিস্থিতিও এইরকম। এই অঞ্চলগুলিতে কোন ভারবাহী শকট নেই। মানুষ, পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মালপত্র বয়ে নেয়ার জন্য পাবেন আপনি শুধু ষাঁড় ও মালবাহী ঘোড়া। তবে গাড়ির পরিবর্তরূপে পাবেন আপনি এখানে অবশিষ্ট ভারতের তুলনায় অনেক বড় আকারের পালকী। এতে চড়লে পাবেন আপনি অনেক বেশি আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। এগুলিতে ক'রে কাউকে যেমন অধিকতর স্বচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি নেয়া হয় অধিকতর দ্রুতগতিতেও। তাছাড়া খরচও পড়ে অন্যান্য স্থানের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম।

বারো ॥ সুরাট থেকে গোয়া এবং গোয়া থেকে বিজাপুর হয়ে গোলকুণ্ডা যাবার পথ-পরিচয়

পর্যটকেরা আংশিক স্থলপথ ও আংশিক সাগরপথ ধরে যেতে পারেন চাইলে। তবে স্থলপথ অতি খারাপ। বিশেষ ক'রে দমন থেকে রাজাপুর অব্দি। অধিকাংশ পর্যটকই অলমাদিয়ের (আরবী অল-মাদিয়া—খেয়া নৌকা) ধরনের দাঁড়টানা নৌকা ভাড়া ক'রে তাতে চড়ে সাগর পথ ধরে যাওয়াটাই পছন্দ করেন তাই। এক স্থান থেকে আরেক স্থান হয়ে হয়ে এভাবে গোয়া যান তারা। পথে অবশ্য ভারতীয় জলদস্যু মালাবারীদের খপ্পরে পড়ার ভয় রয়েছে খুব। এ সত্ত্বেও এ ধরনের ভ্রমণই তাদের কাছে আকর্ষণীয়।

সুরাট থেকে গোয়া যাবার পথ কোশের পরিবর্তে গণনা করা হয়ে থাকে

গোশের ভিত্তিতে। এক গোশ আমাদের চার লীগের প্রায় সমান (অতএব চার সাধারণ কোশের কিছু কমবেশি)।

সুরাট থেকে দমন ৭ গোশ। সেখান থেকে বসাইন ১০ গোশ। তারপর চউল ৯ গোশ। তারপর দাবউল (দাভোল) ১২ গোশ।' তারপর রেজাপুর (রাজাপুর) ১০ গোশ। সেখান থেকে সিনগ্রেল (ভেনগুরলা) ৯ গোশ। গোয়া তারপর ৪ গোশ। তার মানে সুরাট থেকে গোয়া ৬১ গোশ।

আগেই বলেছি, এই উপকূল পথ ধরে যাবার বেলা যে সব বিপদের মুখোমুখি হতে হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মালাবারী জলদস্যু। এরা সকলেই ধর্মান্ধ মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের ওপর বেজায় খড়্গহস্ত। এই জলদস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এরূপ এক নগ্নপদ কারমেলাইট ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। দ্রুত মুক্তিপণ আদায় করার জন্য তার ওপর এমন পীড়ন চালান হয়েছিল যে তার হাতটি অন্তটির আধা হয়ে গেছে খাটো হয়ে। একটি পায়েরও ঠিক সেই দুর্দশা। এইসব দস্যু-নায়কেরা যেসব সৈনিকদের এজন্য নিয়োগ করে, তাদের যে ছ'মাস সাগরে কাটাতে হয় সেজন্য বেতন হিসাবে দেয় মাত্র দুই একু-র মতো (৪ টাকা)। পায় না তারা লুটের মালের কোন ভাগ। তবে, যাদের বন্দী করে, পারে তাদের সঙ্গে থাকা খাদ্য-সম্ভার ও পোশাক-পত্র নিয়ে নিতে। একথা ঠিক যে চুক্তির সময় পার হয়ে গেলে চলে যেতে দেয়া হয় তাদের। তবে, নায়ক যদি রাখতে চায় কাউকে তাহলে আবার সে বাধ্য হয় নতুন ক'রে চুক্তি করতে। এরা ২০-২৫ কোশের বেশি ভেতর-সাগরে হানা দেয়ার দুঃসাহস দেখায় না বড় একটা। পর্তুগীজরা এই জলদস্যুদের কাউকে ধরতে পারলে হয় সোজাসুজি ফাঁসীতে লটকায় নয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেয় সাগরে। এক একটি দস্যু জাহাজে থাকে সাধারণত দুশোজন, কখনো সখনো ২৫০ জন পর্যন্ত মালাবারী। বড় বড় জাহাজগুলিকে আক্রমণের জন্য এদের দশ থেকে পনেরটি জাহাজ এক সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় সাগরে। ভয় করে না কামানকে পর্যন্ত। জাহাজের কাছাকাছি হয়ে ডেকের ওপর আগুনের পাত্র ছুঁড়ে চলে সমানে। সতর্ক ব্যবস্থা না নিলে জাহাজের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটায় এগুলি। এইসব দস্যুদের রীতিনীতি ভাল ক'রে জানা বলে এদের দেখা মেলা মাত্র জাহাজের ডেকের জল নির্গমনের সব ফোকরগুলিকে বন্ধ ক'রে জল-ভরাট ক'রে দেয়া হয় পুরো ডেকটিকে। ফলে এই জলের মধ্যে পড়ে অকামী হয়ে যায় আগুনের-পাত্রগুলির দাপট।

মালাবারীরা এত শুচিবাইগ্রস্ত যে কোন ময়লা বা অপরিচ্ছন্ন সমগ্রী একেবারেই ধরবে না ডান হাত দিয়ে। এজন্য পৃথক ক'রে রেখেছে তারা বাঁ হাতটিকে। আঙুলের নখগুলিও তারা রাখে বেশ বড় বড়, চালায় এ দিয়ে চিরুণীর কাজ। চুল রাখে তারা মেয়েদের মতোই লম্বা, বাঁধে তাকে মাথার ওপর চুড়োর মতো ক'রে। ঢাকে তাকে তেকোণা একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে।

দমন যে স্থরাট থেকে ৭ গোশ দূরে আগেই বলেছি একথা। ঔরঙজেবের দ্বারা এ শহরটি অবরোধের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দেই একটু। অনেকেরই ধারণা, যুদ্ধ বিগ্রহে হাতি বিরাট সহায়ক। একথা অবশ্যই মিথ্যে নয়। তবে যেভাবে কাজে লাগানোর কথা সাধারণত ভাবা হয়, ঠিক সেভাবে সহায়ক নয় কিন্তু সবসময়ে। কেননা, প্রায়ই দেখা যায় শত্রু দলন না ক'রে যারা তাদের লেলিয়ে দিয়েছে উল্টে সেই নিজ পক্ষকেই দলন করছে তারা। এই শহরটি অবরোধের বেলা ঔরঙজেবও অর্জন করেছিলেন অনেকটা ঠিক সেই রকমের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তিনি দমন অবরোধ করার পর কুড়িদিন পার হয়েছে তখন। এমন সময় মতলব আঁটলেন আগামী রববারে আক্রমণ করবেন শহর। ভাবলেন, বিশ্রামের দিন বলে ইহুদীদের মতো খ্রীষ্টানরাও বোধ হয় করবে না কোন প্রতিরোধের চেষ্টা। দমনের সেনানায়ক ছিলেন একজন বৃদ্ধ সৈনিক। তিনপুত্র সহ ছিলেন আগে ফরাসী সেনাদলে। এই তিন পুত্রও এখানে তার সঙ্গে তখন। শহরে তখন বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিরোধার্থে ছুটে আসা অসামরিক ও সাহসী সামরিক ব্যক্তি মিলিয়ে ৮০০ জন। অন্য দিকে মুঘল বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। কিন্তু কোন যুদ্ধ জাহাজ না থাকার দরুন পারেনি দমনের সাগর-পথ আটকে দিতে। সম্ভব হয়নি স্থলপথ ছাড়া জলপথ ধরে কোনরকম আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ। যেহেতু ঔরঙজেব রববারে আক্রমণের তালে আছেন, তাই সামরিক-পরিষদের সিদ্ধান্ত মতো দমনের শাসনকর্তা এই লোকজন আগের দিন মধ্য-রাতের পর জমায়েত ক'রে আদেশ দিলেন অতর্কিত আক্রমণের জন্য। নির্দেশ দেয়া হল, সম্রাটের ২০০ হাতি যেদিকটিতে রয়েছে অশ্বারোহী ও পদাতিকরা একযোগে প্রথম আক্রমণ চালায় যেন সেদিকটিতেই। তাই করল তারা। বাজীতে আগুন ধরিয়ে সমানে ছুঁড়ে চলল সেগুলি হাতিদের ওপর। রাতের অন্ধকারে এর ফলে হাতিগুলি এত ভয় পেয়ে গেল যে কোন দিকে ছুট দেবে ঠিক করতে পারলে না কিছু। মাহুতরাও সামাল দিতে পারল না তাদের। ফলে দৌড় দিল তারা মুঘল সৈন্যদের দিকেই। আর এমন উন্মত্ত ভাবে যে দু'

তিন ঘন্টার মধ্যেই সাফ ক'রে দিল তারা ঔরঙ্গজেবের অর্ধেকের বেশি সৈন্য। তাই, তিনদিন পরেই তুলে নেয়া হল অবরোধ। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর থেকে সম্রাট আর সাহস করেন না খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে কোনরকম সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার।

গোয়ায় দু-দুবার গেছি আমি। প্রথম ১৬৪১ এর শেষের দিকে। তারপর ১৬৪৮ এর শুরুতে। প্রথম বারে মাত্র সাত দিন ছিলাম সেখানে, সুরাটে ফিরে এসেছিলাম স্থলপথ ধরে। গোয়া থেকে উপস্থিত হলাম প্রথমে মূল ভূখণ্ডের বিচোলীতে। সেখান থেকে তারপর বিজাপুর। তারপর গোলকুণ্ডা ও ঔরঙ্গাবাদ হয়ে সুরাট। গোলকুণ্ডায় না গিয়েও যেতে পারতাম সুরাটে। কিন্তু সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছিল বলেই।

গোয়া থেকে বিজাপুর (প্রাচীন বিজয়পুর) যাওয়া যায় সাধারণত আট দিনে। দূরত্ব ৮৫ কোশ। বিজাপুর থেকে গোলকুণ্ডা আমি নিজেই গেছি নদিনে। এই পথ ১০০ কোশ। গোলকুণ্ডা থেকে ঔরঙ্গাবাদের মধ্যে বিরাম পর্বগুলি সুনির্দিষ্ট নয়। ফলে এ পথ পার হতে কখনো নেয় ১৬ দিন, কখনো কুড়ি দিন, এমন কি ২৫ দিনও কখনো কখনো। ঔরঙ্গাবাদ থেকে সুরাট যেতে কখনো দরকার হয় ১২ দিন, আবার কখনো যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না ১৫ কি ১৬ দিনের কমে।

বিজাপুর একটি বড় শহর। তবে বাড়ি-ঘরের দিক থেকেই বল, আর ব্যবসাপত্তরের দিক থেকেই বল, নেই বলার মতো কোন বৈশিষ্ট্যই। রাজার প্রাসাদটি অবশ্যই বেশ বড়সড়, কিন্তু নেই তার কোন শ্রী-ছাঁদ। চারদিককার জল ভরা পরিখা মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি কুমীর, পরিখা পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করা দুরূহ তাই। তিনটি ভালো বন্দর রয়েছে বিজাপুর রাজ্যে। রাজাপুর, দাভোল (বা দাবুল) ও করেপুত্তন। শেষেরটিই সবার সেরা। সাগর-জল পাহাড়ের প্রান্ত ধুয়ে চলেছে একেবারে। সেখানে, ডাঙার কাছেও জলের গভীরতা ১৪ থেকে ১৫ ফাদম। পাহাড় শীর্ষে প্রাকৃতিক জল-প্রবাহ সহ রয়েছে একটি দুর্গ। এটির ভেতরের দৃশ্য বাইরের কোথাও থেকে দেখা যায় না, এবং প্রাকৃতিক ভাবেই দুর্ভেদ্য। এ সত্বেও পর্তুগীজদের সাথে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছেন রাজা।

করেপুত্তন গোয়া থেকে উত্তর দিকে মাত্র পাঁচদিনের পথ। আর যেখান থেকে বিজাপুরের রাজা গোলমরিচ সরবরাহ করেন সেই রাইবাগও (বেলগাঁও

জেলায়) করেপুত্তুন থেকে পূব দিকে ওই একই পথ দূরে। গোলকুণ্ডার মতো বিজাপুরের রাজাও ছিলেন এককালে মুঘলদের অধীন, কিন্তু এখন আর নন তা।

নায়ের শিবজী (জন্ম ১৬২৭ মৃত্যু ১৬৮০)-র বিদ্রোহ ফলে কিছুকাল ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে এ রাজ্যটিকে। তিনি ছিলেন বিজাপুরের রাজার যাকে আমরা ফ্রান্সে রক্ষীবাহিনীর নায়ক বলি তাই। খারাপ আচরণের অপরাধে রাজা রেখেছিলেন তার পিতাকে কারাগারে বন্দী ক'রে। আমৃত্যু দীর্ঘকাল ওই জীবনই কাটাতে হয় তাকে। শিবজী রাজার ওপর তীব্র বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠলেন সেই থেকে। এক দস্যুদল সংগঠন ক'রে হলেন তারই সর্দার। বিনয় ও উদারতা তার এই দুই সদগুণের জন্য হল বহুলোক তার অনুগামী। গড়ে উঠল তার প্রচেষ্টায় দল মধ্যে ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিক দুরকম বাহিনীই। এবং বেশ অল্পকালের মধ্যেই। তার উদারতার খবর পেয়ে চারিদিক থেকে সেনারা এসে যোগ দিল তার বাহিনীতে। ফলে অর্জন করলেন তিনি বড় রকমের প্রচেষ্টায় ঝাঁপ দেয়ার মতো শক্তি এবং নিলেনও সেরূপ কয়েকটি উদ্যম। বিজাপুরের রাজা মারা গেলেন এসময়ে অপুত্রক অবস্থায়। ফলে, হতে হল না তাকে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি। রাজাপুর, রশিগড় (সম্ভবতঃ কানাড়া জেলার রাক্ষসগুড্ড), করেপুত্তুন, দাভোল ও আরো অন্যান্য কতক শহর সহ মালাবার উপকূলের একাংশ দখল ক'রে নিয়ে হয়ে গেলেন তারই অধিপতি। শোনা যায় রশিগড়ের দুর্গটি ভেঙে ফেলার বেলা তার ভেতর থেকে প্রচুর গোপন সম্পদ পেয়ে যান তিনি। আর তাই দিয়েই নাকি তিনি পুষতেন তার সেনাবাহিনীকে। সর্বদা খুব ভাল মাইনে পেত বলে সেনারা তার আদেশ পালন করত মনপ্রাণ ঢেলে।

কোন সন্তান না থাকার দরুন বিজাপুরের মহিষী রাজার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে দত্তক নেন একটি ছেলেকে। ছেলেটিকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তিনি, আলী সম্প্রদায়ের (শীয়া) অনুশাসন মতো পরম যত্ন নিয়ে ক'রে চলেন তাকে লালন-পালন। রাজার মৃত্যুর পর রানীর প্রচেষ্টায় রাজ-সিংহাসনে বসানো হল এই পালিত-পুত্রকেই। রীতিমতো এক সেনাবাহিনী থাকার দরুন শিবজী সমানে যুদ্ধ ক'রে চললেন এ সময়ে। নাবালক পালিত পুত্রের অভিভাবক রূপে রানীর রাজ্য-পরিচালনা কালে করলেন কিছুকালের জন্য এভাবে সঙ্কটের সৃষ্টি। তখন এক চুক্তি সম্পাদিত হল দু-পক্ষের মধ্যে। শর্ত হল, রাজার অধীন রূপে শিবজী প্রভুত্ব করবেন তার বিজিত অঞ্চলের ওপর। দেবেন আদায়ী রাজস্বের

অর্ধেক তিনি রাজাকে। এভাবে কিশোর রাজাকে সিংহাসনে সুস্থিত করার পর রানী গেলেন তীর্থ করতে মক্কায়। আমি যখন ইস্পাহানে, তিনি তখন তীর্থ সেরে ফিরে আসছেন সেপথে।

আসি এবার গোয়া পর্যটন প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়বার যখন গোয়া আসার সিদ্ধান্ত নিলাম, চাপলাম একটি ডাচ জাহাজে। নাম তার Maestricht। ১৬৪৮ এর ১১ই জুন নামিয়ে দিল আমাকে ভেনগুরলায় (বোম্বের রত্নগিরি জেলায়)।

ভেনগুরলা বড়সড় শহর একটি। সাগরকূল থেকে আধকোশ ভেতরে, বিজাপুর রাজ্যে। সারা ভারতের সেরা জাহাজ-ঘাটগুলির মধ্যে এটি একটি। গোয়া অবরোধ কালে প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার নিয়ে গেছেন নিয়মিত এখান থেকেই ডাচরা। এখনও তাদের জাহাজ এখানে চলাচল করছে নিয়মিত, ঠিক যেমনটি করছে বাণিজ্যিক স্বার্থে অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে। এর একটি কারণ এখানকার স্বচ্ছন্দ গতি জলপথ; আরেক কারণ, সংগ্রহ হয়ে থাকে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চাল। এলাচির জন্যও অতি প্রসিদ্ধ এ শহরটি। প্রাচ্য দেশবাসীদের কাছে এটিই হল সবার সেরা মশলা। এ অঞ্চলে প্রচুর আবাদ হয় এর। বেশ দুর্লভ ও মূল্যবান সামগ্রী এটি। উৎপন্ন হয় এখানে আটপৌরে ব্যবহারের উপযোগী মোটা সুতী বস্ত্র এবং পণ্য সামগ্রীর আবরক রূপে ব্যবহারের উপযোগী টোটি (চট) নামের এক ধরনের (পাটের) মোটা কাপড়ও।

পণ্য বিক্রী অপেক্ষা পণ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেই ডাচ কোম্পানীর একটি শাখা রয়েছে ভেনগুরলায়। আগেই বলেছি, বাটাভিয়া, জাপান, বাঙলা, সিংহল ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এদিক পানে সাগর পাড়ি দেয়া প্রতিটি জাহাজই থামে এখানে। শুধু তাই নয়, থামে এখানে সুরাট, লোহিত সাগর, হরমুজ, বসরা প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজও। এমনকি যখনই পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ দেখা দেয়, গোয়ার সাগর পথ অবরোধ করে ডাচরা, তখনই ভেনগুরলা থেকে খাদ্যসম্ভার যোগান দেয় সেখানে ছোট ছোট নৌকায় ক'রে। এই অবরোধ রচনা করে তারা সাধারণতঃ আট থেকে দশটি জাহাজ নিয়ে। যাতে সাগর পথ দিয়ে কোন পণ্য গোয়ায় যেতে না পারে সেজন্য নদী মোহনাটিকে আগলে থাকে পুরো আট মাস কাল। এখানে উল্লেখযোগ্য, গোয়ার প্রবেশ পথটি বছরের একাংশ প্রাকৃতিক ভাবেই বন্ধ হয়ে যায় বালির চরা প'ড়ে। প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে দক্ষিণ ও পশ্চিমা বাতাস সৃষ্টি করে এ পরিস্থিতির।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে অতি ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকাগুলি চলাচলের মতো এক কি দেড় ফুট জল থাকে তখন। কিন্তু প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়ে গেলেই নদীর ভরা-জল অবস্থা ও তার খরস্রোতের দরুন বালি সরে গিয়ে নদী মুখ আবার হয়ে ওঠে বড় জাহাজগুলির চলাচল উপযোগী।

তেরো ।। গোয়া শহরের বর্তমান পরিস্থিতি

গোয়া মাণ্ডবী নদীর মোহনায় ছ থেকে সাত কোশ আয়তনের একটি দ্বীপের বুকে। এ দ্বীপটির পর আরো দু কোশ এগিয়ে গিয়ে সাগর কোলে ঠাঁই নিয়েছে মাণ্ডবী। প্রচুর গম ও চালের ফলন হয় দ্বীপটিতে। তেমনি অগুণতি রকমের ফল। আম, আনারস, কলা, নারকেল এবং আরো কত কি। কিন্তু পিপিন জাতীয় আপেলের কাছে কেউ লাগে না এরা। ইওরোপ ও এশিয়া দুটিই যারা বিশদভাবে ঘুরেছেন, তারাই আমার সাথে একমত হয়েছেন যে গোয়া, কনস্তান্তিনোপল ও তউলন এ দুই মহাদেশে থাকা সব বন্দরগুলির মধ্যে সেরা। গোয়া রীতিমতো একটি বড় শহর। এর ঘের-দেয়ালগুলি মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি। বাড়িঘরগুলির অধিকাংশই অতি চমৎকার ভাবে গড়া। বিশেষ ক'রে, শাসনকর্তার প্রাসাদটি তো বটেই। অগুণতি ঘর রয়েছে এটিতে। বেশ বড় আকারের কতক মহাকক্ষ ও প্রকোষ্ঠ মধ্যে টাঙানো রয়েছে অসংখ্য জাহাজের ছবি। লিসবন ও গোয়া মধ্যে যে সব জাহাজ যাতায়াত করে, নাম সহ তার প্রত্যেকটিরই ছবি রয়েছে এখানে। কে তার অধিনায়ক, আত্মরক্ষার্থে কটি কামান আছে কোন্‌টিতে, লেখা রয়েছে তারও বিবরণ। শহরটি যদি এভাবে চারিদিককার পাহাড়গুলির ঘেরের মধ্যে বন্ধ না হত তবে জনবসতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেত আরো। স্থানটিও হত সেক্ষেত্রে বর্তমানের তুলনায় অধিক স্বাস্থ্যকর। অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি ক'রে স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবাহ উপভোগের সুযোগ থেকে শহরটিকে বঞ্চিত করেছে এই পাহাড়গুলি। এখানকার অসহ্য গরমের প্রধান কারণ এটিই। সাধারণ খাদ্য হিসাবে গরু আর শুয়োরের মাংসের চলই বেশি। মুরগিও মেলে। পায়রা দেখা যায় না বড় একটা। সাগরকূল হওয়া সত্ত্বেও মাছ দুর্লভ। তৈরী হয় বিভিন্ন

রকমের মিঠাই দ্রব্য, তা খায়ও লোকে প্রচুর। ভারতে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি ডাচরা গ্রাস করার পূর্ব পর্যন্ত গোয়ায় জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য ছাড়া চোখে পড়ত না অন্য কিছুই আর। কিন্তু তাদের চারদিককার ব্যবসা বাণিজ্য ডাচদের মুঠোয় চলে যাবার পর সোনা ও রূপা প্রবাহের উৎসধারা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় টুবে গেছে আগেকার সেই আড়ম্বরের সিংহভাগ। আমার প্রথম ভ্রমণকালে এখানকার যে সব ব্যক্তির (বার্ষিক?) দু হাজার একু পর্যন্ত রোজগারের মতো বিষয়-সম্পত্তি ছিল, আমার দ্বিতীয় ভ্রমণ কালে তারা তাদের আগেকার সেই ঠাট নিয়েই এসেছে আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে। বিশেষ ক'রে মহিলারা। দরজার গোড়ায় পালকী থামিয়ে সঙ্গে থাকা বালক ভৃত্যকে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দেয় তারা শ্রদ্ধা জানাতে। তখন যেমন খুশী ভিক্ষে পাঠিয়ে দিন আপনি। তাকে চাক্ষুষ দেখতে চাইলে পারেন আপনি নিজে গিয়েও তার হাতে তুলে দিতে তা। তবে, পুরো মুখটি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকে বলে তাদের চাক্ষুষ দর্শন লাভের সুযোগ খুব কম। কতক ক্ষেত্রে, সাহায্য দেয়ার জন্য আপনি নিজে দরজার গোড়ায় এগিয়ে গেলে আগন্তুক আপনার হাতে তুলে দেবে কোন ধর্মীয় ব্যক্তির সুপারিশপত্র। তাতে বলা রয়েছে, কিরূপ বিত্তশালী অবস্থা থেকে পড়েছেন তিনি এখন কি ধরনের দৈন্যদশায়। এক্ষেত্রে, তিনি যদি কোন মহিলা হন আপনি সুযোগ পেলেন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার। তাকে সম্মান দেখানোর জন্য স্বভাবতঃই বাধ্য হলেন আপনি ভেতরে আসার আহ্বান জানাতে, এক পাত্র পানীয় গ্রহণ ক'রে একটু চাঙ্গা হয়ে নেয়ার অনুরোধ করতে। তারপর এই সান্নিধ্য স্থায়ী হল কখনো কখনো হয়তো পরের দিন পর্যন্তও। (গোয়ার মেয়েদের লাম্পট্যের কথা লিন্‌সকোটেন, পি. ডেল্লা ভল্লে, ফনসেক এবং পাইরার্ড ডি লাভাল জানিয়ে গেছেন আরো বিশদভাবে।)

পর্তুগীজরা যদি (ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে) তাদের অসংখ্য দুর্গ রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত না থাকত এবং ডাচদের প্রতি বিদ্বেষের দরুন প্রথমদিকে নিজেদের কাজকর্মে অবহেলা না করত, তাহলে পড়ত না তারা আজ এমন অতলে খসে।

যে-সব পর্তুগীজ ভারতে আসে, তারা উত্তমাশা অন্তরীপ পার হবার সাথে সাথে বনে যায় সকলেই ফিডালগো বা ভদ্রলোক। নিজের পেড্রো কি জেরোনিমোর মতো সাধাসিধে নামের সঙ্গে অমনি জুড়ে দেয় ডোম বিশেষণ। এজন্যই বিদ্রূপ ক'রে তাদের বলা হয়ে থাকে 'উত্তমাশা অন্তরীপের ভদ্দর লোক'। নিজেদের সামাজিক শ্রেণী-স্তর পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে পালটে ফেলে নিজেদের প্রকৃতিটিকেও

তারা। প্রকৃতপক্ষে, যে-সব পর্তুগীজ ভারতে বসবাস করে তারা পৃথিবীর যে কোন জাতির লোকদের তুলনায় নিজেদের স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে অধিক ঈর্ষা ও প্রতিশোধ প্রবণ। আপন স্ত্রীর ওপর লেশ মাত্র সন্দেহ দেখা দিলেই বিনা দ্বিধায় ক'রে বসে তাকে বিষ খাইয়ে বা ছুরি মেরে হত্যা। কেউ শত্রুতা করলে ভুলেও তাকে ক্ষমা করে না এরা। যদি দু পক্ষ সমান বলীয়ান হয় ও সেজন্য মুখোমুখি লড়াইয়ে সাহসী না হয়, তবে কালো বান্দাদের লাগিয়ে দেয় তার পেছনে। মনিবের আদেশ পেলে করে এরা যে কোন লোককে চোখ বুজে খুন। হয় ছোরা দিয়ে, নয় ব্রাণ্ডার বাস ধরনের বন্দুক দিয়ে, নয়তো এসব বান্দারা যে জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে সদাসর্বদা চলাফেরা করতে অভ্যস্ত সেই খাটো বর্শার আকারের লম্বা বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে। যাকে এভাবে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে যদি কোন কারণে তাকে বাগে পেতে দেরি হয়ে যায়, শহরে কি হাটে-মাঠে-ঘাটে তার দেখা না মেলে, তাহলে দ্বিধা করে না গীর্জার মতো পবিত্র স্থানে ঢুকে তাকে হত্যা করতেও। হয়েছে এজাতীয় দু'তুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার। একটি দমনে, আরেকটি গোয়ায়। গোয়ার ঘটনাটিতে তো হত্যা করা হয়েছিল সাত সাতজন লোককে, এমন কি গুরুতর ভাবে জখম করা হয়েছিল ধর্মযাজককেও। দেশের আইন কোনরকম পদক্ষেপ নেয় না এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে। কেননা, যারা এ ধরনের অপরাধের মূল অনুষ্ঠানকর্তা তারাই হলেন সাধারণতঃ দেশের মাথা। আদালতে এ নিয়ে মামলা উঠলে কখনও আর শেষ-নিষ্পত্তি হয় না তার। মামলার তদারকী করে সাধারণত কানাড়ীনরা। আইনজ্ঞ ও মামলা তদারকের জীবিকা পুরোপুরি তাদেরই মুঠোয়। এদের চেয়ে ধূর্ত ও সূক্ষ্ম কূট-কৌশলী নেই সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ।

ভারতীয় এলাকায় পর্তুগীজদের অতীত প্রতাপ-প্রতিপত্তির কথা বিচার করলে বলা যেতে পারে, ডাচরা যদি কখনো এ অঞ্চলে না আসত তবে অধিকাংশ পর্তুগীজের বাড়িঘরের কোথাও ব্যবহার করা হত না এক টুকরো লোহাও। সব কিছুই তৈরি হত সোনা আর রূপো দিয়ে তাহলে। এজন্য করতে হত বড় জোর তাদের দুই কি তিনবার জাপান, ফিলিপাইন, মলাক্কা বা চীন অঞ্চলে বাণিজ্য যাত্রা। ফিরে আসত পাঁচ কি ছ'গুণ, এমনকি কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ক্ষেত্রে দশ গুণ পর্যন্ত লাভ উঠিয়ে। সাধারণ সৈনিক, শাসনকর্তা এবং নায়করা বিপুল অর্থ অর্জন করত ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে। একমাত্র প্রধান শাসনকর্তা কোন ব্যবসা করেন না, অথবা ক'রে থাকলেও করেন অন্য কারো নামে। তাছাড়া

ব্যবসা না করেও তার উপার্জন যথেষ্ট। আগে কোন অভিজাতর কাছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ লোভনীয় পদ ছিল গোয়ার প্রধান-শাসনকর্তার পদ। এই শাসনকর্তা যতগুলি অর্থকরী অঞ্চলের ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেতেন, কোন শাসনকর্তাকে এতগুলি অর্থকরী অঞ্চলের ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ দেবার ক্ষমতা কোন সম্রাটেরই নেই আর। তার অধীনস্থ সরকার বা অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় শাসন-কর্তাদের নিযুক্তি দেয়া হয় মাত্র তিন বছরের জন্য। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মোজাম্বিকের। এই তিন বছরের মধ্যে শাসনকর্তা লাভ ক'রে থাকেন অন্ততঃ চার থেকে পাঁচ লক্ষ ক্রাউন (=একু। এক একু=২ টাকা)। কখনো কখনো তারও বেশি।

ভারতে আমার শেষ ভ্রমণকালে মোজাম্বিকের শাসনকর্তা তার তিন বছরের কর্তৃত্বকাল শেষ ক'রে ফিরে এসেছিলেন গোয়ায়। তার সঙ্গে ছিল তখন ২ লক্ষ একুর কাছাকাছি মূল্যের তিমির অন্ত্রজাত সুগন্ধি। এর চেয়েও বিপুল অঙ্কের সোনা ও হাতির দাঁতের কথা নাই বা বললাম।

দ্বিতীয় অর্থকরী অঞ্চল ছিল এরপর মলাক্কা। বিপুল পরিমাণ অর্থ জাহাজ-গুলির কাছ থেকে আদায় হত এখানে। কেননা, গোয়া থেকে জাপান, চীন, কোচিন চীন, জাভা, মকস্‌সর, ফিলিপাইন ও অন্যান্য অঞ্চলগামী সব জাহাজ-গুলিই যাতায়াত করত এই প্রণালীটি দিয়ে। আছে অবশ্য আরো একটি পথ। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল ধরে এগিয়ে তারপর সোন্দে (সুন্দা) প্রণালী হয়ে কিংবা জাভা দ্বীপকে উত্তরে রেখে। কিন্তু গোয়া ফিরে প্রত্যেক জাহাজকেই দেখাতে হত মলাক্কার শুল্ক ভবনের দেয়া মুক্ত ছাড়পত্র। ফলে প্রত্যেক জাহাজই বাধ্য হত সেই পথ ধরে যেতে।

তৃতীয় অর্থকরী অঞ্চল হল হরমুজ। এর মূলে ছিল এখানকার বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পারস্য উপসাগর পথে যাতায়াতকারী জাহাজগুলি থেকে আদায় করা শুল্ক।

চতুর্থ লাভপ্রদ এলাকা ছিল মসকাত। হত এখানেও বিপুল আয়। পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও মলিন্দ উপকূল অঞ্চল থেকে ভারতগামী সব জাহাজকেই থামতে হয় এখানে, নেয় এখান থেকেই তারা জল সাধারণতঃ। কোন জাহাজ না থামলেও শুল্ক দাবী করা হত তার কাছ থেকে। এই শুল্কের পরিমাণ ছিল চার শতাংশ।

পঞ্চম অর্থকরী এলাকা ছিল সিংহল দ্বীপ। মালাবার উপকূল, বঙ্গোপসাগর

ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে থাকা পর্তুগীজ বসতিগুলির সবকটিই ছিল এখানকার শাসনকর্তার অধীন। এই বসতিগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র বা কম আয়ের সেখান থেকেও মিলত বছরে অন্ততঃ দশ হাজার একু।

এই পাঁচটি প্রধান অঞ্চলই ছিল আবার (গোয়ায় থাকা) প্রধান শাসনকর্তার অধীন। ছিল এছাড়াও তার ছত্রছায়ায় গোয়া ও ভারতের বিভিন্ন শহরগুলিতে অসংখ্য অফিস। যেদিন তিনি গোয়ায় পদার্পণ করতেন সেদিন থেকেই তার রক্ষীদলের নায়ক পেতেন প্রায় ৪০০০ একু ক'রে শুল্ক থেকে। প্রধান যন্ত্রবিদ, দুর্গসমূহের পরিদর্শক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান পেয়ে থাকেন বার্ষিক ২০০০০ পর্দাও হিসাবে। পর্তুগীজরা সকলেই ছিলেন তখন ধনী। অভিজাতরা সরকার ও তার অন্যান্য সংস্থা সমূহের দৌলতে, আর ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন। ইংরাজ ও ডাচরা এসে তাদের পায়ের নিচের মাটি ধসিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত বহাল ছিল এই অবস্থাই অন্ততঃ। হরমুজের ওপর যতকাল তাদের আধিপত্য অটুট ছিল, আসতে দেননি তারা অন্য কোন সওদাগরকেই সাগর-পথ ধ'রে ভারতে। তাই বাধ্য হয়েছে সবাই তারা সড়ক পথ ধ'রে কন্দহার হয়ে সেখানে যেতে।

দেশীয় অধিবাসী কানাড়ীরা কোন নিযুক্তিই পেত না পর্তুগীজদের অধীনে। ব্যতিক্রম শুধু যা আইন-আদালতের ক্ষেত্রে প্রতিভূ বা তদারককারী, আইনবেত্তা ও লেখক (করণিক)। রাখা হয়ে থাকে দেশীয় অধিবাসীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। কোন কানাড়ী বা কালা আদমি কোন শ্বেতাঙ্গ বা ইওরোপীয়কে আঘাত করলে কোনরকম ক্ষমা দেখান হত না তাকে। সে-অপরাধের জন্য কেটে ফেলা হত তাদের হাত। স্পেনিয়ার্ড ও পর্তুগীজ উভয়েই, এবং বিশেষভাবে স্পেনিয়ার্ডরা এদের নিয়োগ ক'রে থাকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবসায়ের কর্মী হিসাবে।

এই কালা আদমীরা যথেষ্ট চতুর, সেনা হিসাবেও বেশ ভাল। পাদরীরা আমায় দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছেন, পর্তুগীজ ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে এক বছরের মধ্যে যা শেখে এদের ছেলে-মেয়েরা শিখে ফেলে ছ মাসের মধ্যেই তার চেয়ে বেশি। এবং যে কোন বিষয়ই হোক না কেন। এ কারণেই পর্তুগীজরা এভাবে দমন ক'রে রাখে তাদের।

গোয়া ও তার আশপাশ অঞ্চলের ভারতীয়রা পৌত্তলিক। বিভিন্ন বিগ্রহের পূজা ক'রে থাকে তারা। বলা হয়ে থাকে, অতীতে যারা তাদের হিতার্থে কাজ ক'রে গেছেন সেই সব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রূপে পুজো করা

হয়ে থাকে তাদের বিগ্রহ প্রস্তুত ক'রে। অনেকে ক'রে থাকেন আবার বানর পূজাও। আগেই জানিয়েছি, ভারতের বহু অঞ্চলে মন্দির গড়ে করা হয়েছে সেখানে এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থানীয় বানর ছাড়া খেতে দেয়া হয় সেখানে বহিরাগত বানরদেরও। এই সব বহিরাগতরা সপ্তাহে দু'দিন ক'রে খাবার জন্য আসে সেখানে (সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখুন)। সলসেত্তি দ্বীপের এক গ্রামে মন্দির রয়েছে একটি। (এটি বোম্বের উত্তর দিককার সলসেত্তি দ্বীপ নয়। গোয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা।) সেখানে রূপা দিয়ে একটি স্মৃতি-সৌধের মতো তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল তার ভেতরে এক বানরের অস্থি ও নখ। কতক শক্তিশালী রাজা এদের দেবতাদের নিগ্রহ শুরু করলে এই বানরটি ওই দেবতাদের একের দেয়া সংবাদ ও উপদেশাদি অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়ে অনেক উপকার করেছিল তাদের। এমনকি এজন্য সাঁতরে পার হয়েছিল সে সমুদ্র (সম্ভবতঃ মহাবীর হনুমানের নয়, রাখা হয়েছিল এখানে গৌতম বুদ্ধের পূতাস্থি ও নখকণা)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা শোভাযাত্রা সহকারে পূজা দিতে আসত এই মন্দিরটিতে। ধর্ম-প্রচারক ও পাদরী সম্প্রদায়, বিশেষ ক'রে ধর্মদ্রোহীতার তদন্তকারী একদিন সেখানে গিয়ে সেই স্মৃতি-নিদর্শন ছিনিয়ে নিয়ে এলেন গোয়ায়। চলতে থাকল ধর্মীয় পরিষদ ও দেশীয় সাধারণের মধ্যে এ নিয়ে যুক্তি-তর্ক বিবাদ। দিতে চাইল তারা মুক্তিপণ হিসাবে মোটা অর্থ। স্থানীয় অধিবাসীরা সকলেই মত দিল মুক্তিপণ গ্রহণের সপক্ষে। বলল, যুদ্ধকালে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে, কিংবা দরিদ্রদের সেবায় প্রচুর কাজে আসবে এই অর্থ। কিন্তু প্রচারক ও যাজকরা আদপেই সায় দিলেন না তাতে। বললেন, পৌত্তলিকতাকে কোনমতেই উচিত নয় প্রশ্রয় দেয়া। তখন আর্কবিশপ ও ধর্মীয় তদন্তকারী সেই পূতাস্থি নিয়ে এক জলযানে চেপে কুড়ি কোশ ভেতর-সাগরে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে এলেন সেখানে। হয়তো তারা একে পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিগ্রহপূজকদের সুযোগ ঘটে যেত তার ভস্ম সংগ্রহ করার, দেখা দিত তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আবার নতুন কোন ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।

ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেশ কিছু ব্যক্তি বাস ক'রে থাকেন গোয়ায়। আর্কবিশপ এবং তার পাদরী ও প্রচারকগণ ছাড়াও রয়েছেন সেখানে ডোমিনিকান, অগাস্টিন, কর্ডেলিয়ার, নগ্নপদ কারমেলাইট, যেসুইট, এবং কপুচিনরা। শেষোক্তরা রিকালেক্ট সম্প্রদায়ের মতো। রয়েছে তাদের দুটি সন্ন্যাসিনী আশ্রম। অগাস্টিনরাই পরিচালনা করে সেগুলি। কারমেলাইটরা এসেছেন এখানে সবার শেষে। এবং

তাদের মিশন-ভবনটিই সকলের সেরা। একটি চমৎকার অধিত্যকার ওপর সেটি। বয়ে চলেছে সেখানে খোলামেলা বাতাস। একের ওপর আর দুটি দরদালান সহ বেশ মজবুত ক'রে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটিকে। অগাষ্টিনরাই গোয়ায় প্রথম পদার্পণকারী। তাদের আশ্রমটি একটি নিচু অধিত্যকার গোড়ায়। আর গীর্জাটি প্রধান সড়কের ধারে। সামনে তার একটি নয়নাভিরাম চতুষ্কোণ মুক্ত-আঙিনা। যেসুইটরা একটি বাড়ি তৈরির পর, অগাষ্টিনদের কাছে চাইলেন পাশের ওই অধিত্যকাটি। তখন পর্যন্ত ফাঁকাই পড়ে ছিল সেটি। অজুহাত দেখালেন, তাদের পণ্ডিতদের অবসর বিনোদনের জন্য চান একটি বাগান তৈরি করতে সেখানে। শেষ পর্যন্ত কিনলেন সেটিকে। গড়লেন সেখানে একটি দর্শনীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর ফলে অগাষ্টিনদের আশ্রমটি পড়ে গেল অবরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে, বঞ্চিত হল খোলামেলা বাতাস থেকে। এ নিয়ে দেখা দিল উভয়ের মধ্যে জোর বিবাদ। সে-মামলায় জয়ী হলেন শেষ অব্দি যেসুইটরাই।

যেসুইট পাদ্রীরা গোয়ায় পূলিষ্ট বা পল-পন্থী রূপে সুপরিচিত। এর কারণ, তারা তাদের প্রধান গীর্জাটিকে উৎসর্গ করেছেন সন্ত পলের উদ্দেশে। তারা ইওরোপের মতো হ্যাট বা তে-কোণা টুপি পরেন না। পরে থাকেন, কানা না থাকা হ্যাটের মত দেখতে এক ধরনের টুপি। তুরস্কের সম্রাটের দাসেরা যে ধরনের টুপি মাথায় দেয় অনেকটা প্রায় সেইরকমের। গোয়ায় এদের পাঁচটি বাড়ি। সেন্ট পল কলেজ, সেমিনারী ভবন, সন্ন্যাসী ভবন, নোভিশিয়েট বা প্রাথমিক শিক্ষা নিবাস এবং বন জেসাস গীর্জা। এই গীর্জাটির ভেতর-ছাতে যেসব চিত্রকর্ম রয়েছে তা প্রশংসা করার মতো। ১৬৬৩ অব্দে এক দুর্ঘটনায় রাতের দিকে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল কলেজটির বেশির ভাগ অংশ। পুনরায় তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ষাট হাজার একু।

গোয়ার হাসপাতালটি একদা খ্যাতি অর্জন করেছিল সারা ভারত জুড়ে। হত প্রচুর আয় সে-সময়ে। রোগীদেরও যথেষ্ট যত্ন-আত্তি ক'রে সেবা-শুশ্রূষা করা হত তখন। প্রথম যখন আমি গোয়ায় আসি তখন পর্যন্তও অব্যাহত ছিল তা। কিন্তু তার পরিচালক গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটাবার পর থেকে বদলে গেছে সে পরিস্থিতি। রোগীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয় এখন। যেসব ইওরোপীয়রা সুস্থ হবার জন্য সেখানে ঠাঁই নেন তাদের অধিকাংশই সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসার সুযোগ পান না সমাধি সৌধে চিরশয়ান হবার সৌভাগ্য অর্জন না করলে। ঘন ঘন রক্তপাত ক'রে চিকিৎসা করার কৌশলটি উদ্ভাবিত

হয়েছে সবে কিছুদিন হল। প্রয়োজন হলে তিরিশ থেকে চল্লিশবার পর্যন্তও রক্তপাত করা হয়ে থাকে এজন্য। সুরাট থাকাকালে করা হয়েছিল আমাকেই এভাবে চিকিৎসা একবার। দূষিত রক্ত নিষ্কাশিত ক'রে নেয়ার সাথে সাথে বিপদমুক্ত হয়ে যায় রোগীর জীবন। মাখন ও মাংস এ সময়ে তার পক্ষে বিষ তুল্য। ক্রমশঃ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেয়া হত আগে সামান্য পরিমাণ কোমা-বিশেষ। কিন্তু বর্তমানে তুষ্ট থাকতে হয় শুধু একথালা ভাত আর গোমাংসের যুষ খেয়ে। আরোগ্য লাভকালে গরিব ব্যক্তিরা এর ফলে তেষ্টায় কাতর হয়ে জলের জন্য আর্তি জানিয়ে চলে শুধু। কিন্তু যারা তাদের দেখাশোনা করে সেইসব কালা আদমী কিংবা মোষ্টিকো বা বর্ণ-সঙ্করবা এত লোভী ও পাষাণ হৃদয় যে উৎকোচ না পেলে কিছুতেই দেবে না তাদের এক ফোঁটা জল। এই উৎকোচ আদায়ের পরিবেশটিকে নিশ্চিত ক'রে তোলার জন্য শয়তানী ক'রে এই জলও জোগায় আবার তারা লুকিয়ে চুরিয়ে দেয়ার ভঙ্গীতে। রটনা ক'রে বেড়ায়, জল খেতে দেয়া চিকিৎসকদের বারণ। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ও মিঠাই দ্রব্য দুর্লভ না হলেও তা স্বাস্থ্যোদ্ধারের তেমন সহায়ক নয়। গরমের দেশ বলে সেখানে এজন্য বিশেষ প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের।

ঘন ঘন রক্তমোক্ষণ সাহায্যে ইওরোপীয়দের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ভুলে গেছি একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে এতক্ষণ। ঔজ্জ্বল্য ও স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে একনাগাড়ে বারো দিন সকাল দুপুর সন্ধ্যে তিনবার তিন গ্লাস Pissat de Vache' পানের জন্য। কিন্তু এটি এতই বিস্বাদকর যে, রোগীর যতই আকাঙ্খা থাকুক না কেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, তবুও এটি যত কম খেয়ে পারে ক'রে চলে তারই চেষ্টা সকলে। ঔষধরূপে এটির ব্যবহার শিখেছে তারা দেশীয় পৌত্তলিকদের কাছ থেকে (এটি পঞ্চগব্যের অন্যতম)। রোগী এটি খেয়ে থাকুন আর নাই খেয়ে থাকুন, সে তা নিয়মিত খেয়ে গেছে ধরে নিয়েই বারোদিন পর ছেড়ে দেয়া হয় তাকে হাসপাতাল থেকে।

চৌদ্দ ॥ গোয়া থেকে কোচিন হয়ে মসুলিপত্তম যাবার পথ-পরিচয় ও ডাচদের কোচিন শহর দখলের বিবরণ।

সিংহল দ্বীপের বাণিজ্য-বসতি থেকে পর্তুগীজদের সমূলে উচ্ছেদ করার পর ডাচরা নজর দিল কোচিন শহরের দিকে। এ অঞ্চলে উৎপন্ন বাষ্ট্যার্ড নামের এক জাতীয় দারুচিনি (বুনো দারচিনি) ক'রে চলছিল তখন সিংহলের দারুচিনির সঙ্গে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সওদাগরেরা যখন দেখলেন ডাচরা তাদের দারুচিনির দাম বড় বেশি চাইছে, কিনতে শুরু করলেন তারা কোচিনের দারুচিনি। সেটি মিলছিল তখন বেশ সস্তায়। এই ডাচ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার দরুন যে ছিল এ দারুচিনি তখন সমাদৃতও। নেয় হচ্ছিল এগুলি সেখানে পারস্য, বিশাল তাতার রাজ্য, মাস্কোভি, জর্জিয়া, মিনগ্রেলিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের আশেপাশের দেশের সওদাগরদের। কিনতেন এই দারুচিনি বিরাট পরিমাণে বসরা ও বাগদাদের ব্যবসায়ীরা, পাঠাতেন তারা তা অ্যারাবীয়ায়। কিনতেন মেসোপটেমিয়া, অ্যানাতোলিয়া, কনস্তান্তিনোপল, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও পোলাণ্ডের সওদাগরেরাও। এখানে বলা সব কটি দেশেই রয়েছে প্রচুর দারুচিনির ব্যবহার। স্বাদ বাড়াবার জন্য বেশির ভাগ ব্যঞ্জনেই কুঁচি ক'রে বা গুঁড়ো ক'রে দেয় একে। বিশেষ ক'রে লেভেন্টের খ্রীষ্টানরা যখন থালায় ক'রে ভাত পরিবেশন করে তখন তার ওপরে এত পরিমাণ দারুচিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় যে বোঝার উপায় থাকে না সে পদটি কি। আর হাঙ্গেরীয়ানরা তো সব জাতিকে ছাড়িয়ে যায় এ মশলাটির ব্যবহারে। তুর্কী ও অন্যান্য এশিয়াবাসীরা পোলাও মধ্যে দেয় এটিকে কুঁচি কুঁচি ক'রে ভেঙে।

কোচিন অবরোধ করার জন্য বাটাভিয়া থেকে পাঠান হল সেনাবাহিনী। তারা নামল এসে বেল্লি পোর্টে (সম্ভবতঃ বইপুর) নামের একটি স্থানে। এখানে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে গড়া একটি দুর্গ ছিল ডাচদের। এ স্থানটি ক্রাঙ্গানুর নামের একটি ছোট শহরের কাছেই। আগের বছর কোচিন দখলের উদ্যম ক'রে শেষ পর্যন্ত এই শহরটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল ডাচরা। সৈন্যেরা নামার পর এগিয়ে গেল কোচিনের দিকে। পৌঁছাল শহরটির কামানের পাল্লার মধ্যে। শহর ও তাদের মধ্যে ব্যবধান তখন মাঝ দিয়ে বয়ে চলা একটি নদীর। বেল্লে এপাইন

(বইপিন) নামের একটি স্থানে আস্থান নিলে ডাচরা। সেখানকার ভূ-পরিবেশে যেমনটি যা সম্ভব হল পরিখা খনন ক'রে তাতে ঠাঁই নিল সকলে। কয়েক কামান বসিয়ে করল গোলাবর্ষণ। তবে শহরটি তাদের চেয়ে যথেষ্ট দূরে থাকার দরুন সম্ভব হল না তার কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটান। শক্তিবৃদ্ধির জন্য আরো সৈন্য না এসে পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে চলল সেখানেই তারা। কেননা, এই প্রথম দলটিতে এসেছিল মাত্র তিন জাহাজ সৈন্য। তাদের অধিনায়ক ছিলেন অবশ্য তৎকালীন সেরা সাহসী অধিনায়কদের মধ্যে একজন। দিন কয়েক পরেই পৌঁছল এসে অমবোইনা-র (মলক্কা সাগরের একটি দ্বীপ) শাসনকর্তার অধীনে আরো দু জাহাজ সৈন্য। পরে আরো একজন ডাচ অধিনায়ক এলেন কয়েক সিংহলী সেনা নিয়ে। ইওরোপ থেকে নিয়ে আসা সেনার সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে দেশীয় লোককে সেনাদলে নিয়ে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে ডাচরা। নইলে ভারতে তাদের সেনাবাহিনী যতটা বিরাট, সম্ভব হত না শুধু এক বাহিনী সহজে গড়ে তোলা। পরিখায় থেকে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সিংহলী সৈন্যরা বেশ কুশলী, কিন্তু আক্রমণের ক্ষেত্রে একেবারেই কোন কাজের না। অমবোইনা থেকে যারা এসেছিল তারা বেশ কুশলী সৈন্য। তাদের মধ্যে ৪০০ জনকে রেখে দেয়া হল সেন্ট এপাইনের ঘাঁটি আগলানোর জন্য। বাকি সব সৈন্য নিয়ে জাহাজে চেপে এগোন হল এবার। নামল তারা কোচিনের কাছেই সন্ত এ্যাণ্ড্রুর গীর্জার কাছ ঘেঁষে। ডাচদের প্রতিরোধ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পর্তুগীজরা কিছু মালাবারী সেনাসহ অপেক্ষা ক'রে চলছিল সেখানে। (এই মালাবারীরা ছিল মোপলা, এদের অধি-নায়ক ছিলেন ইগনাসিও সেরমেন্টে)। শত্রু সেনাদের নির্ভয়ে ডাঙায় নেমে এগিয়ে আসতে দেখে একপশলা গুলি চালিয়েই পালিয়ে গেল তারা। এই গুলিও তারা নৌকাগুলিকে লক্ষ্য ক'রে চালিয়েছিল বলে হলো না ডাচ পক্ষের তেমন বেশি লোক জখম। ডাচরা (শহরের দিকে) এগিয়ে চলল এবার। দেখল, কয়েক দল পর্তুগীজ সেনা টহল দিয়ে চলেছে সাগর কূলে। আরও কয়েক সজাগ হয়ে অপেক্ষা ক'রে চলেছে সন্ত জিন-এর গীর্জার দিকটিতে। ডাচ বাহিনীর কতক ঘোড়সওয়ারকে আদেশ দেয়া হল তাদের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য। পর্তুগীজরা এবার গীর্জাটিতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেল সব কিছু ডাচ সেনাদের দখলে ছেড়ে দিয়ে। ডাচরা উপস্থিত হল এরপর শহরের ঘের দেয়ালের কাছে। দলে ছিল ক্রিস্তোফাঁ নামের একজন ফরাসী সৈনিক। নজর পড়ল তার প্রাকারের এক বুরুজ থেকে দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা একটি ঝুড়ির দিকে। পলতে

বন্দুকের গুলিকে উপেক্ষা ক'রে দুঃসাহসীর মতো এগিয়ে গেল সে সেটির কাছে। ভেতরে তাকিয়ে একেবারে হতভম্ব। দেখে, রয়েছে ঝুড়িটির মধ্যে কোন দরিদ্র ঘরের হাড্ডিসার চেহারার একটি শিশু। না খেতে পেয়ে চোখের সামনে সন্তানের মরণ দৃশ্য দেখার যাতনা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে তার মা ফেলে রেখে গেছে তাকে এভাবে। কিছুকাল ধরে ডাচরা কোচিন অবরোধ ক'রে রাখার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শহর মধ্যে খাদ্য-প্রবেশ। তারই পরিণতি এ। সৈনিকটি করুণায় অভিভূত হয়ে তুলে নিল শিশুটিকে। নিজের খাবার জন্য যেটুকু যা খাদ্য সঙ্গে ছিল তাই সে খেল তার সঙ্গে ভাগ ক'রে। সেনাধ্যক্ষ দারুণ বিরক্ত হয়ে গেলেন তা দেখে। বললেন, সৈনিকটির উচিত ছিল শিশুটিকে ওই ভাবেই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া। বসানো হল সামরিক পরিষদ, সেখানে প্রস্তাব আনলেন তিনি সৈনিকটিকে এ অপরাধে গুলি ক'রে মারার জন্য। কি নির্মম প্রস্তাব! তবে সামরিক পরিষদ তাতে সায় না দিয়ে দিলেন তাকে লঘু দণ্ড, করলেন বেত্রাঘাতের আদেশ।

সেদিনই প্রতিটি সেনাযূথের দশজন ক'রে সৈন্যকে পাঠান হল কোচিনের রাজার প্রাসাদে অভিযান করার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখল প্রাসাদটি পুরো ফাঁকা। আগের বছরই লুটপাট করেছিলেন এটিকে ডাচ। তারা এরপর হত্যা করল সে অঞ্চলের চারজন রাজা ও ১৭০০ কালা আদমীকে। মাত্র একজন বুড়ো রানীই পালাতে পারলেন যা। কিন্তু ভন রেজ নামের একজন সৈন্য জীবন্ত বন্দী ক'রে আনলেন তাকেও। সেনাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত করলেন তাকে অধিনায়কের পদে। যে গৃহে রানীকে রাখা হল তা প্রহরা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হল পুরো এক কোম্পানী সৈন্যকে। তবে দুদিনমাত্র রইলেন রানী সেখানে। অর্পণ করা হল তাকে জামোরিনের (কালিকটের রাজা) হাতে। এই উপকূল অঞ্চলের ক্ষুদে ক্ষুদে রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার তুলনায় শক্তিশালী। ডাচরা তাকে কথা দিয়েছিল, যদি তিনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে চলেন, তাহলে দেয়া হবে তাকে ক্রাঙ্গানুর শহরটি (মূল নাম কোড়ুঙ্গালূর। পর্তুগীজরা এটিকে দখল করে ১৫২৩-এ। ডাচদের দখলে চলে যায় ১৬৬১-২ তে)।

এরপর (কোচিন দুর্গ প্রাকারের কাছে) কাদামাটি দিয়ে তালের গুঁড়ির ওপরে তালের গুঁড়ি চাপিয়ে ছোট ছোট দুর্গ গড়ে তারই আড়ালে পরিখা খনন ক'রে সেখানে ঠাঁই নিল ডাচ বাহিনী। বসাল জায়গায় জায়গায় কামান। একটি দুর্গ

সাগরকূলবর্তী সন্ত জিন-এর গীর্জার কাছে। বসাল সেখানে চারটি কামান। আরেকটি দুর্গ সন্ত থমাস শহরের কাছে। এখানেই ছিল আহত সৈনিকদের জন্য হাসপাতাল। এবং তার কাছেই রোগাক্রান্তদের হাসপাতাল। কলবেত্তি (বাজারে) র কাছেও (কোচিন শহরের মোপলাদের বসতি এলাকা) বসান হল সাতটি কামান ও দুটি মর্টার। এরপর ক'রে চলল তারা কখনো বোমাবর্ষণ, কখনো বা পাথর বৃষ্টি। তবে পাথর বৃষ্টির দরুনই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল অবরুদ্ধের দল। এই ঘাঁটিটিতেই ডাচদের খোয়াতে হল সব থেকে বেশি লোক। বিশেষ ক'রে একটি ছোট নদীর কূলে। এখানে মাটি ভরাট বস্তা দিয়ে সেতু গড়ে গোপনে নদী পার হবার চেষ্টায় ছিল ডাচরা। কিন্তু দুর্গের একটি বুরুজ ঠিক সেদিকটিতে থাকায় সেখান থেকে আঘাত হেনে ডাচদের কাবু করল পর্তুগীজরা। গোল-মরিচের বিরাট ভাণ্ডারটি ছিল সাগর-ঘেরের মধ্যে। কেউ ছিল না সেখানে তখন। পর্তুগীজরা যেই বুঝতে পারল, শত্রুপক্ষ সেটি দখল ক'রে নেয়ার তালে আছে, তারা তাড়াতাড়ি দুটি কামান সহ কিছু সেনাকে মোতায়েন করল সেখানে। ফলে সেতু বাঁধার পরিকল্পনা বাতিল ক'রে গ্রহণ করতে হল ডাচদের অন্যরকম সব পরিকল্পনা। উল্লেখ করার মতো কোনরকম ঘটনা ছাড়াই পার হয়ে গেল পাঁচটি সপ্তাহ। এরপর এক নৈশ আক্রমণ চালাল ডাচরা। কিন্তু প্রতিপক্ষ দৃঢ় ভাবে প্রতিহত করল তাদের। এই অভিযানে ডাচ পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রাঙ্গানুরের শাসনকর্তা। কিন্তু অধিক মদিরা পানের দরুন হয়ে পড়েছিলেন তিনি মাতাল। ফেললেন নানা ক্রটি বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাই। ফলে দিতে হল বহু সৈন্যকে প্রাণ।

শাসনকর্তা নিজেও হলেন পর্তুগীজদের হাতে বন্দী। যেসব সৈন্যরা তখন পর্যন্ত জীবিত ছিল তাদের তাড়াতাড়ি হটে এসে একটি নৌকায় আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দিলেন ডাচ সেনাধ্যক্ষ। দুমাস পার হবার পর আবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আক্রমণ করার। এবং আগে যেখানটিতে আক্রমণ করা হয়েছিল সেখানেই। একটি বড় রণতরী পাঠিয়ে নিয়ে এলেন এজন্য তিনি নতুন সৈন্য। ঘাঁটি গাড়ল তারা বেল্লে এপাইনের দিকে। কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ রণতরীটি ধাক্কা খেল একটি বালি-চরায়। গেল ডুবে। মারা পড়ল অনেক লোক। যারা সাঁতার জানত তারা অন্য কোথাও যাবার সুযোগ না পেয়ে উঠল গিয়ে শেষপর্যন্ত কোচিনের কাছে। নাবিক ও সৈন্য মিলিয়ে মোটমাট দশজনের মতো। পর্তুগীজরা করল তাদের বন্দী। ফলে আক্রমণ পরিকল্পনাকে সেদিন আর বাস্তবে রূপায়িত

করলেন না সেনাধ্যক্ষ। সমস্ত নাবিকদের নামিয়ে এনে দিলেন তাদের হাতে খাটো বর্শা, হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও তরবারি। ঠিক করলেন, আক্রমণ চালাবেন পরদিন রাতে। কিন্তু সেণ্ট মার্টিন নামের একজন ফরাসী লেফটেনাণ্ট দর্শালেন, রাতে আক্রমণ চালাতে গিয়ে সেনারা হয়তো পড়ে যেতে পারে দুর্গ-প্রাস্তর এখানে সেখানে ক'রে রাখা গর্তের মধ্যে। বরং দিনের বেলা আক্রমণ চালানোই হবে কম ঝুঁকির ব্যাপার। মেনে নেয়া হল তারই পরামর্শ। পরদিন সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হল আক্রমণ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে করা হল যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা। দশটা নাগাদ শুরু করল চারটি সেনাদল মিলে আক্রমণ। প্রতিটি দলে ৫০ জন ক'রে সেনা। এই অভিযানে অনেক সেনাকে হারাল ডাচরা। পর্তুগীজরা হারাল তাদের চেয়ে আরো বেশি। তবে বীরত্বের সঙ্গেই প্রতিরোধ করেছিল তারা শত্রুসেনাদের। আর একাজে তাদের সহযোগিতা করেছিল ২০০ জন ডাচ সৈন্য। (উত্তর জাভার) তুবান শহরটি হাতছাড়া হবার দরুন সাড়ে ছ মাসের মাইনে আটকে রাখায় এবা সকলেই তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ডাচ বাহিনী ছেড়ে যোগ দিয়েছিল পর্তুগীজ বাহিনীতে। এদের সাহায্য না পেলে এ দু মাস কাল শহরটির অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হত না পর্তুগীজদের পক্ষে। সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রতিরোধ করেছিলেন এই বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন ডাচ ইঞ্জিনিয়ার। আপন পক্ষ থেকে খারাপ ব্যবহার মেলায় যোগ দিয়েছিলেন ইনিও শত্রুপক্ষের সঙ্গে।

কর বেত্তির দিক থেকে যে-সব ডাচ সৈন্যরা কোচিন প্রবেশ করেছিল তারা ইতিমধ্যেই দখল ক'রে নিয়েছিল নগর-প্রাকারের একাংশ। এবং সারারাত অস্ত্র হাতে সজাগ হয়ে রইল সেখানে। পরদিন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করল শহর। যুদ্ধে নিহত কতক পাদরীর মৃতদেহ সরিয়ে নেয়ার জন্য এলেন পর্তুগীজরা। অন্য সকলের মৃতদেহ ডাচদের কাছে কর্মরত চীনারাই টেনে নিয়ে নিয়ে ফেলে দিল নদীজলে। পর্তুগীজ ও ডাচ উভয় পক্ষের সেনাদের মরদেহ-ই। আহতদের ভর্তি করা হল হাসপাতালে। বিদ্রোহী ইঞ্জিনিয়ারটি সহ পর্তুগীজ পক্ষের আর যারা সুযোগ পেলেন তারা আগের রাতে গা ঢাকা দিয়ে জাহাজে চেপে ডাচ জাহাজ পরিচয় দিয়ে পালিয়ে গেলেন ডাচ জাহাজ ব্যূহ ভেদ ক'রে। আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও তল্পিতল্পা নিয়ে কোচিন ত্যাগ করল পর্তুগীজরা এরপর। কিন্তু যেই তারা শহরের বাইরে এল, অমনি যুদ্ধ-প্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ডাচ সেনাদল বাধ্য করল তাদের সেনাধ্যক্ষের পায়ের কাছে

অস্ত্র সমর্পণ করতে। ব্যতিক্রম করা হল একমাত্র যা পদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই, দেয়া হল তাদের তরবারি রাখার সুযোগ। (১৬৬৩ অব্দে ডাচরা অধিকার করে এ শহরটি)। সেনাধ্যক্ষ শহর লুটের সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেনাদের। কিন্তু বাস্তবে সম্ভব হল না সে অনুমতি দেযার। কেন তিনি আপন প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না তা সৈন্যদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে ভরসা দিলেন সকলকে ছ মাসের মাইনে পুরস্কৃত করার। দিন কয়েক পরেই সে পুরস্কারের অঙ্ক কমিয়ে করা হল জন পিছু আট টাকা। জামোরিন তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো চাইলেন এবার ক্রাঙ্গানুর শহরটি। রাখা হল অবশ্য সে প্রতিশ্রুতি। তবে জামোরিনের হাতে তা সমর্পণের আগে সেনাধ্যক্ষ, সেখানকার সমস্ত প্রতিরক্ষা স্থাপত্যগুলি ধ্বংস ক'রে দেয়ালগুলিই দিলেন তাকে যা। জামোরিন খুব অসন্তুষ্ট হলেন এতে। জীবিত সেনাদের অধিকাংশকেই এরপর নির্দেশ দেয়া হল এই উপকূল অঞ্চলের ক্ষুদে রাজাদের অন্যতম পোরকাদ (বন্দরের) রাজার রাজ্যের দিকে চুক্তি সম্পাদনার্থে এগিয়ে যাবার জন্য। এসময়ে যিনি ডাচ সেনাধ্যক্ষের পদে ছিলেন, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ভৃত্য। প্রকৃতির দিক থেকে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বর্বর। পোরকাদের দিকে এগোতে গিয়ে পথে চার দিনের মধ্যেও কোন খাদ্য কেনার সুযোগ পেল না সেনারা। এ অবস্থায় দুজন সৈনিক একটি গরু চুরি ক'রে তাকে জবাই করল রেঁধে খাবার জন্য। সেনাধ্যক্ষের কানে সে-খবর পৌঁছন মাত্র দুজনের একজনকে ফাঁসীতে ঝোলালেন তিনি। অন্য জনকে চেয়েছিলেন গুলি ক'রে মারতে। তবে, পোরকাদের রাজার হস্তক্ষেপ ফলে বেঁচে গেল তার জীবন।

পোরকাদের রাজার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর সেনা-গণনার আদেশ দিলেন ডাচ সেনাধ্যক্ষ। দেখা গেল, নাবিক ও সেনা মিলিয়ে জীবিত রয়েছে মোট ছয় হাজারের মতো লোক। অন্যরা মারা পড়েছে হয় যুদ্ধে নয়তো রোগে। কয়েকদিন পরেই নির্দেশ দিলেন তার একাংশকে কান্নানোর শহর অবরোধ করার জন্য। করা হল তাই। এবং বিনা প্রতিরোধেই এসে গেল সে-শহরটি তাদের অধিকারে। তারা সফল হয়ে ফিরে আসার পর সেনাধ্যক্ষ কোচিনের রাজাকে বিতাড়িত ক'রে রাজমুকুট তুলে দিলেন নতুন একজনের মাথায়। এজন্য নির্ধারিত বিশেষ উৎসবের দিন সেনাধ্যক্ষ নিজে আসীন হলেন সিংহাসন-তুল্য একটি আসনে। দু'তিন জন ডাচ অধিনায়ক মনতানি নামের এক মালাবারীকে তখন উপস্থিত করলেন তার সম্মুখে। নতজানু হয়ে সে সেনাধ্যক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করল

রাজমুকুট। অর্জন করল অতি সীমিত একটি রাজ্যের ওপর আধিপত্য। কোচিনের আশেপাশের এক ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে সেটি গড়া। হল্যাণ্ড থেকে এই সেনাধ্যক্ষ যখন এদেশে আসেন তিনি ছিলেন তখন জাহাজের এক রাঁধুনে মাত্র। যে সেনাধ্যক্ষ তরবারির চেয়ে হাতা-খুন্তিই নাড়াচাড়া করেছেন বেশি তার হাত থেকে এক দীন মালাবারীর এই রাজমুকুট গ্রহণের দৃশ্য সত্যিই দর্শন করার মতো। (২২শে মার্চ ১৬৬৩-তে অনুষ্ঠিত এক চুক্তি অনুযায়ী জেনারেল হাসটার্ট কোচিনের সিংহাসনে বসান এসময়ে বীরকেরল-কে)।

কোচিনে আত্মসমর্পণকারী পর্তুগীজদের গোয়ায় পৌঁছে দিতে যে ডাচ জাহাজগুলি গিয়েছিল তা ফিরে এল ইতিমধ্যে। লুটের মালে বোঝাই সেগুলি। আত্মসমর্পণের শর্তের ঠিক বিপরীত কার্যকলাপ এটি। তখন শর্ত হয়েছিল, পর্তুগীজদের অস্ত্রশস্ত্র ও তল্পিতল্পা সহ পৌঁছে দেয়া হবে গোয়ায়, কেড়ে নেয়া হবে না কোনকিছুই। কিন্তু যেই তাদের সমুদ্রে আনা হল অমনি ওইসব হতভাগ্য লোকদের কঠোরভাবে তল্লাসী ক'রে কেড়ে নেয়া হল সবকিছু। সে তল্লাসীর বেলা নারী পুরুষ বাছবিচার করা হল না পর্যন্ত। এবার ফিরে এসেছে জাহাজগুলি সেই লুটের মাল নিয়েই।

ডাচ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ফিরে গেলেন এরপর বাটাভিয়ায়। শহর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ছাড়া ফিরে গেল অন্য সব সৈনিকরাও। পাঠান হল বাটাভিয়া থেকে নতুন একজন শাসনকর্তা। শহরটি সুরক্ষিত করার জন্য করালেন তিনি সৈন্যদের দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম। এত বড় বিস্তীর্ণ এলাকা প্রহরা দেয়া দুঃসাধ্য বলে সেন্ট জন গীর্জার ফটক থেকে সেন্ট পল গীর্জা পর্যন্ত এলাকা এবং সমগ্র কলবেত্তি অঞ্চলটি ছাঁটাই ক'রে দিলেন তিনি শহর থেকে। শহর বিজয়ের অল্পকাল পর থেকেই খাদ্যসামগ্রীর দরদাম খুব সস্তা হয়ে গেল কোচিনে। কিন্তু বেশি দিন আর টিঁকে রইল না তা শাসনকর্তার পদক্ষেপ ফলে। সাথে সাথে তামাক ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ওপর লাগু করলেন তিনি কর। এসব সামগ্রী মাত্র একজন ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে শুরু ক'রে দিলেন তিনি যেমন খুশী দর নেয়া। সৈন্যদের প্রতিও দেখালেন শাসনকর্তা খুব কঠোর মনোভাব। শহরেই আবদ্ধ ক'রে রাখলেন তাদের। বলতে গেলে একরকম কারাগারে বন্দী জীবনই যাপন ক'রে চলল তারা। অত্যধিক কর চাপানোর ফলে তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ল মদ, সুরি (তাড়ি) বা ব্রাণ্ডি কিনে খাওয়া। এই সুরি তালগাছ থেকে মেলা এক ধরণের পানীয়। পর্তুগীজরা যখন কোচিনে প্রভুত্ব

করছিল তখন একজন ব্যক্তি পাঁচ সোল খরচ ক'রে যতটা ভাল থাকতে পারছিল ডাচ আমলে দশ সোল খরচ করেও সম্ভব হল না ততটা ভাল থাকা। কেননা, শহরের ওপর কখনো করের বোঝা চাপায়নি পর্তুগীজরা। এই শাসনকর্তা এত উগ্র মনোভাবের লোক ছিলেন যে সামান্যতম ত্রুটির জন্যও কোন লোককে নির্বাসিত করতেন সিংহলে। লাগানো হত সেখানে তাদের ইট গাঁথুনির কাজে। কখনো পাঁচ বা ছয় বছর, কখনো-বা সারা জীবনের জন্য। তবে যাদেরই পাঠান হত, শাস্তির মেয়াদ অল্প কয়েকবছর হলেও, ফিরতে দেখা যেত না কখনো আর তাদের।

রচেপট নামের একজন ডাচ সৈনিক কোচিন থেকে পালিয়ে হাজির হয়েছিলেন মাদ্রাজে। স্থলপথ ধরে তারপর এলেন তিনি সুরাট। শেষে সেখান থেকে আগ্রা ও দিল্লী। তার কিছুদিন পরে আমিও আমার শেষ ভ্রমণ সূত্রে পৌঁছলাম দিল্লীতে। সে অভাবের মধ্যে রয়েছে জেনে নিলাম আমার চাকুরিতে। ফিরে আসার বেলা দিয়েছিলাম কিছু টাকাও তাকে ধার। কিন্তু তা আর কখনো ফেরত দেয়নি সে। এই রচেপট-এর কাছ থেকেই সেখানকার পথবৃত্তান্ত শোনার সুযোগ হয়েছিল আমার। এছাড়া আরো পনের কুড়িজনকে আমি জানি যারা এসেছে ওই একই পথ ধরে গোয়া থেকে কোচিন ও কোচিন থেকে মাদ্রাজ।

এই সড়কপথ বেশ সংক্ষেপ। ভাল জল এবং খাদ্যেরও কোন অভাব নেই পথে। রয়েছে তবে অন্যান্য ধরনের কিছু অসুবিধা। যেমন, পথে লোক চলাচল খুবই কম। তবে, তার চেয়েও বেশি বিরক্তিকর লোকের জ্বালাতন। এবং বেণিয়াদের শুচিবাইগ্রস্ততা। এরা ছুঁতে দেয় না অন্য কোন লোককে নিজেদের দেহ কিংবা বাসগৃহ। এমনকি যদি কেউ তাদের পুকুর থেকে জল নেয় তবে দেয় সেটিকে পর্যন্ত বুজিয়ে (প্রকৃতপক্ষে জল বার ক'রে তারপর শাস্ত্রীয় মতে শুদ্ধ ক'রে নেয় পুকুরটিকে।) এই কারণে যাতে বিজাতীয় কেউ পুকুরের জল না ছোঁয় সেজন্য পাহারা দেয় সেগুলিকে তাদের পুরোহিতরা।

পনেরো ॥ হরমুজ থেকে মসুলিপত্তম যাবার পথ পরিচয়

১৬৫২-র ১১ই মে ছাড়লাম গোমব্রুন। করলাম গোলকুণ্ডার রাজার একটি বড় জাহাজে চেপে মসুলিপত্তম যাত্রা। প্রতিবছর পারস্য যায় এই জাহাজটি

মসলিন ও চিট্‌জ বা রঙীন বস্ত্রসম্ভার নিয়ে। এগুলির ওপর থাকা ফুলের কাজগুলি করা হয়ে থাকে পুরোপুরি হাতে। ফলে ছাপা কাপড়ের চেয়ে এগুলি যেমন বেশি সুন্দর তেমন অধিক দামী। রাজা মহারাজাদের জাহাজগুলিতে ডাচ কোম্পানি থেকে রেওয়াজ রয়েছে একজন ক'রে পথ-দিশারী ও সহকারী পথ-দিশারী এবং দু-তিনজন ক'রে কামানচী সরবরাহ করার। কেননা, কি ভারতীয়, কি পারসিক উভয়েরই নৌ-চালনার অভিজ্ঞতা অতি কম।, এ জাহাজটিতে ছিল তাই ছজন ডাচ এবং একশোর মতো দেশীয় নাবিক। যখন পারস্য উপসাগর ত্যাগ করলাম বাতাস ছিল মৃদু ও অনুকূল। কিন্তু কিছুদূর পাড়ি দিতে না দিতেই মুখোমুখি হলাম বিক্ষুব্ধ সাগর ও উত্তাল দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহের। এই বায়ুপ্রবাহ আমাদের গন্তব্য পথের দিকে এগিয়ে চলার সহায়ক হলেও সম্ভব ছিল না ছোট একটির বেশি পাল খাটানো। পরের দিন বাতাস হয়ে উঠল আরো বেশি দুরন্ত। পরদিন আরো বেশি। সাগরও ক্রমশঃ আরো বেশি উত্তাল। ফলে, যখন আমরা গোয়ার অক্ষাংশ ১৬ ডিগ্রীতে এসে পৌঁছলাম (গোয়ার অক্ষাংশ ১৫°৩০´ উঃ) শুরু হল বৃষ্টি, দেখা দিল বজ্র-বিদ্যুৎ সহ প্রবল বাত্যা। শামিয়ানা ছাড়া কোন পাল তোলা সম্ভব হল না আর। এবং সেটও রাখতে হল আধা মেলা অবস্থায়। ঝড়-বাত্যার মধ্য দিয়ে গতি ক'রে চললাম এভাবে বেশ কিছু দিন। মাল দ্বীপপুঞ্জকে না দেখেই যেতে হল তাকে পাশ কাটিয়ে। ঢুকে চলল জাহাজের মধ্যেও প্রচুর জল। গ্রীষ্মকালে প্রায় পাঁচ মাস গোমব্রুন-এ জলের মাঝে পড়ে ছিল জাহাজটি। ওই সময়ে জলের ওপরে থাকা কাঠগুলিকে যদি ভিজিয়ে রাখার দিকে যত্ন না নেয়া হয়, ফাঁক হয়ে যায় তার জোড় মুখগুলি। জাহাজে মাল বোঝাই করা হলেই ভেতরে জল ঢুকতে শুরু ক'রে তখন। সকাল বিকাল জল ছিটিয়ে জাহাজগুলিকে ভিজিয়ে রাখার দিকে ডাচরা সদা-সতর্ক। নইলে ঝড়ের মুখে পড়লে দেখা দেয় জাহাজ ডুবে যাবার আশঙ্কা। জাহাজটির মধ্যে ছিল ৫৫টি ঘোড়া। পারস্যের শাহ গোলকুণ্ডার রাজার কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন এগুলি। ছিল এছাড়াও ১০০ জনের মতো সওদাগর। পারসিক ও আরমেনিয়ান। বাণিজ্যের জন্য চলেছেন তারা ভারতে। পুরো একটি দিন-রাত এমন প্রচণ্ডবেগে বাতাস বয়ে চলল যে চারিদিক থেকে জল ঢুকে চলল জাহাজ মধ্যে। আমাদের পাম্পগুলি ভালো না হওয়ার দরুন সৃষ্টি হল এক জটিল পরিস্থিতি। সৌভাগ্যবশতঃ সঙ্গের একজন সওদাগর সাথে নিয়ে চলছিলেন দুই বোঝা গরুর চামড়া। আমরা যাকে রাশিয়ান চামড়া বলি তাই। এগুলি বেশ

শীতল বলে দিনের বেলায় তা বিছানার ওপর পেতে ঘুমোয় লোকে। এবং এই কারণে বেশ দামী এগুলি। চার-পাঁচজন জুতা বা ঘোড়ার জিন প্রস্তুতকারকও ছিলেন জাহাজে। এ চামড়া কিভাবে সেলাই করতে হয় জানতেন তারা তা ভাল করেই। ফলে দারুণ উপকারে এলেন তারা এ সময়ে। চার-চারটি ক'রে চামড়া জুড়ে এক একটি বড় বড় জলের পাত্র তৈরী করলেন তারা। করলেন নিচের ডেকের বিভিন্ন স্থান কেটে পাঁচটি বড় ফোকর। তারপর জাহাজের একদল খালাসী সেগুলি জল ভরাট ক'রে ওই ফোকর দিয়ে তুলে দিতে থাকলেন ওপরে। প্রতিটি চামড়ার সঙ্গেই লাগানো হয়েছিল একটি ক'রে জলের পাইপ। আর টেনে তোলার জন্য প্রধান মাস্তুল থেকে সামনের মাস্তুল পর্যন্ত টাঙানো হয়েছিল একটি মোটা দড়ি। আটকানো তার সঙ্গে ঠিক যতগুলি জলের ভিস্তি ততগুলো পুলি। প্রতিটি ভিস্তি টেনে তুলে জল বাইরে ফেলে দেয়ার জন্য লাগিয়ে দেয়া হল যাত্রীদের। এবং ভিস্তি পিছু যতজন লোক দরকার তার চেয়েও বেশি লোককে। ফলে এক কি দেড়-ঘন্টারও কম সময়ে সব জল বার ক'রে দেযা হল জাহাজ থেকে। এই দিনই প্রচণ্ড বাত্যাকালে ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। তিনটি বজ্রপাত হল আমাদের জাহাজটির ওপর। প্রথমটি পড়ল সামনের মাস্তুলের ওপরে। ফলে ডগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ফালি হয়ে গেল সেটি। তারপর মাস্তুল ছেড়ে ডেকে নেমে ছুটে গেল লম্বালম্বি পুরো জাহাজ বরাবর। ছোটার পথে ঘটালো তিন জনের মৃত্যু। দ্বিতীয়টি পড়ল তার দু'ঘন্টা পরে। গতি করল জাহাজের গলুই থেকে পিছন পর্যন্ত। মারা পড়ল ডেকে থাকা দুজন লোক। তৃতীয়টি পড়ল তার অল্প পরেই। জাহাজের দিশারী, সহকারী দিশারী ও আমি দাঁড়িয়ে তখন একসঙ্গে প্রধান মাস্তুলের কাছে। নৈশ ভোজ এখন পরিবেশন করা হবে কিনা তা দিশারীর কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য এগিয়ে আসছিল এসময়ে রাঁধুনে। বজ্রাঘাতের ফলে রাঁধুনের পেটে ছোট একটি ছেঁদা হয়ে গেল, সমস্ত চুলগুলো পুড়ে গিয়ে দেহটা হয়ে গেল ঝলসানো শূকরের মতো। তবে, আর কোন ক্ষতি হল না তার। কিন্তু যখন ওই ছোট্ট ছেঁদাটিতে নারকেল তেলের প্রলেপ দেয়া হল জোরে চেঁচিয়ে চলল সে সুতীব্র যন্ত্রণায়।

২৪ শে জুন সকালে ডাঙার দর্শন পেলাম আমরা। আরো কাছে এসে জানা গেল সিংহল দ্বীপের প্রধান শহর পয়েন্ট দ্য গ্যালি পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি কিছুটা। পর্তুগীজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এ শহরটি ডাচরা। এখান থেকে মসুলিপত্তম পর্যন্ত চলল বেশ ভাল আবহাওয়া। পৌঁছলাম সেখানে এসে

২-রা জুলাই সূর্যোদয়ের এক কি দু'ঘন্টা পরে। আমাদের দিশারী ডাঙায় নেমে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ডাচ অধিনায়ককে অভিবাদন জানাতে। তিনি যখন শুনলেন যে মঁসিয়ে লুই দ্যু জর্‌ডিনের সঙ্গে এসেছি আমিও এ জাহাজে, সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে যাবার জন্য দুটি ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন আমাদের জাহাজঘাটায়। তার বাড়িটি সেখান থেকে অন্ততঃ আধক্রোশ দূরে। অধিনায়ক ও ডাচ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যথেষ্ট ভদ্রতা সহকারে স্বাগত জানালেন আমাদের। থাকার জন্য দুখানি ঘরের ব্যবস্থা ক'রে জোর পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দিলেন তাদের সঙ্গে থাকার জন্য। শুধু প্রথম রাতের জন্য স্বীকার ক'রে নিলাম তাদের আতিথ্য। পরদিন চলে গেলাম আমরা মঁসিয়ে হারকিউলিসের আবাসে। ইনি সুইডেনবাসী। চাকুরী করেন ডাচ কোম্পানীর অধীনে। বিবাহিত ব'লে শহর মধ্যে একটি বাড়ি ছিল তার। স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য বাস ক'রে চললাম তারই সাথে। ডাচ অধিনায়ক আগ্রহ ক'রে চললেন তার বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ, সেখানে থাকার জন্যও ক'রে চললেন অতি পীড়াপীড়ি। বার দু তিনেক গেলাম তার সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে শহর থেকে আধ ক্রোশ দূরে থাকা ডাচদের মনোরম বাগানটিতে। ডাচদের মধ্যে দু-তিনজন ছিলেন বিবাহিত। তাদের স্ত্রীরাও সঙ্গী হলেন এই প্রমোদ ভ্রমণে। আমরাও তাদের আপ্যায়িত করলাম পারস্য থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা উৎকৃষ্ট ফল-ফলাদি ও ভাল মদিরা পরিবেশন ক'রে। মঁসিয়ে দ্যু জরডিন পারতেন ভাল নাচতে ও বীণা বাজাতে, সুতরাং তিনিও যথেষ্ট আনন্দ দিলেন তাদের। আমাদের ছোট পার্টিগুলিতে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজরাও। তারাও দু-তিনবার মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে আপ্যায়ন করলেন আমাদের। ভোজের পর প্রত্যেকবারই করা হয়েছিল নর্তকীদের নাচের আয়োজন। এদেশে মোটেই অভাব নেই নর্তকীর।

১৮ই ও ১৯শে জুন কিনলাম আমরা একটি পালকি, তিনটি ঘোড়া, এবং ছটি ষাঁড়। মালপত্র, চাকর-বাকর ও আমাদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ঠিক করেছিলাম সরাসরি গোলকুণ্ডায় চলে যাব আমরা, রাজার কাছে। উদ্দেশ্য কতক নাশপাতি আকারের মুক্তো বিক্রী করা তার নিকটে। এই মুক্তোগুলির মধ্যে যেটি কম ওজনের সেটিও ২৪ ক্যারেট। আর, সবার বড়টি ৩৫ ক্যারেটের। ছিল এছাড়া কতক রত্ন-পাথরও। বেশির ভাগই তার পান্না। কিন্তু ডাচরা আমাদের জানাল, বৃথা হবে সেখানে যাওয়া। কেননা, আপন সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলাকে না দেখিয়ে বিরল বা বিপুল দামের কোন কিছুই কেনেন

না রাজা। অথচ মীর জুমলা গেছেন কর্ণাটক প্রদেশে রাজা গণ্ডীকোট অবরোধের জন্য। তখন আমরা ঠিক করলাম আগে তার কাছেই যাব খুঁজে পেতে।

ষোলো ॥ মসুলিপত্তম থেকে কর্ণাটক প্রদেশের দুর্গ-শহর গণ্ডিকোট যাবার পথ পরিচয় ও গোলকুণ্ডা কর্তৃক গণ্ডিকোট অধিকার বৃত্তান্ত

ছাড়লাম মসুলিপত্তম, রওনা হলাম মীর জুমলার উদ্দেশ্যে। ২০ শে জুনের বিকাল পাঁচটা তখন (প্রকৃতপক্ষে জুলাই ১৬৫২)। শহরের ফটক সন্ধ্যা পার হলেই বন্ধ হয়ে যাবে বলে, আগে ভাগে বেরিয়ে পড়ে আশ্রয় নিলাম শহরের আধ কোশ দূরে পাকা একটি বাগিচায়। বাগিচাটি ডাচদের। তাদের প্রধান এগিয়ে দেয়ার জন্য সঙ্গী হলেন আমাদের। বেশ কিছুটা রাত পর্যন্ত কাটালাম গল্প-গুজব আনন্দ-ফূর্তি ক'রে। পরের দিন ২১ তারিখ ডাচদের কাছে বিদায় নিয়ে করলাম তিনকোশ পথ পরিক্রমা। রাতের ঘুম দিলাম নিলমোল (নিডুমুলু)-এ। ২২ তারিখে (জুলাই) ছকোশ পথ পেছনে ফেলে থামলাম ঔহির (ঔয়ুরু) নামের একটি গাঁয়ে এসে। পথে ভেলায় চেপে পার হতে হল একটি নদী। (কৃষ্ণা নদীর মোহনাগুলির একটি)। ২৩ তারিখে ৬ ঘন্টা পথ চলার পর আশ্রয় নিলাম একটি হত দরিদ্র গ্রামে। নামটি তার পতমত। বৃষ্টির দরুন পরের তিনটি দিন চুপ হয়ে বসে থাকতে হল সেখানেই।

রওনা হলাম আবার ২৭ তারিখে (জুলাই)। পথঘাট জলে ডুবে থাকায় হয়ে উঠল না সেদিন আর দেড় কোশের বেশি পথ পাড়ি দেয়া। বেজোয়াড়া নামের একটি বড় শহরে পৌঁছে থেকে গেলাম সেখানেই। বৃষ্টির দরুন নদীতে এমন জলস্ফীতি ঘটেছে যে তার প্রখর স্রোতের ফলে অসম্ভব হয়ে পড়েছে বিপরীত দিকে নৌকা চালানো। নদীর এপার ওপার দড়ি টানা দিয়ে কিভাবে নৌকা পার করা যায় জানে না সে কায়দা এরা। তাই ৩১ তারিখ পর্যন্ত থেকে যেতে হল ওই শহরেই। দেরির আরও একটি কারণ হল পারস্যের শাহের পাঠানো ঘোড়াগুলিকে নদী পার করানো নিয়ে দেখা দেয়া সমস্যা। ইতিমধ্যে খসে গিয়েছে তাদের সংখ্যা পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চাশে। পাঁচটি মারা পড়েছে সাগর পাড়িকালেই।

নবাব বা প্রধান ওয়জীর মীর জুমলা না দেখা পর্যন্ত রাজা কিছু গ্রহণ করেন না বলে সেগুলিকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার কাছে গণ্ডীকোটে।

বেজোয়াড়ায় থাকা কালে দর্শন করলাম অনেকগুলি মন্দির। অসংখ্য মন্দির ছড়ানো এদেশ জুড়ে। ভারতের অন্য যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা বেশি। কারণও আছে এর। এ অঞ্চলের শাসনকর্তারা ও তাদের কতক কর্মচারী মুসলমান হলেও বাকি তার সকলেই পৌত্তলিক। বেজোয়াড়া শহর মধ্যে থাকা মন্দিরটি সত্যিই অতি সুন্দর। তবে দেয়াল ঘেরা নয়। কুড়ি ফুট বা তার কাছাকাছি উঁচু ৫০টি স্তম্ভের ওপর বড় বড় কাটা-পাথর দিয়ে গড়া সমতল ছাত। অসংখ্য মূর্তি খোদাই ক'রে রূপের অলুব ফোটান হয়েছে স্তম্ভগুলিতে। ভয়ঙ্কর-দর্শন দানব ও জীব-জন্তুর মূর্তি। দানবগুলির কারো বা মাথায় চারটি শিঙ, কারো বা বহু পা, কারো বা বহু লেজ। কেউ বা জিভ বার করা, অন্যেরা নানা রকম অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। মেঝের পাথরগুলিতেও খোদাই করা রয়েছে এই একই ধরনের সব মূর্তি। স্তম্ভ-গুলির মাঝের ফাঁকে ফাঁকে উঁচু বেদীর ওপরে বিভিন্ন দেবতাদের বিগ্রহ। বিস্তীর্ণ একটি মুক্তাঙ্গনের মাঝে গড়া হয়েছে মন্দিরটি। অঙ্গনটি যতটা চওড়া লম্বায় তার চেয়ে বেশি। চারদিক দেয়াল ঘেরা। সেই দেয়ালের দুপিঠেও মূল মন্দিরটির মতো একই ধরনের দানব ও জীব-জন্তুর মূর্তি খোদাই। ভেতরে, দেয়ালের চারদিক ঘিরে খিলান ঢাকা পথের অনুরূপ ৬৬টি স্তম্ভের ওপর আশ্রিত টানা দরদালান। বিরাট এক ফটক দিয়ে ঢুকতে হয় ওই অঙ্গনে। ফটকের মাথায় একের ওপর আর দু'টি কুলঙ্গি। নিচেরটি বারোটি স্তম্ভের ওপর খাড়া। ওপরেরটি ছটি স্তম্ভের ওপর। মূল মন্দিরটির স্তম্ভগুলির গোড়ায় লেখ উৎকীর্ণ রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায়। সেগুলির পাঠোদ্ধার করা এদের পুরোহিতদের পক্ষেও বেশ কষ্টসাধ্য।

দেখতে গেলাম আরো একটি মন্দির। অনেক উঁচুতে গড়া। এক ফুট ক'রে উঁচু ১৯৩টি সোপান বেয়ে যেতে হয় সেখানে। মাথায় চূড়া সহ সমবাহু আকারের মন্দিরটি। (শহরের পূর্ব ও পশ্চিমের পাহাড়গুলিতে রয়েছে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এটি তার মধ্যে কোনটি, ঠিক ঠিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি তা।) মাঝে এদেশীয় প্রথায় আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে বসে থাকা ভঙ্গিমায় একটি বিগ্রহ। বিগ্রহটি চার ফুটের মতো উঁচু। মাথায় একটি ত্রিস্তর মুকুট। তা ভেদ ক'রে প্রকটিত হয়েছে চারটি শিঙ। মুখটি মানুষের ও তা পূবমুখি। যে সব তীর্থ পিপাসু এখানে পূজা দিতে আসেন, তারা তাদের দুহাত জোড় ক'রে

বার বার কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে এগিয়ে চলেন বিগ্রহটির দিকে। মুখে আবৃত্তি ক'রে চলেন রাম রাম ধ্বনি। তার মানে, ভগবান! ভগবান! কাছে এসে মূর্তিটির দেহের সঙ্গে ঝোলান একটি ঘন্টায় তিনবার শব্দ তোলেন পরপর। বিগ্রহটির মুখ ও দেহের বিভিন্ন অংশে আগে থেকেই রয়েছে বিভিন্ন রঙের প্রলেপ মাখানো। পূজার্থীদের কারো সঙ্গে রয়েছে তেলের বোতল, তা বিগ্রহের গায়ে মাখিয়ে দেবেন বলে। তারা নিবেদন করেন বিগ্রহের কাছে চিনি, তেল, নানা রকম খাদ্য-সামগ্রী। যারা ধনী তারা দেয় সেই সাথে অর্থও। মন্দিরটির দেখাশোনা করার জন্য রয়েছেন ষাটজন পুরোহিত। বিগ্রহের কাছে যে সব সামগ্রী নিবেদন করা হয় তাই দিয়ে চলে তাদের সংসার। নিবেদনকারীরা যাতে মনে করেন দেবতাই ভোগ করে তা, এজন্য পুরোহিতেরা ফেলে রাখে ওই সব সামগ্রী দুদিন ধরে বিগ্রহের সুমুখে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আত্মসাৎ করে তা। যখন কোন তীর্থযাত্রী কোন বিশেষ শোক-দুঃখ-ব্যাধি থেকে মুক্তি কামনায় এই মন্দিরে যান, সঙ্গে নেন তখন আপন সাধ্য মতো সোনা, রূপা বা তামা দিয়ে গড়া ওই কষ্টভোগ ক'রে চলা ব্যক্তির একটি মূর্তি। উৎসর্গ করেন সেটিকে দেবতার কাছে। এরপর ক'রে চলেন তিনি গান। পূজা শেষে প্রত্যেক যাত্রীই ক'রে থাকেন এটি। মন্দিরটির দরজার সুমুখে রয়েছে একটি ষোল স্তম্ভ শোভিত সমতল-ছাত মণ্ডপ। বিপরীত দিকে রয়েছে চার স্তম্ভের আরেকটি মণ্ডপ। এখানে করা হয় মন্দিরের পুরোহিতদের জন্য রান্নাবান্না। দক্ষিণ দিকে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে একটি বিরাট মঞ্চ। নানা সুন্দর সুন্দর গাছ দিয়ে সেটি ছায়া ঘেরা। রয়েছে একটি চমৎকার কুয়োও সেখানে। বহু দূর দূরান্ত থেকে আসেন তীর্থযাত্রীরা। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র থাকলে ধনী পুণ্যার্থীদের কাছে মেলা দান দিয়ে তাদের খাদ্য যোগান পুরোহিতেরা। এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রধান উৎসবটি হয়ে থাকে অক্টোবর মাসে। ওই সময়ে চতুর্দিক থকে দর্শনার্থীরা এসে বিরাট ভিড় জমায় এখানে। আমরা যখন গেলাম, দেখি একজন স্ত্রীলোক হত্যা দিয়ে পড়ে আছে সেখানে তিনদিন ধরে। থেকে থেকে দেবতাকে প্রশ্ন ক'রে চলেছে, স্বামীকে হারিয়ে কি ক'রে এবার সে করবে তার ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন। একজন পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলাম, কেন এ স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর পাচ্ছে না দেবতার কাছ থেকে? সত্যিই কি কোন উত্তর পাবে সে? তিনি বললেন, দেবতা যতক্ষণ পর্যন্ত না সদয় হবেন ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে। সদয় হলে তবেই দেবতা উত্তর দেবেন তার প্রশ্নের। উত্তর শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার

সন্দেহ হল দেবতা কথা বলার পেছনে নিশ্চয়ই রয়েছে কোন লোক ঠকানো চাতুরী। ঠিক করলাম, যখন কোন পুরোহিত সেখানে থাকবে না, তখন ঢুকব একবার মন্দিরটিতে। যখন তাদের খাবার সময় হল মাত্র একজন ছাড়া চলে গেল আর সবাই। ঠিক দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই পুরোহিতটিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম তাকে তিন বন্দুকের গুলি দূরে থাকা একটি ঝরনা থেকে এক পাত্র জল এনে দেয়ার জন্যে। সে চলে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি মন্দিরে। স্ত্রীলোকটি আমায় দেখে দ্বিগুণ জোরে জানিয়ে চলল তার আকুতি। দোর ছাড়া আর কোথাও দিয়ে ঢোকে না মন্দিরটিতে এতটুকু আলো। ভেতরটা তাই রীতিমতো অন্ধকার। বিগ্রহটির পিছন দিকে কি ব্যাপার-স্যাপার তা দেখার জন্য হাতড়ে হাতড়ে চলে গেলাম সেখানে। দেখি, একটি ফোকর রয়েছে সেখানে, যেখান দিয়ে দিব্যি ভেতরে গলে যেতে পারে একটি মানুষ। পুরোহিত নিঃসন্দেহে এর মধ্য দিয়ে ভেতরে গলে তার মুখ দিয়ে কথা বলায় দেবতাকে। এই দুঃসাহসী কার্যটি শেষ ক'রে ফেলার আগেই পুরোহিত জল নিয়ে হাজির। আমায় ভেতরে দেখে শুরু ক'রে দিলে শাপ শাপান্ত। তাদের মন্দিরটিকে অপবিত্র ক'রে ফেলেছি নাকি আমি। তাড়াতাড়ি তার হাতে দুটি টাকা গুঁজে দিয়ে রচনা ক'রে ফেলা হল মৈত্রী সম্পর্ক। তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে খেতে দিল আমায় একটি পান।

৩১ তারিখে করলাম আবার বেজোয়াড়া থেকে যাত্রা শুরু। পার হলাম নদীটি (কৃষ্ণা)। আট-নদিন ধরে বর্ষণের ফলে জলস্ফীতির দরুন সেটি তখন আধ কোশের মতো চওড়া। ওপারে পৌঁছে, তিন কোশের মতো এগিয়ে যাবার পর দেখা পেলাম একটি মন্দিরের। উঁচু ভিতের 'পরে গড়া। ১৫ / ২০টি সোপান বেয়ে ঢুকতে হয় মন্দিরে। রয়েছে সেখানে কালো পাথরে গড়া একটি ধেনু সহ বিভিন্ন রকমের বিগ্রহ। এক একটি চার-পাঁচ ফুট ক'রে উঁচু। সবগুলিই বিকৃত-দর্শন। কোনটির অনেকগুলি মাথা, কোনটির অনেকগুলি হাত-পা, কোনটির মাথায় অনেকগুলি শিঙ। আর, যেটি যত বিকট-দর্শন, পায় সেটি তত স্তুতি, সম্মান ও পূজা। মন্দির থেকে সিকি কোশ দূরেই রয়েছে একটি বড় গ্রাম। এদিন আরো তিন কোশ পথ পাড়ি দিলাম আমরা। রাত কাটালাম গিয়ে কহকলি (গুন্টুর থেকে চার মাইল উত্তরে কাকানী) গ্রামে। কাছেই তার একটি ছোট মন্দির। মর্মর দিয়ে বেশ সুন্দর ভাবে তৈরি পাঁচ-ছটি বিগ্রহ সেখানে।

অগাষ্ট মাসের প্রথম দিনটিতে সাত ঘন্টা পথ চলার পর পৌঁছলাম একটি বড় শহরে। নাম কোণ্ডেবীর (কোণ্ডাবীর)। জোড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা শহরটি।

পরিখার তলটি কাটা-পাথর দিয়ে বাঁধানো। দুপাশে সুদৃঢ় প্রাকার থাকা একটি পথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় শহর মধ্যে। প্রাকারের গায়ে কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি ক'রে গোলাকার গম্বুজ, যা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না প্রায়। শহরটি পূবদিকে একটি পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে থমকে গেছে বাধা পেয়ে। তার চুড়ার দিকটি পরিধিতে প্রায় এক কোশের মতো, এবং উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রতি দেড়শো পা অন্তর অন্তর দেয়ালটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি। দেয়াল ঘেরা পরিসর মধ্যে তিন তিনটি দুর্গ। তবে, পড়ে রয়েছে বিনা মেরামতি অবস্থায়।

দোসরা তারিখে সাঙ্গ করলাম মাত্র ছ'কোশ পথ পরিক্রমা। রইলাম রাতে কোপেনৌর নামের একটি গ্রামে। পরদিন আট কোশ পাড়ি দিয়ে এলাম অদনকুইগ (আদনকিশহর)। বেশ সুন্দর গ্রামটি। রয়েছে সেখানে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ সহ একটি অতি রমণীয় মন্দির। প্রকোষ্ঠগুলি তৈরি হয়েছিল মূলতঃ বেণিয়াদের পুরোহিতদের বসবাসের জন্য। কিন্তু বর্তমানে সবগুলিরই ভগ্নদশা। এ সত্ত্বেও মন্দির মধ্যে কতক বিগ্রহ রয়েছে বর্তমান পর্যন্ত। তবে, সবগুলিরই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা। এ সত্ত্বেও এই সব হতভাগ্য লোকরা বন্ধ করেনি তাদের পূজা-অর্চনা। চার তারিখে (অগাষ্ট) পার হলাম আট কোশ পথ। রাত্রি যাপন করলাম নোসড্রিপার (নেরনুরুপাদ, কণ্ডুকুর তালুক, নেলোর)। গ্রামটির আধ কোশ আগেই একটি বড় নদী, তবে বেশ ক্ষীণস্রোতা। তখনো (এদিকে) বৃষ্টি শুরু হয়নি বলে। পাঁচুই আট কোশ পেরিয়ে রাত কাটালাম এসে কোনডিকৌর (কণ্ডুকুর) গ্রামে।

সাত ঘন্টা পথ চলার পর ছ তারিখ বিকালে পৌঁছলাম এসে দকিজে (জক্কী পল্লী-গূদুর, স্থানীয় নাম দক্কি পল্লী)। পরদিন তিন কোশ পাড়ি দেয়ার পর দেখা পেলাম নেলৌর (নেল্লোর) নামের একটি শহরের। অনেকগুলি মন্দির এখানে। আরো সিকি কোশ এগোবার পর এলাম এক নদীকূলে। নদীটি পার হয়ে ছ কোশ পথ ভাঙার পর ইতি টানলাম সেদিনের যাত্রায়। রাত কাটালাম গণ্ডরোন (**Mr. Bateman**-এর মতে এটি নেল্লোরের আগে থাকা গণ্ডবরম গ্রাম) নামের একটি গ্রামে। আটুই (অগাষ্ট) আট ঘন্টা চলার পর রহনি করলাম সেবেপেলী (সর্বৈপলী) নামের একটি ছোট গাঁয়ে। ন তারিখে পরিক্রমা করলাম ন কোশ পথ। রাতের ঘুম দিলাম পোন্ডার (পুডৈরু) নামের একটি চমৎকার গ্রামে। পরদিন পুরো এগারো ঘন্টা পথ চলে থামলাম এসে আরেকটি ভাল গ্রামে। এটির নাম সেনেপগোণ্ড (সুরপগুন্ট, চিঙলেপুত জেলা)।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু ক'রে এগিয়ে গেলাম পলিকট (পুলিকট) পর্যন্ত।

দিনটি ছিল অগাষ্ট মাসের ১১ তারিখ। স্থানটি সেনেপগোও থেকে মাত্র চার কোশ দূরে। এই পথ এগোতে গিয়ে একাধিকবার হাঁটতে হল আমাদের সাগর জলের মধ্য দিয়ে। বহু জায়গায় এজল ঘোড়ার জিন ছুঁই-ছুঁই। যেতে পারতাম অবশ্য ভিন্ন একটি পথ ধরেও, কিন্তু সেটি এটির চেয়ে দু-তিন কোশ দীর্ঘ। পুলিকট ডাচদের অধীন একটি দুর্গ। পুরো করমণ্ডল উপকূলই এখন ডাচদের দখলে। এখানে তাদের কারখানা। গোলকুণ্ডায় অবস্থানকারী ডাচদের প্রধান বাস ক'রে থাকেন এখানেই। দুশো জনের মতো সেনার একটি বাহিনী রয়েছে এ দুর্গে। রয়েছে এছাড়াও ব্যবসা উপলক্ষে বসবাসকারী অনেক বণিক এবং কোম্পানীর চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আসা কতক ব্যক্তি। ক্রমে ক্রমে কতক এ দেশীয় লোকও ভিড় জমিয়েছে এখানে এসে। ফলে পুলিকট এখন একটি ছোট শহরের মতো। শহর যাতে দুর্গটির শ্বাসরোধ না করে এ জন্য রাখা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ মুক্ত প্রান্তর। দুর্গ-প্রাকারের ওপরে থাকা মঞ্চগুলিতে বসানো হয়েছে কতক উন্নতমানের কামান। সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে এই প্রাকারের প্রান্ত ছুঁয়ে। তবে, কোন বন্দর নেই এখানে, শুধু জাহাজের বিরামস্থলী হিসাবেই ব্যবহার করা হয় যা। পরের দিন বিকাল পর্যন্ত কাটালাম এ শহরেই। শাসনকর্তা কিছুতেই দিলেন না আমাদের অন্যত্র আহার করতে, এ কাজটি সমাধা করতে হল তারই বাড়িতে একই টেবিলে বসে। তার নাম সিয়ুর পিট [Sieur Pite/Laurens Pit (the elder)], একজন জার্মান। ব্রিমেন শহরে তার জন্ম। অশেষ সেবাযত্ন করলেন আমাদের। প্রাকারের ওপর চড়ে পুরো দুর্গটি ঘুরিয়ে দেখালেন তিন তিনবার। তার ওপর হাঁটাচলা করা চলে স্বচ্ছন্দে। এখানকার বাসিন্দারা যে পন্থায় পানীয় জল সংগ্রহ করে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোয়ারের জল নেমে গেলে সাগরকূলে গিয়ে তার যত কাছাকাছি সম্ভব গর্ত খোঁড়া হয় বালিতে। মেলে সেখান থেকে মিঠে জল। খেতে তা সত্যিই খুব ভাল।

১২ই অগাষ্ট গোধূলি বেলায় ত্যাগ করলাম আমরা পুলিকট। পরের দিন সকাল দশটায় পৌঁছলাম মাদ্রাজ। এটির অন্য নাম ফোর্ট সেন্ট জর্জ। এটি ইংরাজদের দখলে। সাত কি আট কোশ পথ (২২ মাইল) চলতে হয়েছে আমাদের এখানে আসার জন্য। উঠলাম গিয়ে কপুচিনদের আশ্রমে। পরদিন দুর্গে গেলাম ইংরাজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। খেলাম তারই সঙ্গে।

১৫ তারিখে মঁসিয়ে দ্যু জরডিন ও আমি দুজনে মিলে ভোর ভোর রওনা

হলাম সেন্ট থমাস। এ শহরটি মান্দ্রাজ থেকে মাত্র আধ কোশ দূরে। প্রথমেই দেখা করলাম গিয়ে শাসনকর্তার সাথে। যথেষ্ট ভদ্রতা দেখালেন তিনি, বিদায় নিতে দিলেন পুরাপেট ভোজ খাইয়ে তবেই। ভোজের পর গেলাম আমরা অগাষ্টিন ও যেশুইট-দের গীর্জা দুটি দেখতে। প্রথমটিতে সংরক্ষিত রয়েছে একটি বর্শা ফলক। মনে করা হয় এটি দিয়েই ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়েছিল সেন্ট থমাসের। দেখা করলাম কতক পর্তু্গীজের সঙ্গেও। তারাও বেশ আন্তরিক ভাবেই গ্রহণ করলেন আমাদের। বিকালের কোমল আলোয় স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে রওনা হয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলাম আবার মান্দ্রাজে।

পরদিন, ১৬ তারিখ, সেন্ট থমাসের শাসনকর্তা ও পর্তু্গীজরা বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহার পাঠালেন আমাদের। শূওরের নোনা শুকনো উরু, ষাঁড়ের জিভ, মাংসের কাবাব, মাছ, তরমুজ ও আরো নানারকম দেশীয় ফল ফলাদি। এত পরিমাণ উপহার যে তা বয়ে আনতে হয়েছে ন-দশজন লোককে। পরের দুদিন আবার খেলাম ইংরাজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। এই দীর্ঘ যাত্রায় আমাদের দেহমনে যে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য করলেন তিনি সম্ভবপর সবরকম আনন্দ-ফূর্তির আয়োজন। সময় কেটে গেল তারই মধ্যে ডুবে থেকে। ১৯ তারিখে দেখা করলাম মান্দ্রাজে বসবাসকারী কতক দেশীয় খ্রীষ্টানের সঙ্গে। মোটামুটি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে তারা। করল আমাদের বেশ ভালভাবেই আদর-আপ্যায়ন। শুনলাম, শ্রদ্ধেয় কপুচিন পাদরীদের প্রতি তারা রীতিমতো উদার। পরদিন এ দেশীয় কতক ফল-ফলাদি উপহার পাঠিয়ে দিলেন তারা আমাদের। ২১ তারিখ বিদায় গ্রহণ করতে গেলাম যারা আমাদের এত আনন্দ দিয়েছেন, আদর-আপ্যায়ন করেছেন সেই ইংরাজ-প্রেসিডেন্ট ও সে-দেশীয় অন্যান্য প্রধানদের কাছে।

নতুন ক'রে আরম্ভ করলাম আবার পথ পরিক্রমা। পরদিন, ২২ তারিখেই, বেরিয়ে পড়লাম মান্দ্রাজ থেকে। ছ কোশের মতো পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয় নিলাম সেরাভরন (চোলভরম) নামের একটি বড় গ্রামে। ২৩ তারিখে পার হলাম সাত কোশ। রইলাম ঔড়িকোট (উট্রু কোট্টাই)। পুরো অঞ্চলটিই সমতল, কিছুটা বালি প্রধান। পথের দুপাশ জুড়ে অসংখ্য বাঁশ বন। বাঁশগুলি বেশ লম্বা। কতক বন এত নিবিড় যে মানুষের পক্ষে সেখানে ঢোকা অসাধ্য। রয়েছে সে-সব বনে অসংখ্য বানর। পথের এক পাশের বানরদের সঙ্গে অন্য পাশের বানরদের এমন বৈরী সম্পর্ক যে জীবন খোয়াবার ঝুঁকি নিয়ে তবেই যেতে

হয় অন্যের এলাকা মধ্যে। পুলিকটে থাকাকালে সেখানকার শাসনকর্তা বলেছিলেন এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবার কালে তার মতো আমরাও যেন কাজে লাগিয়ে নিই বানরদের-লড়াই দেখার সুযোগ। এই লড়াই বাধানোর জন্য যে কৌশলটির প্রয়োগ করা হয় তা এখুনি বলছি এখানে। এ অঞ্চলের সর্বত্র এক কোশ অন্তর অন্তর ফটক ব' অন্য কোন প্রতিবন্ধক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে পথকে। সতর্ক প্রহরা দেয়া হয় সেখানে। প্রত্যেক পথচারীর কাছেই জানতে চাওয়া হয়, তিনি কোথা থেকে আসছেন, যাবেনই বা কোথায়। যাত্রীরা যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদে ও নিরুপদ্রবে টাকাকড়ি, সোনারূপা সঙ্গে নিয়ে পথ পাড়ি দিতে পারেন সে-জন্যই এ ব্যবস্থা। এই ফটকগুলির কাছে সর্বত্রই কিনতে পাওয়া যায় চাল। যারা বানর-লড়াইয়ের মজা উপভোগ করতে চান তারা এখান থেকে পাঁচ ছ ঝুড়ি চাল কিনে ৪০/৫০ পা অন্তর অন্তর রেখে দেন তা রাস্তার ওপরে। কাছেই ওই সাথে রেখে দেয়া হয় দু ফুট লম্বা ইঞ্চি খানেক মোটা পাঁচ ছটি ক'রে লাঠি। চালের ঝুড়িগুলিকে ওইভাবে খোলা ফেলে রেখে সবাই গিয়ে দাঁড়ায় তারপর কিছুটা দূরে সরে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, দু পাশ থেকেই বাঁশবন ও জঙ্গল ছেড়ে বানররা এগিয়ে আসছে ওই চালের ঝুড়িগুলির দিকে। প্রথম আধ-ঘণ্টা খানেক মুখোমুখি হওয়া দুপাশের দুই বানর দল ঝুড়িটির কাছে না গিয়ে, দিয়ে চলে একে অপরকে ভেংচি ও দাঁতখিঁচুনি। কখনো যায় কিছুটা এগিয়ে, কখনো আবার পিছিয়ে। কিন্তু কেউই প্রতিপক্ষের ভয়ে সাহস করে না ঝুড়িতে হাত দিতে। শেষ অবধি এগিয়ে আসে দলের মেয়েরা, বিশেষ ক'রে যারা সবে মা হয়েছে, ফিরছে আমাদের মেয়েদের মতোই বাচ্চা কোলে নিয়ে। এরা পুরুষদের তুলনায় বেশি নির্ভীক। যেই কোন দলের মেয়েরা গিয়ে চাল নেয়ার জন্য ঝুড়ির দিকে হাত বাড়ায় অমনি অন্য দিককার পুরুষরা লাফিয়ে ছুটে এসে বাধা দেয় তাদের, দেয় আঁচড়ে-কামড়ে। সে দৃশ্য দেখে মেয়ে-পক্ষের পুরুষরা রাগে জলন্ত হয়ে উঠে ঝুড়ির কাছে পড়ে থাকা লাঠি তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের ওপর। শুরু হয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই। দুর্বল পক্ষ হেরে গিয়ে বাধ্য হয় শেষ অবধি পিছু হটে বন-জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যেতে। তখন তাদের কারো বা মাথা কেটে রক্ত ঝরছে, কারো বা জখম হয়েছে দেহের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বিজয়ী দল অধিকার করে চালের ঝুড়ি, খেয়ে চলে তা থেকে চাল। তবে, নিজেদের পেটের খিদে মিটে এলে, অন্যপক্ষের মেয়েদের মধ্যে কতককেও সুযোগ দেয় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তা থেকে ভাগ নিতে।

২৪ তারিখ (অগাষ্ট) চললাম ন কোশ পথ। দু ধারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক আগের দিনের মতোই। এলাম নরভেরন-এ (নারায়ণ-বনম)। পরদিনও এই একই পরিবেশের মাঝ দিয়ে পুরো আট ঘন্টা পথ চলে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলাম এসে গজেল (গাজুল মন্দিরম, দূরত্ব ১৪ মাইল)।

পরের দিনটিতে পার হলাম ন কোশ, থামলাম কৌরুয়ায় (কুরুব-বন্দলু পাহাড়ের কাছে)। কিন্তু কি নিজেদের জন্য, কি ঘোড়া ও ষাঁড়ের জন্য, পাওয়া গেল না কোন খাদ্যসামগ্রী। সঙ্গের লোকেরা যেটুকু যা ঘাস কেটে এনে খাওয়াতে পারল তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ঘোড়া ও ষাঁড়গুলোকে। কৌরুয়া তার মন্দিরটির জন্য বিখ্যাত। পৌঁছে দেখি কদম ফেলে এগিয়ে চলেছে কয়েক দল সৈন্য। কতকের হাতে বর্শা, কতকের হাতে বন্দুক, কতকের হাতে লাঠি। চলেছে তারা মীর জুমলার সেনাবাহিনীর একজন প্রধান অধিনায়কের দলে যোগ দিতে। কৌরুয়ার কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে খাটানো হয়েছে তার তাঁবু। স্থানটি বেশ মনোরম। অসংখ্য গাছপালা ও ঝরনাধারার জন্য স্নিগ্ধ ও সুশীতল। এই অধিনায়ক এত নিকটেই আছেন জেনে বার হয়ে পড়লাম তাকে অভিবাদন জানাতে। পৌঁছে দেখি, বহু অভিজাত ও সর্দারদের ঘেরের মধ্যে বসে আছেন তিনি তার তাঁবুতে। এই অভিজাত ও প্রধানরা সকলেই বিগ্রহ পূজক। অভিবাদন জানিয়ে উপহার দিলাম তাকে রূপা দিয়ে কারুকাজ করা একজোড়া পকেট পিস্তল ও দু গজ আগুন-রঙা ডাচ বস্ত্র। জানতে চাইলেন তিনি, কেন এসেছি আমি এদেশে। উত্তর কোটালাম, কিছু ব্যবসার আশায় দেখা করতে এসেছি গোলকুণ্ডার রাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলার সাথে। শুনে সদয় ব্যবহার করলেন তিনি। তবে দেখলাম ধরে নিয়েছেন তিনি আমাদের ডাচ বলে। ভুল শুধরে দেয়ার জন্য জানালাম যে আমরা সে-দেশবাসী নই, ফ্রান্সের অধিবাসী। এ-দেশ বা জাতি সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধারণা না থাকার দরুন আমাদের দেশের প্রশাসনিক রীতি ও কাঠামো, রাজার প্রতাপ প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন অনেক কিছু। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই এক সময়ে বিছানো হল সুফ্রা বা খাবার চাদর। মুসলমানদের রান্না খান না বলে উঠে বিদায় নিল পৌত্তলিক অভিজাত ও প্রধানরা। আমাদের সে ধরনের সংস্কার নেই জেনে অনুরোধ জানালেন অধিনায়ক তার সঙ্গে আহারে যোগ দেয়ার জন্য। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে বলে নিজেদের ডেরায় ফিরে যাবার ব্যগ্রতার দরুন রাজী হতে পারলাম না সে অনুরোধে। কিন্তু তাঁবুতে ফিরে আসার পরক্ষণেই দেখি, তিনজন লোক মাথায় ক'রে বিরাট থালায়

তিন থালা পোলাও নিয়ে উপস্থিত। অধিনায়ক পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য। তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ক্ষণে জানিয়েছিলেন পরের দিনটি এখানে থেকে তার সাথে হাতি শিকারে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণও। কিন্তু একটি দিনও আর সময় নষ্ট করার ইচ্ছে ছিল না বলে গ্রহণ করা সম্ভব হল না তা। শুনলাম, ছ-সাতদিন আগে ধরেছিলেন তারা পাঁচটি হাতি। কিন্তু পালিয়ে গেছে তার ভেতর থেকে তিনটি। সেগুলিকে আবার ধরার জন্যই পিছু তাড়া ক'রে চলেছেন তারা। যে গরিব কৃষকরা এদের ধরার জন্য সাহায্য করেছিল, ইতিমধ্যেই হত্যা করেছে এরা তাদের দশ-বারোজনকে। কোন্ পদ্ধতিতে তারা হাতি শিকার করে তাও জানার সুযোগ হল এ সময়ে। বনের ভেতর এজন্য কতক বড় বড় খাদ কেটে ডালপালা ও মাটি ছড়িয়ে ঢেকে দেয়া হয় তার ওপরটা। ফলে, স্পষ্ট ক'রে জানার উপায় থাকেনা যে খাদ রয়েছে তার নিচে। শিকারীরা তারপর ঢাক পিটিয়ে হই-হল্লা ক'রে আগুনে বর্শা ছুঁড়ে তাড়া করে হাতির পালকে ওই খাদের দিকে। ভয় পেয়ে দিশেহারা ভাবে ছুটতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে সেখানে আটকে যায় হাতি। শিকারীরা তখন মোটা দড়ি ও শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে তাকে। এগুলি বাঁধা হয় সাধারণতঃ তার চার পায়ে, শুঁড়ে এবং পেট ও পিঠ বেড় দিয়ে। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে ওপরে তোলা হয় হাতিটিকে। এরূপভাবে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও এতগুলি দড়ি ও শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে তিনটি হাতি। এ প্রসঙ্গে শোনাল তারা একটি আশ্চর্য কথা আমাদের। তা সত্য বলে মেনে নিলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। ধরা পড়ার পর কোন হাতি পালিয়ে যাবার সুযোগ পেলে দ্বিতীয় বার আর যাতে খাদে পড়ে বন্দী না হয় বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে যায় সেজন্য। তখন তারা শুঁড় দিয়ে একটা বেশ মোটা ডাল ভেঙে নিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলে তাই দিয়ে মাটি ঠুকতে ঠুকতে। দেখে, কোথাও আবার আগের মতো ফাঁদ নেই তো! যে শিকারীরা ওই হাতিগুলিকে ধরেছিল তাদের মুখেই শুনলাম এ গল্প। আর, এ জন্যেই হাতি তিনটিকে আবার ধরতে পারা সম্পর্কে বেশ সন্দিহান হয়ে পড়েছিল তারা। হাতিদের এই অদ্ভুত সতর্কতা দর্শন করার সুযোগ পাব এ বিশ্বাস যদি মনের কোণে ঠাঁই পেত তাহলে ব্যবসার জরুরী কাজ ফেলেও দু-তিন দিন সেখানে কাটাতে ছিল না কোন আপত্তি আমার। এই অধিনায়ক ছিলেন পদমর্যাদার দিক থেকে আমাদের ব্রিগেডিয়ার স্তরের। তিন বা চার হাজার সেনার মনসবদার। সেনাবাহিনীর ছাউনি পড়েছিল সেখান থেকে আধ কোশ খানেক দূরে।

২৭ তারিখে দু ঘন্টা পথ চলার পর এলাম একটি বড গ্রামে। বন্দী হাতি পাঁচটির মধ্যে অবশিষ্ট দুটিকে দেখলাম সেখানে। দুটি ক'রে পোষমানা হাতির মাঝে বেঁধে রাখা হয়েছে এক একটিকে। প্রতিটি বুনো হাতির সামনে আগুনে বর্শা নিয়ে দুজন ক'রে লোক। নিজেদের ভাষায় তাকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে তাদের দেয়া খাবার খেতে। খাদ্য হিসাবে দেয়া হয়েছে ছোট ছোট খড়ের আঁটি, গুডের চাকা, ভাত ও গোলমরিচের গুঁডো। যখুনি হাতিটা কথা শুনছে না, পোষা হাতি দুটিকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তারা সঙ্গে সঙ্গে পালন করছে তা। একটি হাতি অমনি শুঁড দিয়ে আঘাত হানছে তার কপাল ও মাথায়। যদি বুনোটি মুখিয়ে উঠছে কোন রকম প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অমনি অন্য হাতিটি আঘাত হানছে তার দিক থেকে। ফলে, কাঁকে বাধা দেবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পডছে বুনো বেচারা। এ ভাবেই তারা বুনোদের পোষ মানায়, শেখায় আদেশ মেনে চলতে।

দেখ ! অজান্তে দিয়েছি কখন হাতির বৃত্তান্ত জুড়ে। তা, দিয়েছিই যখন, শোনানো যাক আরো একটুখানি। বন্দী হবার পর আর নারী সঙ্গের ঝোঁক থাকে না পুরুষ হাতিদের (এ কথা সত্য নয়)। এ সত্ত্বেও মরশুমের সময় তারা গরম হয়ে উঠে কখনো-সখনো। একদিনের ঘটনা বলি। হাতিতে চেপে শিকারে চলেছেন শাহ-জহান। তার ছেলেদের একজন তাকে হাওয়া ক'রে চলেছে পাশে বসে। হাতিটি সহসা এত গরম হযে উঠল যে মাহুত আর বাগ মানাতে পারল না সেটিকে। অবস্থা দেখে মাহুত সম্রাটকে জানালে, হাতিটি যে রকম ক্ষেপে উঠেছে তাতে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে তিন আরোহীকেই। একে শান্ত করতে হলে প্রয়োজন এখন যে কোন একজনের আত্ম-বলিদান। তাই করছে সে এখন সম্রাট ও তার ছেলের প্রাণ-বাঁচানোর জন্য। সম্রাট যেন দয়া ক'রে দেখেন তার তিন ছেলেকে। এই বলে সে ঝাঁপিয়ে পডল হাতিটির সুমুখে। হাতিটিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে দিল পা দিয়ে থেঁতলে শেষ ক'রে। এরপর আবার আগের মতো শান্ত হয়ে গেল হাতিটি। সম্ভব হল আবার তাকে স্বাভাবিকভাবে চালানো। সম্রাট এরূপ আশ্চর্যভাবে জীবন ফিরে পেয়ে দুলাখ টাকা বিতরণ করলেন গরিবদের মধ্যে। মাহুতের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ দিলেন তার তিন ছেলেকেই দরবারে চাকুরি।

জীবন্ত হাতির গায়ের চামড়া বেজায় শক্ত হলেও মরার পর কিন্তু থাকে না আর অমনটি। তখন পাখি ধরার আঠার মতো মনে হয় হাত দিয়ে টিপলে।

হাতি আছে এশিয়ার বহু অঞ্চলেই। সিংহলের হাতি আকারে সব থেকে ছোট হলেও সাহসের দিক থেকে সবার সেরা। সিংহল ছাড়াও দেখা যায় এদের সুমাত্রা দ্বীপে, কোচিন রাজ্যে, শ্যাম অঞ্চলে, এবং ভুটান রাজ্যের যে প্রান্তটি প্রতাপশালী তাতার রাজ্যের দিকে, সেখানে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মলিন্দ অঞ্চলের সাগর তটেও মেলে তা। মোজাম্বিকের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে মলিন্দ অঞ্চল থেকে গোয়া এসেছিলেন এক পর্তুগীজ। তিনি আমায় যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন তা থেকে বলা যেতে পারে যে ওই অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে সুপ্রচুর হাতি বর্তমান। তার মুখে শুনেছি, সারা উপকূল অঞ্চল ছড়িয়ে জমিনের বুকে এমন বহু বেড়া রয়েছে যা কিনা শুধু হাতির দাঁত দিয়ে করা। এই বেড়া-গুলির মধ্যে কতক পরিধিতে এক কোশেরও বেশি। তিনি আরো জানিয়েছেন, সেখানকার কালো আদমীরা হাতি শিকার করে এবং খায় তার মাংসও। মারার জন্য হাতি পিছু তাদের একটি ক'রে হাতির দাঁত দিতে হয় গোষ্ঠী প্রধানকে।

হাতি ধরার সিংহলীয় পদ্ধতিটি গোলকুণ্ডার চেয়ে ভিন্ন। এজন্য সিংহলে তৈরি করা হয় চওড়া থেকে ক্রমশঃ সরু একটি লম্বা পথ যার দু-পাশটি থাকে ঘেরা। ফলে, কোন হাতি একবার সেখানে ঢুকলে সুযোগ পায় না আর ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নেয়ার পথের একেবারে শেষপ্রান্তে থাকে শুধু একটি মেয়ে-হাতি থাকার মতো জায়গা। গরম হয়ে ওঠা একটি মেয়ে হাতিকে রাখা হয় সেখানে। এটি পোষা হাতি হলেও বেঁধে রাখা হয় তাকে শক্ত দড়ি ও শিকল দিয়ে। তার ডাকে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ হাতি ঢুকে পড়ে ওই ক্রমসংকীর্ণ পথে। যেই হাতিটি সব থেকে সংকীর্ণ এলাকায় চলে আসে অমনি আশেপাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একজন লোক ওই সংকীর্ণ স্থানটিতে বন্ধ ক'রে দেয় পথটিকে মজবুত ফটক বা অন্য কোন প্রতিবন্ধক দিয়ে। এটি তৈরি করা থাকে আগেভাগেই। এরপর কৌশল ক'রে বেঁধে ফেলা হয় তার শুঁড় ও চার-পা। তখন আর পালাবার কোন উপায় থাকে না হাতিটির। শ্যাম এবং পেগু রাজ্যে এজন্য অনুসরণ করা হয়ে থাকে এই একই পদ্ধতি প্রায়। পার্থক্য শুধু এই যে শিকারীরা পুরুষ হাতির খোঁজে বার হয় একটি মেয়ে হাতিতে চেপে। যখন তার দেখা পায়, মেয়ে হাতিটিকে একটি সুবিধাজনক স্থানে বেঁধে, পেতে রাখে তার কাছে ফাঁদ। মেয়ে হাতিটির ডাকে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে এগোতে গিয়ে ওই ফাঁদে আটকা পড়ে যায় পুরুষ হাতিটি। (ভারতে হাতি ধরার বিভিন্ন পদ্ধতি ও হাতির শ্রেণী বিভাগের জন্য আবুল ফজলের লেখা আইন-ই আকবরী দেখুন।)

সিংহলীয় হাতির ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় একটি বিশেষ বৈচিত্র্য। কোন মেয়ে হাতি প্রথম যে পুরুষ সন্তানটির জন্ম দেয় একমাত্র তারই থাকে গজদন্ত। অন্য পুরুষ সন্তানদের কারোরই থাকে না তা। (আফ্রিকা ও ভারতে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সব হাতিরই থাকে গজদন্ত)। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সিংহল ও অচীন (সুমাত্রা) থেকে মেলা গজদন্ত দিয়ে কোন কিছু তৈরি করলে কখনো হলদেটে হয়ে যায় না তা। মূল ভূখণ্ড ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মেলা গজদন্তের বেলা তা নয় কিন্তু (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হাতি নেই)। এজন্য প্রথমোক্ত অঞ্চলের গজদন্তকে ধরা হয় অধিক মূল্যবান বলে।

বিক্রী করার জন্য সওদাগরেরা যখন কোথাও হাতির পাল নিয়ে চলে তখন তাদের পথ চলার দৃশ্য সত্যিই উপভোগ করার মতো। দলে বড় ও কচি—দু ধরনের হাতিই থাকে সাধারণতঃ। বড়রা আগে আগে, কচিরা পিছে। বড়গুলি পার হয়ে যাবার পর কচি হাতিগুলিকে দেখে শিশুর দল ফূর্তির সঙ্গে পিছু নেয় তাদের। খাবার জন্য বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে কিছু না কিছু খাদ্য, করে তাদের সঙ্গে খেলার চেষ্টা। কচি হাতিরা যখন এগিয়ে দেয়া খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে ওই অবকাশে ছেলেদের কতক লাফিয়ে চড়ে বসে তাদের পিঠে। মজা শুরু হয় এ সময়েই। খাবার খেতে থাকার ফাঁকে তাদের মায়েরা এগিয়ে যাবার দরুন নিজেদের নিঃসঙ্গ ভেবে কচি হাতিরা দ্বিগুণ বেগে চলা শুরু ক'রে দেয় দলে যোগ দেয়ার জন্য। আর, বেগে চলা শুরু করার আগে পিঠে বসে থাকা ছেলেদের শুঁড় উচিয়ে জড়িয়ে ধরে নিচে নামিয়ে দেয় একে একে। কোন রকম ক্ষতি করে না তাদের। ফলে সহজে তাদের সঙ্গ ছাড়ে না শিশুরা। দল বেঁধে পিছু নেয় বেশ কিছুক্ষণ, চলতে থাকে আগের মতোই তাদের খাবার যাচা।

হাতিদের আয়ুষ্কাল নিয়ে অনেক যত্নের সঙ্গে যথেষ্ট গবেষণা চালিয়েও এ সম্পর্কে কোন পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি আজো। যারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে অনেক চেষ্টা করেছি তাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের উত্তর সাধারণতঃ এই রকমের: অমুকের অমুক হাতিটিকে দেখাশোনা করেছেন আমার বাবা, ঠাকুর্দা ও বুড়ো-ঠাকুর্দা। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারে না তারা। এই তিন পুরুষের ধারাবাহিকতা বিচার করলে দেখা যাবে এক একটি হাতির আয়ুষ্কাল দাঁড়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ১২০ বা ১৩০ বছর। (আইন-ই আকবরীতে হাতির পরমায়ু দেয়া হয়েছে ১২০ বছর বলে। ১৪০ বছরেরও ওপর হাতি বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত বর্তমান। মিঃ অ্যাণ্ডারসনের মতে

হাতির আয়ুষ্কাল অন্যূন ১৫০ বছর। দ্রঃ Thirteen years among wild beasts in India-P 56)।

এপর্যন্ত যারাই ভারতের বিবরণ লিখেছেন সকলেই জোর গলায় জানিয়ে গেছেন যে তিন হাজার কি চার হাজার হাতি পুষে থাকেন মুঘল সম্রাট। এ সম্পর্কে প্রায়ই খোঁজ নিয়েছি আমি মুঘল সম্রাটের বর্তমান বাসস্থলী জহানাবাদ থাকাকালে। এবং যার ওপর এদের দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁর কাছ থেকেই। তিনি ফ্রাঙ্কদের প্রতি অতি বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি আমায় জানিয়েছেন, তাঁর দায়িত্বাধীন হাতির সংখ্যা মাত্র ৫০০। এদের বলা হয় ঘরোয়া বিভাগের হাতি। কেননা, এদের ব্যবহার করা হয় শুধু মহিলাদের এবং তল্পীতল্পা সহ তাঁবু বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আর যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হয় মাত্র ৮০ কি বড় জোর ৯০ টিকে। শেষে বলা হাতিগুলির মধ্যে যেটি সব থেকে নির্ভীক তার প্রতিপালন খরচ জোগাতে হয় সম্রাটের বড় ছেলেকে। তার জন্য মাসিক বরাদ্দ রয়েছে খাদ্য ও আনুষঙ্গিক সব খরচ সহ মোট পাঁচশো টাকা। কতকের জন্য বরাদ্দ আবার মাসিক মাত্র পঞ্চাশ, চল্লিশ, তিরিশ ও কুড়ি টাকা। কিন্তু যেসব হাতির মাসিক বরাদ্দ ১০০, ২০০, ৩০০ বা ৪০০ টাকা তাদের দেখাশোনার জন্য রয়েছে অশ্বারোহী। এই বরাদ্দ থেকেই দেয়া হয় তাদের মাইনে। আছে এ ছাড়াও দুই, তিন এমনকি ছটি পর্যন্ত বাচ্চা হাতির প্রতিপালন খরচ। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমের দরুন নিয়মিত বাতাস করতে হয় এদের। এই হাতিগুলি শহর মধ্যে থাকে না সাধারণত। অধিকাংশকেই প্রত্যহ সকালে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রাম অঞ্চলের দিকে। সেখানে ঘুরে ঘুরে খায় তারা বন-জঙ্গল থেকে গাছপালা, আখ ও জোয়ার। ফলে যথেষ্ট ক্ষতি সইতে হয় গরিব কৃষকদের। যারা এদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের কিন্তু লাভ হয় এতে। কেননা, বাইরে থেকে এভাবে যত খেয়ে আসবে ততই কম খাবে সে শহর মধ্যে, ফলে বরাদ্দের টাকা বেঁচে গিয়ে তা পকেট ভারি করবে রক্ষকদের।

সেদিন বন্দী হাতি দুটিকে দর্শনের পর পাড়ি দিলাম আরো দু'কোশ পথ। রাত কাটালাম রাগিয়া পেটা (সম্ভবতঃ অনন্তরাজুপেতা গ্রাম) নামের একটি বড় শহরে। ২৮ তারিখ পরিক্রমা করলাম ৮ কোশ পথ। এলাম ওঁতিকোর (উটুকুর, কুড্ডপা জেলা)।

পরদিন ন'কোশ পথ চলে উপস্থিত হলাম ওঁতিমেদায় (ভোন্তিমিত্ত, উটুকুর থেকে ১৯ মাইল)। সারা ভারতে যত সেরা মন্দির রয়েছে তার একটি এখানে।

বড় বড় কাটা-পাথর দিয়ে তৈরি এটি। তিনটি গম্বুজ এটিতে। সেখানে খোদাই করা রয়েছে বিকৃতদর্শন নানা মূর্তি। মন্দিরটিকে ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরী। পুরোহিতদের বসবাসের জন্য। সেখান থেকে পাঁচশো পা এগিয়ে গেলেই একটি বড় দীঘি। তার কিনারায় ৮/১০ ফুট বর্গাকার অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির। প্রত্যেকটিতেই দৈত্যাকৃতি এক একটি বিগ্রহ। রয়েছে একজন ব্রাহ্মণও সেখানে। যাতে কোন বিধর্মী ব্যক্তি দীঘিটিতে স্নান না করে কি, সেখান থেকে জল না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখে সে। বিধর্মী কেউ জল চাইলে মাটির কলসীতে ক'রে বয়ে এনে তা দেয়া হয় তাদের পাত্রে ঢেলে। যদি ওই সময়ে বিধর্মীর পাত্রটির সঙ্গে কলসীটির ছোঁয়া লাগে তবে ভেঙে ফেলে দেয়া হয় সেটিকে। শুনলাম, যদি কোন বিধর্মী দীঘিটিতে স্নান করে তাহলে বার করে দেয়া হয় ঐ সময়ে দীঘিতে থাকা সমস্ত জল। দানের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত উদার। কেউ অভাবী থাকলে ও ভিক্ষে চাইলে প্রত্যেকেই তার সাধ্য মতো খেতে দেয় তাকে। এই সব পথের ধারে দেখা পাবেন আপনি এমন অনেক স্ত্রীলোকের যারা আগুন নিয়ে বসে আছে পথচারীদের (কল্কির) তামাকে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য। যদি পথচারীর কাছে তামাক (খাবার হুকো কল্কি) না থাকে তাও ধার দেয় এরা। অনেকে শরণ নেয় তাদের খিচুড়ি রান্না ক'রে দেয়ার জন্য। অনেকে নেয় আবার শিম রান্না করিয়ে। কেননা, এর জল খেয়ে অতি কামপ্রবণ ব্যক্তিদের ভুগতে হয় না প্লুরিসিতে। এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে কতক হয়তো এই ধরনের সেবা ধর্মের মানত নিয়েছে ৭/৮ বছরের জন্য। কতক আবার তার চেয়ে কম বা বেশী বছরের জন্য। প্রত্যেক পথচারীকে তারা খেতে দেয় শিমের জল ও ভাতের জল ও দু-তিন মুঠো ক'রে ভাত। কতক স্ত্রীলোককে দেখা যায় আবার রাজপথে ও মাঠে ঘোড়া, ষাঁড ও গরুর পিছু পিছু ফিরছে। এরা সঙ্কল্প নিয়েছে এই সব প্রাণীর মল মধ্যে পরিপাক না হওয়া যে সব শস্যকণা মিলবে, করবে তাই খেয়ে জীবন ধারণ। এ অঞ্চলে যব ও জইয়ের কোনটিই হয় না বলে গরু ঘোড়াকে এক ধরনের বড় ও শক্ত মটর কড়াই (ছোলা) যাঁতায় গুঁড়িয়ে আধ ঘন্টার মতো জলে ভিজিয়ে নরম ক'রে খেতে দেয়া হয় তা।

৩০ তারিখ [অগাষ্ট] এগোলাম আমরা ৮ কোশ পথ। থামলাম এসে গোলপলি (সম্ভবতঃ গোল্লাপল্লী)। ৩১ তারিখ ন'ঘন্টা চলার পর রাতের বিশ্রাম নিলাম গোগেরন (সম্ভবতঃ গোরিগনুর)। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনটিতে মাত্র দু'কোশ পথ পার হয়ে থামলাম এসে গণ্ডিকোট (বুড্ডপা জেলার

একটি দুর্গ শহর)। তিন মাস কাল অবরোধ ক'রে থাকার পর সবে আটদিন হল নবাব (মীর জুমলা) দখলে এনেছেন এ শহরটিকে। এও অসম্ভব হত যদি না কতক ফরাসী তাকে সাহায্য করতেন এ ব্যাপারে। এরা খারাপ ব্যবহার পেয়ে ডাচদের চাকুরি ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন তার বাহিনীতে। চাকুরি করছিল তার কাছে অনেক ইংরাজ ও ডাচ গোলন্দাজও। ছিল তিনজন ইটালীবাসীও। স্থানটি অধিকারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন এরাও।

গণ্ডিকোট কর্ণাটক রাজ্যের একটি দুর্গ-শহর। এটি বানানো হয়েছে একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় (সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৬৭০ ফুট উঁচুতে)। একটি অতি কষ্টসাধ্য রাস্তা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই সেখানে উপস্থিত হবার। এ রাস্তাটি সাধারণভাবে ২০ থেকে ২৫ ফুট চওড়া হলেও স্থানে স্থানে মাত্র ৭ বা ৮ ফুট খাবার।' নবাব সবে ঝুঁকেছেন সেটির সংস্কারের দিকে। পাহাড়ের গা কেটে তৈরি পথটির ডানদিকে রয়েছে একটি ভয়ঙ্কর খাড়া টিলা। তার গোড়া দিয়ে বয়ে চলেছে একটি বড় নদী (পেন্নের নদী)। পাহাড়ের চুড়ায় রয়েছে সিকি কোশের মতো চওড়া ও আধকোশ লম্বা একটি ছোট সমতল অধিত্যকা। চাল ও জোয়ারের চাষ হয় এখানে। জল যোগায় ছোট ছোট অনেক কটি ঝরনা। দক্ষিণের সমতলের বুকে গড়ে উঠেছে শহর। এর তিন দিককার সীমানা নিয়ন্ত্রণ করছে খাড়া পাহাড়মালা ও বয়ে চলা দুটি নদী। তাই শহরে প্রবেশের জন্য রয়েছে মাত্র একটি ফটক এবং তা সমতলের দিকে। কাটা-পাথরের তিনটি দেয়াল দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত করা। গোড়ার পরিখাগুলিও ঐ একই পাথরের লাগোয়া। ফলে অবরোধ কালে মাত্র ৪০০ কি ৫০০ পা চওড়া এলাকা পাহারা দিতে হয়েছিল শহরবাসীদের। ছিল তাদের মাত্র দুটি লোহার কামান। একটি ১২ পাউণ্ডার, অন্যটি ৭ বা ৮ পাউণ্ডার। প্রথমটি বসানো ছিল ফটকের ওপর এবং অন্যটি মঞ্চের মতো একটি স্থানে। নবাব যতক্ষণ পর্যন্ত না উঁচুতে কামান বসানোর উপায় করতে পারলেন ততক্ষণ পর্যন্ত, অবরুদ্ধদের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে চলল তার বাহিনীর বহুলোক। শহর মধ্যে অবরুদ্ধ রাজা পৌত্তলিকদের একজন সেরা ও নির্ভীকতম সেনানায়ক রূপে খ্যাত। নবাব যখন বুঝলেন, উঁচুতে কামান না বসানো পর্যন্ত দখল করা যাবে না এ শহর, তখন তিনি ডেকে পাঠালেন গোলকুণ্ডার বাহিনীতে থাকা সমস্ত ফ্রাঙ্ক গোলন্দাজদের। নির্দেশ দিলেন ওপরে কামান বসানোর এক উপায় খুঁজে বার করতে। সফল হলে চার মাসের মাইনে পুরস্কার হিসাবে দেয়া হবে প্রত্যেককে। হলেন সফল তারা। চারটি

কামানকে উঁচুতে বসিয়ে ক'রে চললেন শহরের ভেতর গোলাবর্ষণ। ফটকের ওপর বসানো প্রতিপক্ষের কামানটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সৌভাগ্য বশতঃ অল্পকালের মধ্যেই পুরো অকেজো ক'রে তুললেন সেটিকে। যখন তারা শহরের ফটকের প্রায় অর্ধেকটা বিধ্বস্ত ক'রে ফেললেন তখন সম্মানজনক সর্তে আত্মসমর্পণ করলেন অবরুদ্ধরা, চলে গেলেন স্থানত্যাগ ক'রে। যেদিন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন নবাবের পুরো বাহিনী ছাউনি ক'রে ছিল পাহাড়টির গোড়ায় সমতলের বুকে, অতি চমৎকার একটি নদীর কাছে (পেন্নের নদী)। এবং নবাব সবে সমাপ্ত ক'রে এনেছেন তার অশ্বারোহী বাহিনী পরিদর্শন। বেশ চটপটে কর্মতৎপর বাহিনী। একজন ইংরাজ গোলন্দাজ ও তার ইতালীয় সহকর্মী মঁসিয়ে দ্যু জর্ডিনও আমাকে দেখে, ফ্রাঙ্ক বলে বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে সবিনয়ে। আমন্ত্রণ জানালেন তাদের সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য। তাদের কাছেই শুনলাম, একজন ফরাসী গোলন্দাজ আছেন এখানে। বর্তমানে তিনি শহর মধ্যে। নাম ক্লড মইলি (Claude Mailli)। বুর্গেসের অধিবাসী (Bourges)। তিনি ব্যস্ত রয়েছেন এখন কামান ঢালাই করার জন্য। ঐ কামানগুলি দিয়ে দুর্গটিকে সুসজ্জিত করতে চান নবাব।

পরের দিন, মাসের ২ তারিখে, পাহাড়শীর্ষে চড়ে উপস্থিত হলাম শহরে। থামলাম মঁসিয়ে মইলির আবাসে। বাটাভিয়াতে, ডাচদের কাছে চাকুরী করা কালেই পরিচয় হয়েছিল তার সাথে। ছিলেন তিনি তখন জেনারেলের উদ্যান-বিশারদ। আনন্দের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। নবাবের কাছেও পেশ করা হল আমাদের আগমন সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন তিনি আমাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেয়ার জন্য। শুধু আমাদের নিজেদের জন্যই নয়, ঘোড়া ও ষাঁড়গুলির জন্যও। এবং যতদিন থাকব গণ্ডিকোটে।

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে দেখা করতে গেলাম নবাবের সাথে। তার তাঁবু খাটানো হয়েছে পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়, পাথর কেটে যেখান থেকে পাহাড়ের গায়ে পথ তৈরী হয়েছে তারই কাছে। সদয়ভাবে গ্রহণ করলেন তিনি আমাদের। জানতে চাইলেন পছন্দসই বাড়ি দেয়া হয়েছে কি না। খাদ্য সামগ্রী যুগিয়ে দেয়া হয়েছে কি না ঠিক মতো। এরপর জানতে চাইলেন আমাদের আগমনের কারণ। শোনালাম তা। নবাব আশ্বাস দিলেন আমাদের। তারপর আদেশ করলেন পান দেয়ার জন্য। বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম শহরে। এসে

দেখি, সব গোলন্দাজরা বসে রয়েছেন আমাদের পথ চেয়ে। সান্ধ্য ভোজনের জন্য জমায়েত হলাম মইলির বাসভবনে। নবাব সেখানে দু'বোতল মদিরা পাঠিয়ে দিলেন আমাদের জন্যে। একবোতল স্প্যানিশ মদিরা ও অন্য বোতল শিরাজী মদিরা, এ দেশে যা রীতিমতো দুর্লভ। ব্রাণ্ডির অবশ্য কোন অভাব নেই এদেশে। চাল (ভাত) ও গুড় দিয়ে তা তৈরী করে তারা। আর এ দুটি সামগ্রী ভারতের সর্বত্রই অপর্যাপ্ত।

চার তারিখে আবার দেখা করলাম নবাবের সাথে। রাজার কাছে বিক্রী করার আশায় যে সব রত্নাদি নিয়ে এসেছি তা দেখালাম তাকে। সেগুলি ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে ও উপস্থিত অন্য কতক আমীরকে দেখিয়ে তারপর তুললেন তার মূল্য প্রসঙ্গ। তা শোনার পর রত্নগুলি ফেরৎ দিলেন আমাদের হাতে। জানালেন, বিষয়টি বিবেচনা ক'রে দেখবেন তিনি। সেদিন তার সঙ্গে খেলাম আমরা। তারপর ফিরে এলাম শহরে। দশ তারিখ মধ্যে আর দেখা হল না নবাবের সঙ্গে।

দশ তারিখ সকালে তিনি ডেকে পাঠালেন আমাদের। তাঁবুতে পৌঁছে, তার কাছাকাছি বসলাম আমরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকরা এনে দিল তার হাতে হীরক ভরা পাঁচটি ছোট থলি। প্রত্যেকটি থলিতেই এক মুঠো ক'রে হীরে। সবগুলিই চেপটা ডিম্বাকৃতি। কিন্তু রঙ তার খুব ঘন, আকারেও অতি ক্ষুদে। বেশির ভাগই এক বা আধ ক্যারাট ওজনের। তবে অন্যান্য দিক থেকে বেশ পরিষ্কার। ছিল দু ক্যারেট ওজনের গুটি কয়েকও। নবাব এ হীরেগুলি আমাদের দেখিয়ে জানতে চাইলেন, আমাদের দেশে এ জিনিষ বিক্রী সম্ভব কিনা। উত্তর দিলাম, যদি এর রঙ পরিষ্কার হত, সম্ভব হত তাহলে। কেননা স্বচ্ছ ও হালকা রঙের না হলে ইওরোপে কদর নেই এর। যখন তিনি গোলকুণ্ডা হয়ে এ রাজ্য দখল করার পরিকল্পনায় মাতেন, তখন শুনেছিলেন যে অনেক হীরাখনি রয়েছে এখানে। বারো হাজার লোককে সেই সব খনিতে কাজের জন্য পাঠালেন তিনি। কিন্তু এক বছর সন্ধান চালিয়ে পেয়েছে তারা মাত্র ওই পাঁচ থলি ক্ষুদে হীরে। নবাব যখন দেখলেন, সেখান থেকে শুধু ঘন রঙা পাথর পাওয়া গেছে, যেগুলির ঝোঁক উজ্জ্বল অপেক্ষা কালোর দিকেই বেশি তখন বুঝলেন সব ঝুঁকি ও পরিশ্রমই জলে গেছে তার। বন্ধ ক'রে দিলেন তখন খনির কাজ। পাঠিয়ে দিলেন ঐ সব গরিব লোকদের আবার চাষবাসের কাজে। নবাব তার হীরেগুলি থলেবন্দী ক'রে রাখার পর একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলাম

আমর। তারপর ঘোড়ায় চেপে বহু অভিজাতকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি শিকারে। আমাদেরও আমন্ত্রণ জানালেন সঙ্গী হবার জন্য। কিন্তু বিনীত ভাবে এড়িয়ে গেলাম তা। আমাদের দেখানো মুক্তাগুলি সম্পর্কে কোন কথা হতে পারল না সেদিন আর।

১৩ তারিখ নবাব শহরে এলেন তার আদেশে মইলির গড়ে তোলা ঢালাই কেন্দ্রটি দেখার জন্য। মইলি আমস্টারডামে নাম লিখিয়েছিলেন ভারতীয় অঞ্চলে আসার ইচ্ছে নিয়ে। বাটাভিয়ায় পৌঁছে পড়ে গেলেন তিনি জেনারেলের নজরে। অত্যন্ত কুশলী ও খুব চালাক চতুর দেখে তিনি রেখে দিলেন তাকে আপনার কাছে। নিযুক্ত করলেন তার উদ্যানে কতক গুহা ও ঝরনা তৈরির জন্য। কিন্তু একাজ ভালো লাগল না মইলির। সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি জেনারেলের রুক্ষ ব্যবহারেও। জোগাড় ক'রে নিলেন তাই বাটাভিয়া থেকে নবাবের কাছে প্রেরিত দূত মঁসিয়ে স্টেটর-এর দলে চাকুরি। নবাব এসময়ে গণ্ডিকোট অবরোধের জন্য ব্যস্ত। কাজ শেষ হতেই হলেন রাজদূত ফিরে যাবার জন্য উদ্যোগী। তার যাত্রার ঠিক আগের দিন মইলি দূতের শল্য চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি ও ওষুধের বাক্স হাতিয়ে নিয়ে লুকিয়ে পড়লেন কোথায়। অনেক খোঁজ চালিয়েও মইলির দেখা না পেয়ে দিন কয়েক অপেক্ষা করার পর ফিরে গেলেন ডাচ-দূত। মইলি তখন যোগ দিলেন শল্যবিদ রূপে নবাবের চাকুরিতে। কিছুকাল পর নবাবকে তিনি জানালেন, তিনি একজন দক্ষ গোলন্দাজ ও কামান ঢালাইকার। ক'রে চললেন তখন সেই পদেই চাকুরি। গণ্ডিকোট জয়ের পর নবাব চাইলেন এখানে দুর্গমধ্যে কতক কামান নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু তা বেশ দুঃসাধ্য কর্ম দেখে মইলির কাছে প্রস্তাব করলেন ভেতরে বসে কুড়িটি কামান ঢালাই করার। দশটি ৪০ পাউণ্ডার, দশটি ২৪ পাউণ্ডার। মইলি নিলেন সে দায়িত্ব। চারদিক থেকে তামা সংগ্রহ ক'রে তা সরবরাহ করা হল তাকে। জমা করা হল এজন্য মন্দির থেকে লুটে আনা কতক বিগ্রহও। গণ্ডিকোটে একটি মন্দির বর্তমান। এটি ভারতের প্রধান মন্দিরগুলির অন্যতম রূপে বিবেচিত। অনেকগুলি বিগ্রহ রয়েছে সে মন্দিরে। কতক সোনার, কতক রূপার। আর ছটি তামায় তৈরি। তিনটি উপবিষ্ট ভঙ্গিমায়, তিনটি দাঁড়ানো ও দশফুট উঁচু। ধাতু ও মূর্তিগুলি গলাবার সব আয়োজন করলেন মঁসিয়ে মইলি। গণ্ডিকোট মন্দিরের ছটি মূর্তি ছাড়া, অন্যান্য মন্দির থেকে আনা সব মূর্তিগুলিকে ফেললেন তিনি গালিয়ে। কিন্তু ঐ ছটি মূর্তিকে বহু চেষ্টা ক'রেও সম্ভব হল না গালানো। নবাব রেগে গিয়ে ভয়

দেখালেন মন্দিরের পুরোহিতদের, অভিযোগ করলেন তারা মূর্তিগুলিকে জাদু করেছে বলে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত একটি কামানও গড়তে পারলেন না মইলি। একটি গেল ফেটে, আরেকটি রইল অসম্পূর্ণ। ফলে, তিনি অব্যাহতি নিলেন এ দায়িত্ব থেকে। এবং কিছুদিন পর চলে গেলেন নবাবের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে।

১৪ তারিখে নবাবের তাঁবুতে গেলাম তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ও মুক্তাদি সম্পর্কে তার শেষ কথা শোনার জন্য। আমাদের জানানো হল তিনি বর্তমানে কতক অপরাধীর বিচারে ব্যস্ত। দ্রুত দণ্ডবিধানের জন্য তাদের উপস্থিত করা হয়েছে তার কাছে। এদেশের রীতি হল কোন অপরাধীকে কারাগারে আটকে না রাখা, গ্রেপ্তারের সাথে সাথে তার অপরাধের বিচার ক'রে দণ্ড দেয়া। যদি দেখা যায় অপরাধী নির্দোষ, তবে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেয়া হয় তাকে। আর, মামলার বিষয়টি যত জটিলই হোক না কেন, করা হয় তার দ্রুত সমাধান। আমাদের আরো জানানো হল, এদিন তিনি নিচে সমতলের বুকে সেনা পরিদর্শন করতে যাবেন বলেও দুরূহ হবে তার সঙ্গে দেখা করা। সন্ধ্যাবেলা ত্রুটি করলাম না আসতে। দেখা হল তাঁবুর দরজার কাছে, সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছিলাম তার ফেরার। মঁসিয়ে দ্যু জরডিন ও আমি অভিবাদন জানালাম তাকে। পরদিন সকালে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

১৫ তারিখ সকাল সাতটায় হাজির হলাম নবাবের কাছে। আমাদের উপস্থিতির খবর জানাতেই ডাকা হল তাঁবুর ভেতরে। দুই সচিবকে কাছে নিয়ে বসেছিলেন তিনি। এ দেশের রীতি হল, মোজা না পরে, ফাঁকা পায়ে চটি গলিয়ে চলাফেরা করা। কেননা, যেখানেই যান সেখানেই হাঁটতে হচ্ছে আপনাকে কার্পেটের ওপর দিয়ে। এছাড়া বসতেও হয় এদেশে তুর্কীদেশের মতো এক রীতিতেই। নবাব বসেছিলেন তার পায়ের আঙুলের ফাঁকে একগোছা চিঠি নিয়ে। তার বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকেও ছিল আরেক গোছা চিঠি। কখনো হাত থেকে চিঠি টেনে নিয়ে তার উত্তর লিখে পাঠাচ্ছিলেন সচিবদের দিয়ে। দিচ্ছিলেন নিজের হাতেও কোন কোনটির উত্তর। চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেলে পড়ে শোনানো হল সেগুলি। এরপর তাতে তার মোহরছাপ এঁটে করা হল পাঠানোর ব্যবস্থা। কতক পদাতিক বাহকের হাত দিয়ে, কতক অশ্বারোহী মাধ্যমে। এখানে বিশেষভাবে শুনিয়ে দেয়ার মতো যে ভারতে রাজা-মহারাজা, সেনাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারেরা পদাতিকের মাধ্যমে যে সব পত্র

পাঠান তা অশ্বারোহীদের বয়ে নিয়ে চলা চিঠির তুলনায় বহু দ্রুত পৌঁছয় প্রাপকদের কাছে। কেননা, প্রতি দু'কোশ অন্তর রয়েছে এজন্য পথের পাশে একটি ক'রে ছোট কুটির। রাখা হয়েছে সেখানে ২/৩ জন ক'রে দৌড়'লী। যখন কোন পদাতিক বাহক বা দৌড়ালী চিঠি নিয়ে ঐ কুটিরে পৌঁছয়, সে তখন সেটি ছুঁড়ে দেয় ঐ কুটিরের দোরগোড়ায় অপেক্ষমান দৌড়ালীদের পায়ের কাছে। তাদের একজন সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ে দৌড়তে শুরু করে পরবর্তী কুটিরের দিকে। হাতে চিঠি এগিয়ে দেয়া অশুভকর মনে করা হয় বলেই তা ছুঁড়ে দেয়া হয় ঐ ভাবে পায়ের কাছে। এবং দৌড়ালীকে মাটি থেকে তুলে নিতে হয় তা। আরো দেখার বিষয় যে ভারতের সর্বত্রই পথের দুপাশে লাগানো রয়েছে গাছের সারি। যেখানে কোন গাছ লাগানো নেই সেখানে ৫০০ পা অন্তর অন্তর বসানো রয়েছে একটি ক'রে পাথর। নিকটবর্তী গ্রামের লোকদের ওপর রয়েছে সেটিকে নিয়মিত সাদা রঙে চিত্রিত করে রাখার দায়িত্ব। ওই স্মারক চিহ্নগুলি দেখে অন্ধকার বা বৃষ্টির রাতে পথ ঠিক করে দৌড়ালীরা। আমরা কাছে বসে থাকা কালে নবাবকে জানানো হল যে চারজন বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁবুর দরজার গোড়ায়। আধঘন্টার মধ্যে কোন উত্তরই দিলেন না তিনি। টানা চিঠি লিখে চললেন নিজে, লেখালেন সচিবদের দিয়েও। তারপর এক সময়ে হঠাৎ আদেশ দিলেন, বন্দীদের ভেতরে আনা হোক। তাদের নিয়ে আসা হলে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ক'রে নিজ মুখে তাদের দিয়ে অপরাধ স্বীকার করিয়ে নেয়ার পর চুপ হয়ে গেলেন ঘন্টা-খানেকের জন্য। চললেন আবার চিঠি লিখে ও লিখিয়ে। এরপর এল তার সুমুখে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাতে পদস্থ সামরিক কর্মচারীর দল। নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি উত্তর দিয়ে চললেন তাদের অভিবাদনের।

এই চার বন্দীর মধ্যে একজন অপরের বাড়ি মধ্যে ঢুকে হত্যা করেছিল তিন শিশু সন্তান সহ এক রমণীকে। সঙ্গে সঙ্গে হাত পা কেটে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তার দেহ ফেলে রাখা হল রাজপথের পাশে একটি মাঠে। অন্য একজন চুরি করেছিল রাজপথে। তার পেট চিরে তাকে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন নবাব। অন্য দুজন যে ঠিক কি অপরাধ করেছে ধরতে পারলাম না তা। তবে আদেশ দেয়া হলে দুজনেরই মাথা কেটে ফেলার। এসব শেষ হবার পর করা হল ভরা পেট ভোজনের জন্য খাবার পরিবেশন। নবাব সাধারণতঃ আহার করেন দশটার সময়। খেতে হল তার সাথে আমাদেরও। সুফ্রা, বা খাবার চাদর সরিয়ে নেয়ার পর বিদায় নিলাম আমরা অধিকাংশ অভিজাতর কাছ থেকে।

তারাও আহারে বসেছিলেন নবাবের সঙ্গে। যখন দু-তিনজন বাদে আর সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তখন জানতে চাইলাম, আমাদের সঙ্গে থাকা রত্ন দি রাজাকে দেখাব কি না। তিনি উত্তর দিলেন, চাইলে যেতে পারি আমরা গোলকুণ্ডায়। সেখানে তিনি তার ছেলেকে লিখে জানাবেন আমাদের বিষয়। আর পৌঁছে যাবে সে চিঠি আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই। ১৬ জন অশ্বারোহীর ওপর দায়িত্ব দিলেন তিনি আমাদের নিরাপদে ১৩ কোশ দূরবর্তী নদী পার ক'রে দিয়ে আসার জন্য এবং পথে যা কিছু প্রয়োজন তা যুগিয়ে দেয়ার জন্য। যাতে কোন সেনা পালাতে না পারে সেজন্য ওই নদীটি পার হতে দেয়া হয় না নবাবের ছাড়পত্র ছাড়া।

সতেরো || গণ্ডিকোট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথ পরিচয়

সেপ্টেম্বর ১৬৫২-র ১৬ তারিখ সকালে ছাড়লাম গণ্ডিকোট। গোলন্দাজদের অনেকেই সঙ্গে চললেন আমাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য। সঙ্গে প্রচুর খাবার দাবার নিয়ে প্রথম বিরাম-পর্ব পর্যন্ত এলেন তারা। সেদিন মাত্র সাতকোশ পথ এগিয়ে রাত কাটালাম এসে কোটেপালী (কোট্টপিল্লী ?)।

পরদিন সকাল বেলা প্রাতরাশের পর বিদায় নিলেন গোলন্দাজরা। ফিরে চললেন গণ্ডিকোট। নবাবের দেয়া ১৬ জন অশ্বারোহীর সাথে এগিয়ে চললাম আমরা। ছ'কোশ পথ পার হয়ে, নদীর অপর পারে থাকা কোটিন নামের গ্রামে রাত কাটালাম সেদিন। নদীতে তখন ভরা জল। আমরা সেটি পার হতেই বিদায় নিল অশ্বারোহীরা। পান তামাকের জন্য তাদের নায়ককে কিছু অর্থ যাচলাম আমরা, কিন্তু নিতে রাজী করানো গেল না কিছুতেই। যে নৌকায় চেপে নদী পার হলাম দেখতে তা বড় ঝুড়ির মতো। বাইরের দিকটি ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে ঢাকা। ভেতরে, তলের দিকটিতে কতক শুকনো কাঠ বিছিয়ে তার ওপর কার্পেট বিছিয়ে দেয়া। যাতে ভিজে না যায় তল্পী-তল্পা ও অন্যান্য সামগ্রী। শকট ও বহল পার করতে হলে সেগুলিকে দণ্ড ও চাকার সাহায্যে আটকে বা বেঁধে নেয়া হয় দুটি ঝুড়ির মাঝে। ঘোড়াগুলিকে নেয়া হয় সাঁতরে। একজন পিছু থেকে চাবুক উঁচিয়ে তাড়া দিয়ে চলে সেটিকে, আরেকজন বল্গা হাতে ধরে রাখে তাকে ঝুড়ির

ভেতর দাঁড়িয়ে। ষাঁড়ের বেলা সে অসুবিধে নেই। পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে, নামিয়ে দিলেই হল জলে। কারো কোন সাহায্য ছাড়াই পার হয়ে যাবে সে। প্রতিটি ঝুড়িতে চারজন ক'রে মাঝি। এক একজন এক এক কোণে দাঁড়িয়ে বৈঠা চালিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেটিকে। চারজনে একতালে বৈঠা চালাতে ব্যর্থ হলে বা কেউ একজন অন্যদের সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে ঝুড়িটি টাল খেয়ে ঘুরপাক খায় তিন চারি বার। জলের স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায় তখন অন্যদিকে। যেখানটিতে নামার কথা সেখানে পৌঁছতে না পেরে চলে যায় দূরে অন্য কোনখানে।

১৮ই সেপ্টেম্বর পাঁচঘন্টা পথ চলার পর এলাম আমরা সেরিমোল। ১৯ তারিখ পার হলাম ন'কোশ। থামলাম সনতিসেলা (কর্ণুল জেলার সঙ্কেরলা)। পরদিন, ২০ তারিখে এগোলাম ন'কোশ পথ। রাত কাটালাম গোরেমেদায় (গুদিমিত্ত)। ২১ তারিখ ছ ঘন্টা পথ ভাঙার পর ঠাঁই নিলাম কমন-এ (কুম্বম বা কুম্বাম শহর)। মীর জুমলার বাহিনী কর্ণাটক জয়ের আগ পর্যন্ত এটি ছিল গোলকুণ্ডা রাজ্যের এক প্রান্তিক শহর।

২২ তারিখ পাড়ি দিলাম সাত কোশ পথ। রাতের ঘুম দিলাম এমেন্দিপত (বেমুলকোট)। মাঝপথে চারহাজারেরও বেশি লোকের একটি দঙ্গলের সাথে দেখা। দেব-বিগ্রহ সহ কুড়িটিরও বেশি পালকি নিয়ে চলেছে স্ত্রী-পুরুষের দল। সোনা ও রূপার ঝালর সহ সোনা, সোনার কাজ করা কিংখাব ও মখমল দিয়ে সাজানো পালকিগুলি। পালকির আকার ও বিগ্রহের ওজন অনুসারে বয়ে নিয়ে চলেছে কোনটিকে চারজন, কোনটিকে বা আট, আবার কোনটিকে বারোজন লোকে। পালকির প্রতিটি দিকে পাঁচ ফুটের মতো পরিধির একটি ক'রে বড় গোলাকার পাখা নিয়ে চলেছে একজন ক'রে লোক। সুন্দর অস্ট্রিচের পালক অথবা বহুবর্ণা ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি সেগুলি। হাতলগুলি তার পাঁচ কি ছ' ফুট লম্বা এবং সোনা ও রূপা দিয়ে ফরাসী ক্রাউন বা একুর মতো পুরু ক'রে মোড়া। এই পাখাগুলি বয়ে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি ক'রে চলেছে প্রত্যেকেই। সকলেরই সাধ দেবতার গায়ে হাওয়া ক'রে, নাক-মুখ থেকে মাছি তাড়িয়ে তার সেবাদ্বারা পুণ্যার্জন ক'রে নেয় একটু। এর চেয়েও বড় আকারের ও হাতল বিহীন একটি পাখা বয়ে চলা হচ্ছে ঢালের মতো। বিভিন্ন রঙা পালক দিয়ে বিচিত্র বর্ণ ক'রে তোলা হয়েছে এটিকে। কিনারা ঘিরে লাগানো হয়েছে সোনা ও রূপার ছোট ছোট ঘুন্টি। যেদিক থেকে রোদ পড়ে সেদিকটিকে এটি দিয়ে আড়াল ক'রে

পালকির পাশে পাশে হেঁটে চলে একজন লোক। দেখে, বিগ্রহের গায়ে রোদ না লাগে যাতে। মাঝে মাঝে বিগ্রহকে আনন্দ দেয়ার জন্য বাহক সেটিকে দুলিয়ে ক'রে চ'লে শব্দ। দেব বিগ্রহ সহ এসব লোক এসেছে বুরহানপুর ও তার আশে-পাশের অঞ্চল থেকে। চলেছে কর্ণাটক রাজ্যে থাকা তাদের প্রধান দেবতার মন্দিরে। পুরো একমাস আগে বেরিয়েছে তারা, প্রধান মন্দিরে পৌঁছতে লাগবে আরো প্রায় চৌদ্দ-পনের দিন। আমার পরিচারকদের ভেতর একজন বুরহানপুরের লোক। এবং ওই একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের। এ মিছিল দেখেই দেবতাদের অনুগমন করার জন্য বসলো ছুটি চেয়ে। বললে, বহুকাল থেকে মানত রয়েছে তার এই তীর্থ করার জন্য। বাধ্য হলাম তাকে ছুটি দিতে। ভালো করেই জানা ছিল, ছুটি না দিলে ওই মিছিলে তার বহু আত্মীয়-স্বজন থাকায়, নিজেই একতরফা ভাবে ছুটি নিয়ে বসবে সে। প্রায় দুমাস পর হাজির হল আমার কাছে সে সুরাটে। মঁসিয়ে দ্যু জরভিন ও আমাকে বিশ্বস্তভাবে আগে সেবা করেছে বলে বিনাবাক্য ব্যয়ে আবার নিয়ে নিলাম তাকে। ক'রে আসা তীর্থ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সে আমায় যে কাহিনী শোনাল তা বিশ্বাস করা শক্ত। আমার কাছ থেকে ছুটি নেয়ার ছ'দিন পরের ঘটনা সেটি। ঠিক ছিল সেদিন তীর্থযাত্রীরা সবাই রাতে কাটাবে নদী পার হয়ে ওপারের একটি গ্রামে। গ্রীষ্মকালে খুব কম জল থাকে নদীটিতে. যে কোন স্থান দিয়ে পার হওয়া যায় হেঁটে। কিন্তু বর্ষা দেখা দিলেই ভারতের চিত্র অন্যরকম। প্লাবনের চেহারা নিয়ে জলস্রোত দেখা দেয় চারিদিকে। এক দু'ঘন্টার মধ্যেই ছোট ছোট নদীর জল বেড়ে যায় দু-তিন ফুট। আচমকা বর্ষায় এ নদীটির অবস্থাও হল তাই। ফলে, নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল যাত্রীদের পক্ষে। অথচ খাবার নেই সাথে। ভ্রমণের বেলা সাধারণতঃ খাবার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয় না ভারতে। বিশেষ ক'রে পৌত্তলিকদের তো কোন প্রয়োজনই পড়ে না তার। জীবন আছে এমন কোন কিছু খায় না ওরা। আর চাল, ময়দা, ঘি, দুধ, শিম ও অন্যান্য শাক-সব্জি, চিনি এবং শুকনো বা তরল যে কোন ধরনের মণ্ডামিঠাই অনায়াসেই প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করা চলে যে কোন নগণ্য গ্রাম থেকেও। তাই, গ্রামে পৌঁছতে না পেরে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে গেল এই বিরাট যাত্রীদল। সঙ্গের শিশুদের কি খেতে দেবে এখন? সকলের মনে এই নিয়ে ভাবনা খেলে গেল, উঠল গুঞ্জন। এই চরম ক্ষণে তাদের মাঝে এসে বসলেন প্রধান পুরোহিত। একটি বড় চাদর দিয়ে নিজেকে ঢাকা দিয়ে ডাক দিতে থাকলেন যার যার খাদ্য প্রয়োজন তাকে এগিয়ে আসার জন্য। এগিয়ে এলে,

প্রশ্ন করতে থাকলেন কি কি তার দরকার? চাল কি ময়দা? কজনের জন্য? এইসব আরকি। তারপর চাদরটির একটি কোণা উঁচু ক'রে একটি বড় চাতার সাহায্যে যে যা চাইল দিয়ে চললেন তাই। ফলে চার হাজার লোকের কেউই না খেয়ে রইল না শেষ পর্যন্ত।

কেবল যে আমার পরিচারকই এ কাহিনীটি শোনাল তা নয়। পরে বিভিন্ন সময়ে যখনই বুরহানপুর গিয়েছি ও সেখানকার প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে খোঁজ নিয়েছি এ ব্যাপারে, তারা সকলেই ভগবানের নামে দিব্যি দিয়ে সমর্থন করেছে এ কাহিনী। এই ব্যক্তিরা সকলেই আমায় চেনে জানে, এদের অনেকে যোগও দিয়েছিল ওই তীর্থযাত্রীর দলে। এ সত্ত্বেও এ কাহিনীতে বিশ্বাস জন্মাল না আমার।

তেইশ তারিখ ৮ কোশ পথ চলে এবং অনেকগুলি খর জলপ্রবাহ পার হয়ে পৌঁছলাম এসে দোপর (দুপাদ, মার্কাপুর তালুকের একটি গ্রাম)। পরদিন, ২৪ তারিখ, পরিক্রমা করলাম মাত্র চার কোশ পথ। বিশ্রাম নিলাম ত্রিপন্তি এসে (ত্রিপুরান্তথম)। পাহাড় শীর্ষে রয়েছে একটি চমৎকার মন্দির। পুরো পাহাড়টিকেই ধাপ কেটে কেটে দেয়া হয়েছে সোপানের আকৃতি। এবং কাটা-পাথর দিয়ে বাঁধানো। এই সিঁড়ির যে পাথরটি সব থেকে ছোট সেটিও লম্বায় দশ ফুট ও চওড়ায় তিন ফুট। মন্দিরটি মধ্যে বহু দৈত্যমূর্তি বর্তমান। অন্যান্য চিত্রকর্মের মধ্যে একটিতে দাঁড়িয়ে আছে ভেনাসের মতো একটি রমণীমূর্তি এবং বহু দৈত্য কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। পুরো চিত্রটিই একটি মর্মর পাথরে খোদাই। তবে হাতের কাজ অতি স্থূল। ২৫ তারিখ আট কোশ পথ পাড়ি দিয়ে এলাম মমলি (মরিভেমুলা)। পরদিনও আট কোশ পাড়ি দিয়ে রাত কাটালাম এসে মচেলিতে (গুন্টুর জেলার মাচেরলা গ্রাম)।

২৭ তারিখে ঝুড়িতে চেপে পার হতে হল একটি বড় নদী (কৃষ্ণা নদী)। আধেক দিন চলে গেল এতেই। ফলে, তিন কোশের বেশি পথ চলা আর হয়ে উঠল না সেদিন। যখন নদীকূলে পৌঁছলাম, দেখি না আছে কোন ঝুড়ি, না রয়েছে পার হবার অন্য কোন উপায়। এমন সময় এগিয়ে এল একজন লোক, পার করা নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের দর কষাকষির পর হল একটা রফা। তখন আমাদের দেয়া পারানির টাকা খাঁটি কি নকল তা যাচাই ক'রে দেখার জন্য জ্বাললে সে এক বড় আকারের আগুন। ছুঁড়লে মুদ্রাগুলি তার ভেতরে। সকল যাত্রীর কাছ থেকে অগ্রিম আদায় ক'রে নেয়া পারানিই পরখ ক'রে দেখল এভাবে

সে। যে টাকাটিই আগুনে ফেলার পর কালচে চেহারা নিল পালটে দিতে হল যাত্রীদের। সেটিকেও আবার বাজিয়ে নেয়া হল এভাবে আগুনে তাতিয়ে। এভাবে অর্থ সম্পর্কে পুরো নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ার পর ডাক দিল সে তার সঙ্গী-সাথীদের। বার ক'রে আনতে বললে ঝুড়ি-নৌকা। এগুলি নদীর অপর পারে কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয় সাধারণতঃ। এদিক থেকে খুব চতুর এরা। যেই দেখে, কোন একটি বিশেষ দিক থেকে যাত্রীরা আসছে নদী পার হবার জন্য, অমনি নৌকাটিকে পাঠিয়ে দেয়া হয় তার বিপরীত তীরে। ফলে, প্রথমে পারানির মজুরি না দিয়ে পার হবার উপায় থাকে না আর কারো। মজুরি বুঝে নিয়ে দলপতি হাঁক দিলে তবেই ঝুড়িটিকে ঘাড়ে ক'রে বয়ে এনে জলে ভাসায় সাথীরা। নিয়ে আসে অন্য পারে, অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছে।

২৮ তারিখে পাঁচ কোশ পথ চলে থামলাম এসে দবির পিনতায় (সম্ভবতঃ দবির হ্রদ)। পরদিন চললাম পুরো বারো ঘন্টা। রাতের ঘুম দিলাম হোলকোরায়। পরদিনটি ছিল সোমবার, অক্টোবর মাসে প্রথম দিন। সেদিন দশ কোশ এগিয়ে রাত কাটালাম এসে অতেনর (১১ পরিচ্ছেদে উক্ত তেনর)। বর্তমান রাজমাতার প্রমোদভবনগুলির একটি এখানে। বাড়িটির সম্মুখে থাকা চতুষ্কটির দিকে মুখ ক'রে পর্যটকদের রাত কাটানোর জন্য রয়েছে এখানে অনেকগুলি ঘর।

এখানে উল্লেখযোগ্য, যে অঞ্চল আমরা পেছনে ফেলে এসেছি সেই কর্ণাটক এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে চিকিৎসক অতি দুর্লভ। রাজা-রাজড়াদের রাখা চিকিৎসক ছাড়া নেই বললেই চলে আর কেউ। সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে, বর্ষাকাল এলে ধুম পড়ে যায় তাই চলতি রোগের প্রতিষেধক গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ক'রে রাখার। শহর ও গ্রাম থেকে পরিবারের প্রবীণ মহিলারা সকালের দিকে বেরিয়ে পড়েন এসবের খোঁজে। অবশ্য, ভাল ভাল শহরে দেখা মেলে ওষুধপত্র সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দু' একজন চিকিৎসকের। প্রতিদিন সকালে বাজারে বা পথের ধারে বসে তারা চিকিৎসার বিধান দেন রোগীদের। প্রথমে রোগীদের নাড়ি টিপে দেখেন, দেন তারপর তাদের ওষুধ। সাধারণতঃ দুই ফার্দিং ক'রে দর্শনী নেন এজন্য তারা এবং মুখ দিয়ে বিড় বিড় ক'রে বকে চলেন কিছু।

২রা অক্টোবর। গোলকুণ্ডা থেকে আর আমরা মাত্র চার কোশ দূরে। থেকে গেলাম এক যুবক ডাচ শল্যবিদের বাড়িতে। রাজার চিকিৎসক তিনি, নাম পিতর দ্য লান (পিটার দ্য লাঞ্জ)। গোলকুণ্ডার রাজা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে বাটাভিয়া থেকে আসা ডাচ রাজদূত মঁসিয়ে চেটেউর রেখে যান তাকে

গোলকুণ্ডায়। রাজা পুরানো মাথা ধরার রোগে ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে। চিকিৎসক বিধান দিয়েছিলেন জিভের নিচে চার স্থান থেকে রক্ত বার ক'রে দেয়ার জন্য। কিন্তু এমন কোন ভাল শল্যবিদ পাওয়া গেল না যিনি সাহস ক'রে নিতে পারেন এ রক্তমোক্ষণের দায়িত্ব। দেশীয় লোকদের কোন ধারণাই নেই এ সম্পর্কে।

রাজার চাকুরিতে যোগ দেয়ার আগে দ্য লানকে জিগ্যেস ক'রে নেয়া হল তিনি রক্তমোক্ষণে কুশলী কিনা। তিনি তখন উত্তর দিলেন, এটি শল্য চিকিৎসায় সব থেকে সহজ কর্ম। বাটাভিয়ান ডাচ দূত গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হলেন তাকে ছেড়ে দিতে। মোটকথা, রাজাকে অমান্য করতে চাইলেন না তিনি। দ্য লান-কে মাসিক মাইনে দেয়া হল ৮০০ প্যাগোডা। রাজদূত বিদায় নেবার কিছুদিন পরে রাজা ডেকে পাঠালেন শল্যবিদ দ্য লানকে। জানালেন, আগামীকাল তিনি চিকিৎসকের নির্দেশমতো জিভের নিচ থেকে রক্তমোক্ষণ করাতে আগ্রহী। কিন্তু তাকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে আট আউন্সের বেশি রক্তপাত না ঘটে। দ্য লান রাজপ্রাসাদে এলেন পরদিন। দু তিনজন খোজা একটি ঘরের ভেতর নিয়ে গেল তাকে। চারজন বৃদ্ধা রমণী তাকে স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে করিয়ে দিলে ভালভাবে স্নান। করলে তার দেহে নানা গন্ধ-দ্রব্য লেপন। তার ইওরোপীয় পোশাকের পরিবর্তে পরালে এদেশীয় পোশাক। নিয়ে যাওয়া হল তারপর তাকে রাজার কাছে। আনা হল দুটি সোনার পাত্র। উপস্থিত চিকিৎসকরা ওজন ক'রে নিলেন সে দু'টিকে। এই পাত্র দুটিতেই ঝরানো হবে রক্ত। করলেন রক্তমোক্ষণ দ্য লান, এবং এত দক্ষতার সাথে যে পাত্র দুটিকে ওজন করার পর দেখা গেল, ঝরানো হয়েছে ঠিক ঠিক আট আউন্স রক্তই। রাজা এত খুশী হলেন যে ৩০০ প্যাগোডা উপহার দিলেন তাকে। যুবতী রানী এবং রানী-মাতাও তার নৈপুণ্যের কথা শুনে করাতে চাইলেন তারই কাছে রক্তমোক্ষণ। তবে আমার মনে হয়, রক্তমোক্ষণের চেয়ে, তাকে দেখার আগ্রহই ছিল প্রধান। কেননা, দ্য লান যুবক, এবং সুগঠিত সুন্দর-দর্শন। এবং কোন একজন বিদেশীকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ খুবই কম পায় তারা। তবে, দূর থেকে দেখা অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ তারা যেরূপ পরিবেশে বাস ক'রে তাতে বাইরের লোক তাদের দেখতে না পেলেও তারা দেখতে পায় বাইরের লোকদের। আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন দ্য লান। নিয়ে যাওয়া হল তাকে একটি কক্ষের ভেতরে। সেখানে সেই একই রমণীর দল আগের বারের মতোই ভালভাবে তার হাত ধুইয়ে, সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন দেহে ও হাতে। তারপর টাঙানো হলো পর্দা। যুবতী রানী পর্দায় থাকা

একটি গর্তের ভেতর দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিলেন রক্তমোক্ষণের জন্য। একই ভাবে রক্তমোক্ষণ করা হল তারপর রানীর মায়ের। প্রথমজন এজন্য পঞ্চাশ ও দ্বিতীয় জন তিরিশ প্যাগোডা বা মন্দির মার্কা মোহর দিলেন তাকে। দিলেন এছাড়াও সোনার বুটিকাজ করা কিংখাব কয়েক প্রস্থ।

গোলকুণ্ডায় পৌঁছবার দুদিন পর নবাবের (মীর জুমলা) ছেলের সঙ্গে গেলাম দেখা করতে। জানানো হল, সেদিন সম্ভব হবে না তার সঙ্গে কথা বলা। পরদিন আবার গেলাম, শুনলাম ওই একই উত্তর। একজন আমাদের জানালেন, তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এভাবে হ'-পিত্যেশ ক'রে দিন গুণে চলতে হবে আমাদের দীর্ঘকাল। প্রথমতঃ এই যুবক আমীরটি বড় একটা রাজার সঙ্গ ছাড়া হন না। যখন হন তখনও সরাসরি এসে ঠাঁই নেন নিজের হারেমে, কাটান আপন রমণীদের সান্নিধ্যে। আমাদের কাজে অযথা দেরী হয়ে চলেছে দেখে শল্য চিকিৎসক গু-লান তৎপর হলেন এবার। বললেন সব কথা রাজার প্রধান চিকিৎসককে। তিনি তার মুখে সব কথা শুনে ডেকে পাঠালেন আমাদের। জানতে চাইলেন কোথা থেকে আমরা এসেছি, কি প্রয়োজনে দেখা করতে চাই রাজার সাথে। জানালাম, সেরা জাতের কতক মুক্তো দেখাতে চাই রাজাকে। শুনে পরদিন নিয়ে আসতে বললেন সেগুলি। করলাম তাই। জিনিষগুলি দেখে ছোট ছোট থলিতে পুরে মুখ বন্ধ ক'রে আমাদের সীল এঁটে দিতে বললেন তিনি। কেননা, রাজার কাছে প্রদর্শনের জন্য কোন কিছু উপস্থাপিত করলে ব্যবসায়ীর সীল সহ-ই করার নিয়ম তা। রাজাও জিনিষগুলি দেখার পর এঁটে দেন নিজের সীল মোহর। যাতে কোন রকম জাল-জুয়াচুরী না হতে পারে সে জন্য এ ব্যবস্থা। আমরা তখন সীল ক'রে প্যাকেটটি দিয়ে এলাম তার কাছে। তিনি কথা দিলেন সেগুলি দেখাবেন রাজাকে। এবং করলেনও তা।

পরদিন খুব ভোরে গুলান সহ বেরিয়ে পড়লাম আমরা শিকারের জন্য। ফিরলাম সকাল আটটা কি নটা নাগাদ। হাতির স্নানের দৃশ্য দেখার জন্য গেলাম নদীতীরে। রাজা ও বড় আমীরদের হাতিগুলি জড়ো হয়েছে সেখানে। পেট পর্যন্ত গভীর জলে নেমে কাত হয়ে শুয়ে, শরীরের যে দিকটি জলে ভেজেনি সেদিকটিতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে চলেছে শুঁড় দিয়ে। দিচ্ছে ভাল ক'রে ধুইয়ে। মাহুতরা এরপর এক ধরনের ঝামা নিয়ে তাদের সারা গা ঘসে ঘসে পরিষ্কার ক'রে দিল গায়ের সব ময়লা। অনেকের ধারণা এই প্রাণীটি যখন নিচে বসে বা শোয় তখন আর ফিরে উঠে দাঁড়াতে পারে না নিজে থেকে। কিন্তু

আমি যা স্বচক্ষে দেখলাম তাথেকে পুরো মিথ্যে প্রমাণ হয় এই ধারণা। দেখলাম, মাহুত যেই একদিকটি ঘষে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে পাশ ফেরাবার নির্দেশ দিল হাতিটিকে, সঙ্গে সঙ্গে পালন করল তার আদেশ সে। তারপর ছদিক ধোয়ানো শেষ হতে স্বচ্ছন্দে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল নদীর পারে, সেখানে কিছুক্ষণ থেকে শুকিয়ে নিল নিজের ভিজে গা। এরপর দেহ চাঙ্গা করার জন্য সারা দেহে নারকেল তেল মাখিয়ে, নিয়ে এল মাহুত একপাত্র লাল বা হলদে রঙ। দিল তাই দিয়ে হাতিটির কপালে, চোখের চারদিকে, বুকে ও পেছনে দাগ টেনে। কতক মাহুত তাদের হাতিগুলির কপালে দিলে সবার শেষে জেল্লাদার তিলক এঁকে।

অক্টোবরের ১৫ তারিখ প্রধান চিকিৎসক ডেকে পাঠালেন আমাদের ত্বপুর ত্বটো নাগাদ। ফিরিয়ে দিলেন মুক্তাগুলো। ওপরে সযত্নে রাজার সীলমোহর আঁটা। মুক্তোগুলি দেখার পর এভাবে তাকে সীল করার আদেশ দিয়েছেন রাজা। চিকিৎসক এরপর দাম জানতে চাইলেন সেগুলির। তার পাশে ছিল একজন খোজা। সে দাম টুকে নিচ্ছিল পর পর। মুক্তোর প্রতিটির জন্য যে দর আমরা দিলাম তা শুনে হাঁ হয়ে গেল সে। মুক্তোর দাম যে কখনো অত হতে পারে বিশ্বাস হল না তার। বলে বসলো, গোলকুণ্ডার রাজ দরবার বোকা লোকের আসর নয়, এরকম দামী রত্ন বহু দেখা আছে তার, রোজই রাজার কাছে নিয়ে আসে লোকে। শুনে তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিয়ে বসলাম খোজাটিকে যে আমার ধারণা রত্নের চেয়ে মেয়ে বাঁদীদের দামই বেশি ভাল ক'রে জানা তার। তারপর মুক্তোগুলি নিয়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে ফিরে এলাম ডেরায়। এসেই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালাম ত্বটি বহল ভাড়া করার জন্য। আমাদের তুজনের চড়ার মতো ত্বটি ঘোড়া তো ছিলই। পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম গোলকুণ্ডা ছেড়ে। তবে দেড় কোশের বেশি এগোন সম্ভব হল না সেদিন। কেননা, রাজার কাছে চাকুরী রত পর্তুগীজ, ইংরাজ ও ডাচ গোলন্দাজরা এগিয়ে দেয়ার জন্য সঙ্গী হবার ফলে আনন্দ ফুর্তির মধ্য দিয়েই কাটল দিনটি।

যে পথ ধরে সুরাট থেকে গোলকুণ্ডায় এসেছিলাম, সেই পথ ধরেই ফিরে চললাম আবার গোলকুণ্ডা থেকে সুরাট। সুতরাং নতুন ক'রে কিছুই বলার নেই আর এ ব্যাপারে। জানাবার মতো ঘটনা শুধু একটিই। খোজাটিকে যে উত্তর দিয়েছি তা রাজার কানে উঠল ত্বদিন পরে। শুনে সাথে সাথে তিনি চার-পাঁচজন ঘোড় সওয়ারকে পাঠালেন আমাদের পেলে দরবারে তার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা আমাদের নাগাল পাওয়ার আগেই পাঁচ বিরাম পর্ব

পথ এগিয়ে গেছি আমরা। এবং তার মধ্যে একটি পর্ব আবার মুঘল সীমান্ত মধ্যে। এমন সময় এক সন্ধ্যায় তাদের একজন উপস্থিত হল আমাদের কাছে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে গেছে গোলকুণ্ডা সীমান্তে। এবং যখন একবার সীমান্ত পার হয়ে গেছি আর যে ফিরতে চাইব না তা বুঝতে পেরেই। এই ঘোড় সওয়ারটি রাজার কাছ থেকে মেলা আদেশনামাটি দেখালে আমাদের। জানালে, রাজা মুক্তাগুলি কেনার জন্য উৎসুক। আপনারা কোন কিছু না জানিয়ে এভাবে চলে আসায় অবাক হয়ে গেছেন তিনি। আমরা আর গোলকুণ্ডার সীমানা মধ্যে না থাকায় এভাবে আশা ভরসা দিয়ে প্ররোচিত করা ছাড়া কিছুই আর উপায়ান্তর ছিল না লোকটির। মঁসিয়ে দ্যু জরডিনও ফেরার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন তার কথায়। কিন্তু এদেশের হাল-চাল তার চেয়ে আমার বেশি জানা। তাই সোজাসুজি ঘোড় সওয়ারটিকে বলে দিলাম যে আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয় ফেরা। সে চ'লে গেলে কেন যে গোলকুণ্ডায় আর ফিরে যেতে চাইলাম না তা বুঝিয়ে বললাম মঁসিয়ে দ্যু জরডিনকে।

সুরাটে পৌছবার সামান্য কয়েক দিন পরেই পিত্তাধিক্যের দরুন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন মঁসিয়ে দ্যু জরডিন। মুঘল সিংহাসনে তখন শাহ-জহান। আগে থেকেই করা ছিল আমাদের সুরাট থেকে আগ্রা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা। কিন্তু তার শ্যালক ও গুজরাট প্রদেশের শাসনকর্তা শায়েস্তা খান আহমদাবাদ থেকে তার এক প্রধান ঘরোয়া কর্মচারীকে পাঠালেন আমার কাছে। জানালেন, বিক্রীর জন্য আমার কাছে কতক ভাল রত্নাদি রয়েছে বলে শুনেছেন তিনি। এক্ষেত্রে আমি যদি তার কাছে যাই ও সামগ্রীগুলি দেখাই তিনি খুশী হবেন খুব। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দেয়া হল আমাকে যে সম্রাটের মতো উদার ভাবেই তিনি দাম দেবেন সব কিছুর। মঁসিয়ে দ্যু জরডিনের অসুস্থতা কালেই এ বার্তা পেয়েছিলাম আমি। নবম দিনে মারা গেলেন দ্যু জরডিন। তার প্রতি যা কিছু আমাদের শেষ করণীয় তা সম্পন্ন করা হল সুরাটেই। তারপর রওনা হলাম আহমদাবাদে। হল সেখানে নবাবের সঙ্গে কতক ব্যবসায়িক লেনদেন। রত্নাদি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা থাকায় দরদামের ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য ঘটল না আমাদের। যেটুকু যা বিরোধ দেখা দিল তা শুধু কিভাবে প্রাপ্য মেটানো হবে তাই নিয়ে। এ ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিলেন তিনি। সাধারণভাবে শুধু শর্ত ক'রে নিলেন যে হয় রূপোর টাকা, না হয় সোনা মোহরে মেটানো হবে প্রাপ্য। তাহলেও নবাব আমাকে

আভাস দিলেন যে এরূপ এক বিরাট পরিমাণ অর্থ রূপার টাকায় দিলে তা সকলের নজরে পড়বে দেখে ওভাবে প্রাপ্য মেটাতে উৎসাহী নন তিনি, বরং সোনা মোহরে দিতেই উৎসুক। কেননা, তাতে অর্থের পরিমাণ বিরাট বলে মনে হবে না বলে লোকের চোখ কাড়বে না তা। তার ইচ্ছাই মেনে নিলাম আমি। তিনি তখন কতক অতি ভাল সোনা-মোহর দেখালেন আমাকে। সে মোহরগুলি সবই পুরানো আমলের, বহুকাল দেখেনি তা বাইরের আলো। কিন্তু সোনা-মোহরের চলতি দাম যেখানে ১৪ টাকা সেখানে এগুলি চালাতে চাইলেন তিনি ১৪½ বা নেহাতপক্ষে ১৪¼ টাকায়। এর ফলে লেনদেন-এ এক অচল পরিস্থিতি দেখা দিল শেষ পর্যন্ত। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে এরূপ বিরাট সংখ্যক মোহরে প্রতিটির ওপর সিকি টাকা ক্ষতি স্বীকার করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে তুষ্ট করার জন্য নিতে বাধ্য হলাম তা ১৪⅛ টাকা দরে। নবাব অন্যান্য দিকে অতুলনীয় ও উদারমনা হলেও, কেনাকাটার ব্যাপারে প্রমাণ করলেন নিজেকে কঠোর ব্যয় সংকোচকারী রূপে।

আহমদাবাদ থেকে সুরাটে ফিরে রওনা হলাম সেখান থেকে আবার গোলকুণ্ডায়। গেলাম হীরে কেনার জন্য সেখানকার খনি এলাকায়। তার পর সুরাটে ফিরে আয়োজন করলাম পারস্য যাত্রার।

আঠেরো ॥ সুরাট থেকে লেখকের হরমুজ প্রত্যাবর্তন ও ইংরাজ-ডাচ যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

গোলকুণ্ডার হীরাখনি অঞ্চল ঘুরে সুরাটে ফিরে এসে জানতে পেলাম, যুদ্ধ বেধে গেছে ইংরাজ ও ডাচদের মধ্যে। ডাচরা কোন জাহাজই পাঠাবে না আর পারস্যে এখন। ইংরাজরাও শোনাল ঐ একই কথা। তারা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছে ৪টি জাহাজ, এখন চেয়ে রয়েছে তারই ফেরার পথ, যে কোন দিনই ফিরে আসতে পারে তা। ফলে, সাগর পথে হরমুজ যাওয়ার সুযোগ বন্ধ তখন। স্থলপথ ধরে আগ্রা ও কন্দহার হয়ে যেতে পারি অবশ্য। কিন্তু সে-পথ রীতিমতো সুদীর্ঘ। এবং বর্তমানে কন্দহার যুদ্ধের দরুন ভারত ও পারস্যের সৈন্য সমাবেশের ফলে সে-পথ অতিক্রম করা যদি অসাধ্য হয়ে না উঠে থাকে, তাহলেও হয়ে উঠেছে অতি দুঃসাধ্য। দীর্ঘকাল কর্মশূন্য হয়ে বসে থাকার আশঙ্কায় যখন স্থির হয়ে উঠেছি

এমন সময়ে, ২রা জানুয়ারী, বাটাভিয়া থেকে পাঁচটি বড় জাহাজ সহসা হাজির হল সুরাটে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম প্রায়। ডাচ অধিনায়ক আমার বন্ধু। সে যে আমায় নিরাশ করবে না তা নিশ্চিত জানা ছিল আমার। এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যেতে পারে যে আমার সমগ্র ভ্রমণ জীবনে এই সব অধিনায়ক বা উপনিবেশ প্রধানদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সহায়তা ও সহৃদয়তা দেখাননি আমাকে। আমিও সব সময়ে তাদের উপকারে আসার চেষ্টা করেছি সুযোগ পেলেই। বিশেষ ক'রে যখুনি আমি হীরা খনিতে গিয়েছি কিনে এনেছি তাদের জন্য হীরা সেখান থেকে। যেহেতু কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ এজন্য এই ব্যক্তিগত সম্পদ ও কেনাকাটার কথা কোম্পানী জানুক তা মোটেই চাইতেন না তারা। তাছাড়া মূল্যবান বস্তু পাথর কেনা কাটার ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের। তাদের চাওয়া এ ধরনের ছোটখাটো উপকার সব সময়েই ক'রে দিয়েছি আমি বিনা লাভে। এ সত্বেও এদের এক জনের জন্যে আমাকে কিন্তু রীতিমতো বেশ কিছুটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল বাটাভিয়ায়। এবং তা থেকে পার পেতেও পোয়াতে হয়েছিল অনেক ঝঞ্ঝাট। সে সব কাহিনী সুযোগ মতো শোনাব অন্য সময়ে। হীরা কিনে দেয়ার মতো ব্যবসায়িক সাহায্য ছাড়াও, যখনই কোন ডাচ বসতিতে উপস্থিত হয়েছি, থেকেছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্যও। পারস্য থেকে ভারতে কখনো আসতাম না আমি ভাল ভাল ফল-ফলাদি ও মদিরা সঙ্গে না নিয়ে। সঙ্গে সব সময়েই থাকত এমন একজন লোক যে ভারতের যে কোন ডাচের চেয়ে করতে পারে ভাল রান্নাবান্না। ছোট ছোট পার্টি দিয়ে সব সময়েই তাদের ভালমন্দ খাইয়েছি আমি। সে-সব অনুষ্ঠানে কসুর করা হয়নি কখনো পেস্তা দিয়ে গাদা গাদা পায়রা বেঁধে খাওয়াতেও। ভোজ শেষে থেকেছে সে-সব অনুষ্ঠানে সব সময়েই এ-দেশীয় প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন। মহিলারা যে এসব পার্টিতে সত্যিই সুতৃপ্ত হতে পেরেছে তার অভিব্যক্তি সব সময়েই প্রকাশ পেয়েছে তাদের কাছ থেকে। এবং তাদের প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি স্বামীসহ জোড়ে জোড়ে।

উপরেই বলেছি, সুরাটের ডাচ-অধিনায়ক ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি যেচেই এই পাঁচটি জাহাজের যে কোনটিতে যাবার প্রস্তাব দিলেন আমায়। তবে তুলে ধরলেন ঝুঁকির দিকটিও। জাহাজ সাগর পাড়ি দিতে দিতে যদি কোন ইংরাজ জাহাজের মুখোমুখি হয় যুদ্ধ তখন অনিবার্য। ফলে আমারও বিপদ ঘটে

যেতে পারে যে কোন ধরনের। বন্ধু বার বার আমাকে এই জীবনের ঝুঁকির কথা ভেবে চিন্তে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বললেও কান দিলাম না তাতে। সুরাটে অকর্মা হয়ে বসে থাকুতে একটুও আগ্রহ ছিল না আমার। এই ডাচ জাহাজ-কটিকে সওদাগরী পণ্যবাহী জাহাজ না বলে রণতরী বলাই হবে সঠিক। অধিনায়ক তার মধ্যে তিনটি জাহাজকে চটপট মাল খালাস ক'রে পারস্য থেকে মালবোঝাই ক'রে রওনা হওয়া চারটি ইংরাজ জাহাজের সন্ধানে বার হয়ে যেতে বললেন আগে আগে। পণ্য-বোঝাই থাকার দরুন ওই চারটি ইংরাজ জাহাজ স্বভাবতই ছিল না তখন যুদ্ধ করার মতো অবস্থায়। তিনটি জাহাজ বন্দর ছাড়ার তিন-চারদিন পর বন্দর ছাড়ল বাকি জাহাজ দুটি। পাঁচটি জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী বোঝাই ক'রে নেয়ার জন্য এ কদিন দেরি হল অন্য জাহাজ দুটির।

যে জাহাজ দুটি সবার শেষে ছাড়ল ঠাঁই নিলাম আমি তারই একটিতে। ১৬৫৪-র জানুয়ারীর ৮ তারিখ সেদিন। ১২ তারিখেই পৌঁছলাম এসে দিউতে। মিলিত হলাম সেখানে আগে বেরিয়ে পড়া জাহাজ তিনটির সংগে। বসল সঙ্গে সঙ্গে সামরিক পরিষদের বৈঠক। ইংরাজ জাহাজ কটিকে ধরার জন্য কোন্ পথ ধরে এগোন হবে তারই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। সকলেরই ধারণা সেগুলি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে পারস্যে। কিন্তু বর্তমানে জানা গেল এখনোও বেশি দূর এগোয়নি তারা। প্রথম ডাচ জাহাজ তিনটি দিউতে পৌঁছবার মাত্র দু-দিন আগে তারা ছেড়েছে এ বন্দর। বৈঠকে ঠিক হল আমাদের উচিত হবে সিন্দি-র দিকে এগোন। এবং তার আগে, নোঙর তুলে দিউ বন্দরের দিকে এগিয়ে গিয়ে করা হবে সে শহরের ওপর গোলাবর্ষণ। শহরের অধিবাসীরা যেই বুঝতে পারল আমরা শহর আক্রমণের জন্য এগোচ্ছি, মাত্র দুবার কামান দেগেই চম্পট দিল শহর ছেড়ে। সব কামানগুলি থেকে গোলাবর্ষণের পর রওনা দিলাম আমরা সিন্দি বন্দরের উদ্দেশে। পৌঁছলাম সেখানে সেই মাসেরই কুড়ি তারিখে। ইংরাজ ও ডাচ উভয়েরই দুটি বাণিজ্য-ভবন ছিল সেখানে। পাঠান হল একটি নৌকাকে তাই সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায়। আমাদের নৌ-অধ্যক্ষকে জানানো হল, ইংরাজ জাহাজ-গুলিতে বোঝাই করার জন্য দুশো পেটি মাল সমুদ্র কূলে স্তূপ ক'রে অপেক্ষা করা হচ্ছে সেগুলির আগমন প্রত্যাশায়। পরিস্থিতির গতি বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ফেব্রুয়ারী দশ তারিখ পর্যন্ত সেখানে থাকার। যদি এর মধ্যে জাহাজগুলির দেখা না মেলে তখন সাগরে সাঁতার দেয়া হবে আবার, খোঁজা হবে তাদের পারস্যে।

ফেব্রুয়ারীর দু-তারিখে, ভোরের দিকে অনেক দূরে দেখা গেল যেন পালের আভাসের মতো। অনেক দূর বলে ঠিক বুঝে ওঠা গেল না নিশ্চিত ভাবে। আবার বায়ু প্রতিকূল বলে সম্ভব হল না সেদিক পানে এগিয়ে যাওয়াও। প্রথম দিকে সবাই ভাবল, বুঝি ওগুলি মাছ ধরার নৌকা। কিন্তু ধীরে ধীরে, পিছন দিক থেকে বায়ুর ধাক্কা পেয়ে ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসার পর চেনা গেল যে সেগুলি ইংরাজ জাহাজ। ডাচ জাহাজগুলি অতি সাধারণ ধরনের রণতরী, জেলে ডিঙিগুলির কাছে এ রকমের ধারণা পেয়ে সহজে আমাদের কাবু ক'রে দখল ক'রে নেয়ার আশায় এগিয়ে আসতে থাকল তারা। আসলে, এ ধরনের ছোট ডাচ জাহাজ এর আগে দেখিনি কেউ। বিশেষ ভাবে যুদ্ধের জন্যই তৈরী হয়েছিল বলে তার কিনারাগুলি উঁচু ছিল না মোটে। ফলে বাইরে থেকে মনে হত বেশ ছোট বলেই। কিন্তু আসলে সেগুলি ছিল বেশ শক্তিশালী রণতরী। আমি যেটিতে ছিলাম সেই 'এডমিরাল' রণতরীটিতে ছিল ৪৮টি কামান। ছিল এছাড়াও প্রয়োজন হলে আরো ১২টি কামান বসানোর সুব্যবস্থা। নাবিকের সংখ্যা ছিল ১২০ জনেরও ওপর। সবকটি পাল খাটিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে সকাল নটা নাগাদ বেশ কাছাকাছি এসে পড়ল ইংরাজ জাহাজ কটি। তাই দেখে নোঙর তোলার জন্য সময় নষ্ট না ক'রে, সোজাসুজি নোঙরের দড়ি কেটে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হল আমাদের জাহাজকটি। আগেই বলেছি বাতাস বইছিল বিপরীত দিক দিয়ে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না আমাদের পক্ষে। অন্যদিকে ইংরাজ জাহাজগুলি অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে গলুইয়ের দিক সামনে রেখে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে সদর্পে। তাদের অধ্যক্ষ ও সহ-অধ্যক্ষের জাহাজ দুটি শেষ অবধি আমাদের অধ্যক্ষের জাহাজটির এত কাছে এসে পড়ল যে আমাদের অধ্যক্ষের জাহাজটির একটি নোঙরের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাদের অধ্যক্ষের জাহাজটির। সত্যি বলতে কি, আমাদের অগ্রনায়কের জাহাজটি এই সংঘর্ষে এরূপ সাহসের ঘাটতি দেখাল যে এই সুযোগে তাদের জাহাজের ভেতর চড়াও না হয়ে তাড়াতাড়ি নোঙরটির দড়ি কেটে ফেলে দূরে সরিয়ে নিল নিজেকে। জাহাজটির কামান দাগার ফোকরগুলি এমন ভালভাবে ঘেরা ছিল যে জাহাজটিতে মোট কটি কামান বাইরে থেকে কোন উপায় ছিল না সে কথা জানার। ইংরাজরা প্রথম পশলা গোলা বর্ষণের পর আমাদের অগ্রনায়কের জাহাজ থেকে শুরু করা হল কামান দাগা। এবং ইংরাজদের তুলনায় আমাদেরটিই হল অধিক কার্যকরী।

প্রতিটি ডাচ জাহাজে কত লোক রয়েছে তা এবার ধারণা করতে পেরে ঘাবড়ে গেল ইংরাজরা। অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের জাহাজটিকে সরিয়ে নিলে দূরে। তবে ইংরাজ পক্ষের সহ-অগ্রনায়কের জাহাজ থেকে শুরু করা হল এবার কামান দাগা। যে জাহাজটিতে আমি ছিলাম এগিয়ে এল সে সেটির দিকেই। আমাদের জাহাজের দশজন লোক এর ফলে প্রাণ খোয়ালেও, ইংরাজ জাহাজটি আমাদের পাশাপাশি না আসা পর্যন্ত কামান দাগায় বিরত থাকলেন আমাদের অধিনায়ক। যখন সেটি পিস্তলের গুলির সীমানা মধ্যে এসে পড়ল গর্জে উঠল একসাথে আমাদের সব কটি কামান। উড়িয়ে দিল ইংরাজ জাহাজটির সামনের মাস্তুলটি। দুটি জাহাজ পরস্পরের গা ঘেঁষাঘেঁষি হতেই আমাদের অধিনায়ক বহু সাহসী লোককে সঙ্গে নিয়ে টাঙি সহ ঢুকে পড়লেন ইংরাজ জাহাজটির ভেতর। আমি ও সহকারী দিশারী এরূপ কুশলতার সঙ্গে কামান দাগলাম ইংরাজ অধিনায়কের কেবিন লক্ষ্য ক'রে যে আগুন ধরে গেল সেখানে থাকা কতক কার্তুজে।

এই অভাবিত আগুনে বিহ্বল হয়ে পড়ল ইংরাজরা। আশংকা দেখা দিল সমগ্র জাহাজে তা ভয়াবহ রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ার। আমাদের অধিনায়কের মনেও দেখা দিল সেই আশঙ্কা। তাই, আপন দলের সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন তিনি আপন জাহাজে ফেরার জন্য। ইংরাজদেরও আদেশ করা হল দশ দশজন ক'রে দল বেঁধে আমাদের জাহাজে আশ্রয় নিতে। তারপর সরিয়ে নেয়া হল আমাদের জাহাজটিকে নিরাপদ দূরত্বে। এরপর নাবিকদের বিহ্বলতা কেটে সাহস ফিরে আসাতেই শুরু হয়ে গেল আগুন নেভানোর প্রয়াস। সম্ভবও হল তা। ইংরাজদের কতকের সঙ্গে আমাদের দশ বারোজন নাবিকও ছিল ওই সময়ে আগুন লাগা জাহাজটিতে। এই যুদ্ধে আমাদের অধিনায়ক বিপুল গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করলেও, জখম হয়েছিলেন গুরুতরভাবে। আর, তার ফলেই মারা যান তিনি দু-তিনদিন পর। (আগুন লাগা এই জাহাজটির নাম দি ফ্যালকন বা বাজপাখী)।

ইতিমধ্যে আমাদের আরেকটি জাহাজও (দ্য এণ্ডেভার) বিক্রমভরে আক্রমণ করল দর্শকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিরিশ কামানের অপর একটি ইংরাজ জাহাজকে। হল সেটিও গুরুতরভাবে জখম। আমরাও আমাদের জাহাজটি নিয়ে এগিয়ে গেলাম সেটির দিকে এবার। পাশাপাশি সব কটি কামান দেগে শুরু ক'রে দেয়া হল তার প্রতিরোধ ক্ষমতা। শুরু করল সেটি ডুবতে।

জাহাজটির ইংরাজ অধিনায়ক ঘোর বিপদে পড়ে ওড়ালেন এবার সাদা পতাকা। চাইলেন ডাচ জাহাজে আশ্রয়। মঞ্জুর করা হল তা। জাহাজটির বহু জায়গায় ছেঁদা হয়ে গিয়েছিল আমাদের কামানের আঘাতে। ছুতোররা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে চলল সেগুলি মেরামত করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু যখন দেখল, জাহাজের নাবিকরা তাদের সাহায্য করা ছেড়ে দিয়ে জাহাজের খোলে মজুদ থাকা কতক শিরাজী মদ ডাচদের হাতে পড়ার আগে নিঃশেষ করার জন্য মেতে উঠেছে তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে তারাও ভিড়ে পড়ল সেই দলে। এদিকে তিরিশ-চল্লিশজন ডাচ নৌকায় চেপে এগিয়ে গেল সে জাহাজটির অধিকার নেয়ার জন্য। জাহাজে উঠে ডকের ওপর কোন নাবিককে দেখতে না পেয়ে নামল খোলে। দেখে, সেখানে তারা সব একজোট হয়ে শিরাজী মদের বোতল খুলে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে একে অপরের স্বাস্থ্যপানে। ডাচরাও জাহাজটির প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পেরে মহোল্লাসে যোগ দিলে তাদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে জাহাজটি তলিয়ে গেল জলের নিচে। জাহাজ মধ্যে মদিরা পানে মত্ত থাকা বিজিত ও বিজয়ী উভয় দলেরই ঘটল সেই সাথে সলিল সমাধি। রক্ষা পেয়েছিল শুধু যা জাহাজটির ইংরাজ অধিনায়ক ও দুজন ফরাসী কপুচিন পাদরী। আমাদের জাহাজটিতে স্বাগত জানানো হল তাদের। আমাদের অধিনায়ক গুরুতর জখম হবার দরুন জাহাজের দায়িত্বে ছিলেন তখন প্রধান দিশারী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দীদের পাঠিয়ে দিলেন প্রধান অধ্যক্ষের কাছে। পরদিন অধ্যক্ষ আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে তার জাহাজে। শত্রু বিজয় সম্ভব করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকল্পে সব কটি জাহাজের অধিনায়করা সমবেত হয়েছিলেন সেদিন সেখানে। এরপর অধ্যক্ষের সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলাম আমরা। বন্দী হওয়া কপুচিন পাদরীরাও তখন ছিলেন সেখানে। অধ্যক্ষ আমাকে বললেন তারা যখন আপনারই দেশবাসী, তখন ইচ্ছা করলে আপনার সঙ্গে একই জাহাজে থাকতে পারেন তারা। তাদের প্রতি যাতে ভাল আচরণ করা হয় সে আদেশও জারী করব এখন আমি। তাই করলেন তিনি। সেদিন সন্ধ্যাতেই তাদের সাথে নিয়ে ফিরে এলাম আমার জাহাজে। আরামে থাকার জন্য যা কিছু দরকার সব কিছুরই ব্যবস্থা ক'রে দিলাম আমার সাধ্য মতো তাদের জন্য।

পারস্য থেকে যে-সব জাহাজ ভারতে আসে তা বোঝাই থাকে সাধারণতঃ মদ আর মুদ্রায়। ইংরাজদের যে জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল তাতে এদুটি সামগ্রী ছিল অন্যগুলির তুলনায় বেশি। এজন্যই সেটি চায়নি সংঘর্ষে যোগ দিতে।

এটি ডুবে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক বিরাট ক্ষতি। ডাচরা আরেকটু সাহসী ও পরিণামদর্শী হলে এড়াতে পারত তার এ পরিণতি। ইংরাজ অধ্যক্ষ তার বহরের একটি জাহাজের এ হেন পরিণতি দেখে চম্পট দিয়েছিলেন অন্য একটি জাহাজে চেপে। আর, সত্যি কথা বলতে কি, ডাচ অধ্যক্ষ ও অধিনায়কদের উদ্যমশীলতার অভাবেই নিশ্চিত বন্দীত্বকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল ইংরাজরা। কি ক'রে সুযোগকে কাজে লাগাতে হয় তা যদি জানতেন তারা তবে জয়ী হতে পারতেন কিন্তু অনেক সহজে।

এ যুদ্ধে কিন্তু মরতে মরতে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম আমি অতি অল্পের জন্য। ইংরাজদের ছোঁড়া একটি গোলা এসে লাগলো ঠিক আমারই কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন ডাচের গায়ে। আর জাহাজের গা থেকে ছিটকানো একটি টুকরো মাথা ফাটিয়ে দু-ফাল ক'রে দিয়েছিল আমারই পাশে থাকা আরেকজন ডাচের। আমার গায়ের কোটটির অংশবিশেষও উড়ে গিয়েছিল তার ঘষটানিতে। ফলে দেহ ভিজে গেল পাশের ডাচটির দেহ থেকে ছিটকানো রক্তে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর ফিরে চললাম আমরা সিন্দি বন্দরে ভেড়ার জন্য। কিন্তু উঠল হঠাৎ প্রবল বাতাস। অতি উত্তাল ঢেউ জাগিয়ে সাগর হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। তাই নোঙর ফেলতে বাধ্য হলাম আমরা পূব উপকূলের দিকে ৬ কোশ এগিয়ে। কুড়ি তারিখ পর্যন্ত থাকতে হল সেখানেই (ফেব্রুয়ারী ১৬৫৪)। ব্যস্ত রইলাম ওই কদিন সকলে আহতদের সেবায়। জখম হওয়া ইংরাজ বন্দীদের বেশির ভাগই মারা গেল এ সময়ে। ফিরলাম তারপর জল আর কতক খাদ্য সামগ্রী নেয়ার জন্য সিন্দিতে। যে নোঙরগুলির দড়ি কেটে ফেলা হয়েছিল সে গুলিকে সাগর গর্ভ থেকে উদ্ধার করার জন্যও বটে। ফেব্রুয়ারীর ২৮ তারিখ পর্যন্ত রয়ে গেলাম সেখানেই। তারপর মনোরম আবহাওয়ায় আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে সুহাস গতিতে এগিয়ে ৭ই মার্চ ভিড়লাম এসে গোমব্রুন।

জাহাজ থেকে নেমে ডাঙায় পা দিয়ে বর্তমান ও আগেকার বিভিন্ন ভ্রমণকালে অসংখ্য বিপদ থেকে আমায় পরিত্রাণ করার জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানালাম ঈশ্বরকে। এবং এখনও প্রতিদিন জানিয়ে চলেছি তা।

দ্বিতীয় পর্ব

এক ॥ মুঘল সাম্রাজ্য ঃ উত্তরাধিকার নিয়ে শাহ-জহানের পুত্রদের মধ্যে লড়াই ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক চিত্র

আমার হিন্দুস্তান যাতায়াত ও রহনিকাল মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনারাজি ঘটে গেছে সে-দেশটিতে, কোন রকম টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই পরিবেশন করছি তার বিবরণ এখানে। কোন্ সূত্র থেকে এসব খবর জানলাম, থাকল না হয় উহ্যই তা। বিবরণ পড়ে পূর্ণ অধিকার রইল পাঠকের যেমন খুশী নন্দন তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নিষ্কর্ষে পৌঁছানোর। বিস্তীর্ণ ও প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্যের যে চিত্র সেখানে থাকাকালে সংগ্রহ করতে পেরেছি আমার দায়িত্ব শুধু তা-ই নিষ্ঠভাবে তুলে ধরা। অর্থহীন অনুমিতি ও বাক্য বিন্যাসের দ্বারা চাইনে অযথা ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে তাকে।

হিন্দুস্তানের বৃহত্তর অংশই বিশাল ও বিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন। বিস্তার তার, একদিকে, সিন্ধুনদের এপারের পাহাড়মালা থেকে গঙ্গা নদীর শেষপ্রান্ত অবধি। পূব-সীমান্ত ঘিরে তার আরাকান, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্য। পশ্চিম প্রান্তে পারস্য ও উজবেগদের তাতার ভূমি। দক্ষিণে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য। উত্তরে ককেশাস (হিমালয়)। উত্তর-পূবে ভূটান রাজ্য। এই ভূটান থেকেই আসে কস্তুরী মৃগনাভি। উত্তর-পশ্চিমে চেগাথে বা উজবেগদের দেশ।

ভারত বিষয়ে, ভারত-অধিবাসীদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে লিখে গেছেন অনেকেই এর আগে। তাই, এমন বিষয়গুলিই শুধু তুলে ধরব এখানে যেগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সে সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না আমাদের দেশবাসীরা। সেই লক্ষ্য নিয়ে প্রথমেই শোনাই এখানে এই ভারত-ভাগ্য বিধাতাদের বংশ পরিচয়। সাধারণত মোগল (মুঘল) নামেই খ্যাত এরা। তার মানে শ্বেতকায়। কেননা, যারা এসে প্রথমে এ দেশ জয় করেন, ছিলেন তারা ফরসা রঙের। মূল ভারত অধিবাসীদের দেহের বরণ বাদামী বা জলপাই ঘেঁষা। (মোঙ্গল ও মুঘল অভিন্ন। এর প্রকৃত অর্থ 'সাহসী')।

বর্তমানে যিনি মসনদে আসীন সেই ঔরঙজেব হলেন আমাদের কাছে ট্যামারলেন রূপে প্রসিদ্ধ মহাপ্রতাপী তৈমুরলঙ থেকে সরাসরি একাদশ উত্তর-পুরুষ। তৈমুরলঙ চীন থেকে পোলাণ্ড পর্যন্ত দিগ্বিজয় ক'রে যশ ও খ্যাতিকে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন অতীত কালের সব সমর নায়কদের। তার উত্তর পুরুষরা সফল হলেন (সিন্ধু ও গঙ্গা) এ দুই নদী মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভারত এলাকা থেকে অসংখ্য রাজাকে নির্মূল ক'রে জয় ক'রে নিতে সে-দেশ। বর্তমান সম্রাট ঔরঙজেব আধিপত্য ক'রে চলেছেন গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী, মুলতান, লাহোর, কাশ্মীর, বাঙলা, এবং আরো অনেক রাজ্যের ওপর। এছাড়াও কত যে রাজা রাজড়া তাদের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছেন নাই বা দিলাম সে-তালিকা। তৈমুরলঙ থেকে ঔরঙজেব পর্যন্ত এ বংশের ধারাবাহিকতা এরকমটি : ১) তৈমুরলঙ বা খোঁড়া তাইমুর। একটি পা তার অন্যটির চেয়ে খাটো ছিল বলেই হন তিনি এমন একটি নামে বিখ্যাত। উজবেগদের দেশ তাতার রাজ্য বা চেগাথের সমরকন্দে চির-শয়ানে রয়েছে তার মরদেহ। জন্মও হয়েছিল তার ওখানেই। (২) তৈমুরের ছেলে মীরান শাহ। (৩) মীরান শাহের ছেলে সুলতান মুহম্মদ। (৪) মুহম্মদের ছেলে সুলতান আবু সঈদ মীর্জা। (৫) আবু সঈদের ছেলে উমর শেইখ মীর্জা। (৬) উমর শেইখের ছেলে সুলতান বাবুর বা সাহসী রাজা। মোগল (মুঘল) -দের মধ্যে ইনিই করলেন প্রথম ভারতে ক্ষমতা বিস্তার। মারা যান ১৫৩২-এ (প্রকৃত পক্ষে ১৫৩০ অব্দে। জন্ম ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৩। ভারত বিজয় অভিযান কাল ১৭ই নভেম্বর ১৫২৫।) (৭) বাবুরের ছেলে হুমায়ুন বা 'সুখী'। এর মৃত্যু হয় ১৫৫২ অব্দে (প্রকৃতপক্ষে ১৫৫৬-তে)। (৮) হুমায়ুনের ছেলে আবুল ফথ জলাল-উদ-দীন মুহম্মদ। সাধারণের কাছে সুপরিচিত হন ইনি আকবর নামে। এর অর্থ 'শক্তিমান'। ৫৪ বছর (প্রায় ৫০ বছর) রাজত্ব করার পর মারা যান তিনি হিজরী ১০১৪ বা খ্রীষ্টাব্দের ১৬০৫-এ। ৯) আকবরের ছেলে সুলতান সলীম। ইনি পরিচিতি লাভ করেন জহাঙ্গীর পাদশা (পাদিশাহ) নামে। জহাঙ্গীর-এর অর্থ 'জগৎ-বিজয়ী'। মৃত্যু হল এর ১৬২৭ অব্দে। তার চার সন্তান মধ্যে প্রথম জনের নাম সুলতান খুসরু। দ্বিতীয় জন সুলতান খুররম। তৃতীয় জন সুলতান পরবীজ। চতুর্থ জন শাহ দানিয়াল। (প্রকৃত পক্ষে পাঁচ পুত্র। তাদের নাম যথাক্রমে : খুসরু, পরবীজ, খুররম, জহান্দার ও শহরিয়ার। দানিয়াল আকবরের পুত্র, জহাঙ্গীরের ছোট ভাই।) (১০) জহাঙ্গীরের চার ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় (প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ছেলের মধ্যে তৃতীয়) খুররম। আগ্রা

দুর্গে সম্রাট রূপে বরণ করে নিলেন একে আমীররা। সিংহাসনে বসলেন শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ নাম নিয়ে। কিন্তু শাহ-জহান বা 'পৃথিবীপতি' নামে অভিহিত হতেই বেশি ভালবাসতেন তিনি। (১১) ঔরঙজেব বা 'সিংহাসনের শোভা'। রাজত্ব ক'রে চলেছেন সে-দেশে ইনিই বর্তমানে।

সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার কালে এই সম্রাটেরা সাধারণের মধ্যে লুট হিসাবে ছড়ানোর জন্য যে-সব মুদ্রা তৈরী ক'রে গেছেন তার চিত্র দেয়া হল এখানে (ট্যাভারনিয়ারের দেয়া এইসব মুদ্রার চমৎকার প্লেটটির কোন প্রতিলিপি তৈরি ক'রে তার গ্রন্থের কোন সংস্করণেই দেয়া হয়নি কখনো।) সম্রাটদের হাত বা পাঞ্জার ছাপ রয়েছে এগুলিতে। মাঝের সব থেকে বড় পাঞ্জাটি হল দশম সম্রাট শাহ-জহানের। ঔরঙজেব ক্ষমতায় আসার পর থেকে গড়া হয়নি আর এধরনের দাক্ষিণ্য মুদ্রা (নিশার মুদ্রা)। প্রায় সবগুলিই এর রূপার, মাত্র সামান্য কয়েকটি সোনার।

প্রতাপশালী এই মুঘল সম্রাট সন্দেহাতীত ভাবে এশিয়ার রাজাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী। তার অধিকারে থাকা সমস্ত রাজ্যগুলির যাবতীয় ভূ-সম্পদই তার, তিনিই সমগ্র দেশের সর্বময় কর্তা। এর সম্পূর্ণ রাজস্ব তার-ই। অভিজাতরা পালন করেন এ রাজার রাজ্যে শুধু যা সেই রাজস্ব আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ-কারীর ভূমিকা। দাখিল করেন তার হিসাব তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে। শাসনকর্তারা তা পেশ ক'রেন আবার প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও রাজস্ব মন্ত্রী (দীওয়ান)-র কাছে। ভারতের এই মহামহিম সম্রাটের অধীন অঞ্চলগুলি এত সরেস, সুফলা ও জনবসতিপূর্ণ যে সমকক্ষ নয় তার অপর কোন রাজ্যই।

দুই ॥ সম্রাট শাহ-জহানের অসুস্থতা ও মৃত্যু-গুজব ফলে সিংহাসন নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ

সম্রাট শাহ-জহানের মৃত্যু হয়েছে এরূপ এক ভ্রান্ত ধারণা থেকে ঘটে গেছে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে এক বিপ্লব-তুল্য ওলট-পালট। এ ঘটনাটি এত অসংখ্য দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় যে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তা জানানোর যোগ্য। এই প্রতাপবান সম্রাট রাজত্ব করেন চল্লিশ বছরেও ওপর (তিরিশ

বছর)। প্রজাদের প্রতি আচরণ ছিল সম্রাটের পরিবর্তে পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত সংসারের পিতার মতো। তার আমলে পুলিশ বা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা ছিল সব বিষয়েই অতি কঠোর। বিশেষ ক'রে সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। ফলে, প্রয়োজন হয়নি কখনো চুরির অপরাধে কাউকে দণ্ড দেয়ার (লেখক এখানে বড়ো বেশি প্রশংসা ক'রে ফেলেছেন শাহ-জহানের প্রশাসন ব্যবস্থার)। বৃদ্ধ বয়সে ক'রে বসেন তিনি অবশ্য অদূরদর্শীর মতো একটি কাজ। তাছাড়া, এত কড়া ধরনের কতক মাদক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন যে পড়ে গেলেন তার ফলে দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে। প্রায় মরতেই বসেছিলেন তিনি। এজন্য বাধ্য হলেন দু-তিন মাসের মতো আপন হারেমে নারী মহলের গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে। এ সময়ে জনসাধারণকে বিশেষ একটা দর্শন দিতেন না এবং দিলেও অনেক দিন পরপর। ফলে একসময় সাধারণের মধ্যে এরূপ এক ধারণা সৃষ্টি হল যে শাহ-জহান বেঁচে নেই আর। চলে আসা প্রথা অনুযায়ী রাজাদের সেদেশে প্রজাদের তিনবার দর্শন দেয়ার কথা প্রতি সপ্তাহে। অন্ততঃ পক্ষকালের মধ্যে তো বটেই।

শাহ-জহানের ছটি সন্তান। চার ছেলে, দু মেয়ে। বড় ছেলের নাম দারা শাহ। দ্বিতীয় ছেলের সুলতান শুজা। তৃতীয়ের ঔরঙজেব। ছোটর মুরাদ বক্স। দু মেয়ের মধ্যে বড় জনের নাম বেগম সাহিব (জহান-আরা), ছোট জনের নাম রোশন আরা বেগম। এসব নাম সে-দেশীয় ভাষায় 'প্রাজ্ঞ', 'সাহসী' 'পারদর্শী' ইত্যাদি ধরনের সম্মান সূচক বিশেষণ। আমরা ইওরোপেও এ ধরনের বিশেষণ যোগ করে থাকি রাজাদের নামের সাথে। যথা: 'ন্যায় পরায়ণ' 'নির্ভীক', 'আলাপী'। পার্থক্য শুধু এই, এসব বিশেষণ-ধর্মী নাম জন্মকালে দেই না আমরা, দেই তার এ ধরনের গুণাগুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার পর তারই স্বীকৃতি রূপে। শাহ-জহান তার চার ছেলেকেই সমানভাবে ভালবাসতেন। অর্পণ করেছিলেন তাদের তার চার সেরা সুবার শাসনকর্তার পদ। বড় ছেলে দারা শিকো (—দারিয়ুসের মতো মহামহিম) থাকতেন রাজধানী দিল্লীতে সম্রাটের কাছে। তিনি পেয়েছিলেন সিনদি (সিন্দ বা সিন্ধু)-র শাসনভার। তার অনুপস্থিতিতে তার এক সহকারীই শাসন করতেন সে অঞ্চল। (প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্জাব ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার পেয়েছিলেন তিনি এবং সহকারীদের মাধ্যমে চালাতেন তার প্রশাসন)। সুলতান শুজাকে দেয়া হয়েছিল বাঙলার শাসনকর্তার পদ। ঔরঙজেবকে দাক্ষিণাত্যের ভার।

আর মুরাদ বক্সকে গুজরাটের। কিন্তু, চার ছেলের প্রতি শাহ-জহান সমদর্শীর মতো ব্যবহার ক'রে তাদের সমানভাবে তুষ্ট রাখতে চাইলেও তাদের উচ্চাকাঙ্খা তৃপ্ত হল না এতে। ফলে চার ছেলের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্নেহশীল পিতার সব প্রয়াস ও পরিকল্পনাই ব্যর্থ হল শেষ পর্যন্ত।

অসুস্থ হয়ে পড়লেন শাহ-জহান। বাধ্য হলেন বেশ কিছুদিন জনসাধারণকে দর্শন না দিয়ে হারেমে আবদ্ধ হয়ে থাকতে। চারিদিকে গুজব রটে গেল, মারা গেছেন তিনি। সমগ্র রাজ্য আপন মুঠোয় আনার জন্য, আপন আখের গুছিয়ে নেয়ার অবকাশ তৈরীর জন্য, বড় ছেলে দারা শিকো গোপন রেখেছেন তার মৃত্যুর খবর। এ কথা অবশ্য ঠিক, তার জীবন-দীপ নিভে যেতে চলেছে এরূপ এক ধারণা থেকে সম্রাট তার সাম্রাজ্যের সব আমীরদের সম্মেলন ডাকতে ও সিংহাসনে আসীন হতে নির্দেশ দেন দারা শিকোকে। আর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। দারা শিকোকে তিনি এমন কথাও বলেন যে যদি ভগবান তাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে 'তিনি' এই-ই দেখে যেতে চান যে তার মৃত্যুর আগেই সে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিংহাসনে। জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনে বসুক তার এই অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত। তাছাড়া, কিছুদিন ধরেই তিনি লক্ষ্য ক'রে আসছিলেন, অন্য তিন ছেলে দারা শিকোর তুলনায় অনেক কম শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে চলেছে তার প্রতি। দারা শিকো প্রকৃতই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন তার পিতাকে। তাই তার নির্দেশ শুনে তিনি বললেন, ঈশ্বরের কাছে সম্রাটের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা ক'রে চলেছেন তিনি। তার বিশ্বাস সম্রাট নিরাময় হয়ে উঠবেন, পাবেন দীর্ঘায়ু হবার সুযোগ। ভগবান যদি তার প্রার্থনা শোনেন তবে আদৌ তার সিংহাসনে বসার ইচ্ছে নেই, সম্রাটের আজ্ঞাধীন হয়ে কাটাতে পারলেই খুশী হবেন তিনি সব থেকে। যাতে রুগ্ন পিতার সেবা যত্ন করতে পারেন সেজন্যও থাকতেন সর্বদা তিনি সম্রাটের পাশে পাশে। দেখা যেত না এক মুহূর্তের জন্যও তাকে তার কাছ ছাড়া হতে। সব সময় তার পাশে হাজির থাকার জন্য রাতে পর্যন্ত সম্রাটের পালঙ্কের কাছে মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে তার ওপর ঘুমোতেন তিনি।

যা হোক, শাহ-জহানের এই মৃত্যু-গুজব পেঁছিল তার অন্য তিন ছেলের কানে। এ খবরে সোজাসুজি অধীর ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তারা, ক'রে বসলেন প্রত্যেকেই পিতৃ সিংহাসনের ওপর দাবী। গুজরাটের শাসনকর্তা,

কনিষ্ঠপুত্র মুরাদ বক্স সঙ্গে সঙ্গে সুরাট অবরোধের জন্য সেনা পাঠালেন সেখানে। এটিই তখন সারা ভারত মধ্যে সব থেকে বড় ও সর্বাধিক বাণিজ্য-চঞ্চল বন্দর। শহরটি ছিল পুরোপুরি অরক্ষিত। প্রতিরক্ষা দেয়াল থাকলেও ছিল না তা মোটেই সুদৃঢ়। নানা স্থানেই তো উন্মুক্ত, অবারিত। ফলে, করা হল না তার সেনাবাহিনীকে বাধা দেয়ার কোন প্রয়াস। তবে, যেখানে ধন রত্ন সঞ্চিত ছিল সেই দুর্গটি রক্ষার জন্য প্রতিরোধ ক'রে চলা হল প্রবল বিক্রমে। যুবক ও উচ্চাকাঙ্খী এই শাহজাদার তখন অর্থের প্রয়োজন। তাই আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চললেন তিনি সেটির দখল নেয়ার জন্য। তার এক খোজা, শাহবাজ খান ছিলেন এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। রীতিমতো একজন পরিশ্রমী ও কর্মোৎসাহী ব্যক্তি। পরিপূর্ণ দক্ষতা নিয়ে অবরোধ চালিয়ে গেলেন তিনি প্রবীণ সেনানায়কের মতোই।

ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েও যখন দখল করতে পারলেন না দুর্গ, তখন এক ইওরোপীয়কে আদেশ করলেন তিনি দুটি 'মাইন' বা বিস্ফোরণের সাহায্যে দেয়াল ধসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সফল ভাবে রূপায়ণ করা হল সে পরিকল্পনার। ১৬৫৭-র ২৯শে ডিসেম্বর করা হল একটি মাইন-এর বিস্ফোরণ ব্যবস্থা। দুর্গ-প্রাকারের এক বিরাট অংশ পড়ল ধসে, তার কাছের পরিখা ভরাট হয়ে গেল এর ফলে। দুর্গের ভেতরকার সেনাবাহিনী হয়ে পড়ল নিদারুণ বিহ্বল ও হত-চকিত। তাদের সংখ্যা বেশ সীমিত হলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সন্ত্রস্ত ভাব কাটিয়ে উঠল তারা। চল্লিশ দিনেরও বেশি সাহসের সাথে প্রতিরোধ ক'রে চলল মুরাদ বক্সের সেনাবাহিনীকে। তার বাহিনীর প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি ঘটাল, জখম ও হত্যা করল বহু সেনাকে। এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের অসহায় পরিস্থিতির আবর্তে ঠেলে দেয়ার জন্য শাহবাজ খুঁজে চললেন তখন তাদের গোলন্দাজদের স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনদের। মতলব, আক্রমণ কালে তাদের দাঁড় করিয়ে দেবেন আপন সেনাবাহিনীর সুমুখে, তোপের মুখে। আপোষ আলোচনার পথ উন্মুক্ত করার জন্য শহরের শাসনকর্তার এক ভাইকেও মধ্যস্থরূপে পাঠালেন দুর্গ মধ্যে। নির্বিবাদে তার হাতে দুর্গ অর্পণে প্ররোচিত করার জন্য দিলেন প্রলোভনজনক এক প্রস্তাবও। কিন্তু দুর্গাধীপ ছিলেন সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুগামী। সম্রাটের মৃত্যু সম্পর্কে নিসংশয় হবার মতো খবরও পাননি তিনি। তাই উত্তর দিলেন, শাহ-জহান ছাড়া আর কাউকে তিনি মালিক বলে স্বীকার করেন না। এ দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব তিনিই ন্যস্ত করেছেন তার ওপর।

সুতরাং তার হাতে অথবা তার নির্দেশিত লোকের হাতে ছাড়া অন্য কাউকে দুর্গ সঁপে দিতে তিনি অক্ষম। তিনি মুরাদ বক্সকে শাহজাদা রূপে, তার সম্রাট মনিবের পুত্র হিসাবে অবশ্যই সম্মান করেন। তবুও সম্রাটের লিখিত আদেশ ছাড়া এ দুর্গ তার হাতে তুলে দেয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে।

দুর্গাধীপের এই অনমনীয় মতিগতি দেখে খোজা শাহবাজ খান চরম ভয় দেখিয়ে কাবু করতে চাইলেন তার সেনাদের। হুমকি দিলেন, যদি আগামীকালের মধ্যে দুর্গ সমর্পণ করা না হয় তবে তিনি দুর্গ মধ্যে থাকা সেনাদের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে-আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কাবু করা গেল না তাদের এ ভয় দেখিয়েও। তবে, সংখ্যাল্পতা ও দেয়ালে ভাঙন ঘটার ফলে প্রতিরোধ ক'রে চলায় অক্ষম হয়ে এবং দ্বিতীয় 'মাইন'টির বিস্ফোরণ ভয়ে শেষ অব্দি সম্মানজনক শর্তে দুর্গ সমর্পণে রাজী হতে একরকম বাধ্য হলেন দুর্গাধীপ। দখল নিয়ে সেটিকে বিশ্বস্তভাবে আগলে রইলেন শাহবাজ খান। মজুত থাকা ধনসম্পদ কব্জা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন মুরাদ বক্সের কাছে আহমদাবাদ। তিনি তখন জনসাধারণের ওপর পীড়ন চালিয়ে সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত সেখানে।*

সুরাট অধিকারের খবর পেয়ে শাহজাদা গড়ালেন এক সিংহাসন সাথে সাথে। দিনক্ষণ দেখে করলেন আপন অভিষেক অনুষ্ঠান। ঘোষণা করলেন নিজেকে শুধু গুজরাট অধিপতি রূপেই নয়, পিতা শাহ-জহানের সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি রূপে। করলেন ঐ সাথে আপন নামে মুদ্রাও চালু। পাঠালেন প্রতিটি শহরে আপন নিযুক্ত শাসন কর্তাদের। কিন্তু দুর্বল ভিতের ওপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার দরুন ঘটল অল্পকালের মধ্যেই তার পতন। তাছাড়া ভাইদের মধ্যে সবার ছোট হবার দরুন ছিল না তার সিংহাসনের ওপর বিধিসম্মত দাবীও কোন। ফলে, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাতে হল তাকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

বাদশাজাদা দারা শিকো উদ্বিগ্ন হলেন সুরাট পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হল না তার পক্ষে। একদিকে তিনি তখন রুগ্ন পিতার দেখাশোনায় ব্যস্ত। অন্যদিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে দ্বিতীয় ভাই সুলতান শুজার গতিবিধির ওপর। তিনি মুরাদ বক্স অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। ফলে মুরাদ

* এই দুর্গের অধীপ ছিলেন তখন সঈদ তঈব। মুরাদ বক্সের কাছে আহমদাবাদে দুর্গের চাবি পৌঁছয় ১৬৫৭-র ২৬শে ডিসেম্বর। আক্রমণ শুরু হয় ১৬৫৭-র নভেম্বরে। এ যুদ্ধ বিবরণের জন্য যদুনাথ সরকারের **History of Aurangzib**, প্রথম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

অপেক্ষা অনেক বেশি বিপদের পাকে ফেলে দিয়েছিলেন দারাকে। সমগ্র বাঙলা আপন মুঠোয় এনে তিনি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছেন বিহার রাজ্যে। বড় ছেলে সুলেইমান শিকোকে এক শক্তিশালী সৈন্যদল সহ অতি দ্রুত শুজার বিরুদ্ধে পাঠানো ছাড়া আর কিছুই ক'রে ওঠা সম্ভব হল না দারা শিকোর পক্ষে। এই তরুণ রাজকুমার সফল হলেন তার কাকাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে বাঙলায় হটিয়ে দিতে। তারপর বাঙলা-বিহার সীমান্তে শক্তিশালী সেনাদল মোতায়েম রেখে ফিরে এলেন পিতা দারা শিকোর কাছে।

(এই প্রতিরোধ অভিযানে সুলেইমানের সঙ্গে ছিলেন রাজা জয়সিংহ ; যুদ্ধ হয় ১৬৫৮ র ফেব্রুয়ারীতে বনারসের কাছে বহাদুরপুরে।)

এই পরিস্থিতির মধ্যে এদিকে মুরাদ বক্সও গুজরাটে রাজা হয়ে বসেছেন, ঘোষণা করেছেন নিজেকে সম্রাট রূপে। সমগ্র সাম্রাজ্য দখল করার জন্য, ভাইদের নির্মূল ক'রে আগ্রা বা জহানাবাদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তিনিও সমান অধীর।

ভাইদের মধ্যে ঔরঙজেব ছিলেন সব থেকে উচ্চাকাঙ্খী, সবার চেয়ে চতুর। তিনি রইলেন এ সময়ে ঘাপটি মেরে বসে। মতলব, নিজেদের মধ্যে লড়াই ক'রে ভাইদের উৎসাহ উদ্দীপনা, ক্ষমতা যতটা সম্ভব নিঃশেষ হোক আগে। তারপর মারা যাবে ঝোপ বুঝে কোপ। মনের কথা মনে পুষে বাইরে এমন ভাব দেখিয়ে চললেন যেন সাম্রাজ্যের প্রতি কোন লিপ্সা নেই তার। প্রচার করলেন, ধন-সম্পদ ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবেন তিনি দরবেশ বা নির্জন সাধকের জীবন। তুখোড়ভাবে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি তার ছোট ভাই মুরাদ বক্সকে জানালেন, তার রাজ্যভোগ আকাঙ্খা রয়েছে দেখে তা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী। কেননা, তিনি মনে করেন, শৌর্য বীর্যের দিক থেকে একমাত্র সে-ই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই, প্রতিবন্ধক দারা শিকোকে নির্মূল ক'রে সিংহাসনে বসার পথ পরিচ্ছন্ন ক'রে দেয়ার জন্য তিনি তাকে সৈন্য সাহায্য ও আর্থিক সাহায্য দুই-ই দিতে উৎসুক। মুরাদ বক্সের বিচার-বিবেচনা শক্তি তীক্ষ্ণ ছিল না আদপে। তাছাড়া ভবিষ্যৎ ক্ষমতা প্রতিপত্তির সোনালী মোহেও হয়ে পড়েছিলেন তিনি আচ্ছন্ন। তাই তিনি অতি সহজেই বিশ্বাস ক'রে বসলেন ঔরঙজেবকে। রাজী হয়ে গেলেন তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একত্রে আগ্রা দখলের জন্য এগিয়ে যেতে। (মালবের উজ্জয়নীর কাছে মিলিত হয়েছিল বাহিনী

সহ ঢুকলেন। মুরাদ আহমদাবাদ থেকে এবং ঔরঙজেব বুরহানপুর থেকে উপস্থিত হন সেখানে।) তাদের গতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলেন দারা শিকো। (উজ্জয়নীর ১১৪ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে, ধরমত-এ, ১৫ই এপ্রিল ১৬৫৮-তে) রণক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমুখি হল দু'বাহিনী। দারার পক্ষে শুভকর হল না এ যুদ্ধ, বিজয় গৌরব লাভ করলেন এবার দু-ভাই। (রাজপুত ও মুসলমানদের মধ্যে রেষারেষির ফলে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দারার বাহিনী। তাছাড়া রণক্ষেত্র নির্বাচনে অসতর্কতা এবং মারওয়ারের রাজা যশোবন্ত সিংহের ত্রুটিপূর্ণ রণকৌশলও এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।)

আপন আমীরদের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপনা করেছিলেন দারা শিকো। ফলে, তার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী প্রধান সেনানায়ক তথা প্রধান ওমরাহের পরামর্শ উপেক্ষা করলেন তিনি। ভাইদের বিশ্রাম নেবার অবকাশ না দিয়ে তড়িঘড়ি আক্রমণ করলে সহজে জিতে যাবেন ভেবে ক'রে বসলেন সেরকুমটি। প্রথম আঘাত হানা হয়েছিল বেশ তীব্র ভাবেই। রণভূমি হয়ে উঠেছিল তার ফলে রীতিমতো রক্তাক্ত। বিক্রম ও উদ্দীপনায় ঝলসে উঠে সিংহের মতো দুরন্ত ভাবে যুঝে চলেন মুরাদ বক্স। দেহে পাঁচটি তীরের আঘাত পেলেন তিনি, তার হাতির দেহও হয়ে উঠল তীরে তীরে শরবন। এ সত্ত্বেও যুদ্ধের ফলাফল চলে চলল দারা শিকোর অনুকূলেই। জয় প্রায় তার হাতের মুঠোয়। পরিস্থিতি দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন ঔরঙজেব। কিন্তু যেই দেখলেন, দারার বাহিনীতে থাকা বিশ্বাসঘাতকরা তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে অমনি ফিরে এলেন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে। দারার বাহিনী মধ্যে থাকা সেরা রণনায়ক ও তাদের সেনাপতি প্রাণ হারাবার পর হীনভাবে তারা ত্যাগ করলেন তার পক্ষ, মদত দিলেন ঔরঙজেবকে। মনোবলে বলীয়ান হয়ে শুরু করল সে এবার দারা শিকোর সঙ্গে লড়াই। দারা শিকো যখন দেখলেন, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন, অল্পসংখ্যক অনুগতের ওপর ভরসা ক'রে যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়, সাথে সাথে পিছু হটলেন তিনি, ফিরে এলেন আগ্রায় পিতার কাছে। পিতা, শাহ-জহান তখন ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে। তিনি তাকে উপদেশ দিলেন আগ্রায় সঞ্চিত থাকা সমগ্র সম্পদ নিয়ে দিল্লীর দুর্গে ঠাঁই নিতে। অতি বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে তাই করলেন তিনি। ফলে এ যুদ্ধে পূর্ণ বিজয়ী হলেন ঔরঙজেব ও মুরাদ বক্স। শেষের জন যুদ্ধ সমাপ্ত হবার আগেই ক্ষত-জনিত রক্তপাতে দুর্বল হয়ে পড়ে বাধ্য হয়েছিলেন চিকিৎসার

জন্য আপন ছাউনিতে ফিরে যেতে। শুধু যে বিপুল অর্থ দিয়ে এই সব বিশ্বাসঘাতকদের আপন দলে টেনে আনতে সফল হয়েছিলেন ঔরঙজেব তা নয়। আসলে, ভারতীয় চরিত্রই হল সর্বদা অস্থিরমতি ও কৃতজ্ঞতা বোধশূন্য। তাছাড়া এইসব প্রধানরা সাধারণত পারস্য ছেড়ে এ দেশে এসে ঠাঁই নেয়া। নেই যেমন এদের বংশ-কৌলিন্য, তেমনি অভাব এদের চিত্তবৃত্তিরও। যার কাছ থেকে বেশি মেলে তার দিকেই ঢলে পড়ে এরা।*

এই প্রসঙ্গে শায়েস্তা খান সম্পর্কে বলি কিছু। তিনি হলেন (জহাঙ্গীরের মহিষী খ্যাতনামা নূরজহানের ভাই) আসফ আলীর ছেলে। পূর্বে তিনি আপন ভগ্নীপতি শাহ্-জহানের পক্ষ নেয়ার জন্য করেছিলেন শাহজাদা বুলাকীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। সে-কাহিনী শোনাব অন্য সময়ে। শাহ-জহানের এই চার পুত্রের সকলেই কিন্তু তার আপন বোন (মমতাজ মহলের)-এর ছেলে। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই তিনি আপন মামা। কিন্তু দারা শিকো ও মুরাদ বক্সের অধিকাংশ বিশিষ্ট কর্মচারীদের মতো ইনিও মনিবের পক্ষ ত্যাগ ক'রে যোগ দিলেন ঔরঙজেবের দলে।

মুরাদ বক্স এবার ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে শুরু করলেন যে ঔরঙজেবকে বিশ্বাস ক'রে কি ভুল ক'রে বসেছেন তিনি। কিন্তু ঔরঙজেব ততক্ষণে ভাগ্যকে আপন অনুকূলে পেয়ে মুহূর্ত সময় নষ্ট না ক'রে লেগে পড়েছেন আপন পরিকল্পনা রূপায়ণে। নিজের প্রতি ভাইয়ের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠার মতো সঙ্গত কারণ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছিল বলে ঔরঙজেবের কাছে দাবী ক'রে বসলেন মুরাদ বক্স এই যুদ্ধে দখল করা সম্পদের অর্ধেক ভাগ। তার মন তখন তাই নিয়ে গুজরাট সরে পড়ার দিকে। কিন্তু, উত্তরে ঔরঙজেব তাকে নির্ভর আশ্বাস সহ বলে পাঠালেন যে তার একমাত্র আকাঙ্খা হল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে তাকে সাহায্য করা। এবং এই আকাঙ্খা সফল করার পন্থা নির্ধারণের জন্য তিনি চান একবার তার সঙ্গে পরামর্শে বসতে। দেহের ক্ষত মোটামুটি নিরাময় হতে মুরাদ বক্স এলেন ভাই

* 'আমীররা অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী। দরবারে সবসময়ে তক্কে তক্কে থাকতেন তারা একে অন্যকে কাবু করার দিকে। সাধারণত ছিলেন এরা নিচ বংশ জাত, কতক তো আদতে দাস। এবং এদের অধিকাংশেরই ছিল না কোন শিক্ষাদীক্ষা। মুঘল-সম্রাট আপন (প্রয়োজন ও) খেয়াল খুশী অনুযায়ী এদের চূড়ায় তুলতেন কিংবা ঠেলে দিতেন বিস্মৃতির অতলে।'—বার্নিয়ার, পৃঃ ২১২

ঔরঙজেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার ছাউনিতে। ঔরঙজেব প্রসন্নভাবে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে, প্রশংসা করলেন তার শৌর্য-বীর্যের। বললেন : তার মতো ব্যক্তিই পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসার উপযুক্ত।

যুবক শাহজাদা ভুলে গেলেন ঔরঙজেবের এই মিষ্টি কথায়। কিন্তু যিনি গুজরাট রাজ্যের সেরা অঞ্চলগুলি তার দখলে এনে দিয়েছিলেন সেই খোজা শাহবাজ খান কিন্তু ভুললেন না। ঔরঙজেবের উদ্দেশ্য যে মোটেই সাধু নয়, তিনি যে তাকে ফাঁদে ফেলার মতলব এঁটেছেন, চেষ্টা করলেন একথা মুরাদ বক্সকে বোঝাতে তিনি। যখন খোজার পরামর্শ মেনে নিয়ে সেই মতো পথ চলার দিকে তিনি ঝুঁকলেন, তখন দেরি হয়ে গেছে রীতিমতো। তাকে উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছেন ঔরঙজেব। মুরাদ বক্সকে এক ভোজ-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। মুরাদ বক্স যতই তা এড়িয়ে যেতে চাইলেন ততই সনির্বন্ধ পীড়াপীড়ি ক'রে চললেন ঔরঙজেব।

শেষ পর্যন্ত আর প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে, তিনি যে তাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন তা গোপন রাখার জন্যই, সে ভোজ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন যুবক শাহজাদা। তবে, এ দিনটিই যে তার জীবনের শেষ দিন হতে পারে, করা হতে পারে তার ওপর মারাত্মক কোন বিষ প্রয়োগের উদ্যম, সে ভয় পুরোপুরি ছিল তার মনে। তবে সে আশঙ্কা মিথ্যাই করেছিলেন তিনি। সে ভাবে তার জীবন নেয়ার কোন সংকল্প-ই ছিল না ঔরঙজেবের। তিনি তাকে পরলোকে না পাঠিয়ে চেয়েছিলেন জীবন্ত আপন মুঠো'র মধ্যে আনতে। তাই করলেন তিনি। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করার নামে রাখলেন শেষ পর্যন্ত তাকে গোয়ালিয়র দুর্গের সুরক্ষিত বন্দীশালায় আবদ্ধ ক'রে। দিলেন এভাবে তাকে নিশ্চিন্তে ক্ষত নিরাময় হবার অবকাশ। নিয়ে চললেন তারপর আপন পরিকল্পনা সুসম্পূর্ণ করার পদক্ষেপ।

তিন ॥ সম্রাট শাহ-জহানের বন্দী-দশা : বৃদ্ধ পিতার প্রতি পুত্র ঔরঙজেবের ব্যবহার

হুমায়ুনের পৌত্র ও আকবরের পুত্র ভারত-অধিপতি জহাঙ্গীর ক'রে গেছেন প্রায় ২৩ বছর কাল রাজত্ব। এবং অতি শান্তিময় পরিবেশের মধ্যেই। শুধু

আপন প্রজাদের কাছেই নয়, অর্জন করেছিলেন তিনি পড়শী রাজ্যগুলিতেও জনপ্রিয়তা। কিন্তু তার দুই ছেলের আশাআকাঙ্খা চরিতার্থের পক্ষে তার এই আয়ু হয়ে পড়ল বিরাট প্রতিবন্ধক। তাদের যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বড় ছেলে খুসরু তখন গড়ে তুলল এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী লাহোরে। উদ্দেশ্য, পিতা জহাঙ্গীরকে অতর্কিতে কাবু ক'রে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবেন রাজ-সিংহাসন। ছেলের এই ধৃষ্টতার কথা জানতে পেরে গেলেন সম্রাট। সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার। তার পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য এগিয়ে গেলেন এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে। করলেন তার অনুগামী বহু বড় বড় আমীর সহ তাকে বন্দী। কিন্তু জহাঙ্গীর ছিলেন মহানুভব প্রকৃতির। গভীর ভালবাসতেন আপন ছেলেকে। সে যে-অপরাধ করেছে তার যোগ্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও, ছেলেকে হাতের মুঠোয় পেয়েও মন উঠলো না তাকে ঐরূপ শাস্তি দিতে। আদেশ দিলেন তাই তার দৃষ্টিশক্তি লোপ ক'রে দেয়ার জন্য। দু'চোখের ওপর গরম লোহার শলাকা চালিয়ে ক'রে দেয়া হল তাকে অন্ধ। তারপর রেখে দিলেন তাকে আপনার কাছেই। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে তার বড় ছেলে সুলতান বুলাকী (দাওয়র বক্স) যাতে বসতে পারে সিংহাসনে। শাহজাদা খুসরুর আরো কয়েকটি ছেলে হয়েছিল ইতিমধ্যে, তবে সকলেই তখন নাবালক। পরে শাহ-জহান নাম নিয়ে যিনি সিংহাসনে বসেন জহাঙ্গীরের সেই দ্বিতীয় পুত্র (প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়) খুরম কিন্তু সুনজরে দেখলেন না তা। তার মনোভাব, ভাইপো অপেক্ষা তার দাবীই অগ্রগণ্য, নির্বাচন করা উচিত তাকেই পরবর্তী উত্তরাধিকারী রূপে। তাই, সে যাতে কোনদিন সিংহাসনে বসার সুযোগ না পায় মন দিলেন তারই পথ তৈরির দিকে। পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা না ক'রে উন্মুখ হলেন তার আগেই সিংহাসন অধিকার ক'রে নিতে। তবে আপন মনোভাব গোপন রাখার জন্য নিলেন তিনি ভেকের আশ্রয়। এমন অভিনয় ক'রে চললেন, যেন তিনি পিতার অনুগত, তার মনোভাবেরই সমর্থক। এই লোক দেখানো আনুগত্যের মাধ্যমেই তুলনামূলক ওভাবে সহজে আপন উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে নিলেন শাহ-জহান। জয় করলেন পিতার মন। আদায় করলেন অন্ধ বড় ভাইকে নিজের সাথে দাক্ষিণাত্যে রাখার অনুমতি। তিনি জহাঙ্গীরকে বোঝালেন, খুসরু সর্বদা তার কাছে কাছে থাকলে যখনই তার অন্ধ ক'রে দেয়া দু-চোখের দিকে দৃষ্টি পড়বে সৃষ্টি করবে তা তারই মনে অস্বস্তি, অশান্তি, বেদনা। তাছাড়া দৃষ্টিশক্তি না থাকার ফলে ভবিষ্যতে ক্রমশঃই হয়ে উঠবে সে তার বোঝা,

ঝঞ্ঝাটের কারণ। এবং সম্রাটের পরিবর্তে তার কাছে দাক্ষিণাত্যে থাকলে সে কাটিয়ে দিতে পারবে তার শেষ জীবন অনেক বেশি সুখ শান্তি আরামে। তার প্রকৃত অভিসন্ধি যে কি তা ধরতে না পেরে সম্রাট সহজেই সায় দিলেন তার প্রস্তাবে। এভাবে বেচারা অন্ধ শাহজাদাকে নিজের হাতের মুঠোয় আনার পর আর রইল না অতি গোপন ও সুচতুর পন্থায় তাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেয়ার কোন অসুবিধা। আপন অপরাধ লোকের কাছে ঢাকা দেয়ার জন্যও অভাব হল না অকাট্য কৈফিয়তের। তবে লোক চক্ষুকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলেও সম্ভব হয়নি কিন্তু ঈশ্বরের চোখকে ফাঁকি দেয়া। আর তিনিও যে নিষ্কৃতি দেননি তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে তাও আমরা দেখতে পাব একটু পরে। (দাওয়র বক্স-কে সুযোগ দেয়া হয়েছিল পারস্যে পালিয়ে যেতে। যেখানে পারস্যের শাহের বৃত্তিভোগী-রূপে জীবন কাটান তিনি।)

অন্ধ বাদশাজাদার মৃত্যুর পর শাহ-জহান বা পৃথিবী-পতি বিশেষণে ভূষিত হলেন সুলতান খুরম। এ বিশেষণকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য গড়লেন এক সেনাবাহিনী। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় ভাই প্রথম সক্রিয় হয়েছিলেন তা এবার নিজের জন্য সুসম্পন্ন করার দিকে মন দিলেন তিনি। অর্থাৎ, তৎপর হয়ে উঠলেন, কি ক'রে পিতাকে সিংহাসন চ্যুত ক'রে নিজে বসবেন সেখানে তারই চেষ্টায়। পুত্রের মৃত্যু ও তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে অতি ক্ষুব্ধ জহাঙ্গীর তার এই দণ্ডযোগ্য দুঃসাহসিক অপরাধের সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠালেন তার বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী। তাদের প্রতিরোধ করার পক্ষে তার শক্তি যে অতি তুচ্ছ তা উপলব্ধি করতে পেরে বিদ্রোহী খুরম পালিয়ে গেলেন দাক্ষিণাত্য ছেড়ে। দুষ্কর্মের সহায়ক সঙ্গী সাথীদের নিয়ে আশ্রয়হীনের মতো এখান থেকে সেখানে ভেসে বেড়ালেন কিছুকাল। উপস্থিত হলেন শেষমেশ বাঙলায়। সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য গড়লেন সেখানে এক সেনাবাহিনী। গঙ্গা পার হয়ে আগুয়ান হলেন বিহার রাজ্যের দিকে। সম্রাট নিজেই এবার এগিয়ে গেলেন তার মুখোমুখি হবার জন্য। এবং আগেকার তুলনায় আরো বেশি সেনা আরো অধিক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে। কিন্তু দুই পুত্রের ক্রিয়াকলাপে মর্মাহত ও বার্ধক্যপীড়িত জহাঙ্গীর মারা গেলেন পথে। মিলে গেল আপন লক্ষ্য চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ শাহ-জহানের। তবে মৃত্যুর আগে এই মহৎ সম্রাট অবকাশ পেয়েছিলেন আপন পৌত্র বুলাকীর (দাওয়র বক্স) ভার তার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ তথা প্রধান মন্ত্রী আসফ খানের ওপর (শায়েস্তা খানের পিতা) অর্পণ ক'রে যাবার। তিনিই

পরিচালনা করতেন সমগ্র সাম্রাজ্য। তার সব আমীরদেরও তিনি নির্দেশ দিয়ে যান, তার মৃত্যুর পর বুলাকীকেই যেন তার বিধি সম্মত উত্তরাধিকারী ও সম্রাট রূপে মেনে নেন সকলে। ঘোষণা ক'রে যান সেই সাথে সুলতান খুররমকে বিদ্রোহী এবং তার উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত বলে। (বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ এখানে। জহাঙ্গীর মারা যান কাশ্মীর থেকে লাহোর ফেরার পথে পাহাড় গোড়ায় থাকা চেঙ্গিস হটলী-তে। এ ঘটনাকাল ২৮শে অক্টোবর, ১৬২৭।)

এছাড়াও আসফ খানকে দিয়ে জহাঙ্গীর শপথ করিয়ে নেন যে ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন, বুলাকীকে যেন হত্যা করা না হয় কখনো। আপন উরু স্পর্শ ক'রে এজন্য সম্রাটের সুমুখে শপথ নিলেন আসফ খান। ফলে বুলাকীর জীবন রক্ষার জন্য আসফ খান ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকলেও, বাধ্য রইলেন না তাকে সিংহাসনে বসানোর দায়ে। সেখানে শাহ জহানকেই প্রতিষ্ঠিত করার দিকে ঝুঁকলেন তিনি। তারই বড় মেয়ে (মমতাজ মহল)-এর সাথে বিয়ে হয়েছিল শাহ-জহানের।* সেই মেয়েই যে শাহ-জহানের চার ছেলে ও দুই মেয়ের জননী, পূর্ব পরিচ্ছেদেই বলেছি সে কথা।

সম্রাট জহাঙ্গীরের মৃত্যু সংবাদ দরবারে ঘোষিত হতেই নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। শুনে নিদারুণ মর্মাহত হলেন সকলে। আমীররা অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠলেন তার অন্তিম ইচ্ছা অনুরূপ সুলতান বুলাকীকে সম্রাট পদে বরণ ক'রে নেবার জন্য। সুলতান বুলাকী তখনও নাবালক। তার দুই নিকট-ভাই সম্রাটের অনুমতি নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ ক'রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারই প্রচারে। এ দুই তরুণ শাহজাদা ছিলেন কোমল প্রকৃতির। তারা নজর করলেন, শায়েস্তা খানের পিতা ও শাহ-জহানের শ্বশুর আসফ খান ভাবী সম্রাটের প্রতি বিরূপ অভিসন্ধি-পরায়ণ। তারা সাথে সাথে সাবধান ক'রে দিলেন তাকে। ভাবী সম্রাট তখনও তরুণ, অভাব অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিচক্ষণতার। তাই অপরিণামদর্শীর মতো সোজাসুজি আসফ খানকেই শুনিয়ে বসলেন সে-কথা। সরাসরি তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, কাকা সুলতান খুররমকে তিনি সিংহাসনে বসাবার মতলবে আছেন তাদের এই নিশ্চিত ধারণা সত্য কি না? আসফ খান সযত্নে এড়িয়ে গেলেন সত্যকে। করলেন উলটে তাদেরই মিথ্যা ভাষণ ও দুরভিসন্ধির দায়ে দোষী। তারপর বললেন: তিনি তার শাহানশাহের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকবেন, তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখার জন্য কার্পণ্য করবেন না শেষ রক্তবিন্দু ঢালতেও। সুলতান বুলাকী ভাবলেন, তাকে লক্ষ্য

করেই বুঝি একথাগুলি উচ্চারণ করেছেন আসফ খান। তিনি কিন্তু আদতে তার জামাতা শাহ-জহানকে সিংহাসনে বসবার সিদ্ধান্ত থেকে, সেই ভাবেই ব্যক্ত করেছেন তার মনোভাব। তার এ কথাগুলির আসল লক্ষ্য কিন্তু শাহ-জহানই। ন্যায়ের চেয়ে সম্পর্কের নৈকট্যকেই প্রাধান্য দিলেন আসফ খান। তার চাতুরী ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যে দণ্ড-পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তাকে তিনি সামাল দিলেন এই চতুর পন্থায়। ওই দুই শাহজাদাকে কবজায় এনে প্রাণ নিলেন তাদের। সেনাবাহিনী ও রাজ্য-প্রশাসন দুয়ের ওপর সর্বেসর্বা থাকার সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ সামরিক কর্মচারী ও দরবারের আমীরদের শাহ-জহানের অনুকূলে আপন দলে টানলেন তিনি। তারপর আপন উদ্দেশ্য যাতে আগে ফাঁস না হয়ে যায়, তরুণ ভাবী সম্রাটের মনে যাতে অধিকতর সন্দেহের সৃষ্টি না হয় সেজন্য রটালেন তিনি শাহ-জহানের মিথ্যা মৃত্যুর খবর। প্রচার করলেন, পিতার সমাধি পাশে সমাহিত হবার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে গেছেন তিনি, তাই নিয়ে আসা হবে তার মরদেহ আগ্রায়। (এখানেও ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ। জহাঙ্গীরের মরদেহ আগ্রায় সমাধিস্থ করা হয়নি, হয়েছে লাহোরের শাহদরে।)

অতি চতুরতার সঙ্গে রূপায়িত করা হল সমগ্র কূট পরিকল্পনাটি। আসফ খান নিজে বয়ে নিয়ে গেলেন এই মিথ্যা মৃত্যু খবর তরুণ ভাবী সম্রাটের কাছে। জানালেন, মরদেহ যখন আগ্রার এক কি দু'কোশের মধ্যে পৌঁছবে, শিষ্টাচার রীতি অনুযায়ী জাঁহাপনার উচিত হবে তখন এগিয়ে গিয়ে তার প্রতি সম্মান দেখানো। তিনি এই বংশেরই সন্তান বলে, জাঁহাপনার পিতার ভাই বলে এ সম্মান তার প্রাপ্য। এদিকে ছদ্মবেশে আগ্রার দিকে রওনা হলেন শাহ-জহান। আগ্রার নিকটবর্তী সৈন্য ছাউনির কাছাকাছি এসে ঠাঁই নিলেন একটি শবাধারে। সেটি এমনভাবে তৈরি করানো হয়েছিল যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া চলে তার মধ্যে শুয়ে থেকে। বয়ে আনা হল শবাধারটিকে একটি তাঁবুর ভেতর। আসফ আলীর সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকা সব প্রধান কর্মচারী ও আমীররা উপস্থিত হলেন সেখানে মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ছল ক'রে। তরুণ ভাবী সম্রাটও সেই সমাবেশে উপস্থিত হবার জন্য রওনা হলেন আগ্রা থেকে। আসফ খান দেখলেন, পেয়ে গেছেন তিনি তার পরিকল্পনা কার্যকরী করার সুবর্ণ পরিবেশ। উন্মুক্ত করলেন তিনি তখন শবাধারটি। ভেতর থেকে বেরিয়ে সমগ্র সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন শাহ-জহান। জয়ধ্বনি তুলে তাকে সম্রাট রূপে শ্রদ্ধা ও

অভিবাদন জানালেন সেনা-নায়কের দল, উপস্থিত অন্যান্য কর্মচারীরা। জনসমক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হল সম্রাটরূপে তার নাম। তুলে দেয়া হল তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার। দেখতে দেখতে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম নতুন সম্রাট হিসাবে চারিদিকে। পথে জানতে পেলেন সে-খবর তরুণ ভাবী-সম্রাট বুলাকীও। দেখলেন, তাকে ত্যাগ ক'রে সকলেই প্রায় ভিড়েছে আসফ খানের দলে। ফলে এমন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি যে পালানো ছাড়া আর কোন পদক্ষেপ নেয়ার কথাই চিন্তায় এল না তার। শাহ-জহানও তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পিছু তাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন না আর। দিলেন তাকে দীর্ঘকাল অবারিত ভাবে ভারতে ফকীরের প্রায় ভেসে বেড়ানোর সুযোগ। শেষে এ ধরনের জীবন অসহ বোধ হবার দরুন চলে গেলেন তিনি পারস্যে, নিলেন শাহ সফবীর কাছে আশ্রয়। তিনি অতি উদার চিত্তে গ্রহণ করলেন তাকে, দিলেন একজন বড় রাজার যোগ্য বৃত্তি। এখনো তা ভোগ ক'রে চলেছেন তিনি। পারস্য পর্যটন কালে তার সঙ্গে দেখা ও আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। করেছিলাম তার সাথে পান, ভোজনও।

এই পন্থায় বসলেন সিংহাসনে শাহ-জহান। আপন স্থিতি সুদৃঢ় ক'রে তোলার জন্য নির্মূল ক'রে চললেন তারপর বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে। ভয়, পাছে তারা স্বর তোলে, বিদ্রোহ জাগায় বিধিসম্মত উত্তরাধিকারীর পক্ষ নিয়ে। যারাই তার ভাইপোর প্রতি সহানুভূতি দেখাল, যাদেরই চাল-চলন সন্দেহজনক মনে হল, ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন তাদের ইহলোক থেকে। তার রাজত্বের প্রাথমিক পর্ব এর ফলে শুধু নিষ্ঠুরতায় ভরা, জন-মানসে তার স্মৃতি এজন্য যথেষ্ট কালিমা মাখা। তার রাজত্বের অন্তিম ভাগও অনুরূপভাবে বেদনা-জর্জর। ন্যায়-সঙ্গত উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ঠিক যেরূপ অন্যায় ভাবে রাজ্য আত্মসাৎ ক'রেছেন তিনি, জীবদ্দশা কালে ঠিক সেরূপ অন্যায় ভাবেই আপন পুত্র ঔরঙজেব বঞ্চিত করেছেন তাকে সেই রাজ্য থেকে, রেখেছেন তাকে বন্দী ক'রে আগ্রা দুর্গে। ঘটনা কিভাবে এতদূর গড়ালো সংক্ষেপে শোনাই তো।

(আগ্রা দুর্গ থেকে ৮ মাইল পূবে) সামোগড়ের প্রান্তরে (১৬৫৮-র ২৯শে মে) ঔরঙজেব ও মুরাদের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হল তাতে হেরে গেলেন দারা শিকো। চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তার সামরিক প্রধানরা বর্জন করলেন তার পক্ষ। হেরে গিয়ে, সেই গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে যতটা যা

রাজকীয় ধন-সম্পদ সাথে নেয়া সম্ভব হল তা নিয়ে চলে গেলেন তিনি লাহোর বিজয়ী দুই পুত্রের দুঃসাহসিক স্পর্ধাকে সংযত করার প্রত্যাশা নিয়ে থেকে গেলে শাহ-জহান আগ্রা দুর্গেই। কিন্তু তাদের একমাত্র চিন্তা তখন, কি ক'রে পিতার কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা আসীন হবেন সেখানে। সম্ভবত পিছ পা ছিলেন না তারা এজন্য পিতাকে হত্যা করতেও। পুত্রদের স্পর্ধার সীমা দেখার জন্য, তাদের হাতে বন্দী হবার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য দুর্গের ফটক রুদ্ধ ক'রে তিনি বাস ক'রে চললেন সেখানে। ঔরঙজেব এবার বন্দী করলেন মুরাদ বক্সকে। দিয়েছি সে ঘটনার বিবরণ আগের অধ্যায়েই। এলেন তারপর তিনি আগ্রায়। দুর্গটি দখল ক'রে নেয়ার পথ প্রশস্ত করার জন্য তিনি এমন ভাণ করলেন যে শাহ-জহান মারা গেছেন বলেই তার বিশ্বাস। দুর্গটি রয়েছে তার মতে বর্তমানে কোন আমীরের দখলে। ঔরঙজেব যতই প্রচার চালালেন শাহ-জহান মারা গেছেন, শাহ-জহান তত বেশি ক'রে জানাতে চাইলেন, সে-কথা সত্য নয়, তিনি বেঁচে আছেন এখনো। শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করলেন সম্রাট, ঔরঙজেবকে ঠেকানো এ-ভাবে সম্ভব নয় তার পক্ষে। কেননা, সব ক্ষমতা এখন তার কব্জাতেই, ভাগ্যও সবরকম ভাবে সহায়তা দিয়ে চলেছে এখন তাকেই। এছাড়া আগ্রা দুর্গের মধ্যে থাকা কুয়োগুলি শুকিয়ে যাবার দরুন দেখা দিয়েছে জলাভাব। দুর্গের একটি ছোট দ্বারপথ দিয়ে নদী থেকে জল আনার ব্যবস্থা না করলে আর নয় এখন। অথচ ওই অংশটিই হল দুর্গের সব থেকে দুর্বলতম স্থান। আর, ঔরঙজেব ইতিমধ্যেই সজাগ প্রহরা বসিয়ে দিয়েছে সেখানে। তখন তিনি যে জীবিত আছেন সে-সম্পর্কে ঔরঙজেবকে নিঃসন্দিহান করার জন্য, যাতে সে আর এ-সম্পর্কে কোন ছলনার আশ্রয় না নিতে পারে তার পথরোধের জন্য, পাঠালেন তার কাছে আপন গৃহস্থালীর প্রধান পরিচালক ফাজিল খানকে। (ফাজিল খান, অলা-উল-মুল্ক, তুনী ছিলেন খুরাসানের তুন অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন কবি ও সজ্জন। সিংহাসনে আসীন হবার পর ঔরঙজেব প্রথম তাকেই বরণ করেন ওয়জীর পদে। কিন্তু মাত্র ১৬ দিন সে-পদে থাকার সুযোগ হয় তার। ১৬৬৩-র জুন মাসে বিদায় নেন তিনি এ পৃথিবী থেকে।)

ফাজিল খানকে নির্দেশ দেয়া হল সে যেন ঔরঙজেবকে জানায়, তার পিতা, সম্রাট তাকে আদেশ করেছেন দাক্ষিণাত্যে তার আপন প্রদেশে ফিরে যাবার জন্য। সে যেন আর কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি না ক'রে, পালন করে এ আদেশ।

সম্রাটের প্রতি এভাবে আনুগত্য দেখিয়ে সে যেন রচনা করে এ-পর্যন্ত যা কিছু ঘটে গেছে তা মার্জনা করার মতো পরিবেশ। ঔরঙজেব এ সত্ত্বেও অটল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। ফাজিল খানকে উত্তর দিলেন: তাঁর সম্রাট পিতা যে মারা গেছেন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিহান। এ জন্যই সিংহাসনের দাবীদার হয়ে নেমেছেন লড়াইয়ে। ভাইদের মতো তাঁরও সমান দাবী রয়েছে সিংহাসনের ওপর, অন্ততঃ তাঁর চেয়ে অন্য কারো এতটুকুও বেশি দাবী আছে বলে মনে করেন না তিনি। সম্রাটের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি যদি সত্যিই জীবিত থাকতেন তবে তাঁর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করার মতো কোন পদক্ষেপ নেয়ার লেশমাত্র স্পৃহাও দেখা দিত না তাঁর মনে। আর, সম্রাট যদি সত্যিই মারা গিয়ে না থাকেন, তবে স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে চাই আমি। সেক্ষেত্রে তাঁর পাদ চুম্বন ক'রে ফিরে যাব আপন প্রদেশে। বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব তাঁর আদেশ।

দুর্গের ভেতর ফিরে গিয়ে ফাজিল খান জানালেন তাঁর বক্তব্য সম্রাটকে। শুনে তিনি উত্তর দিলেন: তার সাথে দেখা করতে আমি রাজী। বলুন গিয়ে দেখা করার জন্য সে দুর্গের ভেতর এলে স্বাগত জানান হবে তাকে। কিন্তু, ঔরঙজেব শাহ-জহানের চেয়েও বেশি ধারালো ও চতুর। ফাজিল খানকে তিনি জানালেন: দুর্গের ভেতরকার সৈন্যদের সরিয়ে যতক্ষণ না তাঁর সৈন্যরা তার ভার নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে সেখানে যাবার ঝুঁকি নেয়া। সঙ্গত কারণেই শাহজাদার মনে এই আশংকা দেখা দিয়েছিল যে দুর্গটিকে আপন দখলে নেয়ার আগে সেখানে প্রবেশ করলে তার পরিণতি তাঁর দিক থেকে খারাপ হতে পারে, করা হতে পারে সেই সুযোগে তাকে বন্দী। তাঁর সিদ্ধান্ত জানার পর, বাঞ্ছিত অন্য কোন পদক্ষেপ নিতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত সম্রাট মেনে নিলেন ছেলের দাবীই। তখন শাহ-জহানের সেনারা বেরিয়ে গেল দুর্গ থেকে। ঔরঙজেবের বড় ছেলে সুলতান মহম্মদের নেতৃত্বে তাঁর সেনারা দখল নিল দুর্গের। ছেলের প্রতি আদেশ দিলেন ঔরঙজেব সম্রাট পিতাকে এই সুযোগে বন্দী করার জন্য। দেখা করার জন্য শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় পিছিয়ে চললেন তিনি দিনের পর দিন দুর্গ মধ্যে নিজে প্রবেশ করার তারিখ। তাঁর জ্যোতিষীরা যখন এজন্য কোন শুভ দিন-ক্ষণের সন্ধান পেলেন না তখন আগ্রা থেকে চলে গিয়ে ঠাঁই নিলেন দু'তিন কোশ দূরে শহরতলির একটি বাড়িতে। জনসাধারণের মধ্যে বেশ অসন্তোষ খেলে গেল এর ফলে। তারা উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা ক'রে চলছিলেন সেই শুভক্ষণের যখন পিতার কাছে উপস্থিত হবে পুত্র, দূর হবে সব বিবাদ-বিসম্বাদ।

আসলে, ঔরঙজেবের এতটুকুও আগ্রহ ছিল না এ ধরনের দেখা-সাক্ষাতের জন্য। উল্টে, নিয়ে বসলেন তিনি অন্য এক বিসদৃশ সিদ্ধান্ত। শুরু করলেন পিতার ব্যক্তিগত খরচ-খরচায় নিয়ন্ত্রণ। দখল ক'রে নিলেন, দারা শিকো তড়ি-ঘড়ি পালিয়ে যাবার বেলা সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারা যত যা অবশিষ্ট রাজকীয় ধন-সম্পদ। বোন বেগম সাহিব গভীর ভালবাসতেন তার সম্রাট পিতাকে। তাই সে যাতে পিতার কাছেই থাকতে পারে, তাকে সঙ্গ দিতে পারে, রাখলেন এজন্য তাকেও দুর্গে আবদ্ধ ক'রে। পিতার ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে তিনি যত যা ধন-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছিলেন, নিলেন তাও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে।

আপন ছেলের কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার লাভের আভাস পেয়ে পালিয়ে যাবার এক অসফল প্রয়াসও করলেন শাহ-জহান। যে-সব রক্ষীরা তাকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে এল, হত্যাও করলেন তাদের জনাকয়েককে। এ সংবাদ পেয়ে তাকে আরো নিবিড়ভাবে বন্দী ক'রে রাখার নির্দেশ দিলেন ঔরঙজেব। অতি আশ্চর্যের বিষয়, এই বিরাট সম্রাটের একজন সেবকও এগিয়ে এল না তাকে মদত দেয়ার জন্য এ পরিস্থিতিতে। শাহ-জহান বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তার সব প্রজারা যেন ভুলে গেল তার কথা, মুছে ফেলল তাকে তাদের স্মৃতির কুঠুরী থেকে। সকলেরই চোখ ফেরানো যেন নতুন সূর্যের দিকে। সম্রাট রূপে চেনে না, জানে না যেন তারা ঔরঙজেব ছাড়া আর কাউকেই। যদি কচিৎ কেউ তার দুর্ভাগ্য দেখে ব্যথা অনুভব করেছে? ভয় নির্বাক ক'রে রেখেছে তাদের। হীনতম উপায়ে বাধ্য করা হয়েছে তাদের, যে সম্রাট পিতার মতো পালন করেছেন তাদের, করেছে কোমল ব্যবহার যা সম্রাটদের চরিত্রে বিরল, পুরোপুরি বর্জন করতে তাকে। কোন আমীর তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে যদিও সম্রাট যথেষ্ট রূঢ় হয়েছেন তার ওপর, কিন্তু জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য ক'রে দিয়েছিলেন তিনি সব রকম সুব্যবস্থা। তারা যথেষ্ট ভালবাসত তাকে। অথচ এই সঙ্কটের বেলা তার কোন পরিচয় কিন্তু দেয়নি তারা। ফলে গভীর বিষাদের মধ্যেই বন্দী-শালায় তার শেষ দিনগুলি অতিবাহিত ক'রে গেছেন এই মহান সম্রাট; সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ১৬৬৬ অব্দের শেষ নাগাদ (প্রকৃতপক্ষে ২২শে জানুয়ারী, ১৬৬৬)। ওই সময়ে ভারতে আমি আমার শেষবারের পর্যটনে ব্যস্ত। জহানাবাদ শহরটি নির্মাণ শুরু করেছিলেন তিনিই। এখনও শেষ হয়নি তা। মৃত্যুর আগে একবারটির জন্য তিনি দেখতে চেয়েছিলেন শহরটিকে। কিন্তু এজন্য, যে তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে তার সেই পুত্র ঔরঙজেবের অনুমতি

প্রয়োজন। সেখানে তাকে যেতে দিতে একটুকুও অনিচ্ছা ছিল না তার। এমনকি যতদিন তিনি চান ততদিন জহানাবাদে তাকে থাকতে দিতেও ছিল না তার কোন আপত্তি। তবে, আগ্রার মতোই থাকতে হবে তাকে সেখানকার দুর্গে বন্দী অবস্থায়। আর, যদি তিনি নৌকায় ক'রে সেখানে যেতে রাজী থাকেন, ফিরতে রাজী হন জহানাবাদের প্রাসাদে যমুনার বুকে পড়ে থাকা চিত্রিত ও অলংকৃত ছোট নৌকাগুলির একটিতে—তবেই। স্থলপথে হাতিতে চেপে তাকে ভ্রমণের সুযোগ দিতে একেবারেই রাজী ছিলেন না ঔরঙজেব। তার আশংকা ছিল, পাছে তার পিতাকে দেখে জনসাধারণ বিদ্রোহ জাগায় তার পক্ষ নিয়ে। আর তিনি নিজেই যদি তাতে নেতৃত্ব দিয়ে বসেন, তবে এদেশের লোক যেরূপ মতি পরিবর্তনশীল, তাতে হয়তো পেয়ে যাবেন তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ। পুত্রের কঠোর মনোভাব দেখে, সে যে এভাবে তাকে নিঃশেষ করার জন্য উদগ্রীব তা উপলব্ধি করতে পেরে, ত্যাগ করলেন জহানাবাদ দেখার আকাঙ্খা শাহ-জহান। পুত্রের এরূপ ক্রূর মনোভাবে তিনি এত মর্মাহত হলেন যে তা-ই তাকে দ্রুত এগিয়ে দিল মৃত্যুর দিকে।

পিতার মৃত্যু খবর পৌঁছন মাত্র আগ্রায় উপস্থিত হলেন ঔরঙজেব। দখল ক'রে নিলেন প্রয়াত সম্রাটের যে রত্নসম্ভার তার জীবদ্দশা কালে তিনি কেড়ে নেননি সেগুলি। কিছু মূল্যবান রত্ন ছিল বেগম সাহিবেরও। দুর্গে বন্দী করা কালে সেগুলি তার কাছ থেকে নিয়ে নেননি তিনি। শুধু তার সিন্দুক ভরা প্রচুর সোনা রূপা দখল ক'রেই তুষ্ট হয়েছিলেন তখন। এবার তার রত্নসম্ভার দেখে ঔরঙজেবের মনে সুদৃঢ় হল তার সম্পর্কে পোষণ ক'রে আসা সন্দেহ। তার এই বোন, বেগম সাহিবের সাথে শাহ-জহানের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এরূপ এক ধারণা চালু ছিল আগে থেকেই। এ সত্বেও তিনি তার বোনের সাথে সম্মান ও সমাদর পূর্ণ ব্যবহার ক'রে এমন এক পন্থায় সেগুলি হস্তগত করলেন যাকে, মোটেই অন্যায় বা অযুক্তিকর বলা চলে না বাহ্যিকভাবে। তবে, তাকে আর আগ্রায় রাখলেন না তিনি, স্থানান্তরিত করলেন জহানাবাদে। যখন দরবারের লোকজনদের সাথে তিনি আগ্রা ছেড়ে সেখানে যান তখন যে হাতিটির পিঠে তিনি বসে ছিলেন সেটিকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। বাঙলা থেকে ফেরার পথে আমি তখন আগ্রায়। এর অল্পকাল মধ্যেই খবর ছড়াল, মারা গেছেন বেগম সাহিব। আর পৃথিবী শব্দ সকলেরই ধারণা, বিষপ্রয়োগ ক'রেই এত দ্রুত সরানো হয়েছে তাকে। বেগম সাহিব বা জহান-আরা বেগম মারা যান আরো দীর্ঘকাল

পরে ১৬৮১-র ১৬ই সেপ্টেম্বর। সুতরাং বিষপ্রয়োগ ক'রে তাকে হত্যার এই খবর নিতান্তই গুজব।)

চার ॥ দারা শিকোর সিন্ধু ও গুজরাট অঞ্চলে পলায়ন : ঔরঙজেবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ : বন্দী দশা ও মৃত্যু

শাহ-জহানের হতভাগ্য সন্তানদের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের কোন্ পরিণামের দিকে ঠেলে দিল, দারা শিকোর ভাগ্যে কি ঘটল তা শোনাই এবার।

পিতার উপদেশ মতো আগ্রা দুর্গ থেকে তড়িঘড়ি যত যা পারলেন সোনা রূপা কুড়িয়ে নিয়ে দারা শিকো আশ্রয় নিলেন গিয়ে শেষ অবধি লাহোরে। ভাবলেন, নতুন ক'রে আবার এক সেনাবাহিনী গড়ে, ভাই ঔরঙজেবকে কাবু ক'রে, অল্প কালের মধ্যেই শক্ত ক'রে নেবেন আবার তিনি আপন পায়ের নিচেকার মাটি। এই চরম দুর্ভাগ্যের সময়েও তার অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুগামীরা অনুসরণ করে চললেন তাকে ছায়ার মতো। তার বড় ছেলে সুলেইমান শিকো রাজা রূপের* সঙ্গে ব্রতী হলেন তার রাজ্য থেকে সেনা সংগ্রহে। সৈন্যদের দ্রুত বাহিনীতে যোগদানে আকৃষ্ট করার জন্য সঙ্গে তখন তার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অর্থ রাজা রূপের লোভকে ক'রে তুলল অসামাল। করলেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা, হীন চক্রান্তের মাধ্যমে সে-অর্থ আত্মসাৎ। পাছে সে আরো ক্ষতি ক'রে কিংবা তাকেই বন্দী ক'রে বসে এই ত্রাসে সুলেইমান শিকো দ্রুত আশ্রয় নিলেন গিয়ে শ্রীনগর রাজ্যে রাজা নক্তি-রানীর** কাছে। তিনি করলেন আরও হীন বিশ্বাসঘাতকতা। তুলে দিলেন কিছু দিন পরেই তাকে ঔরঙজেবের হাতে।

* রাজা রূপ সিংহ ছিলেন কাশ্মীরের জম্মু পার্বত্য এলাকার জমিদার। দারা শিকো যখন লাহোরে সামরিক প্রস্তুতির দিকে মন দেন সে-সময়ে তিনি যোগ দেন তার পক্ষে। পরে ঔরঙজেব প্রলোভন দেখিয়ে দারার পক্ষ ত্যাগ করতে প্ররোচিত করেন তাকে। (**History of Aurangzib, Pt III, ii, 104** দেখুন)

** শ্রীনগরের রাজা ছিলেন এ-সময়ে পৃথ্বী শাহ। বিদ্রোহী প্রজাদের নাক কাটার অভ্যাসের জন্য তার পত্নী বিখ্যাত হয়ে ওঠেন নক্তি-রানী বা নাক-কাটি রানী নামে। এই শ্রীনগর গাড়োয়াল জেলার দেবলগড় পরগণায়।

দারা শিকো যখন দেখলেন, রাজা রূপ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্যান্য সঙ্গীসাথীরাও সবাই তাকে ত্যাগ ক'রে যোগ দিয়েছে ঔরঙ্গজেবের দলে, তখন লাহোর ত্যাগ ক'রে যাত্রা করলেন সিন্দ রাজ্যের দিকে। লাহোর-দুর্গ ত্যাগের পূর্বে সঙ্গে থাকা সমস্ত সোনা-রূপা ও রত্নসম্ভার শক্তিশালী রক্ষী বাহিনীর প্রহরাধীনে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ করলেন নদীপথে বুক্কুরে। বুক্কুর সিন্ধুনদের মাঝে থাকা একটি দ্বীপ। ক'রে নিলেন তিনি সেখানকার দুর্গটিকে দখল। সেখানে ধন-সম্পদ ও দুর্গ রক্ষার দায়িত্বে রাখলেন ছয় হাজার সৈন্য সহ তার এক খোজা (বসন্ত মেওয়াতী) কে। রেখে গেলেন দুর্গ অবরুদ্ধ হলে প্রতিরোধ ক'রে চলার মতো খাদ্য ও সমর সম্ভার। এরপর গেলেন তিনি সিন্দে। রেখে গেলেন সেখানে অনেকগুলি ভারি কামান। উপস্থিত হলেন কছনগন (কচ্ছ)-এর রাজার কাছে। তিনি তাকে অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ করলেন না কিছুই। গেলেন তখন সেখান থেকে গুজরাটে। সেখানে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা জানাল তাকে স্থানীয় অধিবাসীরা। স্বীকৃতি দিল তাকেই প্রকৃত সম্রাট ও শাহ-জহানের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী ব'লে। সেখান থেকে সব শহরে, এবং বিশেষ ক'রে সুরাটে ফরমান জারী করলেন তিনি। নিয়োগ করলেন সুরাটের জন্য একজন শাসনকর্তাও। সুরাট দুর্গটির রক্ষক ছিলেন এসময়ে মুরাদ বক্স নিযুক্ত জনৈক রাজা। তিনি কিন্তু স্বীকার ক'রে নিলেন না দারা শিকোর আধিপত্য। দৃঢ়ভাবে জানালেন, মুরাদ বক্সের লিখিত নির্দেশ ছাড়া তিনি কারো হাতে সমর্পণ করবেন না এ দুর্গ। একেবারে অটল হয়ে রইলেন তিনি আপন সিদ্ধান্তে। তাই দেখে, যাতে শহরের শাসনকর্তাকে কোন বিপদে ফেলতে না পারেন তার ব্যবস্থা নিয়ে, নিরুপদ্রবে তাকে থাকার সুযোগ দেয়া হল দুর্গের ভেতরে।

ইতিমধ্যে আহমদাবাদে দারা শিকো খবর পেলেন যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের আনুগত্য বর্জন করেছেন, উৎসুক তিনি তার পক্ষে যোগ দিতে। ইনি ছিলেন ভারতবর্ষের অতি শক্তিশালী রাজাদের একজন। দারা শিকোকে তিনি আমন্ত্রণও জানালেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য। দারা শিকোর সৈন্য ক্ষমতা বিরাট কিছু নয় এ-সময়ে। যখন তিনি আহমদাবাদ আসেন, সঙ্গী সেনার সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও কম। রাজার আমন্ত্রণে আস্থাবান হয়ে তাই করলেন দারা শিকো। উপস্থিত হলেন নির্দেশিত মিলন স্থল অজমীরে। ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে দেখা পাবেন রাজার। কিন্তু রাজা জয় সিংহের প্রচেষ্টায়

ইতিমধ্যে মতের পরিবর্তন ঘটালেন যশোবন্ত সিংহ। রাজা জয় সিংহ যশোবন্ত সিংহের চেয়েও বিক্রম ও প্রতিপত্তি-শালী রাজা। তার পরামর্শে আবার ফিরে গেলেন যশোবন্ত ঔরঙজেবের শিবিরে। মন দিলেন তারই স্বার্থ-সিদ্ধির দিকে। প্রতিশ্রুত তারিখে তিনি এলেন না তাই আর অজমীরে। পরে, যদিও বা এলেন সে শুধু হতভাগ্য দারা শিকোকে প্রবঞ্চনা করার জন্য। পরস্পরের মুখোমুখি হল দু ভাইয়ের সেনাবাহিনী। শুরু হল যুদ্ধ। চলল তা তিন দিন ধরে। কিন্তু যুদ্ধের মাঝে যশোবন্ত সিংহ করলেন দারা শিকোর সাথে পরিকল্পিত ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা। তার পক্ষ ত্যাগ ক'রে ভিড়লেন গিয়ে ঔরঙজেবের দিকে। দারা শিকোর সেনারা হয়ে পড়ল তা দেখে ভগ্নোৎসাহ, শুরু করল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে। (এ যুদ্ধ হয়েছিল অজমীরের দক্ষিণে দেওরাই গিরিপথে। ১৬৫৯-এর এপ্রিল মাসে।) উভয় বাহিনীরই প্রচুর রক্ত ঝরে এ-যুদ্ধে। ঔরঙজেবের শ্বশুর শাহ নওয়াজ খানের মৃতদেহ পড়েছিল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-প্রান্তরেই। মারা পড়ে দু'পক্ষের কম করেও আট-ন হাজার ক'রে সেনা। জখমীদের সংখ্যা এর চেয়েও বেশি। দারা শিকোর নেই তখন আর কোন সহায়-সম্বল। ভাগ্যও তার সব উদ্যমে সব আশায় ছাই ঢেলে চলেছে ক্রমাগত। শেষে যদি নিজেও বন্দী হন শত্রুর হাতে এই ত্রাসে করুণ পরিস্থিতি ও যান-বাহনের চরম অসুবিধার মধ্যে আপন পত্নীদের, সন্তানদের কতকক ও অতি বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে গেলেন তিনি পালিয়ে। যখন আহমদাবাদের কাছাকাছি তখন ওই পথ ধরে মহাপ্রতাপী মুঘলদের দরবার দর্শনের জন্য আগ্রায় চলেছেন মঁসিয়ে বার্নিয়ার। ইনি একজন ফরাসী চিকিৎসক। যেমন আপন প্রতিভার জন্য, তেমনি তার আকর্ষণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্য লাভ করেছেন অধুনা তিনি ভুবন জোড়া খ্যাতি। দারা শিকোর এক পত্নীর একটি পা তখন এরিসিপেলাস (বাতবিসর্প রোগ)-এ আক্রান্ত। হাতের কাছেই একজন পারদর্শী ইওরোপীয় চিকিৎসক আছেন খবর পেয়ে দারা শিকো ডেকে পাঠালেন তাকে। মঁসিয়ে বার্নিয়ার এলেন তার শিবিরে। মহিলাটির রোগ পরীক্ষা ক'রে দিলেন তাকে ওষুধ। দ্রুত ভাল হয়ে গেলেন তিনি। বিড়ম্বিত বাদশাজাদা অতি খুশী হলেন তার ওপর। জোর পীড়াপীড়ি করলেন চাকুরী নিয়ে তার কাছে থাকার জন্য। মঁসিয়ে বার্নিয়ারও হয়ত রাজী হয়ে যেতেন তার প্রস্তাবে। কিন্তু সেই রাতেই খবর এল, আহমদাবাদের প্রশাসনভার যার ওপর দারা শিকো রেখে যান তিনি তার সেনাদলের আবাসন-অধ্যক্ষকে অনুমতি দেননি শহরে প্রবেশের।

ঘোষণা করেছেন ঔরঙজেবের প্রতি আনুগত্য। ফলে, বাধ্য হলেন দারা শিকো সেই রাতের আঁধারেই দ্রুত ছাউনি তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে। নয়তো কে জানে আবার কোন্ নতুন বিপদ এসে আছড়ে পড়ে মাথায়, মুখোমুখি হতে হয় না জানি আবার নতুন কোন বিশ্বাসঘাতকতার। এগিয়ে চললেন সিন্দের দিকে।

পারস্যে চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হলেন দারা শিকো সিন্দে। সেখানে তাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে চলেছেন দ্বিতীয় শাহ আব্বাস। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেনা ও অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্যের। পাছে নতুন ধরনের কোন বিপত্তি ঘটে এই আশঙ্কায় চাইলেন না বাদশাজাদা অনিশ্চিত সাগর পথ ধরে সেখানে যাবার ঝুঁকি নিতে। ভাবলেন, স্থলপথ ধরে যাওয়াই হবে তার ও তার পরিবারবর্গের পক্ষে অধিক নিরাপদ। কিন্তু তবুও ঠকতে হল তাকে। কন্দহার-গামী সড়কপথ ধরে পাঠানদের বাসভূমি পার হবার কালে তার সাথে অতি জঘন্যতম ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল সেখানকার এক গোষ্ঠীপ্রধান জুঁই খান। (মালিক জীবন আই-যুব, যার প্রকৃত নাম জিহন্দ। বোলান গিরিপথের নিকটবর্তী দাদর অঞ্চলের আফগান। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হয় তাকে বখতিয়ার খান উপাধি)। তিনি ছিলেন তার সম্রাট পিতারই এক কর্মচারী। অপরাধের দরুন তিনি দিয়েছিলেন একে হাতির পায়ের নিচে দলিত হয়ে মৃত্যুর সাজা। তখন, এই দারা শিকোর হস্তক্ষেপের ফলেই রক্ষা পেয়েছিল তার জীবন। এই বেদনাকর ঘটনার পূর্বে জুঁই খানের গৃহে পৌঁছবার আগেই এক পদাতিক সংবাদ বাহকের মুখে পেলেন তিনি আরেকটি মর্মান্তিক বার্তা। যে পত্নীকে তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন, যিনি তার এই দুর্ভাগ্যকর জীবন-অধ্যায়ে সর্বদা তার সাথী ছিলেন, তারই মৃত্যুর খবর (এর নাম নাদিরা বেগম। দাদর যাবার পথে ডায়েরিয়ায় মৃত্যু হয় তার)। পথে গলা ভেজাবার মতো এক ফোঁটাও জল না পেয়ে গরমে ও তৃষ্ণায় ছটফট করে মারা গেছেন তিনি। এ খবর শুনে নিদারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গী-সাথীদের প্রচেষ্টায় যখন চৈতন্য ফিরে পেলেন, শোকের উচ্ছ্বাসে ফেললেন আপন দেহের পোশাক ছিঁড়ে ফালি ফালি ক'রে। এটা পূব জগতের এক অতি প্রাচীন প্রথা। পুত্র অবসলোমের মৃত্যু-খবর পেয়ে ডেভিড এভাবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন আপন পোশাক।

ভাগ্য-বিড়ম্বিত বাদশাজাদা এতকাল অটল ভাবে মুখোমুখি হয়েছেন প্রতিটি দুর্ভাগ্যকর পরিস্থিতির। এই প্রথম দেখা গেল শোকে উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়তে

তাকে। সঙ্গী-সাথীরা শত প্রবোধ দিয়েও পারল না তাকে শান্ত করতে। পরলেন তিনি শোকের পোশাক। মাথায় উষ্ণীষের পরিবর্তে জড়ালেন এক টুকরো মোটা কাপড়। এই পোশাকেই উপস্থিত হলেন তিনি বিশ্বাসঘাতক জুঁই খানের গৃহে। সেখানে ঘুমোবার জন্য পেতে দেয়া হল তাকে একটি খাটিয়া। ঘুম থেকে উঠেই মুখোমুখি হলেন তিনি আরেক পরম দুর্ভাগ্যের। জুঁই খান বন্দী করতে চেয়েছিলেন তার দ্বিতীয় (প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়) ছেলে সিপিহর শিকোকেও। কিন্তু বালক হয়েও সে সাহসের সঙ্গে বাধা দিল তার এই অপপ্রয়াসকে। তীরের আঘাতে ঘায়েল করল তিন তিন জনকে। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে প্রতিরোধ ক'রে চলা সম্ভব হল না তার মতো এক বালকের পক্ষে একা একা! যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে বাধা দিতে না পারে সেজন্য চক্রান্তকারীরা আগেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল বাড়িটির সবকটি দরজা। বালক শাহজাদাকে বন্দী করতে গিয়ে এর ফলে যে গোলমালের সৃষ্টি হল তারই দরুন ঘুম ভেঙে গেল দারা শিকোর। পিছমোড়া ক'রে হাত বাঁধা অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে এল তারা তার দিকে। সে-দৃশ্য দেখে মর্মাহত পিতার এতটুকুও দেরি হল না প্রকৃত পরিস্থিতি, চক্রান্তের হীন স্বরূপটি বুঝে নিতে। নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না তিনি আর বিশ্বাসঘাতক জুঁই খানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: 'সেরে ফেল, সেরে ফেল, তোমার যা করার তা চটপট সেরে ফেল হতচ্ছাড়া অকৃতজ্ঞ শয়তান! জানি, ভাগ্য এখন আমাদের প্রতি বিমুখ, ঔরঙ্গজেবের অন্যায় লালসার এখন আমরা শিকার। তবে, মনে রেখ, একদিন তোমার জীবন না বাঁচালে, এভাবে মরতে হত না আজ আমায়। এ কথাও ভুলে যেও না, যে-রাজবংশের রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত সে-বংশের কোন সন্তানকে বাঁধেনি এর আগে আর কেউ এভাবে পিছমোড়া ক'রে।' তার এ ধরনের মন্তব্য কিছুটা বিচলিত ক'রে তুলল জুঁই খানকে। নির্দেশ দিলেন তিনি শিশু শাহজাদার বাঁধন খুলে দিতে। রাখলেন দুজনকেই তখন শুধু সতর্ক প্রহরার ঘেরে। 'দারা শিকো ও তার অনুগামীদের বন্দী করা হয়েছে' পাঠানো হল তাড়াতাড়ি এই মর্মে রাজা যশোবন্ত সিংহ ও আবদুল্লা খানের কাছে বার্তা। দারা শিকোর সঙ্গে থাকা ধন-সম্পদ কবজা করার জন্য তারা ছুটে এলেন দ্রুত। কিন্তু তার আগেই জুঁই খান যথেষ্ট অবসর পেয়ে গেছলেন তার যা-কিছু মহামূল্যবান সম্পদ আত্মসাৎ ক'রে নেয়ার। তার পত্নীবর্গ ও সন্তানদের সাথেও করলেন তিনি চরম বর্বরের মতো আচরণ। রাজা ও আবদুল্লা খান সেখানে পৌঁছে দারা শিকো ও সিপিহর শিকোকে একটি

হাতিতে এবং পত্নীবর্গ ও অন্য সন্তানদের আরেকটি হাতিতে চাপিয়ে নিয়ে এলেন জহানাবাদ। (রাজা যশোবন্ত সিংহ ও আবদুল্লা খানের কাছে নয়, জয়পুরের কচ্ছোয়া অধিপতি জয় সিংহ এবং বহাদুর খানের কাছে অর্পণ করা হয় দারা শিকোকে। ১৬৫৯-এর ২৩শে অগাষ্ট দিল্লী আনা হয় তাকে; শহর মধ্যে ঘোরানো হয় ২৯শে। যদুনাথ সরকার ও বার্নিয়ার দেখুন।)

সেপ্টেম্বরের ন' তারিখে শহরে আনা হল দারা শিকোকে। যাকে একদিন সম্রাটের আসনে দেখবেন বলে ভেবেছিলেন সকলে, তাকে দেখার জন্য ভেঙে পড়ল শহর শুদ্ধু লোক। তাকে যে সত্যিই বন্দী করা হয়েছে এ বিষয়ে সর্ব-সাধারণকে সংশয়মুক্ত করার জন্য, ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ ক'রে যেন তিনি নিজেকে মসিলাঞ্ছিত করেছেন এমন এক ভাব দেখাবার জন্য ঔরঙজেবের নির্দেশে ঘোরানো হল তাকে জহানাবাদের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে ও সমস্ত বাজার এলাকাগুলিতে। বন্দী-আবাস রূপে নির্বাচন করা হল আসীর দুর্গ (মধ্য প্রদেশের নীমার জেলার আসীরগড় দুর্গ)। এসময়ে যারা ভিড় জমিয়েছিল তাকে দেখার জন্য, তাদের মধ্যে অনেকেই জানতেন, ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্রাট হবার কথা তারই। এমনকি তখনও মনে মনে চাইছিলেন তাকেই সম্রাটের আসনে দেখতে। এ সত্ত্বেও তাদের কারোরই সাহস হল না তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার। পূর্বে এই বাদশাজাদার অধীনে কাজ করতেন ও প্রচুর উপকৃত হয়েছেন এরূপ কতক প্রশস্ত-মনা সৈনিক-ই শুধু যা উন্মুখ হলেন তার প্রতি তাদের আনুগত্যের পরিপ্রকাশ ঘটাতে। যাদের হাতে তিনি বন্দী তাদের কাছ থেকে মুক্ত করার মতো ক্ষমতা না থাকায় তারা তাদের ক্ষোভের আগুন মেটাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বাসঘাতক জুঁই খানের ওপর। সাময়িকভাবে ওই সময়ে তাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা হলেও অল্পকালের মধ্যেই গুণতে হল তাকে আপন কৃতকর্মের মাশুল। এক অরণ্যের ভেতর দিয়ে যখন তিনি আপন দেশে ফিরে আসছিলেন তখন হত্যা করা হল তাকে।

তুখোড় রাজনীতিক এবং অসাধারণ ছলনা-দক্ষ হয়েও ঔরঙজেব চতুর্দিকে প্রচার ক'রে বেড়ালেন দারা শিকোকে বন্দী করা হোক এরকম কোন নির্দেশ তার পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি কখনো। তিনি শুধু চেয়েছিলেন পিছু তাড়া ক'রে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হোক এ সাম্রাজ্য-সীমা ছেড়ে বাইরে চলে যাবার জন্য। কিন্তু দারা একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না তাতে। অসঙ্গত পন্থায় তাকে বন্দী করার, রাজরক্তের প্রতি সমীহ না দেখিয়ে লজ্জাকর ভাবে তার পুত্র কিশোর শাহজাদা

সিপিহর শিকোর দুহাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধার সমস্ত দায় জুঁই খানের। এ জন্য কোন রাজনির্দেশ ছিল না তার প্রতি। তার এই জঘন্য কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে সম্রাটের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ। কঠোর দণ্ড পাবার যোগ্য অপরাধ। জুঁই খান ও তার সহযোগীরা আংশিকভাবে সে শাস্তিভোগ করেছে নিজেদের প্রাণ খুইয়ে। ঔরঙজেবের নির্দেশে প্রচারিত এই কাহিনী নিঃসন্দেহে সাধারণের চোখে ধুলো দেয়ার এক ফিকির। সত্যিই যদি রাজরক্তের প্রতি তার এত শ্রদ্ধা, বড় ভাইয়ের ওপর এত টান, তবে কখনোই তিনি হুকুম দিতে পারতেন না তার শিরশ্ছেদ করার। অথচ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই করলেন তিনি সে-কাজ। আর তা পালনও করা হল অবিলম্বে।

নির্বাচিত বন্দী আবাসে দারা শিকোকে নিয়ে যাবার জন্য কঠোর প্রহরার মধ্যে ত্যাগ করা হল জহানাবাদ। পথে থামল সকলে একটি মনোরম স্থানে। দারা ভাবলেন এবার করা হবে তার জন্য বিশ্রামের, ঘুমোবার ব্যবস্থা। পরিবর্তে, গড়া হল সেখানেই তার শিরশ্ছেদ শিবির। তিনি আহার সমাধার পর, মৃত্যুর আদেশ শোনানোর জন্য এলেন তার কাছে সইফ খান। এই সইফ খান ছিলেন ইতিপূর্বে দারা শিকোরই কর্মচারী। তাকে দেখে উৎফুল্ল স্বরে অভ্যর্থনা জানালেন দারা শিকো, বললেন: তার অতি বিশ্বস্ত সেবকদের একজনকে দেখার সুযোগ পেয়ে তিনি আজ ভারী খুশী। সইফ খান উত্তর দিলেন: একদিন তিনি তার সেবক ছিলেন একথা সত্য হলেও বর্তমানে তিনি ঔরঙজেবের গোলাম। তিনি তাকে আদেশ করেছেন তার (দারার) মুণ্ড নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হবার জন্য। মরতে হবে তাহলে আমাকে? জিজ্ঞাসা ফোটালেন দারা। 'সম্রাটের আদেশ সেই রকমটিই': উত্তর ঝরালেন সইফ খান: 'আর, সে আদেশ তামিল করার জন্যই আমি এসেছি এখানে।' সিপিহর শিকো তখন ঘুমোচ্ছিলেন তাঁবুর মূল কক্ষটির লাগোয়া একটি কুঠুরিতে। এই কথাবার্তায় ভেঙে গেল তার ঘুম। সাথে সাথে উদ্দাম হয়ে উঠলেন তিনি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্রের কতক ছিনিয়ে নিয়ে পিতাকে রক্ষা করতে ছুটে আসার জন্য। কিন্তু সইফ খানের সঙ্গীরা আটকে দিল তাকে। দারা শিকোও আত্মরক্ষার জন্য কিছুটা উদ্যম করলেন প্রথমে। কিন্তু তা বৃথা বুঝে শান্ত হয়ে গেলেন পরে। একটু অবকাশ ভিক্ষা করলেন শুধু প্রার্থনা জানানোর জন্য। মঞ্জুর করা হল তা। সরিয়ে নেয়া হল সিপিহর শিকোকে সেখান থেকে। করা হতে থাকল তাকে ভোলাবার জন্য নানা প্রয়াস। আর সেই ফাঁকে এক ক্রীতদাস দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল তার মুণ্ড। সইফ খান

বয়ে নিয়ে গেলেন তা ঔরঙজেবের কাছে।* ভাইয়ের শিরশ্ছেদের ফলে সিংহাসনে তার স্থিতি সুদৃঢ় হল ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। এই রক্তাক্ত বিয়োগ নাটিকার পর শোকাহত সিপিহর শিকোকে নিয়ে যাওয়া হল গোয়ালিয়র দুর্গে। রাখা হল কাকা মুরাদ বক্সের সাথে একত্রে সেখানে। দারার পত্নীবর্গ ও কন্যারা ঠাঁই পেলেন ঔরঙজেবের হারেমে।

পাঁচ ॥ ঔরঙজেবের সিংহাসন দখল ও নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা: সুলতান শুজার পলায়ন

মুঘল সিংহাসনে আপন আসন পুরোপুরি পাকা করার জন্য ঔরঙজেবের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল এবার কি করে বাঙলায় শিকড় গেড়ে বসা অবশিষ্ট ভাই সুলতান শুজাকে সরিয়ে দেবেন এ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। আগ্রার দুর্গে ঔরঙজেব বন্দী ক'রে রাখা সম্রাট পিতা শাহ-জহান-কে মুক্ত করার জন্য সুলতান শুজা তখন সমর সজ্জা ক'রে চলেছেন সেখানে।

পিতা শাহ-জহান ও ছোট ভাই মুরাদ বক্সকে বন্দী এবং সিংহাসনের ন্যায়-সঙ্গত উত্তরাধিকারী দারা শিকোকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার পর সক্রিয় হয়ে উঠলেন ঔরঙজেব নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণার জন্য। ভাগ্য তার অনুকূলে, রয়েছেন তার পিছে সাম্রাজ্যের সব আমীররাও। চলিত প্রথা অনুযায়ী এ ধরনের উৎসবে আনুষ্ঠানিক ভাবে বসতে হয় একটি সিংহাসনে। সে সিংহাসন তৈরি

* বার্নিয়ার জানিয়ে গেছেন, দারা শিকোকে রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল প্রথমে গোয়ালিয়র দুর্গে। কিন্তু ঔরঙজেব আহূত পরিষদ রায় দিল তার মৃত্যুর সপক্ষে। তদনুসারে তার শিরশ্ছেদ করা হয় পুরানো দিল্লীর খিজরাবাদের কারাগারে। এ ঘটনাকাল ১৬৫৯-এর জুলাই মাস। বার্নিয়ারের বিবরণ অনুযায়ী তার হত্যাকারী ছিলেন নজর বেগ নামের এক ক্রীতদাস। সইফ খানের নির্দেশ মতো এ কাজ করে সে। ঔরঙজেবের ষোড়শ রাজ্যবর্ষে গোয়ালিয়রের বন্দীশালা থেকে মুক্তি দেয়া হয় সিপিহর শিকোকে। তার সাথে বিয়ে দেয়া হয় ঔরঙজেবের কন্যা বদর-উন-নিসার।

করার জন্য প্রয়োজন হল না দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করার। কেননা, অবিস্মরণীয় তৈমুর লঙ শুরু ক'রে যাওয়া সিংহাসনটি সম্রাট শাহ-জহানই সম্পূর্ণ ক'রে রেখেছিলেন বন্দী হবার আগে। এ যাবৎ পৃথিবীতে যত সিংহাসন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে অপূর্ব, সবার চেয়ে মূল্যবান সে-সিংহাসনটি। কিন্তু সিংহাসনে অভিষেকের জন্য প্রয়োজন প্রধান কাজীর সম্মতি, তিনিই ঘোষণা ক'রে থাকেন নতুন সম্রাটের নাম। প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হল এদিকটি নিয়েই। তার অভিসন্ধির সরাসরি বিরুদ্ধতা করলেন প্রধান কাজী। বলে বসলেন, মহম্মদের অনুশাসন ও প্রাকৃতিক বিধি দুই-ই সমান ভাবে পিতা বেঁচে থাকা যাবৎ পুত্র-কে সম্রাট রূপে ঘোষণার বিপক্ষে। তার ওপর, পিতার পর যিনি সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেই বুড় ভাইকে হত্যা করার দরুনও হারিয়েছেন তিনি সিংহাসনে বসার যোগ্যতা। প্রধান কাজীর এ জাতীয় বলিষ্ঠ প্রতিরোধ সমস্যার মধ্যে ফেলে দিল ঔরঙজেবকে। আপন উদ্দেশ্য-কে ন্যায় ও ধর্ম সম্মত রূপ দেবার জন্য ডাকলেন তিনি উলেমা বা ধর্মবেত্তাদের এক সম্মেলন। জানালেন: রোগ ও বার্ধক্যের ভারে জরজর হয়ে পড়ার দরুন পিতা রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম। ভাই দারা শিকো (ইসলাম) ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন না বলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তাকে। মদিরার প্রতি আসক্ত ছিলেন তিনি, করতেন কাফেরদের আনুকূল্য। এই যুক্তি এবং নিপীড়ন ভীতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তার ডাকা 'বিবেক পরিষদ' রায় দিলে যে তিনি সাম্রাজ্য লাভের উপযুক্ত, উচিত হবে তাকেই সম্রাট রূপে ঘোষণা করা। প্রধান কাজী এ সত্বেও অটল রইলেন তার সিদ্ধান্তে। অতএব দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্নকারী রূপে প্রধান কাজীকে তার পদ থেকে সরিয়ে, রাজ্যের কল্যাণ ও ন্যায়-ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় উৎসাহী অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সে আসনে বসানো ছাড়া রইল না সমাধানের দ্বিতীয় আর কোন পথ। তাই করা হল তৎপরতার সঙ্গে। পরিষদ এজন্য যাকে নির্বাচন করলেন তাকেই এবার নিয়োগ করলেন সে পদে ঔরঙজেব। আর, ঔরঙজেবের এই মহানুভবতার প্রতিদান স্বরূপ তিনিও ১৬৬০ অব্দের ২০শে অকটোবর সম্রাট রূপে ঘোষণা করলেন তার নাম। (জামা) মসজিদে এই নাম ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে আসীন হলেন তিনি সিংহাসনে। রাজ্যের সব অভিজাতরা অভিনন্দন জানালেন তাকে। জহানাবাদে মহা ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হল এ উৎসব। ওই সাথে রাজ্যের সর্বত্র নির্দেশ জারী করা হল এই অভিষেক উৎসব পালনের জন্য। অতি জাঁকজমকের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্যের সর্বত্র পালন করা হল তা।

(ট্যাভারনিয়ারের দেয়া অভিষেক তারিখটি সঠিক নয়। দু'দুবার সিংহাসনে অভিসিক্ত হন ঔরঙজেব। একবার সাধারণ ভাবে, আরেকবার ব্যাপক অনুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রথমবারের অভিষেক হয়, দারা শিকোকে সামোগড়ের যুদ্ধে হারিয়ে পালাতে বাধ্য করার এবং মুরাদ বক্স ও শাহ-জহানকে বন্দী করার পর ১৬৫৮-র ২১শে জুলাই। দ্বিতীয়বার, সুলতান শুজার বিরুদ্ধে খজুহা-য় ও দারার বিরুদ্ধে দেওরাই-তে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর জয়লাভের পর ১৬৫৯-র ৫ই জুন। দারাকে বন্দী ও তার শিরশ্ছেদ দ্বিতীয় অভিষেকের পরবর্তী ঘটনা। যদুনাথ সরকার দেখুন। প্রধান কাজী কর্তৃক বিরোধিতার যে বিবরণ এখানে দেখা হয়েছে তা কিন্তু অন্য কোন সূত্র থেকে সমর্থিত হয় না।)

দ্বিতীয় ভাই সুলতান শুজা-কে নির্মূল না করা পর্যন্ত কিছুতেই সুস্থির হতে, আপন সিংহাসন ও সাম্রাজ্যকে নিরাপদ মনে করতে পারছিলেন না ঔরঙজেব। সুলতান শুজা তখন শাহ-জহানকে মুক্ত করার জন্য বাঙলায় এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী সংগঠনে ব্যস্ত। প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই তাকে বাধা দেয়া সঠিক হবে ভেবে বড় ছেলে সুলতান মহম্মদের নেতৃত্বে পাঠালেন তার বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী ঔরঙজেব। সহকারী রূপে সঙ্গে দিলেন মীর জুমলা-কে। তিনি ছিলেন পারস্য থেকে এ পর্যন্ত ভারতে আসা সেনানায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যদি তিনি তার মনিবদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বর্জন ক'রে চলতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে উত্তরসূরীদের কাছে চিরপূজ্য হতে পারতেন তার তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি ও সাহসের জন্য। কিন্তু প্রথমে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন গোলকুণ্ডার রাজার সাথে। অথচ তার কাছে থেকেই পেয়েছিলেন তিনি অগাধ ঐশ্বর্যশালী হবার সুযোগ। এরপর করলেন শাহ-জহানের সঙ্গে। অথচ তার রক্ষাছত্রের নিচে থাকার দরুনই সে-সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি, পেরেছিলেন আরো সম্পদশালী হতে। সারা ভারতবর্ষে তার চেয়ে ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালী আমীর কেউই ছিলেন না আর।

সেনারা যেমন সমীহ করতেন মীর জুমলাকে, বাসতেন তেমনই আবার ভাল। সে-দেশে চলিত যুদ্ধের কলাকৌশলে ছিলেন তিনি অতি অভিজ্ঞ ও নিপুণ। শাহ-জহানকে বর্জন ক'রে ভিড়েছিলেন এসময়ে তিনি ঔরঙজেবের দলে। যদি এরূপ একজন সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ককে মোকাবেলা করতে না হত, তাহলে সুলতান শুজা যে ভাইকে অধিকতর বিপন্ন ক'রে তুলতেন, কোন সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। এমনকি, হতে পারতেন হয়ত এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীও। বারকয়েক

পরস্পরের মুখোমুখি হল দুই বাহিনী। জিতল কখনো এপক্ষ, কখনো ওপক্ষ। যুদ্ধ অনিশ্চিত ভাবে ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে দেখে সহকারীর পরামর্শে আপন সমর কৌশল পালটালেন সুলতান মহম্মদ। সুলতান শুজার ধ্বংস ত্বরান্বিত করার জন্য অস্ত্র-ক্ষমতার পাশাপাশি নিতে শুরু করলেন ছলনা ও কূট-কৌশলের শরণ। কাকার সেনাবাহিনীর নায়কদের অধিকাংশের সাথেই করলেন তিনি গোপন সম্পর্ক স্থাপন। লোভনীয় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোর প্রয়াস ক'রে চললেন তাদের ঔরঙজেবের পক্ষে ভেড়াবার জন্য। তাদের বোঝালেন ঔরঙজেবই হচ্ছেন ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শক্তিস্তম্ভ ও রক্ষক। টেনে আনলেন এভাবে অধিকাংশকেই আপন পক্ষে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার জন্য দিলেন প্রত্যেককে প্রচুর উপহারও। এই নীতি সুলতান শুজার বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করল একেবারে। ব্যর্থ হলেন তাদের এ নীতির আঁচ সামলাতে তিনি। তার বাহিনী ছিল প্রধানতঃ পেশাদার সৈনিকদের নিয়ে গড়া। এরা এমন এক শ্রেণীর লোক যারা যখন যার কাছ থেকে বেশি মিলবে তারই পক্ষে। তারা ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে এল, সুলতান শুজার কাছে বেশি কিছু আশা করা বৃথা। সে ক্রমে নিঃস্ব হবার পথে। ঔরঙজেবের পক্ষ নিলেই বরং অধিক লাভের সম্ভাবনা এখন। তার ভাগ্য বর্তমানে সব দিক থেকে অনুকূল, সাম্রাজ্যের সব ধন-সম্পদ এখন তারই মুঠোয়। ফলে ভাইয়ের সমগ্র সেনাবাহিনীকে ঘুষ খাইয়ে আপন দলে টানা কিছু কঠিন হল না ঔরঙজেবের পক্ষে। শেষ যুদ্ধ কালে সুলতান শুজা হতভম্ব হয়ে দেখলেন সেনারা সকলেই ত্যাগ করেছে তাকে। পত্নীদের ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পালানো ছাড়া আর কোন পথ রইল না তখন। বিশ্বাসঘাতকেরা, বুঝি নিজেদের হীনতায় লজ্জিত হয়েই, পিছু তাড়া করল না তাকে আর। অথচ সহজেই তা করতে পারত তারা। বরং তিনি পালিয়ে যেতে না যেতেই, হীন প্রবৃত্তি তাড়িত লোকদের মতো মেতে উঠল তারা তার পরিত্যক্ত শিবিরে হানা দিয়ে ফেলে যাওয়া তল্পিতল্পা লুটপাটে। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার রূপে তাদের তা করার অনুমতি দিলেন মীর জুমলা। সপরিবারে নৌকায় চেপে গঙ্গা পাড়ি দিলেন সুলতান শুজা। কিছুকাল পরে আশ্রয় নিলেন গিয়ে বাঙলার সীমান্ত পারের রাজ্য আরাকান-এ।

ছয় ॥ ঔরঙজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদ ও দারা শিকোর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেইমান শিকোর বন্দীদশা ঃ সুলতান শুজার শেষ পরিণাম

ঔরঙজেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে একজন বিরাট রাজনীতিক ব'লে। তিনি যে সত্যিই তাই কোন সংশয় নেই এতে। এ সত্ত্বেও তিনি কিন্তু দিয়েছেন নিজেকে প্রতারিত করার সুযোগ। বিশেষ ক'রে যিনি দু' দু'জন রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এরূপ এক জবরদস্ত সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে আপন ছেলের হাতে শক্তিশালী এক সৈনাবাহিনী তুলে দিয়ে। এরকমটি করার বেলা তার মনে এ ভাবনা দেখা দেয়া উচিত ছিল যে তার সাথেও তিনি করতে পারেন ওই একই ধরনের ব্যবহার। নিজে শাহজাদা অসংখ্য কু-কর্মের মধ্য দিয়ে পথ তৈরী ক'রে আসীন হয়েছেন সিংহাসনে। হটিয়েছেন সেখান থেকে পিতাকে, রেখেছেন তাকে বন্দী ক'রে। বড় দু'ভাইয়ের একজনকে বন্দী ক'রে করেছেন তার শিরশ্ছেদ, অন্যজনকে বাধ্য করেছেন পালিয়ে যেতে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই তিনি সদা সতর্ক ছিলেন পাছে তার নিজের ছেলেও তাই ক'রে বসে, বদলা নেয় এভাবে পিতামহের প্রতি তার আচরণের। তাই, যখুনি তার কাছে খবর এল সুলতান মহম্মদকে অস্বাভাবিক বিষাদ ও চিন্তামগ্ন দেখা যাচ্ছে তখুনি তিনি নিশ্চিতভাবে ধরে নিলেন, সে এখন মতলব এঁটে চলেছে তারই সর্বনাশের। এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি উন্মুখ হলেন মীর জুমলার কাছ থেকে এ সম্পর্কে কিছু হদিশ লাভের জন্য। তার কাছে লিখলেন: শুনতে পেলাম সুলতান মহম্মদ গোপন যোগাযোগ রচনা করেছিল তার কাকা সুলতান শুজার সঙ্গে। এক্ষেত্রে তাকে বন্দী ক'রে দরবা'রে পাঠিয়ে দেয়াই সঙ্গত হবে তার পক্ষে। পত্রটি আচমকা পড়ল গিয়ে সুলতান মহম্মদের এক রক্ষীর হাতে। দিল সে এনে সেটি শাহজাদাকে। বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়ে তিনি তখন চেপে দিলেন পত্রটিকে। তবে, মীর জুমলার কাছে হয়ত এ নিয়ে আরো পত্র দেয়া হয়েছে এবং তাতে হয়ত তার সম্পর্কে এর চেয়েও বিস্তারিত ভাবে সব নির্দেশাদি এসেছে এই আশঙ্কা থেকে তিনি আর নিরাপদ মনে করলেন না সেখানে থাকা। ঠিক করলেন, চুপি চুপি গঙ্গা পাড়ি দিয়ে ঠাঁই নেবেন গিয়ে কাকা সুলতান শুজার

কাছে। তার কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে অন্ততঃ পিতার চেয়ে ভাল ব্যবহার। অতএব তুললেন তিনি মাছ-শিকারে যাবার ধুয়ো। সেই ছলে দ্রুতগতি নৌকা তৈরি করিয়ে তাতে চেপে নিজের বেশ কিছু অনুগত কর্মচারী সহ হলেন কাকার ছাউনিতে উপস্থিত। তিনি তখন গঙ্গার অপর কূলে। ক'রে চলেছেন আরাকানে গিয়ে সেখানকার রাজার কাছে আশ্রয় নেয়ার চিন্তা-ভাবনা। এবং তারই ফাঁকে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে মন দিয়েছেন কতক সেনাদল গঠনে। কাকার কাছে পৌঁছে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন সুলতান মহম্মদ। চাইলেন পিতার আদেশে অনন্যোপায় হয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য মার্জনা। স্বীকার করলেন, পিতা যে অন্যায় পথে, অসৎ উপায়ে সিংহাসন দখল করেছেন সে-কথাও। এ হয়ত ঔরঙজেবের আবার এক নতুন ফিকির। হয়ত সুলতান মহম্মদকে এভাবে পাঠিয়েছে সে তার প্রকৃত পরিস্থিতি, শক্তি-সামর্থ্য ও ত্রুটি-দুর্বলাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য।—এ ধরনের সন্দেহ, যে সুলতান শুজার মনে উঁকি মারলো না, তা নয়। তবু সৎ ও উদার-চিত্ততার দরুন ভাইপোকে আশ্রয় দিলেন তিনি। কিছুদিন পর কাকা-ভাইপো একত্রে গঙ্গা পার হয়ে করলেন এক যুদ্ধ উদ্যম। অনেক দুর-বাধ পার হয়ে সদল ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঔরঙজেবের সেনাবাহিনীর ওপর। যথেষ্ট উদ্দীপনার সাথে আক্রমণ চালিয়ে করলেন তার বহু সেনাকে হত্যা। কিন্তু যখন দেখলেন, হতচকিত ভাব কাটিয়ে শত্রুপক্ষও শক্তভাবে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছে তখন শত্রুপক্ষকে যতটুকু ঘায়েল করা সম্ভব হয়েছে তাতেই খুশী থেকে আবার ফিরে গেলেন তারা গঙ্গার অন্য পারে। নইলে, শত্রুঘেরের মধ্যে পড়লে যখন খুশী আপন সুবিধা মতো মূল ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়া যাবে না, প্রধানতঃ এই আশংকা থেকেই করলেন এমনটি।

এদিকে ছেলের পালানোর খবর জানানো হ'ল ঔরঙজেবকে। তা শুনে মীর জুমলার ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হলেন তিনি। তবে, সাহস করলেন না সরাসরি মনোভাব প্রকাশ করতে। কে জানে তখন হয়ত সেও ধরবে ওই পথ! গোলকুণ্ডার রাজা এবং তার পিতা শাহ-জহানের সাথে যেমনটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, করবে তেমনটি হয়তো তার সাথেও। মীর জুমলাকে তাই শুধু তিনি লিখলেন : সুলতান মহম্মদ এখনো ছেলেমানুষ। তার এই পালানো যৌবন সুলভ উদ্দামতা ও গতানুগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি-চাতকতা ছাড়া কিছুই নয় আর। তাকে কি ক'রে পথে আনা যায় তার দায়িত্ব আপনার বিচক্ষণতা ও

কলাকৌশল ক্ষমতার ওপরই ছেড়ে দিলাম আমি। এভাবে মীরজুমলার প্রতি প্রকাশ্যে যে আস্থা ঔরঙজেব দেখালেন তা উদ্দীপিত ক'রে তুলল তাকে। সুলতান শুজার পক্ষ ত্যাগ ক'রে সুলতান মহম্মদ আবার যাতে পিতার দিকে ঢলেন, ঘর মুখো হন, সে-জন্য খাটিয়ে চললেন তিনি সবরকম কৌশল। সুলতান মহম্মদকে তিনি জানালেন, তার প্রতি লেশমাত্রও বিরূপতা পোষণ করেন না তার সম্রাট পিতা। তিনি সর্বদাই উদারভাবে তাকে তার বুকে ঠাঁই দিতে উন্মুখ। পিতার প্রতি অনুরক্তি ও আপন বিচক্ষণতার পরিচয় দেবার জন্য তার উচিত এক্ষেত্রে সুলতান শুজার কাছে তার অবস্থানকে পিতার উপকারে ব্যবহার করা। তা করলে পেতে পারবেন তিনি পিতার আরো বেশি ভালবাসা, অর্জন করতে পারবেন আরো বেশি আস্থা। ভ্রের এ টোপ সহজেই গিললেন সুলতান মহম্মদ। ঠিক যেভাবে একদিন তিনি কাকা সুলতান শুজার ছাউনিতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই একদিন ফিরে এলেন আবার পিতা ঔরঙজেবের সেনাছাউনিতে। মীর জুমলা সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। দেখালেন অপার খুশীর ভাব। পরামর্শ দিলেন, দেখা হতেই পিতাকে যেন তিনি বলেন, সুলতান শুজার কাছে গিয়েছিলেন তিনি শুধুমাত্র তার শক্তি সামর্থ্য ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে গোপনে খবরা-খবর সংগ্রহের জন্যই। এছাড়াও বললেন, এখন তার উচিত অবিলম্বে পিতার কাছে চলে যাওয়া, তার সেবার্থে কি কি তিনি করেছেন তা আনুপূর্বিকভাবে জানিয়ে সে-জন্য তার প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ করা। ঔরঙজেবেরও নির্দেশ ছিল ছেলেকে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয় তার কাছে। সুলতান মহম্মদ এরপর স্ব-ইচ্ছাতেই হোক কিংবা বাধ্য হয়েই হোক, রওনা হলেন জহানাবাদ। মীর জুমলার পাঠানো রক্ষী বাহিনীর সাথে উপস্থিত হলেন সেখানে। রক্ষীনায়ক সম্রাটের কাছে তার আগমন বার্তা জানালে ছেলের বাসস্থান বরাদ্দ করলেন তিনি আপন প্রাসাদের বাইরে। হস্ত-চুম্বনের জন্য তার কাছে আসারও অনুমতি দেয়া হল না তাকে। রক্ষী-নায়ককে বললেন, তাকে যেন জানানো হয় সম্রাটের দেহ এখন ভাল নেই। গোয়ালিয়র দুর্গে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সেই বাসস্থানেই রইলেন তিনি গৃহবন্দী হয়ে।

এবার শোনাই অভাগা দারা শিকোর বড় ছেলে সুলেইমান শিকোর ভাগ্যে কি ঘটল সেই কাহিনী।

আগেই জানিয়েছি, রাজা রূপের কাছে প্রতারিত হয়ে আশ্রয় নেন তিনি শ্রীনগরের রাজা নক্তি-রানীর কাছে। যাতে ঔরঙজেবের কবলে পড়তে না হয়

এজন্য সাহসী অথচ ভাগ্য-বিড়ম্বিত এই রাজকুমার অনন্যোপায় হয়ে কাটিয়ে চললেন সেখানকার পাহাড়ে-পর্বতে বন্য জীবন। ফলে সবরকম ভাবে চেষ্টা করেও সফল হলেন না ঔরঙ্গজেব তার কোন ক্ষতি করতে। অন্যদিকে, ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়ে শ্রীনগরের রাজাও তাকে নির্ভর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি রাজ্য হারাতে হয় তবুও তিনি তার আশ্রিতকে রক্ষা ক'রে চলবেন ঔরঙ্গজেবের পীড়নের হাত থেকে। যে পরিস্থিতিই দেখা দিক না কেন, কখনো ত্যাগ করবেন না তাকে। তিনি যে অকপট-শুদ্ধ চিত্তে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সে-সম্পর্কে সুলতান সুলেইমান শিকোকে নিশ্চিন্ত করার জন্য আপন রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটিতে স্নান ক'রে বিশুদ্ধ হয়ে, তিনি যে দেবতাবর্গের অনুগামী তাদের সাক্ষী রেখে, করলেন অপিন অঙ্গীকার পাঠ। এরপর তাকে অবিশ্বাস করার আর কোন কারণ দেখতে পেলেন না সুলেইমান শিকো। নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যেতে রইলেন শিকারে। আর সঙ্গী-সাথীরাও তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা ক'রে চলল তার মনোরঞ্জন করতে, তাকে আমোদ প্রমোদের ভেতর ডুবিয়ে রাখতে।

রাজা নক্কিরানী যাতে সুলেইমানকে তার হাতে তুলে দেন সেজন্য তাকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব আদেশ দিলেন তার সেনাদলকে পার্বত্য শ্রীনগর অঞ্চল অভিযানে। কিন্তু পাহাড় ঘেরা এই রাজ্যের গিরিপথগুলি যথেষ্ট দুর্গম ও সংকীর্ণ হওয়ায় রাজা মাত্র হাজার সেনা নিয়েই সমর্থ হলেন সেগুলি রক্ষা করতে, মুঘলদের লক্ষ সেনাকে ঠেকিয়ে রাখতে। ফলে ব্যর্থ হল ঔরঙ্গজেবের সব প্রয়াস। অস্ত্র শক্তি দিয়ে রাজাকে কাবু করা সম্ভব নয় দেখে নিলেন ছলনা ও কূট কৌশলের পথ। চেষ্টা করলেন প্রথমে মিষ্টি কথা ও প্রলোভনে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজাকে বশে আনতে। কিন্তু বিফল হলেন তাতে। রাজা কিছুতেই রাজী হলেন না তার শপথ ভাঙতে। তাছাড়া রাজ্যের পুরোহিতরাও তাদের পূর্বাভাসের দ্বারা রাজাকে এই বিশ্বাসের বশবর্তী ক'রে তুলেছিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই রাজ্য-হারা হবেন ঔরঙ্গজেব, সুলেইমান শিকোই হবেন সম্রাট। এ কারণেও তার সঙ্গে অতি সদয় ও আন্তরিক ব্যবহার ক'রে চলছিলেন রাজা।

এবার ভিন্ন নীতি ধরলেন ঔরঙ্গজেব। করলেন বাণিজ্য অবরোধ। ফলে পাহাড় পর্বত সংকুল এ রাজ্যটির অধিবাসীরা বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, পড়ে গেলেন বিষম সঙ্কটে। না পারেন নিজেদের উৎপাদন বাইরে বেচতে না পারেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় বাইরে থেকে আমদানি করতে। দেখা দিল রাজ্য

জুড়ে ক্ষুব্ধ গুঞ্জন, সুলেইমান শিকোকে আশ্রয় দেয়া নিয়ে অসন্তোষ। আখ্যা দিলেন রাজার এ ক্রিয়াকলাপকে তারা জনস্বার্থ বিরোধী বলে। রাজ্যের পুরোহিতদের মনেও সংশয় দেখা দিল নিজেদের উচ্চারিত ভবিষ্যৎ-বাণীর যথার্থতা নিয়ে। তাকে বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয় মনে করলেন এবার তারা। এগিয়ে গেলেন শেষ অবদি সকলে তারা হতভাগ্য শাহজাদার ধ্বংসের পথ সুগম ক'রে দেয়ার জন্য। আর, সে কর্মটি সুসম্পূর্ণ করলেন দারার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতাকারী, রাজা যশোবন্ত সিংহ (প্রকৃতপক্ষে রাজা জয় সিংহ)। তিনি রাজা নক্তি-রানীর কাছে গোপনে দূত পাঠিয়ে পরামর্শ দিলেন তাকে নিজের ও রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে ঔরঙজেবের দাবি মেনে নিয়ে তার হাতে সুলেইমান শিকোকে অর্পণ করার জন্য। রাজা যশোবন্ত সিংহের (জয় সিংহের) এ পরামর্শ নিদারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল রাজা নক্তি-রানীকে। তিনি যে দেবতাদের সাক্ষী রেখে সুলেইমানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপন রাজ্য এবং প্রাণের বিনিময়েও তাকে রক্ষা ক'রে চলার। অথচ সে প্রতিশ্রুতিকে আঁকড়ে থাকলে রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়ার, রাজ্যভ্রষ্ট হবার মতোই পরিস্থিতি এখন।

কি করবেন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে ডাকলেন তিনি ব্রাহ্মণদের নিয়ে এক পরামর্শ সভা। তারা রায় দিলে, রাজ্যের অধিবাসীদের ও তাদের ধর্মমতকে সুরক্ষার দায়িত্ব তারই। ঔরঙজেব মুসলমান, ভিন্নধর্মী। তিনি যদি এ রাজ্য দখল ক'রে নেন তবে বিপন্ন হবে প্রজাদের ধন, জীবন, ধর্ম সব কিছুই। যে শাহজাদার জীবন রক্ষা ক'রে কোন সুফলেরই অধিকারী হবেন না তিনি তার পরিবর্তে জীবন ও ধর্ম রক্ষা করাই তার পরম কর্তব্য। এ পরামর্শ সভা বসল ও তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সুলেইমান শিকোর সম্পূর্ণ অজান্তে। তাই, তিনি তখন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। রাজা নক্তি-রানী আপন মর্যাদা ও বিবেক উভয় রক্ষাকল্পে রাজা যশোবন্ত সিংহের দূতকে জানালেন, শাহজাদার সাথে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তবে ঔরঙজেব নিজ প্রচেষ্টায় তাকে বন্দী করলে আপত্তি নেই তার। অন্ততঃ সে-রকম পদক্ষেপ নেয়া হলে রক্ষা পায় তার নিজের (রাজার) মান-মর্যাদা, সুনাম। আর, করা যেতে পারে এটি অতি সহজেই। তার রাজ্যের কতক নির্দিষ্ট পাহাড়ী এলাকায় নিয়মিত শিকার করতে যান সুলেইমান। ওই সময়ে সামান্য কিছু লোক মাত্র সঙ্গে থাকে তার। সুতরাং যশোবন্ত সিংহ নিজে সেনা পাঠিয়ে অনায়াসে বন্দী করতে পারেন তাকে, অর্পণ করতে পারেন ঔরঙজেবের হাতে।

এই গোপন উত্তর পেয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহ (জয় সিংহ) তার পুত্র (রাম সিংহ)-র ওপর চাপালেন সুলেইমান শিকোকে এইভাবে বন্দী করার পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব। করা হল তা। হাজির করা হল বন্দী সুলেইমান শিকোকে জহানাবাদে। ঔরঙজেবের সম্মুখে তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন: 'কেমন লাগছে এখন?' সুলেইমান উত্তর ফাটালেন: 'আপনার হাতে বন্দী হলে যেমনটি লাগার কথা। পিতার ভাগ্যে যে ব্যবহার জুটেছে প্রত্যাশা করি না তার চেয়ে ভিন্নরকম কিছু।' শুনে ঔরঙজেব জানালেন, ভয় পাবার কিছু নেই। প্রাণ নেয়ার কোন ইচ্ছে নেই তার। সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এ বিষয়ে। এরপর ঔরঙজেব জানতে চাইলেন সুলেইমান যে ধন-রত্ন তার সঙ্গে নিয়েছিলেন কি হয়েছে তার? সুলেইমান জানালেন: তাকে উচ্ছেদ করার সৌভাগ্য অর্জনের প্রয়াস করতে গিয়ে ব্যয় হয়েছে তার একাংশ সেনা সংগ্রহ ও সমর-সজ্জার পেছনে। একাংশ আত্মসাৎ করেছে কুখ্যাত প্রতারক ও লোভী রাজা রূপ (সিংহ)। আর, বাকিটা হাতিয়ে নিয়েছে বিশ্বাসহন্তা রাজা নকি রানী, তাকে রক্ষা করার আশ্বাস ও পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েও, হীন প্রতারকের মতো তাকে শত্রু-পক্ষের হাতে তুলে দেয়ার বেলা। ভাইপোর পরম নির্ভীকতা বিস্মিত ও অভিভূত ক'রে তুলল ঔরঙজেবকে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তার দু-চোখের দৃষ্টি তখন আচ্ছন্ন, ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেক ফাঁসীর দড়িতে ঝুলন্ত। সিংহাসনে আপন স্থিতিকে নিরঙ্কুশ করাই তখন তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তাই নির্দেশ দিলেন: পুত্র সুলতান মহম্মদ, ও ভাইপো সুলেইমান শিকোকে রাখা হোক তাদের কাকা মুরাদ বক্স ও অন্যান্য শাহজাদাদের সাথে একত্রে গোয়ালিয়র দুর্গে। ১৬৬১-র ৩০শে জানুয়ারী পালন করা হল সে আদেশ।

(ঔরঙজেব ও সুলেইমানের মধ্যে এই জানুয়ারী ১৬৬১-তে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতকারের অপর এক বিবরণের জন্য বার্নিয়ার ও মানুচি দেখুন। আফিংয়ের বীজ বা পোস্ত খাইয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়া হয় তাকে। ১৬৬২-র মে মাসে ৩০ বছর বয়সে মারা যান সুলেইমান।)

ঔরঙজেবের পায়ে বিঁধে থাকা কাঁটা রূপে রইল এবার শুধু সুলতান শুজা। জীবিত থাকলেও তখন তিনি করুণ পরিস্থিতির মধ্যে। আশ্রয় নিয়েছেন গিয়ে আরাকানের রাজার কাছে। পারেন তবুও তিনি যে-কোন সময়ে সঙ্কটের

সৃষ্টি করতে। তাই, এ কাঁটাটিকে তুলে না ফেলা পর্যন্ত কিছুতেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ঔরঙজেব।

এদিকে শুজা যখন দেখলেন কোন দিক থেকেই কোনরকম সাহায্য-সহায়তা লাভের আশা নেই আর, পড়লেন তিনি হতাশ হয়ে। ঠিক করলেন, চলে যাবেন তীর্থ করার জন্য মক্কায়। তারপর পারস্যে উপস্থিত হয়ে নেবেন সেখানকার শাহের কাছে আশ্রয়। কিন্তু এ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে মোচা পর্যন্ত সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য দরকার একটি জাহাজ। ভাবলেন, আরাকান কি পেগু যে কোন দেশের একজন রাজা এজন্য নিশ্চয়ই তাকে যুগিয়ে দেবেন তা। কিন্তু তাদের কারোরই যে খুব জাঁকজমক ক'রে সাজান সরু ও চ্যাপ্টা ধরনের আধ-গ্যালি জাতীয় নৌকা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন জাহাজ নেই, রাখতেন না তিনি সে-খবর। এগুলি ব্যবহার করা চলে শুধু যা নদীতেই তাই ত্যাগ করতে হল শেষ পর্যন্ত তাকে সে পরিকল্পনা। বাধ্য হলেন আগের মতো আরাকানের পৌত্তলিক রাজার কাছেই থেকে যেতে। আপন নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্য চাইলেন তিনি তখন রাজার এক কন্যাকে বিয়ে করতে। রাখা হল তার সেই অনুরোধ। জন্মাল সেই রাজকুমারীর গর্ভে একটি ছেলেও তার। কিন্তু এর ফলে শ্বশুর ও জামাইয়ের সম্পর্ক অধিক অন্তরঙ্গ না হয়ে বাঁক নিল বিদ্বেষ ও বৈরিতার দিকে। সে-রাজ্যের যে-সব অভিজাত ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিলেন সুলতান শুজার প্রতি, তারা সক্রিয় হয়ে উঠলেন এই সুযোগে রাজার মন বিষিয়ে তুলতে। তাকে তারা বোঝালেন, রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রে, তার গর্ভে পুত্র-সন্তান লাভ ক'রে সুলতান শুজা এখন সুযোগ খুঁজে চলেছে কি ক'রে তাকে হটিয়ে সে নিজেই বসবে এ রাজ্যের সিংহাসনে। রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রে চলছিলেন কতক মুসলমানও। সেদিকে অঙ্গুল নির্দেশ ক'রে রাজাকে তারা আরো বোঝালেন যে ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় জিগির তুলে শাহজাদা স্বচ্ছন্দে এদের সংঘবদ্ধ ক'রে চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে সরিয়ে দখল ক'রে নিতে পারে আরাকানের সিংহাসন। রাজা সহজেই বিশ্বাস করলেন এদের কথা। এ সন্দেহ যে একেবারে অকারণ তা বলা চলে না অবশ্য। সুলতান শুজার কাছে ছিল তখন পর্যন্ত বেশ কিছু সোনার মুদ্রা এবং প্রচুর রত্নপাথর। তারই একাংশ খরচ ক'রে আরাকান রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু লোককে হাত ক'রে ফেলেছিলেন ইতি-মধ্যেই তিনি। এ ছাড়াও ছিল বাঙলা থেকে তার সাথে আসা অনুগামীদের

মধ্যে যারা সে-পর্যন্তও ছিলেন তার কাছে। এরাও সংখ্যায় প্রায় দুশো জনের মতো। এদের সবাইকে সংঘবদ্ধ ক'রে চরম দুঃসাহসীর মতোই সক্রিয় হয়েছিলেন তিনি আরাকান রাজ্যের সিংহাসন দখলের এক পরিকল্পনায়। তার এই বেপরোয়া মনোভাব আসলে কিন্তু আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুঞ্জীভূত হতাশারই এক বিস্ফোরণ।

ঠিক হয়ে গেল পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার দিনক্ষণও। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ওই দিন জোর ক'রে প্রাসাদের ভেতর ঢুকে রাজ পরিবারের সবাইকে নির্মূল ক'রে করবেন তিনি নিজেকে আরাকান রাজ্যের অধিপতি রূপে ঘোষণা। কিন্তু ঠিক আগের দিনটিতেই ফাঁস হয়ে গেল এই বিরাট ষড়যন্ত্র। ফলে সুলতান শুজা ও তার পুত্র বান্তু-র সুমুখে রইল না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায়। ছুটলেন তারা পেগুর দিকে, সেখানকার রাজার কাছে আশ্রয় নেয়ার আশায়। আকাশছোঁয়া দুরারোহ পর্বতমালা, বাঘ-সিংহে ভরা গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হল তাদের। নেই স্বাভাবিক পথ-ঘাটও। ফলে, পদে পদে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হলেন তারা। এদিকে শত্রুপক্ষও পিছু নিল অল্পক্ষণের মধ্যে। পিতাকে সপরিবারে নিরাপদে পালাবার সুযোগ তৈরি ক'রে দেয়ার জন্য, যদি শত্রুপক্ষ পিছু তাড়া করে তাহলে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য, সুলতান বান্তু ছিলেন তার অনুচরদের নিয়ে সকলের পিছে। প্রথম বিপক্ষ দলটিকে বাধা দিলেন তিনি বিক্রমের সঙ্গে। কিন্তু আক্রমণকারীরা দলে ভারি হওয়ায় বেশিক্ষণ রোখা সম্ভব হল না। তার দুই ছোট ভাই, মা এবং বোনদের সাথে বন্দী হলেন তিনি আরাকান সেনাদের হাতে। রাখা হল দুর্ভাগা পরিবারটির সবাইকে জেলে বন্দী ক'রে। করা হতে থাকল অতি রুক্ষ ও নির্মম ব্যবহার। কিছুদিন বাদে রাজা ঝুঁকলেন সুলতান বান্তু-র বড় বোনকে বিয়ে করার দিকে। ফলে, করা হল আগের কঠোরতাকে শিথিল, দেয়া হল কতক সুযোগ সুবিধা, তুলনামূলক স্বাধীনতা। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশিদিন সইল না তাদের। কর্মতৎপর ও উচ্চাকাঙ্খী বান্তু অধীর হয়ে উঠলেন চটপট আপন ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। করলেন রাজাকে উচ্ছেদের আশায় নতুন এক চক্রান্ত। কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে ব্যর্থ হল সে উদ্যম। রাজা হলেন এবার চরম বিরূপ। নিশ্চিহ্ন করলেন পুরো পরিবারটিকে। এমনকি নিজের যে কন্যার সাথে সুলতান শুজার বিয়ে দিয়েছিলেন ও এ-সময়ে গর্ভবতী ছিলেন, তাকেও।

পালানোর কালে সুলতান শুজা ছিলেন অন্য সবার আগে আগে। তার

ভাগ্যে যে কি ঘটল সঠিকভাবে জানা যায় না তা। এ সম্পর্কে এত কাহিনী চালু রয়েছে যে কোনটি ঠিক তা বলা শক্ত। তবে, ঘটনায় মিল না থাকলেও সব বিবরণীই একমত যে তিনি বেঁচে নেই আর। হয়, পিছু নেয়া আরাকান সেনাদের হাতে, নয়তো ঐ সব দেশের অরণ্যে থাকা অগণ্য বাঘ-সিংহের থাবার ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে খুইয়েছেন আপন প্রাণ।

(কতক লেখকের বিবরণ অনুযায়ী একটি কনোই বা নৌকায় চাপিয়ে নদীপথে নিয়ে আসা হচ্ছিল তাকে। পথে উলটে যায় নৌকাটি। তাকে সেভাবে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিয়ে বন্দীকারীরা অন্য একটি নৌকায় উঠে প্রাণ বাঁচায় ও ফিরে আসে তখন। ডাচদের বিবরণ অনুযায়ী মগদের খপ্পরে প'ড়ে প্রাণ হারান তিনি। মুসলমানদের সূত্রে পাওয়া যায় না এ সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত বিবরণই।)

দীর্ঘ ছ বছর কাল ধরে চলা বিখ্যাত এই (গৃহ) যুদ্ধের যতটুকু যা বিবরণ জানা ও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে এতক্ষণ শোনালাম তা। সুরাট, আগ্রা, জহানাবাদ বা বাঙলা যেখানেই গিয়েছি, শোনার সুযোগ হয়েছে এ বৃত্তান্ত এমন সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে যারা প্রত্যক্ষদর্শী, প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির বেলা উপস্থিত ছিলেন ঘটনাক্ষেত্রে। আর, প্রত্যেকের বিবরণ মধ্যেই ছিল ঐক্য, শোনাননি কেউ ভিন্নতর ধরনের কোন বিবরণী। তাছাড়া, এর কতকাংশের প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেও।

সাত ‖ ঔরঙ্গজেবের রাজ্যারম্ভ : পিতা শাহ-জহানের মৃত্যু

ভাই দারা শিকোকে নিশ্চিহ্ন করার পর কি ভাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন ঔরঙজেব পঞ্চম পরিচ্ছেদে শুনিয়েছি সে ইতিবৃত্ত। সেই অভিষেক অনুষ্ঠানের আগে আরো এমন কতক ঘটনা ঘটে যা শোনানোর মতো। এখানে বলা যাক তার কিছু কিছু।

অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন-কতক আগে সব চক্ষুলজ্জা ত্যাগ ক'রে শাহ-জহানকে আপন শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন ঔরঙজেব। ওই সাথে জানালেন, আর দিন কয়েক পরেই তার অভিষেক অনুষ্ঠান। ওই উপলক্ষে ব্যবহার করার জন্য যদি তিনি

অনুগ্রহ ক'রে তার কাছে থাকা রত্নালঙ্কারের কতক দেন ভাল হয় খুব। বংশীয় অপরাপর সম্রাটদের মতো জাঁকজমকের সাথে লোকসমুখে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় তার পক্ষে তাহলে। পিতা যে মোটেই ভাল ভাবে নেবেন না এ প্রস্তাব ঔরঙজেব ভাল করেই জানতেন তা। শাহ-জহানও জ্বলে উঠলেন তার এ দাবির কথা শুনে। কারাগারে অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে অপমান করছে ছেলে, এটাই ধরে নিলেন তিনি। দিন কয়েক উন্মাদের মতো অবস্থা হল তার, এমনকি দেখা দিল মৃত্যুর আশঙ্কা। এই মানসিক অবস্থার মধ্যে থেকে থেকে হাঁক দিয়ে চললেন তিনি হামান-দিস্তা এনে দেয়ার জন্য। বলে চললেন: যাতে তার মূল্যবান মণি মুক্তা রত্নালঙ্কারগুলি ঔরঙজেব হাত করতে না পারে তাই গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ফেলবেন সে-সব। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো তার কাছে কাছে থাকা বড় মেয়ে বেগম সাহিব (জহান-আরা বেগম) পা ধরে মিনতি ক'রে চললেন তাকে শান্ত হবার জন্য, ওই ধরনের চরম পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য।* উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার দরুন তার ওপর পূর্ণ প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা রাখতেন বেগম সাহিব। করলেনও রত্ন আভরণগুলিকে চুর-বিচুর করার সংকল্প থেকে তাকে নিরস্ত। তবে, একদিন এগুলি পেয়ে তার পরম শত্রু ভাই তার প্রতি তুষ্ট হবে এ মনোভাব থেকে কিন্তু এগুলি রক্ষা করলেন না তিনি, করলেন বরঞ্চ নিজে সেগুলি পাবার আশায়। যাই হোক, (পিতা কোন রত্নালঙ্কার না দেয়ার ফলে) ঔরঙজেব আর বহু-রত্ন-বিভূষিত হয়ে বসতে পারলেন না সিংহাসনে। পরেছিলেন শুধু যা একটিই রত্ন এবং সেটিও শোভা পাচ্ছিল তার টুপিতে। তবে, তিনি যদি সত্যিই রত্ন-বিভূষিত হয়ে সিংহাসনে বসতে চাইতেন তাহলে কিন্তু মোটেই অভাব হত না তার। পিতার রত্নসম্ভার তিনি চেয়েছিলেন শুধু সেগুলিকে স্থায়ীভাবে আপন অধিকারে আনার মতলব নিয়েই। পারস্যের বিবরণে আগেই আমি জানিয়েছি, মাথায় পরে থাকা তার ওই টুপিটিকে রাজমুকুট বলা চলে না আদপেই। এ কারণে এই সিংহাসন, আরোহণ অনুষ্ঠানকেও দেয়া চলে না অভিষেক আখ্যা।*

---

*রত্ন আভরণ সম্পর্কে বার্নিয়ারের বিবরণ কিছুটা অন্যরকম। তিনি জানিয়েছেন, 'সে আবার সেগুলি চাইলে তাকে দেয়ার আগে তিনি সেগুলি হাতুড়ি দিয়ে চুর-চুর করে ফেলতে দ্বিধা করবেন না—এরূপ কথা বললেও পরে আবার আপনা থেকেই তার কতক পাঠিয়ে দেন তার কাছে।' শেষে, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহ-

(টুপিতে যে-রত্নটি থাকার কথা ট্যাভারনিয়ার বলেছেন সেটি খুব সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভাগ—১১ পরিচ্ছেদ, ২৩ পরিচ্ছেদ এ বর্ণিত টোপাজটি। বার্নিয়ারও বলে গেছেন এটির কথা।)

সিংহাসনে আসীন হবার সাথে সাথে বর্জন করলেন ঔরঙজেব গমের রুটি, মাছ ও মাংস। জীবন ধারণ ক'রে চললেন শুধু যবের রুটি, শাক সবজি ও মিঠাই খেয়ে। ত্যাগ করলেন সবরকমের মাদক পানীয়ও। যে অগুণতি অপরাধ তিনি করেছেন তারই প্রায়শ্চিত্ত কল্পে তার এই কৃচ্ছ্র সাধনা। রাজ্য বা ক্ষমতা ভোগের আকাঙ্খা কিন্তু এতটুকুও শিথিল হয়নি তার এ সত্বে। বরং সিংহাসন বর্জন না করে যতক্ষণ দেহে জীবন আছে ততক্ষণ তা আঁকড়ে থাকতেই যেন সংকল্পবদ্ধ তিনি।

সম্রাটের আসনে ঔরঙজেবের স্থিতি পাকা হতে, সারা এসিয়া সে সংবাদ জানার পর-শুরু হল বিভিন্ন দেশের রাজা-সুলতানদের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য জহানাবাদে রাজদূত পাঠানোর পালা। আগ্রহ দেখালেন তারা তার সঙ্গে সহযোগিতা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য। সবার আগে দূত পাঠা'লো উজবেগ তাতাররা। তারপর মক্কার শরীফ, হাইমন (ইয়েমেন) ব অ্যারাবিয়া ফেলিক্সের রাজা, বসরার রাজা, ইথিওপিয়ার রাজা প্রভৃতি। ডাচরাও পাঠালেন তাদের সুরাটের ফ্যাক্টরীর প্রধান নির্দেশক মঁসিয়ে অ্যাড্রিক্যানকে (ডিরক ভন এড্রিকেন, ১৬৬২-৬৫)। অতি শিষ্ট ব্যবহার করা হল তার সাথে। ইওরোপীয়দের প্রতি সম্ভ্রমের মনোভাব থেকে দ্রুত ডাকা হল তাকে সাক্ষাতকারের জন্য। ভারতের এই সম্রাটদের ধারণা, বেশিদিন ধরে তাদের দরবারে বিদেশীদের উপস্থিতি সম্রাটের গৌরব-গরিমা বৃদ্ধির সহায়ক। প্রথামতো এইসব রাজদূতেরা তাদের আপন আপন দেশের দুর্লভতম নানা সামগ্রী উপহার দিলেন ঔরঙজেবকে। তিনিও প্রথম থেকেই চাইছিলেন সারা এসিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক তার সুখ্যাতি। সুতরাং দূতেরা যাতে পরিপূর্ণ সন্তোষ নিয়ে দেশে ফিরে যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে করলেন না কোনরকম অবহেলা।

জহানের মৃত্যুর পর আগ্রায় তার হারেমে ঔরঙজেব উপস্থিত হলে একটি বড় সোনার পাত্র ভরাট রত্ন-সম্ভার তাকে উপহার দেন বেগম সাহিব। থিভেনট-ও দিয়ে গেছেন বার্নিয়ারের মতো একই বিবরণ। তিনি আরো জানিয়েছেন, ময়ূর সিংহাসনটিও কারাগারে শাহ-জহানের কাছেই ছিল ওই সময়ে। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়।

শাহ্-জহানের মৃত্যুর মাসকতক পূর্বে পারস্যে দূত পাঠালেন ঔরঙজেব। প্রথমে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানানো হল তাকে। প্রথম একমাস ভোজ ও শিকার প্রমোদ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথা শোনা গেল না কোথাও। তার মনোরঞ্জনের জন্য প্রতি রাতেই করা হল বাজী পোড়ানোর ধূম। মহাপ্রতাপী মুঘল-সম্রাটের পক্ষ থেকে যেদিন রাজদূতের উপহার সামগ্রী অপর্ণের কথা, সেদিন অতি মনোহর সাজ-পোশাকে সেজে সিংহাসনে আসন নিলেন পারস্যের শাহ। গ্রহণ করলেন রাজদূতের দেয়া সামগ্রীগুলি। তারপর তাচ্ছিল্যভরে বিলিয়ে দিলেন সব তার প্রাসাদ কর্মচারীদের মধ্যে। রেখে দিলেন একমাত্র যা ৬০ ক্যারেটের মতো ওজনের একখণ্ড হীরে। কিছুদিন পর শাহ ডেকে পাঠালেন রাজদূতকে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর জানতে চাইলেন তিনি সুন্নী অর্থাৎ তুর্কীদের ইসলাম ধর্মীয় ধারার অনুগামী কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের তাৎপর্য যে কি তা আগেই বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি পারস্য বিবরণ প্রসঙ্গে। পারসিকরা যার অনুগামী সেই নবী আলীর বিরুদ্ধে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে রাজদূত বেশ চতুর ভাবেই উত্তর দিলেন এর। বললেন, মহামহিম শাহ-জহান তার নাম করণ করেছিলেন বওভাক খান অর্থাৎ মুক্ত চিত্তের অধিকারী। তিনি প্রচুর বদান্যতাও দেখিয়েছেন তার প্রতি। সম্মানিত করেছেন তাকে তার দরবারের প্রথম সারির কর্মচারীর পদ দিয়ে। শুনে জলন্ত ভঙ্গিমায় উক্তর ফোটালেন শাহ: "তবে তো দেখছি আপনি রীতিমতো একজন শয়তান চরিত্রের লোক। যিনি আপনাকে এত বদান্যতা দেখিয়েছেন তার বিপদের সময়ে করেছেন তাকেই ত্যাগ আপনি। ভিড়েছেন সেই স্বেচ্ছাচারীর দলে যে কিনা নিজের পিতাকে ক'রে রেখেছে কারাগারে বন্দী, রক্ত ঝরিয়েছে ভাই আর ভাইপোদের। তারপর প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এ কেমন কথা বলুন তো! কি করে তার স্পর্ধা হল 'আলমগীর ঔরঙশাহ বা যে রাজার অধিকারে সমগ্র পৃথিবী' এমন এক জাঁকালো উপাধি নেয়ার? (আলমগীর=বিশ্বজয়ী; ঔরঙজেব=সিংহাসনের শোভা)। এখন পর্যন্ত তো সে এক চিলতে ভূমিও জয় করেনি, যা কিছু কবজা করেছে সে তো খুন আর বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে।' তারপর আবার যোগ করলেন: 'ভাবাই যায় না আপনিও তার সেইসব পরামর্শদাতাদের একজন যে কিনা মন্ত্রণা দিয়েছে তাকে এত রক্ত ঝরাতে, ভাইদের প্রাণ নিতে, যার কাছ থেকে এত মান-সম্মান পেয়েছেন এত উপকার পেয়েছেন সেই পিতাকে জেলে কয়েদ ক'রে রাখতে। যে দাড়ি আপনার গালে শোভা পাচ্ছে নেই তা রাখার কোন যোগ্যতাই

আপনার।' এরপর শাহ সোজাসুজি আদেশ করলেন তাকে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলতে। সে দেশে এটিই হল চরম অপমান। শাহ যে তার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি রাজদূত। দেয়া হল ওই সঙ্গে তাকে চলে যাবার আদেশও। ঔরঙজেবের প্রতি উপহার স্বরূপ দেয়া হল তার সাথে ১৫০টি সরেস ঘোড়া, কতক সোনা ও রূপার কার্পেট, সোনার বুটিদার কিংখাব বস্ত্র, কতক মূল্যবান ও সুদর্শন কোমরবন্ধনী এবং আরো নানারকম সুদৃশ্য বস্ত্র-সম্ভার। এক কথায়, ঔরঙজেব তাকে যে পরিমাণ মূল্যের উপহার পাঠিয়েছিলেন দিলেন তাকে তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যের উপহার। তবে, ঔরঙজেবের পাঠানো উপহার সম্ভারও ছিল মূল্যের দিক থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি (টাকার?)।

বওভাক খান যখন দেশে ফিরে এলেন ঔরঙজেব তখন আগ্রায়। সেখানে পৌঁছে সম্রাটকে জানালেন সব বিবরণ। আপন রাজদূতের প্রতি শাহের এরূপ অপমানসূচক ব্যবহারের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন ঔরঙজেব। শাহের পাঠানো ঘোড়াগুলির কতক রাখার আদেশ দিলেন নগরীর কেন্দ্রস্থলে, কতক বিভিন্ন রাস্তার কিনারায়। শহরময় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন আলীর অনুগামীরা নজিস বা অপবিত্র না হয়ে চড়তে পারবে না এগুলির পিঠে। কেননা, এগুলি পাঠিয়েছেন এমন এক রাজা যিনি সত্য-ধর্মের অনুগামী নন, যার সঙ্গে সম্ভব নয় কোন রকম সম্পর্ক রাখা। এরপর দিলেন ঘোড়াগুলিকে হত্যা করার নির্দেশ। পুড়িয়ে ফেলা হল অন্যান্য উপহার সম্ভারও। দিলেন শাহকে কটু ভাষায় গালিগালাজও।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নাগাদ (প্রকৃত পক্ষে প্রথম দিকে, ২২শে জানুয়ারী) মারা গেলেন শেষমেষ শাহ-জহান। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন ঔরঙজেব। তার অপকর্মের জলন্ত নিদর্শন রূপে বর্তমান থেকে যে অহরহ তাকে বিঁধে চলছিল সে আপদ দূর হল এবার চিরকালের মতো চোখের সুমুখ থেকে। ক্ষমতা ভোগের সুখ আস্বাদনের সুযোগ এতদিনে পেলেন তিনি পূর্ণমাত্রায়। এর অল্পকাল পরেই বোন বেগম সাহিবকে ফিরিয়ে দিলেন তার পূর্ব সুযোগ সুবিধা, মর্যাদা। বর্ষণ করা হল তার ওপর 'বাদশাহ বেগম' আখ্যা-ও। তিনি যে অশেষ গুণশালিনী ছিলেন, ক্ষমতা ধরতেন সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন করার, কোন সন্দেহ নেই এতে। যদি (গৃহ) যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দেয়ার বেলা তার পিতা ও ভাইয়েরা তার ওপর নির্ভর করতে পারতেন, ঔরঙজেবের সাধ্যও ছিল না সম্রাটের আসনে বসে।

ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত তখন। অপর বোন রৌশন-আরা বেগম ঔরঙজেবকেই সমর্থন ক'রে চলেন পূর্বাপর। যেই খবর পেলেন ঔরঙজেব অস্ত্র ধারণে উদ্যোগী হয়েছেন অমনি পাঠিয়ে দিলেন তাকে সাহায্যের জন্য নিজের য-কিছু সোনাদানা। তার এই সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিদানে ঔরঙজেবও প্রতিশ্রুতি দেন তাকে শাহ বেগমের মর্যাদা দানের, তাকে এক সিংহাসনে বসার সুযোগ দেয়ার। সে কথা রাখেন তিনি। বরাবর অটুট ছিল তাদের এই গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক। তবে শেষবার যখন আমি জহানাবাদ গেলাম, শুনলাম তাদের সম্পর্কে দেখা দিয়েছে বর্তমানে কিছুটা শীতলতার আমেজ। এর কারণ যা শোনা গেল তা এরকমটি। গোপনে একজন সুদর্শন যুবককে আপন-মহল মধ্যে এনেছিলেন শাহজাদী। দিন পনের কুড়ি পর তার সঙ্গ লিপ্সার উষ্ণতা শীতল হতে যখন যুবকটিকে মহল থেকে বিদায়ে আগ্রহী হলেন, দেখা গেল সকলের অগোচরে, সম্রাটের অজান্তে সম্ভব নয় আর সেটি করা। দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাড়াতাড়ি তিনি তখন সম্রাটের কাছে খবর পাঠালেন যে একজন পুরুষ হারেম মধ্যে ঢুকে প্রবেশ করেছে তার মহলে। হয় চুরি না হয় তাকে খুনের মতলব নিয়েই যে একাজ করেছে সে কোন সন্দেহ নেই এতে। সুতরাং তার নিরাপত্তা বর্তমানে বিপন্ন। এদিন রাতে যে খোজা প্রহরীর দল প্রহরায় ছিল কঠোর শাস্তি দেয়া হোক তাদের এজন্য। খবর পেয়ে সম্রাট নিজে কতক খোজাকে নিয়ে ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। এই চরম পরিস্থিতির মধ্যে রক্ষা পাবার আর কোন পথ নেই দেখে বেচারা যুবকটি মহলের এক জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে বয়ে চলা নদীর বুকে।* তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটে এল চারিদিক থেকে তখন অজস্র লোক। হাঁক দিয়ে সম্রাট তাদের বললেন, লোকটির কোন ক্ষতি করা না হয় যেন। ধরে, উপস্থিত করা হোক তাকে প্রধান কাজীর কাছে। ব্যাপারটি নিয়ে এরপর কোন কথাই শোনা যায়নি আর। রমণীরা যে-হারেম মধ্যে জীবন কাটান সেখানে যে কত নাটকীয় অঘটন ঘটে চলেছে সে-কথা সহজেই কল্পনা ক'রে নেয়া যেতে পারে এ থেকে।

---

* বার্নিয়ারের বিবরণ অনুযায়ী খোজারা প্রাসাদ প্রাকারের ওপর থেকে নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তাকে। রৌশন-আরা সম্পর্কে যে সব কেচ্ছা কাহিনী ট্যাভারনিয়ার, বার্নিয়ার ও মানুচি শুনিয়ে গেছেন যদুনাথ সরকারের মতে সেগুলি নেহাৎই মিথ্যা রটনা।

আট ।। মুঘল সম্রাটের বার্ষিক ওজন উৎসব : তার সিংহাসন ও দরবারের অপূর্ব শোভা ও জাঁকজমক

চুকল সম্রাট (ঔরংজেব)-এর কাছে (রত্ন বেচা ও তাই নিয়ে) লেন-দেনের পর্ব (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন)। চলে যাবার বাসনা নিয়ে গেলাম এরপর বিদায় নিতে তার কাছে। ১৬৬৫-র নভেম্বরের পয়লা তারিখ সে-দিনটি। সম্রাট জানালেন তার রত্নের পুঁজি না দেখিয়ে যেতে দিচ্ছেন না আমাকে। অনুগতের মতোই সে দুর্লভ সম্মান অর্জনে রাজী হয়ে গেলাম আমি। ফলে সুযোগ ঘটে গেল আরো একটি অনুপম উৎসব প্রত্যক্ষ করার। শুরু হল সেটি নভেম্বরের চার তারিখে। আর চলল তা পাঁচ দিন ধ'রে। এ উৎসব সম্রাটের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। চলিত রয়েছে এ সময়ে সম্রাটকে ওজন করার প্রথা (হিন্দু প্রথার অনুকরণে এটি চালু করা হয় আকবরের আমল থেকে)। আগের বছরের তুলনায় ওজন যত বেশি বেড়েছে বলে দেখা যায়, খেলে যায় তত বেশি আনন্দের ঢেউ। ওজন সমাপ্ত হলে তিনি বসেন এসে সব থেকে মূল্যবান সিংহাসনখানিতে। এটির বর্ণনা এখুনি শোনাচ্ছি আপনাদের। আসেন তখন রাজ্যের যত অভিজাতেরা। জানান সম্রাটকে অভিবাদন, নিবেদন করেন নানা উপহার সামগ্রী। পাঠান তা প্রাসাদের মহিলারাও। আসে সুবাদার ও অন্যান্য উচ্চ মহল থেকেও। হীরা, চুনি, পান্না, সোনা ও রূপা, দামী দামী কার্পেট, সোনা ও রূপার বুটিদার কাজ করা কিংখাব ও অন্যান্য ধরনের মূল্যবান বস্ত্র, হাতি, উট, ঘোড়া—মেলে এরকম অসংখ্য ধরনের উপহার। সব মিলিয়ে তিন কোটি লিভরেরও বেশি (দু কোটি টাকা বা রুপিয়া)।

পাঁচদিনের এই উৎসবটির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় ৭ই সেপ্টেম্বর বা প্রায় দুমাস আগে থেকেই। পাঠককে এই প্রসঙ্গে অনুরোধ জানাব প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অক্ষরের রঙ-তুলি দিয়ে চিত্রিত করা জহানাবাদের প্রাসাদটিকে একবারটি কল্পনার দূর-দর্শনে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে। আরম্ভ করে দেয়া হয় প্রথমেই মণ্ডপ তৈরীর কাজ ওই প্রাসাদের ভেতরকার বিশাল দুই প্রাঙ্গণ 'পরে। তার মাঝ থেকে মহাকক্ষ পর্যন্ত মাথা তোলে তিনদিক খোলা মণ্ডপ। যে চাঁদোয়াগুলি দিয়ে ওই দুই অতি বিশাল মণ্ডপের মাথা আবৃত করা হয় সেগুলি সব সোনার

সুতো দিয়ে কারুকাজ করা লালরঙা মখমলের। এরূপ ভারি সে ছাউনি যে তা খাড়া রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় জাহাজের মাস্তুলের মতোই মোটা মোটা খুঁটি। তার কতক ৩৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। প্রথম প্রাঙ্গণে তৈরি মণ্ডপটিতে রয়েছে এরকম ৩৮টি খুঁটি। যেগুলি মহাকক্ষের কাছে সেগুলি ভুকাট মুদ্রার মতো মোটা সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। বাকিগুলি মোড়া ঠিক অমন মোটা রূপোর পাত দিয়ে। যে দড়িগুলির টানা দিয়ে এই স্তম্ভগুলিকে খাড়া রাখা হয়েছে, তৈরী সেগুলি বিভিন্ন রঙা সুতা পাকিয়ে। কতক তো মোটা মোটা কাছির মতোই। আগেকার বর্ণনাতেই জানিয়েছি, প্রথম প্রাঙ্গণটি দরদালান দিয়ে ঘেরা। দরদালানের লাগোয়া সারি সারি ছোট-কক্ষ। প্রাসাদ প্রহরা কালে আমীররা থাকেন এখানে। এক একজন আমীরের প্রহরার পালা টানা এক এক সপ্তাহ। যখন যে আমীরের পালা পড়ে তার অধীন সেনা ও হাতিযূথের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় দরবার এবং সম্রাটের বাস-মহল কিংবা তিনি বাইরে থাকলে তার তাঁবুর নিরাপত্তা রক্ষার। কর্তব্যরত আমীরকে খাদ্য যোগানো হয় তখন সম্রাটের পাকশালা থেকেই। যখন তা বয়ে আনা হয় তখন দূর থেকে তা চোখে পড়া মাত্র তিনি আনত হয়ে প্রতিবার হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ ক'রে তিন তিনবার কুর্নিশ জানান তাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান ওই সাথে সম্রাটের নিরোগ স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও শত্রুদমন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্যে। রাজ্যের অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই সব আমীররা এবং রাজবংশীয় কুমাররা সম্রাটকে প্রহরা দেয়ার সুযোগ লাভকে মনে ক'রে থাকেন বিরাট গৌরবের বলে। প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ ও পালা শেষে বিদায় নেয়ার বেলা পরেন তারা তাদের সেরা সাজ-পোশাক। হাতি-ঘোড়া-উটগুলিকেও সাজান মূল্যবান সাজ সরঞ্জামে। কতক উটের পিঠে বসানো থাকে একটি ক'রে ঘূর্ণায়মান কামান ও তার পিছে সেগুলি দাগার জন্য একজন ক'রে কামানচী। এই আমীরদের মধ্যে যারা একেবারে নিচু মর্যাদার, রয়েছে তাদের অধীনে অন্ততঃ দু-হাজার অশ্বারোহী। রাজবংশীয় কোন কুমার যখন প্রহরা দেন তার অধীনে থাকে তখন ছ-হাজার পর্যন্ত অশ্বারোহী (এ সম্পর্কে বার্নিয়ারের বিবরণও দেখুন)।

সাত সাত খানি অনুপম সিংহাসন রয়েছে মহাপ্রতাপী মুঘল সম্রাটের। একটির সারা দেহ খচিত হীরে দিয়ে। অন্যগুলি চুনি, পান্না ও মুক্তো দিয়ে (এ সম্পর্কেও বার্নিয়ার দেখুন)। প্রথম প্রাঙ্গণের মহাকক্ষটিতে যেটি বর্তমান সেই প্রধান সিংহাসনখানি চেহারায় ও আকারে আমাদের ক্যাম্প খাট-এর মতোই।

তার মানে ৬ ফুট দীঘল, চার ফুট চওড়া। পায়া চারটি বেশ ভারি ও মজবুত। কুড়ি থেকে পঁচিশ ইঞ্চি মতো উঁচু। তার চার দিককার চার আড়কাঠের ওপর সিংহাসনের পাটাতন। এই আড়কাঠগুলি থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে বারোটি স্তম্ভ। মাথার ওপরকার চাঁদোয়াটি তিন দিক দিয়ে সেগুলির সাথে আটকানো। বসানো সেটি দরবারের দিকে মুখ ক'রে। পায়া ও ১৮ ইঞ্চিরও বেশি দীঘল আড়কাঠগুলি সোনা দিয়ে মোড়া। খচিত রয়েছে তার গায়ে অসংখ্য হীরে, চুনি ও পান্না। প্রতিটি আড়কাঠের মধ্যবিন্দুতে একটি ক'রে পশ্চাৎ ভাগ অবতল ক'রে কাটা বড় আকারের ব্যালাস চুনি (বদকশান থেকে যেন প্রজাতের চুনি)। বর্গাকার ক্রুশ চিহ্নের আকৃতি রচনা ক'রে তাকে ঘিরে বসানো হয়েছে চারটি পান্না। এর পর পুরো আড়কাঠ জুড়ে ওই ধরনের ক্রুশ চিহ্ন। তবে এমন ভাবে সাজানো যে একটির মাঝে যেখানে রয়েছে ব্যালাস চুনি ও তার চারদিক চারটি পান্না, তার পরেরটিতে রয়েছে মাঝখানে পান্না ও চারদিকে চারটি ব্যালাস চুনি। পান্নাগুলি টেবল কাট। চুনি ও পান্নার মাঝের ফাঁকগুলি হীরা দিয়ে ভরাট। এই হীরাগুলির মধ্যে যেগুলি সবার চেয়ে বড় তাও ওজনে দশ থেকে বার ক্যারাটের বেশি নয়। সবগুলিই বেশ সুদৃশ্য, তবে বড় বেশি লেপাপোছা সমতল ধরনের। কতক জায়গায় সোনার বুকে খচিত করা হয়েছে মুক্তাও। সিংহাসনটি যেদিক পানে দীঘল, তারই দু দিককার এক দিকে রয়েছে সেটিতে চড়ার জন্য চারটি সোপান। সিংহাসনের ওপর রাখা তিনটি তাকিয়া বা বালিশের মধ্যে যেটি সম্রাটের পিছন দিকে থাকে সেটি সব থেকে বড়। এবং আমাদের বোলষ্টরের মতোই গোলাকার। অন্য দুটি থাকে তার দু পাশে। সেগুলি চ্যাপটা ধরনের। এছাড়াও সিংহাসনটির গায়ে ঝোলানো থাকে একটি তরবারি, একটি গদা, একটি গোলাকার ঢাল এবং একটি ধনুক ও তীর বোঝাই তূণীর। অস্ত্রশস্ত্র, তাকিয়া এবং সোপান সব কিছুই সিংহাসনের সাথে মানানসই ভাবে রত্ন দিয়ে খচিত। শুধু এই একটি সিংহাসনের বেলাই নয়, সবকটি সিংহাসনের বেলাই। (এ প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদও দেখুন)।

গুণে দেখলাম এই অতুলনীয় সিংহাসনটিতে খচিত থাকা বড় ব্যালাস চুনির সংখ্যা ১০৮টির মতো। সবগুলিরই পিছন দিকটি অবতল। যেটি সব থেকে ছোট সেটিও ১০০ ক্যারাট ওজনের। কতকের ওজন ২০০ ক্যারাট বা তার বেশি। পান্নাগুলির মধ্যে বেশ কটি সুস্বচ্ছ, তবে প্রচুর খুঁত রয়েছে সেগুলিতে।

যেটি সবচেয়ে বড় তার ওজন হবে প্রায় ৬০ ক্যারাট। যেটি সব থেকে ছোট সেটি ৩০ ক্যারাটের কাছাকাছি। গুণে দেখলাম, পান্নার সংখ্যা ১১৬-র মতো। অর্থাৎ চুনির চেয়ে পান্নাই রয়েছে বেশি।

চাঁদোয়ার নিচের দিকটিও হীরে আর মুক্তা দিয়ে সু-অলংকৃত। কিনারা ঘিরে মুক্তার ঝালর। আয়তাকার গম্বুজাকৃতি এই চাঁদোয়াটির মাথায় একটি ময়ূর। তার পেখম মেলা পুচ্ছগুলি নীলকান্ত মণি ও অন্যান্য সব রঙীন রত্ন-পাথর সাজিয়ে তৈরি। দেহটি সোনার বুকে নানারকম মূল্যবান রত্ন-পাথর খচিত ক'রে গড়া। বুকের সুমুখ দিকটিতে বড় আকারের একটি চুনি। ঝুলছে সেখান থেকে ৫০ ক্যারাট বা তার কাছাকাছি ওজনের একটি মুক্তা। নাসপাতি আকারের এই মুক্তাটির রঙ কিছুটা হলুদাভ ধরনের। ময়ূরটির দু-প্রান্তে তারই সমান উঁচু দুটি পুষ্প-স্তবক। রয়েছে তাতে নানা ধরনের ফুল। সবগুলিই সোনার তৈরি, ও মূল্যবান রত্ন-পাথর খচিত। দরবারের বিপরীত দিকে, সিংহাসনের দিকটিতে রয়েছে একটি রত্ন-আভরণ। তার হীরে খণ্ডটি ৮০ থেকে ৯০ ক্যারাট ওজনের। সেটিকে ঘিরে চুনি আর পান্না বসানো। সম্রাট যখন সিংহাসনে বসে থাকেন পুরোপুরি দেখতে পান এটিকে। এই অতুলনীয় সিংহাসনটির সব থেকে মূল্যবান অংশ হল আমার মতে এর চাঁদোয়াটিকে ধরে রাখা স্তম্ভ বারোটি। অতি সুন্দর মুক্তার সারি দিয়ে ঘেরা এগুলি। প্রতিটি মুক্তাই আকারে গোল, রঙও চমৎকার। ওজনে প্রত্যেকটি ৬ থেকে ১০ ক্যারাট। সিংহাসন থেকে চারফুট দূরত্বে দুদিকে দুটি ছত্র। তার দণ্ড দুটি সাত-আট ফুট উঁচু পর্যন্ত হীরা, চুনি ও মুক্তামণ্ডিত। দুটি ছত্রের আচ্ছাদনীই লাল মখমলের। তার সর্বাঙ্গে মুক্তার কারুকাজ, কিনারা জুড়ে মুক্তার ঝালর।

তৈমুরলঙের শুরু ও শাহ-জহানের সম্পূর্ণ করা এই বিখ্যাত সিংহাসনটি যতদূর যা আমার পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তা নিবেদন করলাম এখানে। যারা সম্রাটের ধন-রত্নাদির ও এই অনুপম শিল্পকীর্তিটির মূল্যের হিসাব রাখেন তারা দৃঢ়ভাবে আমায় জানালেন যে এটির মূল্য ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

এই অতুলনীয় ও অনুপম-দর্শন সিংহাসনটির ঠিক পেছনেই রয়েছে স্নানাধারের মতো আকৃতির আরেকটি সিংহাসন। বৃত্তাভাস এ সিংহাসনটি দৈর্ঘে প্রায় সাত ফুট, প্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুটের মতো। বাইরের দিকটি হীরা ও মুক্তা দিয়ে অলংকৃত। তবে সেটির মাথার ওপরটিতে নেই কোন চাঁদোয়া।

প্রথম প্রাঙ্গণটির ডানদিকে একটি বিশেষ তাঁবু বর্তমান। সম্রাটের জন্মবার্ষিকী

উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব কালে শহরের বিশিষ্ট নর্তকীদের এখানে হাজির হতে হয় সম্রাটের সুমুখে নাচ ও গান করার জন্য। সম্রাট বসে থাকেন এসময়ে আপন সিংহাসনে (দরবারে নাচ-গান নিষিদ্ধ করেছিলেন ঔরঙজেব)। বাঁয়ে, আরেকটি তাঁবু ঘেরা স্থান বর্তমান। সেখানে হাজির থাকেন সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তারা, রক্ষী বাহিনীর ও সম্রাটের গৃহস্থালী বিভাগের অন্যান্য প্রধানরা।

সম্রাট যখন সিংহাসনে আসীন থাকেন, তখন এই প্রাঙ্গণ এলাকাটিতেই দুপাশে পনেরটি ক'রে সারিবদ্ধ ভাবে তিরিশটি সুসজ্জিত ঘোড়া দাঁড করিয়ে রাখা হয় সদা-প্রস্তুত অবস্থায়। এক একটি ঘোড়াকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন ক'রে সহিস। এদের বল্গাগুলি অতি সরু এবং তার বেশির ভাগ অংশই হীরে, চুনি, পান্না ও মুক্তা খচিত। সামান্য কিছু অংশে শুধু ছোট ছোট সোনার মুদ্রা। প্রতিটি ঘোড়ারই মাথায় একগুচ্ছ ক'রে সুদৃশ্য পালক গোঁজা পিঠে বন্ধনী আঁটা একটি ক'রে ছোট তাকিয়া। তার সর্বাঙ্গে সোনার সুতো দিয়ে করা সূচী-কর্ম। গলায় ঝোলান রয়েছে একটি ক'রে সুদৃশ্য রত্নপাথর। হয় হীরা, নয় চুনি, নয় তো পান্না। যে ঘোড়াটির দাম সব থেকে কম সেটিও ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা। কতকের মূল্য বিশ হাজার। সাত থেকে আট বছর বয়সী শাহজাদা (ঔরঙজেবের চতুর্থ পুত্র মুহম্মদ আকবর) যে ঘোড়াটিতে চড়েন সেটি রীতিমতো ছোটখাট। উচ্চতায় একটি গ্রে-হাউণ্ডের চেয়ে বেশি নয় কিন্তু অতি সুগঠিত চেহারার।

সম্রাট সিংহাসনে আসীন হবার আধ ঘণ্টা কি বড় জোর এক ঘণ্টা পরে ৭টি অতি সাহসী ও যুদ্ধে সুশিক্ষিত হাতি হাজির করা হয় তার পরিদর্শনের জন্য। যদি সম্রাট চড়তে চান সেজন্য হাওদা বসানো থাকে এদের একটির পিঠে। অন্য-গুলির পিঠে কিংখাবের আচ্ছাদন, সোনা বা রূপার শিকল দিয়ে গলার সাথে আটকানো। চারটির পিঠে রাজকীয় ধ্বজা। একজন ক'রে লোক হাত-বর্শার সাথে ধ্বজাটি আটকিয়ে খাড়া ধরে আছে সেটি। হাতিগুলিকে একের পর আর নিয়ে আসা হয় সম্রাটের ৪০ থেকে ৫০ পা কাছ পর্যন্ত। সিংহাসনের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে ভূমি স্পর্শ ক'রে সেটিকে মাথায় ঠেকায় তারপর জানায় এভাবে পর পর তিনবার অভিবাদন সম্রাটকে। প্রতিবারের কোলে সেই সাথে উচ্চনাদ। এরপর সম্রাটের দিকে পিছু ফেরে। একজন লোক উঁচু ক'রে তুলে ধরে তার পিঠের আচ্ছাদনটি। উদ্দেশ্য, হাতিটি অক্ষত দেহে ভালো অবস্থায় আছে কিনা, ভাল খেতে পাচ্ছে কিনা তা যাতে নজর দিয়ে বুঝতে পারেন

সম্রাট। প্রত্যেকটিরই রয়েছে তার নিজস্ব মাপের সিল্কের দড়ি। সেটি দিয়ে মেপে দেখা হয় আগের বছরের তুলনায় সে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান হয়েছে কিনা এ বছর। হাতিগুলির মধ্যে যেটি সেরা, সেটি সম্রাটের অতি প্রিয়। সেটি দুর্দম ও বিরাটকায়। তার জন্য মাসিক ব্যয় বরাদ্দ পাঁচশো টাকা। খাওয়ান হয় তাকে সেরা খাদ্য, সেই সাথে বেশ কিছু পরিমাণ চিনি। দেয়া হয় মদিরাও। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সম্রাট যখন হাতিতে চ'ড়ে ভ্রমণে বার হন আমীররা তখন তার পিছে পিছে চলেন ঘোড়ায় চেপে। সম্রাট যদি চাপেন ঘোড়ার পিঠে তাহলে পিছু নেন তারা পায়ে হেঁটে। যা হোক, হাতি পরিদর্শন শেষ হলে উঠে পড়েন সম্রাট। জনা তিন চার খোজাকে নিয়ে বৃত্তাভাস আকারের সিংহাসনটির পিছন দিকে থাকা একটি ছোট দরজা দিয়ে চলে যান অপন হারেমে।

অন্য পাঁচখানি সিংহাসন সাজিয়ে রাখা হয়েছে অপর একটি প্রাঙ্গণে থাকা এক অনুপম মহাকক্ষ মধ্যে। চারখানি চার কোণে, একটি মাঝে—এভাবে গুণ চিহ্নের আকারে।

আধঘন্টা'র মতো আপন হারেমে কাটাবার পর তিন-চার জন খোজা সহ আবার ফিরে আসেন সম্রাট। এবার আসন নেন এই মহাকক্ষটিতে, ওই পাঁচখানি সিংহাসনের মাঝেরটিতে। পাঁচ দিনের উৎসব কালে পরিদর্শনের জন্য কখনো আনা হয় তার কাছে তার নিজস্ব হাতি, কখনো বা নিজস্ব উট। আসেন দরবারের সব অভিজাতরা, প্রথা মতো নিবেদন করেন তাকে উপহার। প্রাচ্যের সেরা সম্রাটের যোগ্য পরিবেশ মধ্যে অতি জাঁকজমকের ভেতর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এসব। ক্ষমতায় ও ধনসম্পদে ইওরোপ মধ্যে ফ্রান্সের অধিপতির যে স্থান, এশিয়া মধ্যে মহাপ্রতাপী মুঘল সম্রাটেরও ঠিক তাই। তবে শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে প্রথম জনের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না তার। যুদ্ধ করতে নামলে আমাদের শৌর্য-বীর্যবান ও সুচতুর ইওরোপীয় সেনার সাথে এঁটে উঠতে পারবে না তার সেনারা (এই একই মত প্রকাশ করেছেন বার্নিয়ারও)।

নয় ॥ মুঘল দরবারের আরও বিবরণ

আগেই জানিয়েছি, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে শুধু নিরামিষ খেয়ে জীবন ধারণ ক'রে চলেছেন ঔরংজেব। সেই সাথে রয়েছে আবার নানা রকম

ধর্মীয় উপবাস। এ দুইয়ের ফলে হয়ে পড়েছেন তিনি রীতিমতো ক্ষীণ ও দুর্বল।
— অব্দে যে ধূমকেতুটির উদয় হয় ভারত থেকে অতি বিরাট আকারে দেখা যায় তাকে। আমি নিজেও তখন ভারতে। এ ধূমকেতুটি যতদিন দৃশ্যমান ছিল ততদিন শুধু সামান্য জল ও অল্পস্বল্প জোয়ারের রুটি খেয়ে কাটালেন ঔরঙজেব। সেই থেকে পাননি কখনো আর তিনি নীরোগ স্বাস্থ্য ভোগ করার সুযোগ। (হ্যালীর ধূমকেতু। ১৬৬৫ অব্দে দেখা দেয় এটি। ইওরোপের আকাশে এর আবির্ভাব তারিখ ২৭শে মার্চ। স্থায়ী হয়েছিল একমাস কাল। এর পুচ্ছটির দৈর্ঘ ছিল ৫ ডিগ্রী।)

(ঔরংজেব একসময়ে টুপির ওপর আপন হাতে সূচীকর্ম ক'রে জীবন ধারণ করতেন তারই আয় থেকে। কোরানের উদ্ধৃতি নকল ক'রে সেগুলিও বেচতেন এজন্য। চার্ডিনের রেখে যাওয়া বিবরণ দেখুন, Voyages-Vol VIII.)

সিংহাসনে বসে থাকা কালে বিভিন্ন দিনে তিন তিনবার ঔরঙজেবকে জল খেতে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। হীরা-চুনি-পান্না খচিত একটি সোনার পাত্রে ক'রে আনা হল সে-জল। সম্পূর্ণ গোলাকার ও মসৃণ একটি স্ফটিক পাথরের বড় কাপে ঢেলে দেয়া হল তা তাকে খেতে। কাপটির সর্বাঙ্গও পাত্রটির মতোই অলংকৃত। ওপরের ঢাকনাটি সোনার। চলিত রীতি মাফিক, হারেমের মহিলারা ও খোজারা ছাড়া আর কেউ পান না বড় একটা সম্রাটের আহার দর্শনের সুযোগ। অতি কদাচিৎ কোন প্রজার গৃহে খেতে যান তিনি। তা সে বংশীয় কোন শাহজাদাই হোক আর আপনার অন্য কোন আত্মীয়ই হোক। আমার শেষবারের পর্যটন কালে তার প্রধান ওয়াজীর ও খুড়-শ্বশুর (এবং মেশো) জাফর খান আমন্ত্রণ জানালেন তাকে তার নতুন গড়া প্রাসাদটি দেখে যাবার জন্য। এটিই হল সেরা অনুগ্রহ যা তাদের ক'রে ধন্য করতে পারেন তিনি। জাফর খান ও তার স্ত্রী সম্রাটের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার বহর দেখাবার জন্য রত্নালঙ্কার, হাতি, ঘোড়া, উট ও অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে দিলেন তাকে প্রায় সাত লক্ষ টাকার উপহার। জাফর খানের এই পত্নী সারা ভারত মধ্যে অতি দ্যুতিময়ী ও উদারমনা মহিলা (ইনি ছিলেন শায়েস্তা খানের বোন, সুতরাং ঔরঙজেবের মাসী)। সম্রাটের সব বেগম ও কন্যারা মিলিয়ে যত খরচ করেন, তিনি একাই ক'রে থাকেন তার বেশি। ফলে, যদিও তার স্বামী বাস্তবে সারা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, তবুও সব সময়ে তার পরিবার দেনাগ্রস্ত। সম্রাটের জন্য অতুলনীয় এক ভোজের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মহিলা। কিন্তু সম্রাট খেলেন না, ফিরে গেলেন

আপন প্রাসাদে। তিনি তখন তার জন্য রান্না করা পদগুলি পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। সেগুলি খেয়ে এত ভাল লাগল সম্রাটের যে, যে খোজা সেগুলি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে দিলেন তিনি ৫০০ টাকা বখশীশ, রাঁধুনেদের দিলেন তার দ্বিগুণ।

সম্রাট যখন পালকীতে চেপে মসজিদে যান, তার এক ছেলে ঘোড়ায় চেপে পিছু নেন তার। অন্য আর সব কুমাররা ও গৃহস্থালীর কর্মচারীরা অনুসরণ করেন তাদের পায়ে হেঁটে হেঁটে। মুসলমান জনসাধারণ এ সময়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা ক'রে চলে মসজিদের সোপানের ওপরে। যখন তিনি ফিরে আসেন, তারাও আসে তার আগে আগে প্রাসাদের ফটক পর্যন্ত। সম্রাটের আগে আগে চলে ৮টি হাতি। চারটি হাতির পিঠে থাকে দুজন ক'রে লোক। একজন হাতিটিকে চালায়, অন্যজন উঁচিয়ে ধরে থাকে হাত-বর্শার সঙ্গে লাগান রাজকীয় ধ্বজা। অন্য চারটি হাতির পিঠে থাকে হাওদা। একটি চারকোণ অন্যটি গোল; একটি ঢাকা, অন্যটির চারদিক বিভিন্ন ধরনের কাচ দিয়ে ঘেরা। সম্রাট বাইরে কোথাও গেলে দেহরক্ষী রূপে সচরাচর ৫০০ থেকে ৬০০ সেনা চলে তার সাথে সাথে। প্রত্যেকেরই হাতে থাকে একজাতীয় হাত-বর্শা। সেটির লোহার ফলার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অ টকানো থাকে দুটি ক'রে উড়ন-বাজী (রকেট)। প্রত্যেকটি শহরের মতোই মোটা, আর লম্বায় ফুটখানেক। আগুন লাগিয়ে ছেড়ে দিলে ৫০০ গজ দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় এই হাত বর্শাটিকে উড়ন-বাজী দুটি। (যুদ্ধেও ব্যবহৃত হয় এ ধরনের উড়নবাজী। শোনা যায়, সামুগড়ে মুরাদ বক্স ও ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দারার যুদ্ধকালে এরূপ উড়নবাজীর আঘাতে ত্রস্ত ও বেসামাল হয়ে ওঠে দারার হাতিটি। ফলে এক সঙ্কটময় মুহূর্তে হাতির পিঠ থেকে নিচে নেমে যেতে বাধ্য হন দারা।)

সম্রাটের অনুগমন করে তিন-চারশো পলতে বন্দুকধারীও। তবে, যেমন এরা ভীতু তেমনি আনাড়ী। থাকে কতক অশ্বারোহীও। কিন্তু এরাও তেমন কিছু সুদক্ষ নয়। আমাদের একশো ইওরোপীয় সেনার বড় একটা অসুবিধা হবে না এদের হাজার জনকে কাবু করতে। তবে এও ঠিক, এরা যে ধরনের কৃচ্ছ্র জীবন যাপন করে তা অভ্যাস করতে হিমশিম খেয়ে যাবে আবার আমাদের সেনারা। কি অশ্বারোহী, কি পদাতিক সকলেই তাদের খিদে মেটায় সামান্য কিছু ময়দা (ছাতু) জল আর গুড় দিয়ে মেখে, ছোট ছোট দলা পাকিয়ে নিয়ে তাই গিলে। নেহাৎ তা আর ভাল না লাগলে, রাতের দিকে

চালের সঙ্গে উপরোক্ত শস্য ও নুন সহযোগে সচরাচর খিচুড়ি। এগুলি খাবার সময় প্রথমে তারা তাদের আঙুলের ডগাগুলিকে ঘিয়ে ডুবিয়ে নেয়, তারপর গ্রাস তোলে মুখে। কি সাধারণ সৈনিক, কি গরিব জনসাধারণ সকলেই যে খাদ্য খেয়ে সচরাচর জীবন ধারণ করে তা এই স্তরের। তার ওপর এ দেশের উত্তাপও কুপোকাৎ ক'রে দেবে আমাদের সেনাদের। ভারতীয় সেনারা যে ভাবে সারাদিন প্রখর সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নিচে কাটায় তা একেবারেই সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশের কৃষকদের পোশাক বলতে মাত্র যা এক টুকরো কাপড় লজ্জা নিবারণের জন্য শরীরের যে অংশটুকু নেহাৎ না ঢাকলে নয় এ দিয়ে শুধু যা সেটুকুই আড়াল করে তারা। করুণতম দারিদ্র্যের সীমানায় ঠেলে দেয় হয়েছে তাদের। যদি কোন সুবাদার একবার জানতে পারে যে এদের হাতে কিছু অর্থ জমেছে বা বিষয় সম্পত্তি হয়েছে অমনি 'লাঠি যার সবই তার' নীতিতে সরাসরি কেড়ে নেয় তা। ভারতে এমন এক একটি প্রদেশ (জেলা ?) আপনার চোখে পড়বে যা প্রায় মরুভূমির মতোই জনশূন্য। শাসন-কর্তাদের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে কৃষকরা ব্যাপকভাবে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে (আশ্চর্য। এরপরও লেখক শাহ-জাহানের প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি প্রজাদের সন্তানের মতো পালন করতেন বলে!) আসল ঘটনা হল, এরা নিজেরা মুসলমান হবার দরুন যতটা পারে জুলুম চালায় এইসব অসহায় পৌত্তলিকদের ওপরে। যদি এদের কেউ মুসলমান হয়ে যায় সে শুধু এই পীড়ন ও হাড়ভাঙা খাটুনি এড়ানোর জন্য। তারা যোগ দেয় তখন সেনাদলে। নয়তো হয়ে যায় সংসার ত্যাগী ফকীর, জীবন ধারণ করে ভিক্ষাবৃত্তির ওপর। কিন্তু আসলে এই সব ফকীরেরা দুনিয়ার এক একটি সেরা পাজি। অনুমান করা হয়, রয়েছে ৮ লক্ষের মতো মুসলমান ফকীর এবং বারো লক্ষের মতো পৌত্তলিক সন্ন্যাসী সারা ভারতে।

প্রতি পক্ষকাল মধ্যে একবার ক'রে শিকারে যান সম্রাট। পথ পাড়ি দেবার বেলা এবং শিকারের সময় হাতির পিঠেই কাটান তিনি সর্বক্ষণ। যে-সব প্রাণী তিনি শিকার করেন তাদের তাড়া ক'রে নিয়ে আসা হয় তার হাতির সামনে, পলতে বন্দুকের গুলির সীমানা ভেতরে। সিংহ, বাঘ, হরিণ, মৃগ এগুলিকেই সাধারণতঃ তাড়া করা হয় এজন্য। বুনো শুয়োর বাদ। কেননা, সাচ্চা মুসলমান বলে এদের মুখদর্শন করতেও চান না সম্রাট। ফেরার বেলা চাপেন তিনি পালকীতে। মসজিদে যাবার বেলায় যে ধারায় পিছু নেয় সবাই, এ সময়েও

ঠিক তেমনটি। ব্যতিক্রম শুধু এই, এ সময়ে এলোমেলো ভাবে তার আগে আগে থাকে শ দুই-তিনেক অশ্বারোহী সেনা। (বার্নিয়ারও দেখুন এ প্রসঙ্গে)।

শাহজাদীরা, তা সে সম্রাটের পত্নী, কন্যা, বোন যেই হোন না কেন, প্রাসাদের বাইরে আসেন না কখনো। ব্যতিক্রম ঘটে এর, যখন বায়ু পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য ভ্রমণে বার হন গোণাগুণতি কিছু দিন। কেউ কেউ অবশ্য কখনো কচিৎ অভিজাতদের গৃহে যান তাদের পরিবারের মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য। যেমন ধরুন, জাফর খানের স্ত্রীর কাছে, যিনি হলেন স্বয়ং সম্রাটের মাসী। তাও কিন্তু সম্রাটের অনুমতি না নিয়ে নয়। এ বিষয়ে এখানকার রীতি প্রথা পারস্য থেকে পৃথক। পারস্যে শাহজাদীরা বার হন শুধু রাতে। সঙ্গে থাকে অসংখ্য খোজা প্রহরী। পথে এ সময়ে মানুষজন থাকলে তাদের হটিয়ে চলে তারা। কিন্তু এ দেশে, মুঘল শাহজাদীরা বার হন সাধারণতঃ সকাল ৯টা নাগাদ। সঙ্গে থাকে মাত্র তিন চার জন খোজা প্রহরী এবং দশ বারো জন বাঁদী। এই শেষোক্তরা হলেন তার সম্মানের প্রতীক। কারুকার্য করা ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা পালকীতে ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শাহজাদীদের। চলে পিছু পিছু একজন মানুষ বসার যোগ্য একটি ছোট্ট ঠেলা-গাড়ি। দুজন ব্যক্তি ঠেলে নিয়ে চলে এটিকে। আর চাকাগুলিও এর এক-ফুটের চেয়ে বড় নয়। শাহজাদীরা যখন উদ্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছান, পালকী বাহকরা যাবার সুযোগ পায় শুধু বা প্রথম ফটক পর্যন্ত। খোজারা বাধ্য করে তারপর তাদের সেখান থেকে সরে যেতে। শাহজাদী পালকী থেকে নেমে চাপেন ওই গাড়িটিতে। সঙ্গের বাঁদীরা গাড়িটি ঠেলে নিয়ে যান তাকে সে বাড়ির অন্দরমহলে। প্রসঙ্গক্রমে আগেই শুনিয়েছি, অভিজাতদের অন্দরমহলটি থাকে বাড়ির ঠিক মাঝে। দু' তিনটি প্রাঙ্গণ, একটি কি দুটি বাগান পার হয়ে তবে পৌঁছতে হয় সেখানে।

রাজ পরিবারের কোন কন্যার সাথে দরবারের কোন অভিজাতর বিয়ে হলে, সেই রাজ-নন্দিনীই হয়ে ওঠেন তার সর্বময় প্রভু। যদি তার আকাঙ্ক্ষা মতো তিনি না ওঠেন, বসেন, কাজকর্ম করেন পড়তে হয় তাকে রীতিমতো বিপাকে। সম্রাটের সান্নিধ্যে যাবার তাদের অনায়াস সুযোগ থাকায় ক্ষমতা ধরেন তার ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে স্বামীকে সম্রাটের ভ্রুকুটির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোয়, যেমন খুশী নাজেহাল করার। অধিকাংশ সময়েই দাবী তোলেন তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য। প্রচলিত প্রথা হল, জ্যেষ্ঠ পুত্রই হয়ে থাকেন সিংহাসন (বা পদ)-এর উত্তরাধিকারী। যদি তিনি দাসী গর্ভে জন্মে থাকেন তাহলেও। তাই,

হারেমের রাজ-নন্দিনীরা যেই টের পান অন্য কোন সপত্নী বা দাসীর গর্ভে স্বামীর কোন সন্তান জন্ম নিতে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়েন যে-কোন উপায়ে তার গর্ভ নষ্ট ক'রে দিতে। ১৬৬৬-তে যখন পাটনায় যাই, শায়েস্তা খানের বর্ণ-সঙ্কর পর্তুগীজ শল্যবিদ আমায় জানালেন: এক মাসের ভেতর স্বামীর হারেমের আটজন মহিলার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন শায়েস্তা খানের রাজনন্দিনী পত্নী। একমাত্র আপন সন্তানরা ছাড়া তার কোন সপত্নীর সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখুক তিনি কিছুতেই হতে দিতে রাজী নন তা।

।। দশ ।। লেখককে আপন রত্ন সম্ভার প্রদর্শনের জন্য মুঘল সম্রাটের আদেশ।

যেদিন সম্রাটের কাছে বিদায় অনুমতি নিতে যাই ঠিক তার পরদিন, ১৬৬৫-র নভেম্বরের ২ তারিখ সাত-সকালেই হাজির আমার কাছে সম্রাটের পাঁচ-ছ জন কর্মচারী। সঙ্গে রয়েছেন নবাব জাফর খানেরও জনাকয়েক প্রতিনিধি। জানালেন সম্রাট ডেকেছেন আমায়। গেলাম। পৌঁছবার সাথে সাথে তার রত্নাগারের দায়িত্বে থাকা দুই প্রধান (১ম পর্ব, ৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন) নিয়ে গেলেন আমায় সম্রাটের কাছে। চলিত রীতি-প্রথা মাফিক অভিবাদন জানানোর পর তারা নিয়ে গেলেন আমায় একটি ছোট প্রকোষ্ঠ মধ্যে। যে মহাকক্ষটিতে সিংহাসনের ওপরে বসেছিলেন সম্রাট তারই একপ্রান্তে এ প্রকোষ্ঠটি; তিনি সিংহাসনে বসেই দেখতে পাচ্ছিলেন আমাদের। প্রকোষ্ঠ মধ্যে অপেক্ষা ক'রে চলছিলেন রত্নাগারের প্রধান আকিল খান। আমাদের দেখে চারজন খোজাকে আদেশ করলেন তিনি রত্নগুলি নিয়ে আসার জন্য। রত্নাদি আনা-নেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী সোনার তবকে মোড়া দুটি বড় কাঠের পাত্রে ক'রে সেগুলি নিয়ে এল তারা। একটির ওপর লাল, অন্যটির ওপর সবুজ মখমলের ঢাকনা। সোনার সুতো দিয়ে বুটির কাজ করা দুটিতেই ঢাকনা সরিয়ে নেবার পর তিনবার ক'রে গোনা হল রত্নগুলিকে। উপস্থিত থাকা তিনজন করণিক তালিকাবদ্ধ করলেন তার বিবরণ। সব কাজই অতি যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধীরে সুস্থে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে ক'রে থাকে ভারতীয়রা। কাউকে তাড়াহুড়ো করতে দেখলেই রেগে যায় তারা। কিচ্ছুটি না বলে এমন ভাবে তাকাবে ও হাসবে যেন সে-লোকটি উন্মাদ ছাড়া কিছুই নয় আর।

প্রথম যে রত্নখণ্ডটি আমার হাতে তুলে দিলেন আকিল খান সেটি একটি প্রকাণ্ড হীরে। কাটা সেটি বর্তুলাকার গোলাপের ছাঁদে (অর্থাৎ বহুভুজ আকৃতি ক'রে)। একটি দিক তার বেশ উঁচু। নিচের দিককার এক কিনারা ঘেঁসে রয়েছে একটি ক্ষুদে গর্ত এবং ভেতরে খুঁত। রঙটি সুদৃশ্য। ওজন ৩১৯½ রত্তি

যা আমাদের ২৮০ ক্যারাট (অন্যত্র দিয়েছেন ২৭৯$\frac{9}{16}$ ক্যারাট)। এক রতি আমাদের $\frac{7}{8}$ ক্যারাটের সমান। আপন মনিব গোলকুণ্ডার রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী মীর জুমলা এটি উপহার দিয়েছিলেন পরে তিনি যার অনুগামী হন সেই শাহ-জহানকে। ওই সময়ে আকাটা অবস্থায় ছিল এটি, ওজন ছিল তখন ৯০০ রতি (অন্যত্র বলেছেন ৯০৭ রতি) বা ৭৮৭$\frac{1}{2}$ ক্যারাট (অন্যত্র বলেছেন ৭৯৩$\frac{5}{8}$ ক্যারাট)। এবং কয়েকটি খুঁত ছিল তখন এটিতে।

ইওরোপে হলে পুরো অন্যভাবে কাটা হত এ হীরেখানিকে। বার ক'রে নেয়া হত বেশ কয়েকটি নিখুঁত টুকরো। তারপরও এর ওজন থাকত এখন য' আছে তার চেয়ে বেশি। কিন্তু তা না ক'রে বাকিটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঘসে চুর চুর ক'রে। ভেনিসের বাসিন্দা Sieur Hortensio Borgio কাটেন এ হীরেটিকে। পুরস্কার হিসাবে করতে হয় লাঞ্ছনা ভোগ। হীরেটিকে বরবাদ করে দেয়ার জন্য করা হল তাকে ভৎর্সনা। বলা হল, কাটার উচিত ছিল হীরেটি যা দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে বেশি ওজনের। পরিশ্রমের মজুরী না দিয়ে উলটে করলেন সম্রাট তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা। যদি বেশি সম্বল থাকত তার, আদায় করা হত আরও বেশি। Sieur Hortensio যদি ঝানু কারিগর হতেন তবে সম্রাটের এই হীরেখানির কোন ক্ষতি না করেই বাগিয়ে নিতে পারতেন এ থেকে বড়সড় একখানি টুকরো। ঘসে উড়িয়ে দেয়ার জন্য যে বিরাট ঝকমারি পোয়াতে হয়েছে বেঁচে যেতেন তিনি তার হাত থেকেও। আসলে, ছিলেন না তিনি উঁচু দরের হীরে-কাটিয়ে। (হীরাটি কাটেন প্রকৃতপক্ষে একজন ফরাসী কারিগর। নাম সম্ভবতঃ La Grange.)

এই অপূর্ব পাথরটি দেখে ফিরিয়ে দেয়ার পর আবার হাতে আরেকটি পাথর দিলেন আকিল খান। এটি নাসপাতি গড়নের, এবং সুন্দর আকৃতির। রংটিও স্বচ্ছ ও সুন্দর। দেখালেন আরো তিনটি মসৃণ-সমতল হীরে। দুটি সুস্বচ্ছ, অন্যটিতে কতক ক্ষুদে কালো কালো দাগ। প্রত্যেকটির ওজন ৫৫ থেকে ৬০ রতি, নাসপাতি গড়নেরটির ৬২$\frac{1}{2}$ রতি। এরপর দেখালেন প্রতিটি ১৫ থেকে ১৬ রতি ওজনের ১২টি হীরে বসানো একটি জড়োয়া অলঙ্কার। হীরেগুলির সবকটিই গোলাপ ছাঁদের। মাঝেরটি হৃদয় আকৃতির। মনোহর স্বচ্ছ বর্ণের। তবে তিনটি ছোট্ট খুঁত বর্তমান। গোলাপ ছাঁদে কাটা এ হীরেটির ওজন ৩৫ থেকে ৪০ রতি। দেখালেন এরপর ১৭টি হীরে বসানো আরেকটি জড়োয়া। আধেক তার মসৃণ সমতল, আধেক গোলাপ ছাঁদের। সব থেকে বড়টির ওজন

৭ বা ৮ রতির বেশি নয় কখনো। একমাত্র মাঝেরটির ওজনই ১৬ রতির মতো হবে যা। সব কটিই প্রথম শ্রেণীর স্বচ্ছ-রঙা, নিখুঁত ও সুন্দর আকৃতির, এমন চমৎকার হীরে চোখে পড়েনি কখনো আগে আর। নাসপাতি গড়নের অপূর্ব দুটি মুক্তা দেখালেন এবার। এক একটির ওজন ৭০ রতির মতো, দুদিকে সামান্য একটু চাপা। রঙ ও গড়ন দুই-ই সুন্দর। এরপর হাতে তুলে দিলেন একটি মুক্তার বোতাম। ওজন ৫৫ থেকে ৬০ রতি। গড়ন ও রঙ দুই-ই চমৎকার। দেখালেন তারপর একটি অতি নিটোল ও নিখুঁত গোল মুক্তা। শুধু একটি দিক অতি সামান্য একটু যা চাপা। ওজন ৫৬ রতি। পারস্যের শাহ দ্বিতীয় আব্বাসের উপহার এটি। ২৫ থেকে ২৮ রতি বা তার কাছাকাছি ওজনের আরও তিনটি গোল মুক্তা দেখালেন এরপর। তবে এগুলির রঙ হলুদ ঘেঁসা। দেখার সুযোগ হল ঝকমকে সাদা রঙের নিটোল গোল একটি মুক্তাও। ওজন সেটির ৩৬২ রতি। একেবারে সব দিক দিয়ে নিখুঁত। এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ঔরঙ্গজেব কিনেছেন এটিকে। এ পর্যন্ত বলা সব কটি রত্নের মধ্যে একমাত্র এটিই যা তার নিজের সংগ্রহ। অন্যগুলি তার অধিকারে এসেছে বড় ভাই দারা শিকোর কাছ থেকে। এগুলি বাগিয়ে নেয়ার পরই মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় তার। কতক সম্ভবতঃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পেয়েছেন উপহার হিসাবে। আগেই জানিয়েছি, রত্নের প্রতি নেই তেমন কোন আকর্ষণ সম্রাটের। মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের অত্যুৎসাহী অনুগামী রূপে নিজের প্রকাশ ঘটাতেই তিনি গৌরব বোধ করেন শুধু যা।

যাতে আমি স্বচ্ছন্দে পরখ ক'রে দেখতে পারি এজন্য সব কটি রত্নই একের পর আর আমার হাতে তুলে দিয়ে চলছিলেন আকিল খান। এবার দিলেন দুটি মুক্তা। দুটিই নিটোল গোল, দুটিই একেবারে সমান ওজনের। ২৫½ রতি এক একটি। একটি ঈষৎ হলদে, অন্যটির রঙ অতি সজীব, যতটা সুন্দর একটি মুক্তার পক্ষে হওয়া সম্ভব ঠিক তেমনটি। একথা অবশ্য ঠিক, যিনি পর্তুগীজদের কাছ থেকে মসকাত দখল ক'রে নিয়েছেন অ্যারাবীয়ার সেই সুলতানের কাছে যে মুক্তাটি রয়েছে সেটিই হল সৌন্দর্যে পৃথিবীর সব মুক্তার সেরা। যেমন নিটোল গোল, তেমনি ধবধবে সাদা ও সজীব, দেখলে ভ্রম হবে বুঝিবা স্বচ্ছ সেটি। তবে ওজনে সেটি মাত্র ১৪ ক্যারাটের। এশিয়ার এমন কোন সুলতান নেই যিনি তার কাছে সেটি বেচে দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেননি অ্যারাবীয়ার সুলতানকে।

এরপর দেয়া হল আমার হাতে দু ছড়া মালা। একটি মুক্তা ও বিভিন্ন আকৃতির

চুনি মুক্তার মতো ছেঁদা করে গাঁথা। অন্যটি মুক্ত' আর পান্নার। পান্নাগুলি গোলাকার ও ছেঁদা করা। সব কটি মুক্তাই গোল। রঙ বিভিন্ন ধরনের। ওজন এক একটির ১০ থেকে ১২ রত্তি। চুনি থাকা মালাদ্বির ঠিক মাঝে রয়েছে 'ওল্ড রক' (অতি পাঁক' ও সর্বাধিক মূল্যবান গোত্রীয় একটি বড পান্না। আয়তাকার ক'রে কাটা ও অতি ঝলমলে রঙা। তবে ভেতরে অনেকগুলি খুঁত। ওজন তিরিশ রত্তির মতো। পান্না থাকা মালাটির মাঝে রয়েছে একটি প্রাচ্য দেশীয় এমিথিষ্ট বা রক্তমুখি নীলা। দেখতে লম্বাটে সমতল, ওজনে ৪০ রত্তির কাছাকাছি। সৌন্দর্যের দিক থেকেও নিখুঁত। দেখলাম একটি ব্যালাস চুনিও। অবতল পশ্চাত রীতিতে কাটা। যেমন চমৎকার তার রঙ তেমন সেটি স্বচ্ছ। উত্তাল বিন্দুতে ছেঁদা করা। ওজন ১৭ মিশকাল। ছয় মিশকাল হল এক ফ্রেঞ্চ আনসের সমান। হাতে দিলেন এরপর আরো একটি ওই একই রীতিতে কাটা চুনি। রঙের দিক থেকে পুরো ত্রুটিহীন, তবে সামান্য খুঁত রয়ে গেছে পাথরটিতে। এটিও উত্তাল বিন্দুতে ছেঁদা করা। ওজনে ১২ মিশকাল। দিলেন এবার একটি প্রা'চ্যদেশীয় টোপাজ (হলদে রচা পুষ্পরাজ)। বেশ ঝলমলে রঙের আটটি চৌখুপী ক'রে কাটা। ওজন ছয় মিশকাল। তবে রয়ে গেছে ভেতর পানে একদিকে একটি সাদা ফুটকি।

।। এগারো ।। মুঘল সাম্রাজ্য, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী

ইতিপূর্বে যারা মহাপ্রতাপী মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে বই লিখেছেন তারা কেউই যে সে-দেশ বিদেশী রাজ্যগুলিকে কি কি পণ্যসম্ভার যোগান দেয় তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়ার কোন তাগিদ বোধ করেননি স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে একথা। তাই দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে সে-দেশ ভ্রমণ কালে এ সম্পর্কে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে, শোনাব এখানে তা। অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করা'এসব তথ্য নিঃসন্দেহে খুশী করবে আপনাদের। বিশেষ ক'রে যদি আপনি ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে থাকেন তবে তো কথাই নেই।

বইটির প্রথম পর্বে ভারতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে যে-সব খবর শুনিয়েছি তা স্মরণ রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে। বলেছি সেখানে তাদের ওজন মণ ও সেরের কথা। পরিমাপ, ভারতীয় 'হাত' সম্পর্কে আরো গুটিগতক কথা বলা দরকার মনে করি এখানে।

এল বা গজ পরিমাপ ভিত্তিতে যে-সব সামগ্রী পরিমাপ করা হয়ে থাকে সেগুলি মাপার জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে-দেশে 'হাত'-এর। ইওরোপে

যেমন বিভিন্ন মাপের এল চলিত রয়েছে ঠিক তেমনি চলিত রয়েছে সেখানে বিভিন্ন মাপের 'হাত'। এই 'হাত' আবার ২৪ তসু-তে বিভক্ত। ভারতীয় পণ্য সম্ভারের বেশির ভাগই যেহেতু সুরাটে সরবরাহ করা হয় তাই পৃষ্ঠার কিনারে দিয়ে দিলাম সুরাটে চলিত হাতের এক-অষ্টমাংশ বা তিন তসুর দৈর্ঘ।

প্রথমে শোনানো যাক আপনাদের রেশম, সুতী বস্ত্র, তুলা, মশলা ও ওষধি এই পাঁচ শ্রেণীর অন্তর্গত যা কিছু পণ্যসম্ভারের কথা।

রেশম

কাশিমবাজার বাংলা রাজ্যের একটি গ্রাম। বার্ষিক ২২ হাজার বেল রেশম যোগান দেয়ার ক্ষমতা ধরে সে। প্রতিটি বেলের ওজন ১৬ আউন্সের ১০০ লিভর। ডাচরা সাধারণতঃ ৬ থেকে ৭ হাজার বেল নেয় এ থেকে। হয় জাপান নয়তো হল্যাণ্ডের জন্য। আরো বেশি মাল পেলে খুশী হত তারা। কিন্তু তাতার দেশ ও মুঘল সাম্রাজ্যের বণিকেরা বাধার সৃষ্টি করে তাতে। এই বণিকরাও নেয় ডাচদের সমান মাল। বাকিটা থেকে যায় স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে নিজেদের কাপড়-চোপড় বোনার জন্য। এই রেশমী সুতার প্রায় সবটাই নিয়ে আসা হয় গুজরাটে। এবং তার বেশির ভাগই আবার আহমদাবাদে ও সুরাটে। সেখানে বোনা হয় তা দিয়ে রকমারী বস্ত্র-সম্ভার।

প্রথমতঃ তৈরি করা হয়ে থাকে তা দিয়ে কার্পেট। রেশম ও সোনার সুতা দিয়ে, রেশম, সোনা আর রূপার সুতা দিয়ে; শুধু রেশমের সুতা দিয়ে। এগুলি তৈরি হয় সব সুরাটে। পশমী কার্পেট বোনা হয়ে থাকে আগ্রা থেকে বারো কোশ দূরে ফতেহপুর সীক্রী-তে।

দ্বিতীয়তঃ বুনোট করা হয়ে থাকে সাটিন। কতক সোনা ও রূপার ডুরি দেয়া। কতক বিভিন্ন রঙা ডুরি দেয়া। কতক আবার ডুরি-বিহীন সাধাসিধে একরঙা। তৈরি করা হয় ঠিক এই একই রকম ভাবে বিভিন্ন প্রকার তাফতাও।

তৃতীয়তঃ উৎপাদন করা হয় পটোল (বা পট্ট বস্ত্র)। এগুলি অতি কোমল রেশমী বস্ত্র। পুরো জমিন জুড়ে বিভিন্ন রঙা ফুলের বাহার। বোনা হয়ে থাকে এগুলি আহমদাবাদে। এক এক খণ্ডের দাম ৮ থেকে ৪০ টাকা অবধি বিভিন্ন রকমের। ডাচ কোম্পানীর লাভজনক লগ্নীগুলির এটি একটি। এজন্য, কোম্পানীর কোন কর্মচারীকেই ব্যক্তিগত ভাবে এ ব্যবসা করার অনুমতি দেয় না তারা। এই

বস্ত্রসম্ভার রপ্তানি করা হয়ে থাকে ফিলিপাইন, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা, ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে।

কাঁচা রেশম সম্পর্কে জেনে রাখুন একটি কথা। প্যালেষ্টাইন ছাড়া আর কোথাও তা সাদা হয় না প্রাকৃতিক ভাবে। কিন্তু অলেপ্পো ও ত্রিপোলির সওদাগরেরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যায় সে রেশম অল্পস্বল্প সংগ্রহ করতে। কাশিম বাজারের কাঁচা রেশম পারস্য ও সিসিলির মতোই হলুদাভ। কিন্তু তাকে কি ক'রে সাদা করতে হয় সে রহস্য জানা রয়েছে কাশিম বাজারের অধিবাসীদের। ৮০।গাছের ছাইয়ের জলে সে-গুলিকে ধোলাই ক'রে প্যালেষ্টাইনের রেশমের মতোই ধবধবে ক'রে তোলে তারা। কাশিম বাজার থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটি খাল পথ দিয়ে বাঙলা থেকে সংগৃহীত এই রেশম ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসে ডাচরা। এই খালটি প্রায় ১৪ কোশ লম্বা। গঙ্গা ধরে হুগলী আসতেও পাড়ি দিতে হয় সমান পথ। তারপর সেখানে বোঝাই করা হয় তা ডাচ জাহাজগুলিতে।

সূতি কাপড়ঃ চিত (চিন্তজ) বা চিত্রিত কাপড়

চিত (চিন্তজ) বা চিত্রিত সূতী কাপড় তৈরি হয় গোলকুণ্ডায়। বিশেষ ক'রে মসুলিপত্তমের নিকট-অঞ্চলে। এগুলির অন্য নাম কলমেনদর (কলমদার) বা 'তুলি দিয়ে চিত্রিত' বস্ত্র। এর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প। এ পেশায় যত জন কারিগর আছেন সবাইকে নিয়োগ করলেও তিন বেল কাপড় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মুঘল সাম্রাজ্যে যে সব চিত তৈরি হয় সেগুলি চিত্রিত নয়, ছাপা। সূতী কাপড়ের সূক্ষ্মত্ব ও ছাপার রকমফের অনুযায়ী বিভিন্নতা রয়েছে এর সৌন্দর্যে। লাহোরে উৎপাদিত চিত-ই সব থেকে মোটা। এই কারণে সব থেকে সস্তাও। কুড়ি হিসাবে বিক্রী হয় এগুলি। দাম পড়ে ষোল থেকে তিরিশ টাকা। সিরোঞ্জেও তৈরি চিতের দাম বিশ থেকে ষাট টাকা অব্দি বা কিছু কম-বেশি। সব চিতই সূতী কাপড়ের ওপর ছাপা। শয্যা-আবরণী, সুফ্রা বা খাবার চাদর, বালিশের খোল, পকেট-রুমাল, এবং পারস্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক ভাবে সকলের ওয়েষ্ট কোট তৈরির জন্য ব্যবহার হয় এগুলির। ঝলমলে রঙা চিতের উৎপাদন কেন্দ্র হল বুরহানপুর। বানানো হয় এগুলি দিয়ে রুমাল। যারা নস্য নেন তারা অধুনা খুবই ব্যবহার করেন এগুলি। ব্যবহৃত হয় এছাড়াও এগুলি

ওড়না রূপে। এশিয়া জুড়ে মেয়েরা এগুলি অবগুণ্ঠন হিসাবে মাথায় দেয় বা গলায় জড়ায় তা।

বাফতা বা সুতী কাপড়-কে রাঙিয়ে নিতে হয় লাল, নীল, কালো প্রভৃতি রঙে। বেরঙ' অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এগুলি আগ্রা ও আহমদাবাদ। কেননা, রাঙানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীল এ দুই শহর ও তার আশেপাশের এলাকাতেই উৎপাদিত হয় সাধারণতঃ। দাম প্রতি খণ্ড দু থেকে তিরিশ-চল্লিশ টাকা পর্যন্ত। সুক্ষত্ব, পাড়ে ব্যবহৃত সোনার পরিমাণ এবং ওই সাথে কতকের দুদিককার আঁচলে ব্যবহৃত সোনার পরিমাণের দরুন দামের এ জাতীয় রকমফের। এক বিশেষ ধরনের জলে চুবিয়ে কি ক'রে এই বস্ত্রগুলিকে উটের লোমে তৈরি বস্ত্রের মতো ঢেউ খেলানো ক'রে তোলা যায় সে কারিগরীও ভারতীয়দের দখলে। এ ধরনের বস্ত্রগুলিই বাফতার মধ্যে সব থেকে মূল্যবান।

যে-সব বাফতার দাম খণ্ড পিছু দুই থেকে বারো টাকার মধ্যে সেগুলিই সাধারণতঃ রপ্তানি হয়ে থাকে মেলিন্দ (মলিন্দ, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলস্থ একটি আরব শহর) উপকূল অঞ্চলে। মোজাম্বিকের শাসনকর্তার প্রধান বাণিজ্য এটি-ই। সেখানকার কাফেরদের কাছে তিনি বেচে থাকেন এগুলি। তারা বেচার জন্য নিয়ে যায় আবার আবিসিনিয়া ও সব রাজ্যে (দক্ষিণ অ্যারাবীয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চল)। সাবান ব্যবহার করে না সেখানকার অধিবাসীরা। আর এ কাপড়গুলো ব্যবহার করা চলে শুধু জলকাচা দিলেই। যেগুলির দাম বারো বা তার ওপরে সেগুলি রপ্তানি করা হয় ফিলিপাইন, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ এলাকায়।

সাদা সুতী বস্ত্র

সাদা সুতী বস্ত্র সংগ্রহ করা হয় আংশিক লাহোরের প্রান্তিক অঞ্চল ও আগ্রা থেকে, আংশিক বাঙলা থেকে। কিছু কিছু বরোদা, ব্রোচ, রেননসারী (সুরাট থেকে ২৪ মাইল দক্ষিণে, নবসারী) ও অন্যান্য সব অঞ্চল থেকে। কোরা অবস্থায় নিয়ে আসা হয় সেগুলিকে রেননসারী ও ব্রোচ। সেখানকার গ্রামাঞ্চলে প্রচুর লেবু হয় বলে রয়েছে সেখানকার বড় বড় মাঠ জুড়ে এগুলি ধোলাইয়ের ব্যবস্থা। লেবুর জলে ভিজিয়ে না রাখলে পরিষ্কার হয় না এগুলি ভালভাবে।

আগ্রা, লাহোর ও বাঙলা থেকে আনা সুতীর কাপড় বেচা হয় কুড়ির থাক হিসাবে। দাম ষোল টাকা থেকে তিনশো, চারশো এমনকি তারও বেশি। অর্থাৎ

বরাত দিয়ে যেরূপ সরেস মাল তৈরী করা হয় সেই মতো দাম। বেনারসারী ও ব্রোচে যে-সব সুতী বস্ত্র বোনা হয় কোরা অবস্থায় থাকে সেগুলি একুশ হাত ক'রে লম্বা। ধোলাইয়ের পর খেপে গিয়ে হয়ে যায় কুড়ি হাত। বরোদারগুলি কোরা অবস্থায় কুড়ি হাত, ধোলাই পরে ১৯½ হাত। এ তিনটি শহর থেকে যে সব বাফতা ও সুতী বস্ত্র আসে তা দু'ধরনের। চওড়া আর খাটো। যেগুলির কথা একটু আগে বললাম সেগুলি হল খাটো প্রস্থের। এর এক এক খণ্ডের দাম দুই থেকে ছয় মাহমুদী। চওড়াগুলি প্রস্থে দেড় হাত, দৈর্ঘ্যে ২০ হাত। এর দাম সাধারণত: পাঁচ থেকে বারো মাহমুদী। বণিকেরা চাইলে বরাত দিয়ে এর চেয়েও বেশি চওড়া, বেশি সরেস জিনিস পারেন তৈরি করিয়ে নিতে। সে-সবের দাম পাঁচশো মাহমুদী পর্যন্ত নানারকম। আমি সে-দেশে থাকা কালে এমন দুখণ্ড কাপড় বিক্রী হতে দেখেছি যার এক এক খণ্ডের জন্য ক্রেতা দিয়েছেন এক হাজার মাহমুদী। একখানি কেনেন ইংরেজরা, অন্যখানি ডাচরা। দু'খানিই ২৮ হাত ক'রে লম্বা। ভারতে দৌত্য সেরে যখন পারস্যে ফিরে এলেন মুহম্মদ আলী বেগ, শাহ দ্বিতীয় সফবীকে দিলেন তিনি উট পাখির ডিমের আকারের একটি নারকেল। নানা রকম মূল্যবান রত্ন-মণ্ডিত সেটি। যখন নারকেলটি খোলা হল তার ভেতর থেকে বার হল ৬০ হাত লম্বা কাপড়ের একটি পাগড়ী। মসলিন বস্ত্র এটি। এত সূক্ষ্ম যে হাত দিয়ে ধরেও সহজে কেউ বুঝতে পারবে না সেটি কি। একবার পর্যটন শেষ ক'রে ফেরার বেলা আমার শখ হল এর এক আউন্স সুতা নিয়ে যাবার। দাম পড়ল লিভর পিছু ৬০০ মাহমুদী হারে। দরবারের বহু মহিলা সহ প্রয়াত বিধবা রাজমাতা পর্যন্ত অবাক বনে গেলেন সেই সুতার সূক্ষ্মতা দেখে। বলতে গেলে দেখাই যায় না তা চোখে।

তুলার সুতা

তুলা ও তুলায় কাটা সুতা আসে বুরহানপুর ও গুজরাট সুবা থেকে। যতটা ঠাই দখল করে সে তুলনায় দাম নেহাৎ তুচ্ছ বলে ইওরোপে পাঠানো হয় না কোন তুলা। রপ্তানি করা হয় তা একমাত্র বা লোহিত সাগর এলাকা, হরমুজ, বসরা, কখনো কখনো সুন্দ দ্বীপমালায় আর ফিলিপাইন অঞ্চলে। সুতার বেলা কি ইংরাজ কি ডাচ দুই কোম্পানীই তা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে ইওরোপে। তবে, সেরা মিহি জাতের সুতা না। যে-সব জাতের সুতা ১৫ থেকে ৫০ মাহমুদী মধ্যে মণ তাই (৩৪ লিভরের মণ)। এ সুতা মোমবাতির সলতে,

মোজা বোনা এসবের জন্য প্রয়োজন হয়, মিশেল দেয়া হয় রেশমের সঙ্গে রেশম বস্ত্রে। সেরা জাতের সুতা কোন কাজেই আসে না ইওরোপে।

নীল

মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে এটি। বিভিন্ন অঞ্চলের জিনিসের মান বিভিন্ন রকম। দামও সেই অনুযায়ী কম-বেশি।

প্রথমতঃ মেলে তা আগ্রা থেকে এক হতে দুদিনের পথ বিয়ানা (ভরতপুর রাজ্য), ইন্দৌয়া (হিনদৌন, জয়পুর রাজ্য), কোরসা (খুরজা, বুলন্দশহর জেলা, উত্তরপ্রদেশ) এলাকায়। এখানকার নীলই সবার সেরা রূপে গণ্য। সুরাট থেকে আটদিনের পথ এবং আহমদাবাদ থেকে দু কোশ পথ দূরে, সারখেজ নামের একটি গাঁয়েও উৎপাদিত হয় এটি। চাক কাটা নীল আনা হয় প্রধানতঃ সেখান থেকেই। আর আনা হয় গোলকুণ্ডা রাজ্য থেকে কিছুটা। মানের দিক থেকেও যেমন তা এক, তেমনি দামের দিক থেকেও প্রায় এক। সুরাটী নীল, যার এক মণ ৪২ সের বা আমাদের ৩৪½ লিভরের সমান, মেলে পনের থেকে কুড়ি টাকায়। এই জাতের নীল তৈরী হয়ে থাকে কিছু পরিমাণে ব্রোচেও। আগ্রার পড়শী এলাকা থেকে যেগুলি আসে সেই সেরা জাতের নীল চাক কাটা হয় অর্ধ মণ্ডলাকারে। এখানকার এক মণ ৬০ সের বা ৫১¾ লিভরের সমান। দাম গুণতে হয় মণ পিছু ৩৬ থেকে ৪০ টাকা। সুরাটের সড়ক পথে বুরহানপুর থেকে ৩৬ কোশ দূরে রাউত নামের একটি বড় গ্রাম ও তার আশেপাশের সব ছোট ছোট গ্রামগুলিতে (পূব খান্দেশ জেলার অরাবদ-এর সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন একে Sir W. Foster) সেখানকার অধিবাসীরা এক লাখেরও বেশি টাকার নীল বেচে থাকেন প্রতি বছর।

সবার শেষে বলি বাঙলার নীলের কথা। ডাচ কোম্পানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে তা মসুলিপত্তমে। এই নীল এবং বুরহানপুর ও আহমদাবাদ অঞ্চলের নীল আগ্রার তুলনায় দামে শতকরা তিরিশ ভাগ শস্তা।

যে-ধরনের উদ্ভিদ থেকে নীল উৎপাদিত হয় তার চাষ শুরু হয় প্রতিবছর বর্ষার পরে পরেই। নীলে রূপান্তরিত হবার আগ পর্যন্ত দেখতে তা অনেকটা শণ গাছের মতোই। বছরের মধ্যেই তিনবার কাটা হয় একে। প্রথমবার কাটা হয় দু-তিন ফুট মতো উঁচু হয়ে গেলেই, গোড়ার দিকে ইঞ্চি ছয়েকের মতো রেখে দিয়ে। প্রথম কাটা ডাঁটিগুলি দ্বিতীয় বারের তুলনায় ভাল। দশ থেকে

বারো ভাগ নীল কম মেলে দ্বিতীয় বারেরগুলি থেকে। তৃতীয় বা শেষ বারের-গুলি থেকে মেলে দ্বিতীয় বারের চেয়েও কুড়ি ভাগ কম। রঙের আভাতেও থাকে পার্থক্য, আর তা থেকেই করা হয়ে থাকে এদের শ্রেণীবিন্যাস। যে কোন এক চাক নীল ভাঙলেই ধরা যায় এই পার্থক্য। প্রথম বারের ডাঁটিগুলি থেকে তৈরী নীল বেগুনী ঘেঁষা নীল রঙা। পরেরগুলির তুলনায় অনেক সুদৃশ্য, অনেক ঝলমলে এ রঙের আভা। দ্বিতীয় বারের রঙের আভা আবার তৃতীয়ের তুলনায় ঝলমলে। এই প্রভেদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে তার দামের ওপর। এছাড়াও শাস্ত্র রয়ে গেছে ওজন ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিয়ে ভারতীয়দের নানা কারসাজি। তবে, সে-কথায় আসছি একটু পরে।

ডাঁটিগুলি কাটার পর ভিজিয়ে রাখা হয় তা একটি চুন ভরাট জলাধারের ভেতর। এই জলাধারটি পরিধিতে সাধারণতঃ ৮০ থেকে ১০০ পায়ের মতো। যতদিন পাতাগুলি ভালভাবে জারিত হয়ে পেছল কাদার মতো না হয়ে যায় ততদিন প্রত্যহ ঘেঁটে ওলট পালট ক'রে দেয়া হয় তাকে। তারপর চুপচাপ ফেলে রাখা হয় দিন কতক। যখন দেখা যায়, সব জলের নীচে তলিয়ে গেছে ও ওপরের জল স্বচ্ছ চেহারা নিয়েছে, তখন জলাধারের চারিদিকে থাকা নালী-গুলি খুলে দেয়া হয় সব জল বার ক'রে দেয়ার জন্য। এরপর ঝুড়িতে ক'রে সেই গাদ তুলে নিয়ে বসে যায় কামিনরা সমতল মাঠে। সেগুলিকে ডেলা পাকিয়ে চলে আধফালি মুরগির ডিমের আকারে। তবে, আহমদাবাদের নীলকে দেয়া হয় সমতল খুদে খুদে কেকের আকার। জাহাজে ক'রে ইওরোপে চালান দেয়ার বেলা এগুলিকে ভাল ক'রে ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নেয়া হয় যাতে ধুলো বালির দরুন জাহাজ ভাড়া বেশি গুণতে না হয় অযথা। পরে, সেই গুঁড়োগুলোকে বেচে দেয় তারা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে। তারা কাপড় বা সুতা রাঙাবার কাজে ব্যবহার করে তা।

কামিনরা আঙুল ডুবিয়ে হাতে তেল মেখে নিয়ে ঝুড়ি থেকে নীলের কাথ তুলে তুলে প্রতিটি ডেলাকে অভীষ্ট আকার দিয়ে শুকোবার জন্য রেখে চলে রোদে। সওদাগররা যখন তা কেনে, গুটি কতক চাকা সব সময়ে পুড়িয়ে দেখে নেন তাতে বালি মেশাল দেয়া হয়েছে কিনা। কেননা, কামিনরা সেগুলি দলা পাকানোর বেলা তেল মেখে নিয়ে বালির ওপর রাখে হাতটিকে। ফলে তা নীলের কাথের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওজনদার ক'রে তোলে তাকে। আগুনে পোড়ালে নীল ছাই হয়ে যায়, বালি পড়ে থাকে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি।

ধরা পড়ে যায় তাই বালি ভেজাল থাকলে। শাসনকর্তারা এই জুয়াচুরি রোখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না, তবু সব সময়েই কিছু না কিছু লোক ক'রে চলে তা।

সোরা

যেমন আগ্রা থেকে তেমনি বাঙলার একটি শহর পাটনা (বর্তমানে বিহারে) থেকে মেলে সুপ্রচুর সোরা। অপরিশোধিত সোরার তুলনায় পরিশোধিত সোরার দাম তিনগুণ। পাটনার চোদ্দ কোশ ওপর দিকে ছাপরায় এজন্য একটি কুঠি স্থাপনা করেছে ডাচরা। যত সোরা সেখানে পরিশোধন করা হয় নদীপথে হুগলী পাঠিয়ে দেয়া হয় ত। এজন্য হল্যাণ্ড থেকে বয়লার আনিয়ে নিজেরাই উদ্যমী হয়েছিল পরিশোধনের কাজে। কিন্তু সফল হতে পারেনি তাতে। স্থানীয় লোকেরা যখন দেখল, পরিশোধন ক'রে তারা যে লাভ ক'রে চলেছে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার মতলবে রয়েছে ডাচরা, অমনি দিল তারা ঘোল সরবরাহ বন্ধ ক'রে। এটি না পেলে সম্ভব নয় সোরা পরিশোধন। কেননা, খুব সাদা আর অতি স্বচ্ছ না হলে কোন মূল্যই নেই সোরার। এক মণ সোরার দাম সাত মাহমূদী।

মশলা

এলাচ, আদা, গোলমরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনি আমাদের পরিচিত মশলার মধ্যে কয়েকটি। এলাচ ও আদার কথা বলা যাক প্রথমে। কেননা, এর মধ্যে প্রথমটি জন্মায় বিজাপুর রাজ্যে এবং দ্বিতীয়টি মুঘল সাম্রাজ্যে। এছাড়া বাকি মশলাগুলি বাইরে থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে সুরাটে। সেখানকার বাণিজ্যের কতক বিশিষ্ট পণ্য এগুলি।

এলাচ হল মশলার মধ্যে সেরা। তবে ভারী দুষ্প্রাপ্য। আর যেখানকার কথা বললাম মাত্র সেখানেই যা এটি জন্মায় অল্প পরিমাণে। তাই, অভিজাতরাই শুধু এটিকে ব্যবহার ক'রে থাকেন তাদের খাদ্যে। ৫০০ লিভর এলাচ বিক্রী হয় ১০০ থেকে ১১০ রিয়ালে।

আদা আসে আহমদাবাদ থেকে। এবং প্রচুর পরিমাণেই। এসিয়ার অন্য যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা এখানে এর ফলন অনেক বেশি। মুরব্বার (candy)

পরিণত করে যত আদা বিদেশে রপ্তানি করা হয়, তুষ্কর হয়ে পড়ে তার সবটা বেচা।

মরিচ দুই প্রজাতের। একটি ছোট, অন্যটি তার তুলনায় অনেক বড়। এ দুটি যথাক্রমে ক্ষুদে মরিচ আর লম্বা মরিচ নামে প্রসিদ্ধ। লম্বাগুলি সংগ্রহ করা হয় প্রধানতঃ মালাবার, তুতিকোরিন ও কালিকট শহর থেকে। মেলে তা বিজাপুর রাজ্যেও, বেচা হয় সেখানকার রাজপুর নামের ছোট একটি শহর থেকে। ডাচরা সংগ্রহ করে এগুলি মালাবারীদের কাছ হতে। তবে সরাসরি নগদ অর্থ দিয়ে না, তুলা, আফিম, সিঁদুর, পারদ ইত্যাদি সামগ্রীর বিনিময়ে। এই লম্বা মরিচ-ই চালান হয়ে থাকে ইওরোপে। ক্ষুদে মরিচ মেলে বস্তম, অচীন ও অন্যান্য পূবের দেশগুলিতে। এসিয়া থেকে বাইরে চালান করা হয় না তা। সেখানে প্রচুর চাহিদা এর, বিশেষ ক'রে মুসলমানদের মধ্যে। কেননা, এক পাউণ্ড মরিচে যত লম্বা বিচি থাকে, সমান ওজনের ক্ষুদে মরিচে থাকে প্রকৃতপক্ষে তার দ্বিগুণ। পোলাও-এ বেশি ব্যবহার এর, মুঠো মুঠো দেয়া হয় তাতে। তাছাড়া বড় মরিচে বড্ড বেশি ঝাল।

সুরাটে সরবরাহ করা হলে, এই ক্ষুদে মরিচ কোন কোন বছর দেখা গেছে প্রতি মণ ১৩ কি ১৪ মাহমূদী দরে বিক্রী হতে (৩৪ লিভরের মণ)। ইংরাজ কোম্পানিকে দেখেছি এ দরে কিনতে। তারা রপ্তানি করে ঐগুলি (এসিয়ার) হরমুজ, বসরা এবং লোহিত সাগর অঞ্চলে। লম্বা মরিচ হলাণ্ডীরা কেনে মালাবার উপকূল অঞ্চল থেকে প্রতি ৫০০ লিভর ৩৮ রিয়াল দরে। তবে, পণ্যের বিনিময়ে কেনে বলে ঐ সূত্রে পায় তারা প্রকৃতপক্ষে এর আধেক দামে। নগদ টাকা দিয়ে কিনলে পেয়ে যেত তারা ২৯ থেকে ৩০ রিয়াল দরে। কিন্তু ডাচরা যে কায়দায় কেনে তার চেয়ে এতে বেশি গুণতে হত আসলে। মুঘল অঞ্চলের গভীরে না গিয়ে গুজরাট রাজ্য থেকেই মিলে যায় প্রচুর লম্বা মরিচ। দাম পড়ে মণ পিছু ১২ থেকে ১৫ মাহমুদি। লম্বা মরিচের কাঠ মেলে চার মাহমূদী দরে।

জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনি—মশলার মধ্যে এই চারিটির ওপরেই যা ডাচদের আধিপত্য। প্রথম তিনটি মেলে মলুক্কা দ্বীপমালা থেকে। আর চতুর্থ বা দারুচিনি সিংহল দ্বীপ থেকে।

বিশেষ কতক বছরে লবঙ্গ ও জায়ফল কেনাবেচা দেখার সুযোগ হয়েছে আমার সুরাটে। ওই সময়ে সেখানকার ডাচ কোম্পানির কাছে লবঙ্গ বেচেছে তারা প্রতি মণ ১০৩½ মাহমূদী, জৈত্রী ১৫৭½ মাহমূদী, আর জায়ফল ৫৬½

মাহমুদী দরে। সুরাটের মণ ৪০ সেরি, আমাদের ১৬ আউন্সের ৩৪ লিভরের সমান।

দারুচিনি পুরোটাই আসে বর্তমানে সিংহল দ্বীপ থেকে। যে গাছ থেকে এটি মেলে তার সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে আমাদের উইলো গাছের। তিন পরত ছাল রয়েছে এই গাছের দেহে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরত দুটিই যা কেটে ছাড়িয়ে নেয়া হয় তা থেকে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিই আবার সেরা মানের। প্রথম দুটি পরত ছাড়িয়ে নেয়ার সময় তৃতীয় পরতটিতে যাতে ছুরির ঘা না লাগে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় সেদিকে। সেটিতে চোট লাগলে বাঁচে না আর গাছগুলি। এই কাটার কৌশল ছেলেবেলা থেকে তালিম পেয়ে পেয়ে আয়ত্ত ক'রে ফেলে স্থানীয় অধিবাসীরা। সাধারণত যা মনে করা হয়, দারুচিনি সংগ্রহের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়ে ডাচদের। কেননা, সিংহলের রাজা, যিনি রাজধানী শহরের নামানুসারে কাণ্ডীর রাজা রূপে খ্যাত, ডাচদের প্রতি ঘোর বৈরী ভাবাপন্ন। ডাচরা তাঁকে যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা না রাখার দরুনই সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কের। তাই প্রতিবছরই ছাল সংগ্রহের সময় কামিনদের ওপর অতর্কিত হামলার জন্য সেনা পাঠান তিনি। ফলে তাদের নিরাপত্তার জন্য পনের ষোল শ সেনা পুষতে হয় ডাচদের। তার মানে, একজন দারুচিনির ছাল কাটালি পিছু একজন ক'রে সেনা। এছাড়াও যোগাতে হয় এই সব কাটালীদের বছরের বাকী সময় খাই-খরচ। রয়েছে এর পরেও আবার দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন ব্যয়। এ সবের ফলে বিরাটভাবে বেড়ে গেছে দারুচিনির উৎপাদন খরচ। পর্তুগীজদের দখলে এ ব্যবসাটি থাকা কালে পরিস্থিতি কিন্তু এরকমটি ছিল না মোটেই। তাদের পোয়াতে হয়নি এত সব বাড়তি খরচের ঝক্কি। ফলে, প্রায় পুরোটাই ছিল তাদের লাভ। দারুচিনি গাছের ফল দেখতে অনেকটা জলপাইয়ের মতো। তবে, খাবার উপযোগী নয় মোটেই। পর্তুগীজরা অন্যভাবে কাজে লাগাতো এর একাংশ। বোঁটা শুদ্ধু কড়াইয়ে চাপিয়ে করা হত তাকে জলে সেদ্ধ। জাল দেয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত না বাষ্প হয়ে উবে যায় পুরোটা জল। ঠাণ্ডা হবার পর ওপরে জমা হত সাদা মোমের মতো কাথ। আর, তলের দিকে কর্পূর। ওই কাথ দিয়ে বানাতো তারা সরু ছোট ছোট বাতি। ব্যবহার করত তা তারা তাদের গীর্জাগুলিতে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান কালে। সেগুলি জ্বালানো মাত্র সমগ্র গীর্জা ভুরভুর হয়ে উঠত দারুচিনির সুবাসে। লিসবনে রাজকীয় গীর্জাতেও পাঠানো হত প্রায়ই

এগুলি। আগে, কোচিনের আশেপাশের রাজাদের রাজ্যগুলি থেকেও দারুচিনি (বাস্টার্ড দারুচিনি) সংগ্রহ করত পর্তুগীজরা। কিন্তু ডাচরা কোচিন শহর দখল এবং দারুচিনির জন্মস্থলী সিংহলের উপকূল অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর দেখল, কোচিনের পড়শী অঞ্চলের দারুচিনি ক্ষতি ঘটিয়ে চলেছে তাদের দারুচিনি ব্যবসায়ে। সেখানকার দারুচিনি সিংহলের মতো উৎকৃষ্ট না হওয়ার দরুন বিক্রী হত কম দামে। তাই ধ্বংস ক'রে দিল তারা কোচিন ও তার পড়শী অঞ্চলের দারুচিনি ক্ষেতগুলি। নেই এখন তাই সিংহলীয় ছাড়া আর কোন দারুচিনির অস্তিত্ব। আর সে দারুচিনির পুরোটাই তাদের হাতের মুঠোয়। এই উপকূল অঞ্চল যখন পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল তখন ইংরাজ কোম্পানী তাদের কাছ থেকে কিনত দারুচিনি। দিত এজন্য তাদের মণ পিছু পঞ্চাশ মাহমুদী ক'রে দাম।

সুরাটে বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা ওষধি সমূহের বাজার দর

সল (সল্ট) অ্যামোনিয়াক—চলতি সাধারণ দর	মণ প্রতি	২০	মাহমুদী
বোরাক্স বা সোহাগা—ওপরেরটির মতো এটিও আনা হয় আহমদাবাদ থেকে অপরিশোধিত অবস্থায়।	,,	৩৫	,,
চাঁচ-গালা	,,	৭½	,,
ঐ—পরিশোধিত—	,,	১০	,,
ঐ—সীল দেয়ার গালার কাঠি আকারে কোন কোন ধরনের বেলা মণ প্রতি দাম ৫০ বা ৬০ মাহমুদী। কস্তুরী যোগ করা হলে তার চেয়েও বেশি।	,,	৪০	,,
জাফরান—সুরাট থেকে মেলা, একমাত্র রঙের জন্য ব্যবহার করা হয় এর	,,	৪½	,,

সাদা জিরা	মণ প্রতি	৮	মাহমুদী
কালো জিরা	,,	৩	,,
ক্ষুদে আরদেট (সম্ভবতঃ কালো হরীতকী)	,,	৩	,,
ধুনা—আরব উপকূল থেকে আনা	,,	৩	,,
মস্তকি—Mirrhagilet (myrrh-gilet) রূপে অভিহিত সেরা মানের	,,	৩০	,,
Mirrha-Bolti—আরব দেশ থেকে আনা	,,	১৫	,,
Cassia (The fruit of Cassia fistula, L)	,,	২	,,
মিছরি	,	১৮	,,
Asutinat—এক ধরনের অতি উত্তেজক শস্য (সম্ভবতঃ পারসিক ইসবগুল)	,,	১	,,
Fenouil (The fruit of Pimpinella anisum, L) —large			
Do— small & very hot	,,	১½	,,
Oupelote root (The root of Aucklandia costus)	,,	১৪	,
Cointre(সম্ভবতঃ গুগগুল বা ধুনা)	,,	৫	,,
Anzerout (Anzarūt : এক জাতীয় ধুনা)	,,	১২০	,,
Aloes sucotrine (Prepared from the juice of Aloe perryi, Linn) আরব থেকে	,,	০৮	,,
যষ্ঠি মধু	,,	৬	,,
কুচিলা গাছের শিকড়	,,	১২	,,
অগুরু—বড় টুকরা	,,	২০১	,,
— ঐ —ছোট টুকরা	,,	৪০০	,,
— ঐ—অতি তৈলাক্ত	,,	৪০০০	,,

শোনাই এবারে লাক্ষা, চিনি, আফিম, তামাক ও কফি সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য।

লাক্ষার প্রায় সবটাই আসে পেগু থেকে। বাংলা রাজ্যেও মেলে কিছুটা। আর এই শেষের অঞ্চলটির লাক্ষাই হলো মূল্যবান। এটি থেকে নিষ্কাশন করে সেখানকার অধিবাসীরা সুতী কাপড় চিত্রণ ও রাঙানোর জন্য ব্যবহৃত সুদৃশ্য

উজ্জ্বল লাল রঙ। এ সত্ত্বেও ডাচরা সেখান থেকে সংগ্রহ করে এটি, রপ্তানি করে পারস্যে। সেখানেও ব্যবহৃত হয় এগুলি রঞ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রঙ উৎপাদনে। তারপর মল রূপে যে লাক্ষা অবশিষ্ট থাকে তা লাগানো হয়ে থাকে শাণে কুঁদে তৈরি কাঠের খেলনা রূপম গুনের কাজে। এ ধরনের খেলনা খুবই জনপ্রিয়। তৈরি হয় এছাড়াও এ দিয়ে সীল করার গালা। রঙীন ক'রে তোলার জন্য এই লাক্ষা-মলের সাথে মেশানো হয়ে থাকে ইচ্ছা বা প্রয়োজন মতো যে কোন ধরনের রঙ। পেগু থেকে যে লাক্ষা মেলে তা অন্যান্য দেশের মতো ভালো জাতের হলেও দামে সব থেকে সস্তা। এর কারণ আর কিছুই না। পিঁপড়েরা সেগুলি মাটিতে জমা ক'রে স্তূপ গড়ে তোলে সেখানে। এক একটি স্তূপ কখনো কখনো মদ রাখার পিপের মতোই বড় আকারের। তাই মেশানো থাকে এর সঙ্গে কিছুটা মাটি কি অন্যান্য ময়লা। কিন্তু বাঙলায় সেগুলি তারা ক্ষরণ ক'রে জমা করে সাধারণতঃ গাছ-গাছালি ভরা বনে জঙ্গলে গাছের ডালের প্রান্ত ঘিরে। ফলে সেখানকার লাক্ষা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এজন্যে দামেও বেশি। পেগুর অধিবাসীরা রাঙানোর জন্য রঙ নিষ্কাশন করে না এগুলি থেকে। বাঙলা ও মসুলিপত্তম থেকে আসা রাঙানো সুতীবস্ত্র ব্যবহারেই তারা অভ্যস্ত। তাছাড়া তারা সভ্যতার এরূপ নিচু সোপানে রয়ে গেছে যে প্রসার ঘটেনি তাদের মধ্যে কোন শিল্পকর্মেরই। লাক্ষা-মল দিয়ে গালা তৈরি ক'রে আপন জীবন নির্বাহ ক'রে থাকে সুরাটের বহু স্ত্রীলোক। আপন পছন্দমতো তাতে যে-কোন রঙ মিশিয়ে স্প্যানিশ মোমের ধাঁচে ডাঁটি (Stick) তৈরি করে এর। ইংরাজ ও ডাচ কোম্পানি বছরে প্রায় ১৫০ পেটির মতো বিদেশে রপ্তানি করে এগুলি। আধা-আধি রজন (resin) মেশানো থাকলেও গালার এই ডাঁটিগুলির দাম লিভর প্রতি দশ সোলের বেশি না। ফ্রান্সে বিক্রী হয়ে থাকে এগুলি আনস প্রতি দশ সোল দরে (১৬ আনস—এক লিভর)।

নরম চিনি (বা গুড়) প্রচুর রপ্তানী হয়ে থাকে বাংলা রাজ্য থেকে। হুগলি, পাটনা, ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে অগুণতি যান চলাচল করে এগুলি নিয়ে। পাটা-গুড় (বা মিছরি?) তৈরি হয়ে থাকে গুজরাটে। কি ক'রে একে পরিশোধন করতে হয় সে কৌশল এখানকার অধিবাসীদের ভাল ক'রেই জানা। এজন্য এর নাম হল রাজভোগ্য গুড়। এই গুড়ের এক একটি পাটা বা খণ্ডার ওজন ৮ থেকে ১০ লিভর।

আফিম মেলে বুরহানপুরে। এটি সুরাট ও আগ্রার মাঝে থাকা একটি

উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য চঞ্চল শহর। ডাচরা সেখান থেকে কেনে এ পণ্যটি, তারপর (মালাবার অঞ্চলে) বিনিময় করে এর সাথে গোল-মরিচের।

তামাকও প্রচুর পরিমাণে আবাদ করা হয়ে থাকে বুরহানপুরের আশেপাশের অঞ্চলে। এত অপর্যাপ্ত যে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘরে জমা হয়ে যাবার দরুন এক এক বছর আমি দেখেছি, একেবারেই চাষ করা হয় না এর কিংবা অবহেলা ক'রে নষ্ট হয়ে যেতে দেয় অর্ধেক আবাদ।

[ধূমপানের অভ্যাসটি কিউবার ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ১৯৪২-এ প্রথম রপ্ত করে স্প্যানিয়ার্ডরা। তাদের মাধ্যমেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এটি ছড়িয়ে পড়ে তুরস্ক, মিশর ও ভারতবর্ষে। ঘটতে থাকে তারপর এর ব্যবহারের ক্রমপ্রসার। ওই সময়ে এর প্রসার রোধের জন্য খ্রীষ্টান ও মুসলমান সরকারগুলি প্রবর্তন করেছিল নানারকম কঠোর আইন। কিন্তু সব-ই বিফল হয় শেষ পর্যন্ত।]

কি পারস্য কি ভারতবর্ষ—কফি জন্মায় না এ দুটি দেশের কোথাও (এখন অবশ্য সে চিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে ভারতে)। এ সত্ত্বেও কতক ভারতীয় জাহাজ মক্কা থেকে ফেরার পথে বোঝাই ক'রে নিয়ে আসে এটি। এজন্যই ওষধির তালিকায় নাম করেছি এর। কফির ব্যবসা প্রধানভাবে হয়ে থাকে হরমুজ আর বসরায়। মোচা থেকে ফেরার পথে ডাচরা তা যত পারে নিয়ে আসে জাহাজ বোঝাই ক'রে। কেননা, প্রচুর চাহিদা রয়েছে সেখানে এ পণ্যটির। হরমুজ থেকে তা চালান যায় পারস্যে, এমনকি বৃহৎ তাতার রাজ্যেও। বসরা থেকে ছড়িয়ে পড়ে তা চালদী-তে; ইউফ্রেটেস নদীপথ ধরে তার কূলবর্তী আরব অঞ্চলগুলিতে, মেসোপটেমিয়ায় ও অন্যান্য তুর্কী প্রদেশগুলিতে। ভারতে এর ব্যবহার খুবই অল্প।

আগ্রা থেকে বিল মাধ্যমে যে-সব সামগ্রী সুরাটে আসে তার ওপর বিনিময় খরচ দিতে হয় শতকরা পাঁচ হারে। রয়েছে এছাড়া পণ্য সামগ্রীর ভিন্নতা অনুযায়ী শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত মোড়ক, পরিবহন ও শুল্ক খরচ।

সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে তা বাট কিংবা মুদ্রা যে আকারেই আনা হোক না কেন, সুরাটে প্রবেশ করলেই গুণতে হয় সেজন্য দুই শতাংশ হারে শুল্ক (প্রথম পর্ব ২য় পরিচ্ছেদ দেখুন)। এ শুল্ক ফাঁকি দেয়ার জন্য সম্ভবপর কোন পন্থার আশ্রয় নিতেই কসুর করে না ব্যবসায়ীরা। ধরা পড়লে অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাদের শুধু দ্বিগুণ হারে শুল্ক আদায় ক'রে। রাজারা

অবশ্য খুশী হতেন পুরো অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে পারলেই। কিন্তু কাজীরা তার বিরুদ্ধে। কেননা, কোনরকম বাণিজ্য শুল্ক আদায় ও অর্থের ওপর সুদ নেয়া মহম্মদের অনুশাসন-বিরুদ্ধ।

বারো ॥ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে অনুসৃত ভেজাল ও ঠকামি

রেশমী বস্ত্রে ঘটানো হয়ে থাকে দৈর্ঘ, প্রস্থ ও মানের দিক থেকে নানান কারচুপি। দৈর্ঘ-প্রস্থের বেলা নিশ্চিন্ত হতে হবে তা মেপে নিয়ে। মান নির্ধারণ করতে হবে তা সুসম ভাবে বোনা হয়েছে কিনা, ওজন ঠিক আছে কিনা, রেশমের সঙ্গে তুলো মিশেল দেয়া হয়েছে কিনা এসব যাচাই ক'রে নিয়ে। রেশমের সঙ্গে তুলো মিশেল দেয়ার প্রবণতা অতি প্রবল ভাবে বর্তমান ভারতীয়দের মধ্যে।

রূপার ওপর সোনার জলের প্রলেপ দেয়ার কৌশলটি জানা নেই ভারতীয়দের (এখন আর একথা সত্য নয়)। তাই ডুরি দেয়া বস্ত্রে খাঁটি সোনার সুতো ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তারা। ফলে, ডুরির জন্য সঠিক সংখ্যার সোনার সুতো ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সেটিও দেখে নেয়া দরকার। রূপোর ডুরির বেলাও দেখে নিতে হবে তার সুতোর সংখ্যা। তাফতা বস্ত্রের বেলা প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে তার সূক্ষ্মত্বের প্রতি, দেখে নিতে হবে সেটি সুসম ভাবে বোনা হয়েছে কিনা। তারপর ভাঁজ খুলে পরখ ক'রে নেয়া দরকার, ওজন বাড়াবার উদ্দেশ্যে তার খাঁজের ভেতরে গোঁজা হয়েছে কিনা অন্য কোন সামগ্রী। প্রতিটি খণ্ড সঠিক ওজনের রয়েছে কিনা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটিকে ওজন ক'রে দেখে নেয়া প্রয়োজন তাও।

আগেই জানিয়েছি, প্রচুর পরিমাণ রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হয়ে থাকে আহমদাবাদে। যেমন সোনা ও রেশম মিশিয়ে, তেমন রূপো ও রেশম মিশিয়ে, তেমনি আবার নিরেট রেশমেরও। বুনোট করা হয় এছাড়া সোনা, রূপো আর রেশমের গালিচাও। তবে, পারস্যের মতো এখানকার গালিচাগুলির রঙ দীর্ঘস্থায়ী নয় ততো। হাতের কাজের দিক থেকে অবশ্য দুই-ই সমান সুন্দর।

যে-সব গালিচার ওপর সোনা ও রূপোর কাজ রয়েছে সেগুলির আকার, সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা বিচারের জন্য চোখ গড়ে তোলা দরকার দালালদের। গালিচাখানি ভাল ও মূল্যবান শিল্প সামগ্রী কিনা তা নির্ধারণ করার দায় তারই। তাতে ব্যবহৃত সোনা ও রূপোর সুতো সঠিক মানের কিনা তাও পরখ ক'রে দেখা দরকার কয়েকটি সুতো তা থেকে বার ক'রে নিয়ে।

ডাচ কোম্পানি মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-সব সুতী বস্ত্র বরাত দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয় তার মধ্যে আছে মোটা ও মিহি সব রকমেরই। পাঁজা বাঁধা অবস্থায় এনে জমা করা হয় সেগুলি সুরাটের মালগুদামে। দালালদের সরবরাহ করা হয়'তো অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে।

এ ধরনের বস্ত্রের ক্ষেত্রে ঠকামি করা হয় সাধারণত দৈর্ঘ, প্রস্থ ও মিহিত্ব নিয়ে। প্রতিটি পাঁজায় থাকে প্রায় দুশোখানির মতো কাপড। তার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে হয়তো পাঁচ-ছয় থেকে দশখানি পর্যন্ত কম মিহি, জালি, দৈর্ঘে প্রস্থে খাটো মাপের কাপড়। পাঁজা খুলে একটি একটি ক'রে পরখ ক'রে না নিলে উপায় নেই তা অন্য কোন ভাবে ধরার। মিহিত্ব বিচারের জন্য নির্ভর করতে হবে চোখের দক্ষতার ওপর। দৈর্ঘ প্রস্থ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্য অবশ্য রয়েছে মাপকাঠি ব্যবহারের সুযোগ। ভারতের বেলা করা যেতে পারে আরো একটি পদ্ধতির অনুসরণ। তা হলে, আড়ের বা টানার দিকে মোট কটি সুতো ব্যবহার করা হয়েছে তা গুণে দেখা। যদি কোনটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যার কম থাকে, বুঝতে হবে হয় সেটি জালি, নয়তো খাটো কিংবা মোটা। মানের প্রভেদ এক এক সময়ে এত সূক্ষ্ম যে এভাবে সুতো না গুণে সাদা চোখে ধরা যায় না মোটেই। অথচ বিপুল অঙ্কের সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই অতি সামান্য প্রভেদও দেখা দেয় মোটা ক্ষতির কারণ হয়ে। কেননা, ১৫ থেকে ২০ একু দামের এক একখানি বস্ত্রখণ্ডের ওপর কম পক্ষে ছাড় দিতে হয় তখন এক থেকে দুই একু। যারা এ কাপড়গুলি ধোয় তারাও আবার লেবুর খরচ বাঁচিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য পাথরের ওপর আছড়ায় এগুলিকে। কাপড়টি মিহি হলে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর ফলে, কমে যায় তার মূল্য।

ভারতীয়রা যখন নিজেদের জন্য কাপড় বোনে তখন সেটির দাম দুই একুর বেশি হলেই সোনা ও রূপার সুতো ব্যবহার করে তার দুদিককার আঁচলে। আর কাপড়ের মান যত বেশি মিহি হয় লাগানো হয় তত বেশি করে তা। মূল সুতী কাপড়টির দাম যা, লাগান হয় অনেক সময়ে তার চেয়েও অধিক মূল্যের সোনা ও

রূপার সুতা। এজন্য ফ্রান্সে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে কাপড়ের বরাত দেয়া হলে তাদের নিষেধ ক'রে দেয়া দরকার, তাতে যেন সোনা ও রূপার সুতা না দেয় তারা। ভারতে সোনা ও রূপার সুতা দিয়ে বস্ত্র ও পোশাক অলংকৃত করা হলেও ফ্রান্সে কোন কদর নেই তার। পোলাণ্ড ও মস্কোভির জন্য বরাত দেয়া হলে তাতে কিন্তু ভারতীয় আদলে সোনা ও রূপার অলংকরণ প্রয়োজন। কাপড়ে সোনা বা রূপার কাজ না থাকলে পোল ও রুশীরা মোটেই নেবে না তা। তবে জাহাজে আনার বেলা সতর্ক থাকতে হবে যেন সেঁত (damp) লেগে কালো হয়ে না যায় তা আবার। সেক্ষেত্রে লোকে আর কিনতে চাইবে না তা।

নীলের সাহায্যে বেগনী বা কালো রঙ করার বেলাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে কারিগররা কালো না ক'রে ফেলে দুই আঁচলে থাকা সোনার সুতোগুলিকে। ভাঁজ করার পর কাপড়গুলিকে মসৃণ করার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় থাবড়ে সুতাগুলিকে খণ্ড বিখণ্ড না করে যেন।

প্রতিটি কাপড়ের আঁচলে নীল ও সোনার তবকের সাহায্যে আরবীয় আদলে ফুলের বিচিত্র নক্সা এঁকে দেয় ভারতীয়রা। আঁচলের পুরা প্রস্থ জুড়ে থাকে এগুলি। খরচ পড়ে এজন্য আব পিয়েস্ত। ফ্রান্সে রপ্তানি করার বেলা এই নক্সা আঁকতে নিষেধ ক'রে দিয়ে এ খরচ বাঁচাতে পারেন আপনি। কিন্তু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়ার কোন দেশ বা আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে চালান করার বেলা আঁচল জুড়ে ফুলের এ নক্সাগুলি না থাকলে সেগুলি বেচা দায় হয়ে পড়বে আবার যে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে।

রঙীন ও ছাপা কাপড়ের বেলা রাঙানো ও ছাপার কাজ করা হয়ে থাকে কাপড় কোরা থাকা কালেই। সজাগ থাকা দরকার সে-কাজ যাতে সেরে রাখা হয় বর্ষা নামার আগেই। কেনন', সেগুলি ধোয়ার বেলা জল যত ঘোলাটে থাকে ততই উজল হয়ে ওঠে তুলি বা ব্লকের সাহায্যে চিত্রিত করা নক্সার রঙ (প্রথম পর্ব চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৩৫ দেখুন)।

কোন্ কাপড়টি ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয়েছে, কোন্‌টি তুলি দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে তা স্থির করা সম্ভব অতি সহজেই। আর, দালাল যদি চালাক চতুর কুশলী হয় তবে কাজের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ক'রে কোন্ কাপড়টি ভাল ও সুন্দর, কোন্‌টি তা নয় অনায়াসে বাছাই ক'রে দেবে তা। তবে এ ধরনের কাপড়ের সূক্ষ্মত্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা সাদা কাপড়ের তুলনায় ঢের কঠিন। তাই সে-সব ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

সুতী বস্ত্রের জন্য সবার আগে দরকার সুতা উৎপাদন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফুরাটে তা গুদামজাত করা। কেননা, সুতার পুরোটাই কাটা হয়ে থাকে গুজরাট প্রদেশে। সুতার বেলা ঠকামি সম্ভব শুধু তার ওজন আর মান নিয়েই যা। ওজনে ঠকামি করা চলে মাত্র দুটি পন্থায়। প্রথমতঃ সেঁতসেতে জায়গায় সেগুলিকে ফেলে রেখে কিংবা সুতার লাচির গাঁটে গাঁটে আজেবাজে জিনিস গুঁজে দিয়ে ওই ভাবে তার ওজন বাড়িয়ে; দ্বিতীয়তঃ কারিগর বা বণিকদের কাছ থেকে দালাল ··· সংগ্রহের বেলা ওজনে ফাঁকি দিয়ে।

মানের দিক থেকে ঠকামি করা হয় মাত্র একটি উপায়েই যা। প্রতি মণ সুতায় তিন চার গাঁট নিকৃষ্ট মানের সুতা গুঁজে দিয়ে। এমন সুতাও রয়েছে যার দাম মণ প্রতি ১৫০ ক্রু। ফলে বিরাট অঙ্কের সুতার ক্ষেত্রে বেশ ক্ষতি সইতে হতে পারে এ জাতীয় ঠকামির জন্য। ডাচ কোম্পানীকে হামেশা এ দুই ধরনের ঠকামির মধ্যে পড়তে হয় বলে তা রোধ করার জন্য তারা যে-ধরনের সতর্কতা অবলম্বন ক'রে থাকে তা শোনানো যাক এই প্রসঙ্গে। সংগ্রহের বেলা সমস্ত সুতোই ওজন করা হয়ে থাকে পরিচালক ও তার পরামর্শদাতার উপস্থিতিতে। ওজনের পূর্বে প্রতি মণ সুতার প্রত্যেকটি গাঁট পরখ ক'রে নেয়া হয় ভাল ভাবে। দেখা হয়, আজেবাজে' জিনিস' গুঁজে দিয়ে ওজনে ভারি করার কিংবা নিরস মানের সুতা গুঁজে দিয়ে দামে ঠকাবার ফিকির করা হয়েছে কিনা। এই পরখের দায়িত্ব সহপরিচালক ও তার অধীন কর্মচারীদের। যাচাই ও ওজন শেষ হলে তারা প্রত্যেক বেল বা পাঁজা সুতায় এঁটে দেয় একটি ক'রে ওজন ও মান সম্পর্কিত বিবরণী। হল্যাণ্ডে পৌঁছবার পর সেই সুতার পাঁজা যখন খোলা হয় তখন ওই বিবরণীর সাথে মালের ওজন ও মানের কোনরকম হেরফের দেখা গেলে বিবরণীটিতে যার সই রয়েছে আদায় করা হয় তার কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ।

নীলের কাথ কি ভাবে ডেলা পাকিয়ে রোদে শুকানো হয় আগেই বলেছি সে-কথা। যে-সব ভারতীয় বণিকদের ঠকাতে উৎসুক তারা সাধারণতঃ শুকোতে দেয় এগুলিকে বালির ওপরে। বালি লেগে গিয়ে যাতে ওজনে ভারি হয়ে যায় নীলের খণ্ডগুলি সেজন্যই নেয়া হয় এধরনের পদক্ষেপ। কখনো কখনো সেঁতসেতে জমিনের ওপরও ফেলে রাখা হয় তাকে। ফলে ভিজে ভারি হয়ে যায় সেগুলি। তবে, স্থানীয় শাসনকর্তা এধরনের ঠকামি ধরতে পারলে জোর জরিমানা ক'রে থাকেন অপরাধীকে। এ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ দালাল ও পরিচালক সহজেই ধরে ফেলতে পারেন এ জাতীয় ঠকামি। এজন্য প্রয়োজন শুধু কিছু পরিমাণ নীলের

টুকরো জ্বালিয়ে দেখা। তাতে বালি মেশান থাকলে নীলগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে তা।

ভারতবর্ষের দালালদের সম্পর্কে কিছু কৌতুহলকর তথ্য জানানোর আছে এখানে। এরা সাধারণতঃ এদের বংশ বা গোষ্ঠীর প্রধান। তাদের হয়ে সমগ্র যৌথ সম্পত্তির তদারকি করে সে, বোঝে তার হিসাব নিকাশ। এজন্য প্রাচীন ও অভিজ্ঞদেরই মনোনীত করা হয়ে থাকে এ পদটিতে। বংশীয় সকলের সব কিছু সামগ্রীর অভিভাবক ও গচ্ছিতদার হয়ে সে যাতে তাদের জন্য লাভ উশুল করতে পারে সে-জন্যই নেয়া হয় এ ধরনের পদক্ষেপ। ব্যবসায়িক লেনদেনের পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে সে। ভারতীয় রীতি হল সান্ধ্যভোজের পরিবর্তে কিছু মিঠাই খেয়ে এক গ্লাস জল পান করা। এটি চুকে যাবার পর বংশের প্রবীণরা সবাই মিলিত হন দালালের গৃহে। তিনি তখন সারা-দিনের কাজ কারবারের বিবরণী শোনান তাদের, পরামর্শ করেন ভবিষ্যত কর্ম-প্রণালী নিয়ে। বংশীয় স্বার্থ যাতে ভাল ভাবে রক্ষিত হয় সে-জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেন তিনি। ঠকে যাবার পরিবর্তে সম্ভব হলে ঠকানোর জন্যই আগ্রহী হতে দেখা যায় তাকে।

তের ॥ পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলে একটি নতুন বাণিজ্য-সংস্থা গড়ে তুলতে হলে কিরূপ নীতি ও পদক্ষেপের প্রয়োজন

যদি কোন জাতি পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান তবে সবার আগে সংগ্রহ করতে হবে তাকে একটি উপযুক্ত বন্দর সে-দেশে। এমন একটি বন্দর, যেখানে জাহাজগুলির পুনর্বিন্যাস সম্ভবপর। সুযোগ থাকবে যেখানে সাগর পাড়ির মরশুম শেষে জাহাজগুলির বিরাম নেয়ার। ইংরাজরা যে সে-দেশে প্রত্যাশিত ধরনের অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি তার মূলে রয়েছে এ রকম একটি ভাল বন্দরের অভাব। পুনর্বিন্যাস করা না হলে উইয়ের দাপটে কোন জাহাজই টেঁকে না দুবছর।

ইওরোপ থেকে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চল সুদীর্ঘ পথ। তাই, পানীয় জল ও খাদ্য-সামগ্রীর সরবরাহ লাভের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপের আশেপাশে একটি ঘাঁটি থাকাও একান্ত জরুরী। ভারতীয় অঞ্চলে যাওয়া ও সেখান থেকে আসা দুবারেই এ ধরনের সরবরাহ প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে ফেরার বেলা তো বটেই। কেননা, জাহাজ তখন পণ্য সামগ্রীতে বোঝাই, সম্ভব নয় দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও খাদ্য-সম্ভার পুরোটা একসাথে সঙ্গে নিয়ে চলা। ডাচরা ইতিমধ্যেই অন্তরীপে একটি দুর্গ তৈরী ক'রে অন্যান্য জাতিকে বঞ্চিত করেছে সেখানকার সুযোগ সুবিধা থেকে। ইংরাজরাও এই একই পদক্ষেপ নিয়েছে সেন্ট হেলেনে। অথচ জাতিবর্গের দ্বারা স্বিরীকৃত নিয়মাবলী অনুযায়ী এবং ইওরোপের অধিবাসী-বর্গের মিলিত সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে এ দুটি স্থান দীর্ঘকাল ধরে উন্মুক্ত ছিল পৃথিবীর প্রত্যেকের বিরামস্থলী হিসাবে। যাই হোক, এ সত্ত্বেও অন্তরীপের কাছাকাছি আরেকটি দুর্গ গড়ার উপযুক্ত কোন নদী মোহনা থাকা সম্ভব। ডৌফিন দ্বীপের তুলনায় যে-অঞ্চল হয়ত অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তো চামড়ার জন্য গবাদি পশুর কেনাবেচা ছাড়া নেই অন্য আর কোন বাণিজ্যেরই অস্তিত্ব। আর, এ বাণিজ্য এতই সামান্য যে যে-কোন প্রতিষ্ঠানকে অল্পকালের মধ্যে ভরাডুবির মুখোমুখি হতে হবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে। তবু, কোন ফায়দা না মেলা সত্ত্বেও ফরাসীরা তা নিয়েই সেখানে মশগুল হয়ে আছে এখন পর্যন্ত।

আমার এরূপ এক সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণও রয়েছে একটি। ১৬৪৮ অব্দে লিসবন থেকে ভারত অভিমুখি দুটি পর্তুগীজ জাহাজ পানীয় জল সংগ্রহের আকাঙ্খায় অন্তরীপে ভেড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যে পর্যবেক্ষণ চালায় বেশ কিছু গলদ রয়ে গেছে তাতে। সাগর অতি উত্তাল হয়ে ওঠায় দরুন অন্তরীপ থেকে ১৮ বা ২০ কোশ পশ্চিমে থাকা একটি উপসাগর মধ্যে প্রবেশ করে তারা। দেখা পায় সেখানে একটি নদীর। জল তার বেশ নির্মল ও স্বাদু। স্থানীয় নিগ্রো অধিবাসীরা যুগিয়ে দিল তাদের নদী অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের পাখি, মাছ আর গোমাংস। প্রায় পনের দিনের মতো রইল তারা সেখানে। চলে আসার বেলা সেখানকার দুজন অধিবাসীকে নিয়ে এল সাথে ক'রে গোয়ায়। উদ্দেশ্য, তাদের পর্তুগীজ ভাষ শিখিয়ে সেখানে কি ধরনের বাণিজ্য চালান যেতে পারে করবে সে বিষয়ে যতটা সম্ভব খবরা-খবর সংগ্রহ (প্রথম পর্ব, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দেখুন)। সুরাটের ডাচ অধিকর্তার কাছে এ খবর পৌঁছতে তিনি অনুরোধ করলেন আমায় গোয়া যাবার জন্যে। ওই দুই নিগ্রো বাসিন্দার কাছ থেকে পর্তুগীজরা

।কি খবরাখবর সংগ্রহ করেছে বললেন সে-বিষয়ে একটু খোঁজ খবর নিতে। সেখানে গেলে গোয়া দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক সেন্ট আমণ্ড (অন্যত্র আমস্ত) নামের ফরাসী স্থপতি আমায় জানালেন, পর্তুগীজ ভাষার একটি শব্দও সে দুজনকে শেখাতে পারেননি তারা। সংকেত মাধ্যমে শুধু এটুকুই অনুমান করা গেছে যে কিমির অন্তর্জাত সুরভি ও গজদন্তের সাথে তারা পরিচিত। এ সত্ত্বেও, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা গেলে সেখান থেকে যে সোনা সংগ্রহ সম্ভব হবে সে-বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ ছিলনা পর্তুগীজদের মনে। কিন্তু পর্তুগালে বিদ্রোহ ও স্পেনের সাথে তার যুদ্ধবিগ্রহ (১৬৪০-৮৮) এ ব্যাপারে তাদের বিশদ অনুসন্ধানের সুযোগ দিল না আর। প্রস্তাবিত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানটির উচিত হবে এ বিষয়ে সযত্নে খোঁজ-খবর নেয়। তবে সজাগ থাকতে হবে ওঁচরা যেন সুযোগ না পায় এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হবার কি তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ করার।

এই প্রতিষ্ঠানের আপন জাহাজগুলি পুনর্বিন্যাসের জন্য ও বর্ষাকালে নিরাপদ আশ্রয় নেয়ার জন্য সুরাটের কাছেপিঠে একটি বন্দরও থাকা দরকার। বর্ষার প্রতিকূল আবহাওয়ার মরসুমে সাগর যে-রকম সংহার মূর্তি ধারণ ক'রে তার দাপট সহ্য করা কোন জাহাজের পক্ষেই অসম্ভব। অথচ পাছে তাদের সুরাট স্থিত দুর্গের ওপর কোন বিপদ ঘনায় এই আশংকায় মুঘলরা কোন বিদেশী জাহাজকেই ঢুকতে দেয় না সেখানকার নদীতে। নইলে পাঁচ মাসকাল স্থায়ী বর্ষা-ঋতুর বিধ্বংসী ঝড়ঝঞ্ঝা কালে খালি জাহাজগুলি নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিতে পারত সেখানে।

প্রতিষ্ঠানের জাহাজগুলি নিরাপদে ঠাঁই নেয়ার মতো উপযুক্ত স্থান রয়েছে শুধু যা একটিই। সেটি হল দিউ শহর। বর্তমানে পর্তুগীজদের অধিকারে তা। বহুদিক থেকেই এর অবস্থান স্বার্থের অনুকূল। শহর এলাকা মধ্যে রয়েছে বর্তমানে চারশোর কাছাকাছি বাড়ি। আছে প্রচুর লোককে বাসস্থান যোগান দেয়ার ক্ষমতা। নাবিকদের যতো যা কিছু দরকার সবই সহজলভ্য সেখানে। গুজরাট উপকূলে কাম্বে উপসাগরের প্রবেশমুখে দক্ষিণ-পূর্ব মুখি হয়ে অবস্থিত এ শহর ও বন্দর দ্বীপটি। আকারে প্রায় বৃত্তাকার, আধেকের ওপর সাগর ঘেরা। কোন উঁচু পাহাড়মালা দ্বারা আবদ্ধ নয়। পর্তুগীজরা দ্বীপটির কোল ঘেঁষে কতক প্রতিরক্ষা স্থাপত্যও গড়ে তুলেছে এবং সহজেই সুসম্পূর্ণ রূপ দেয়া যেতে পারে তাকে। স্বাদু জলের অসংখ্য কুয়া সেখানে। রয়েছে একটি নদীও। শহরের

কাছেই সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে সেটি। তার জলও সুরাট ও সুওয়ালীর নদীর তুলনায় ভাল। রয়েছে জাহাজ ঠাঁই নেয়ার মতো অতি বিস্তীর্ণ এলাকা।

পর্তুগীজরা প্রথম যখন ভিত গাড়ে ভারতে, তখন গ্যালী, ব্রিগানটাইন ও ক্ষুদে জাহাজ মিলিয়ে পুরো একটি নৌ-বহর রাখা হত দিউতে। এগুলির সাহায্যে বেশ দীর্ঘকাল কর্তৃত্ব ক'রে চলে সে-দেশের বিভিন্ন স্থানের সামগ্রিক বাণিজ্যের ওপরে। এরূপ দাপটের সঙ্গে এর সাহায্যে সাগরের ওপর প্রভুত্ব ক'রে চলে তারা যে দিউর শাসনকর্তার ছাড়পত্র ছাড়া পারতো না অন্য কেউই কোনরকম বাণিজ্য করতে। গোয়ায় থাকা পর্তুগাল রাজ-প্রতিনিধির নামে এ ক্ষমতা খাটাতেন তিনি। এই ছাড়পত্র সূত্রে যে পরিমাণ শুল্ক আদায় হত তা যথেষ্ট ছিল এই নৌ-বহর ও সেনাবাহিনী পুষে চলার পক্ষে। এছাড়া তিন বছরের মেয়াদে নিযুক্ত শাসনকর্তাও এতটুকু আলস্য দেখাতেন না ঐ কাল মধ্যে নিজের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ ক'রে নিতে।

সে-অঞ্চলে যে-ধরনের শক্তি ঘাঁটিই গড়ে তোলা হোক না কেন তদনুপাতে বিরাট মাত্রায় লাভবান হওয়া সম্ভবপর। পর্তুগীজরা যদিও ইদানীং দুর্বল হয়ে পড়েছে তা সত্ত্বেও লাভ ওঠানোর দিকে বসে নেই তারা হাত গুটিয়ে। যে পরিমাণ অর্থ তারা মহাপ্রতাপী মুঘল সাম্রাজ্যে ও বিজাপুর রাজ্যে নিয়ে যায় সেজন্য কোন শুল্ক গুণতে হয় না তাদের, দিতে হয় না যে-সব সামগ্রী তারা নিয়ে আসে সেজন্যেও॥

বাদলের মরসুম পার হয়ে গেলে দেখা দেয় উত্তর বা উত্তর-পূব বায়ু প্রবাহ। তখন হালকা নৌকায় চেপে তিন কি চার জোয়ার কাল মধ্যেই দিউ থেকে সুরাট যাওয়া সম্ভব। মাল বোঝাই বড় জলযান হলে তাকে এগোতে হবে অবশ্য সারাক্ষণ কূল ঘেঁষে ঘেঁষে। পায়ে হাঁটা পথে যে-কোন লোক দিউ থেকে সুরাট যেতে পারে চার কি পাঁচ দিনে। এজন্য যেতে হবে প্রথমে তাকে গোগেস (গোগো) নামের ছোট একটি শহরে। তারপর সেখান থেকে উপসাগরের শেষ মাথা পেরিয়ে সুরাট। বন্যা-বাদলের দরুন যদি এপথ ধরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্য দিউ থেকে সুরাট পৌঁছতে সাত কি আট দিন লেগে যাবার কথা। কেননা, পুরো উপসাগরটি পরিক্রমা করতে হবে তখন তাকে।

নিজ পরিসরের বাইরে থাকা কোন ভূ-ভাগের ওপর এ শহরটির কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নেই। তবে রাজা বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার সাথে এ ব্যাপারে একটা

বোঝা-পড়ায় পৌঁছন কঠিন হবে না মোটেই। এবং ওই উপায়ে শহরের অধি-বাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সংগ্রহ করা যেত যতটা চাই জমি। শহরটির লাগোয়া অঞ্চলের জমি মোটেই উর্বর নয়। সেখানকার বাসিন্দারাও সারা মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে চরম দরিদ্র। এ'সত্বেও সারা দেশ জোড়া সেখানকার বনাঞ্চলে সুপ্রচুর গবাদি পশু বর্তমান। ফলে একটি মেষ বা গরুর দাম সেখানে দুই পিয়েস্তার বেশি নয়। সুওয়ালীতে বিরাম কালে ইংরাজ ও'ডাচরা তাদের জাহাজগুলির খাদ্যসামগ্রী বাঁচাবার জন্য তাঁদের লোকজনদের সরবরাহ ক'রে চলে এই গোমাংস।

প্রসঙ্গক্রমে এ সংবাদটি দিয়ে রাখা ভাল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে মেষের মাংস খেলে আমাশয়ে ভুগতে হয় প্রায়ই। ফলে নাবিকদের পক্ষে এটি রীতিমতো ক্ষতিকর। কিন্তু গরুর মাংস খেলে নেই সে ভয়।

যে রাজা এ অঞ্চলটি শাসন ক'রে থাকেন তিনি যাবজ্জীবন শাসনকর্তার বিশেষণ ব্যবহারের অধিকারী। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রায় সব রাজার ক্ষেত্রেই তাই। তাঁরাই হলেন প্রদেশের অভিজাত। তাদের বংশধরেরা ব্যবহার করে শুধু শাসনকর্তার বিশেষণ। এই রাজা ভাল ব্যবহার ক'রে থাকেন পর্তুগীজদের সঙ্গে। কেননা, তারা তার প্রতিবেশী হবার দরুন গম, চাল, তরিতরকারী প্রভৃতি কিনে থাকে তার অঞ্চল থেকেই। ফলে এই পথে যথেষ্ট অর্থ পায় পর্তুগীজদের কাছ থেকে তার রাজ্য। এই একই কারণে ফরাসীদের সাথে আরও ভাল ব্যবহার ক'রে থাকেন তিনি।

বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি রূপে একরূপ একটি স্থান হাতের মুঠোয় আনার পর সর্বাধিক জরুরী হল প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য দুজন যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন; একরূপ ব্যক্তি যারা বিজ্ঞতা ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক থেকে বিশিষ্ট, রয়েছে যাদের বাণিজ্যিক প্রতিভা। এদের ভাতা দেয়ার ব্যাপারে উচিত হবে না কোনো কার্পণ্য দেখানো। এদের একজন থাকবেন কোম্পানীর পরিচালক বা ডাচদের ভাষায় কম্যাণ্ডারের পদে। তাকে সহায়তার জন্য থাকবে কতক ব্যক্তিকে সদস্য রূপে নিয়ে গড়া এক মন্ত্রণা-পরিষদ। অন্যজন থাকবেন দালাল ও সওদাগরের পদে। তাকে সংগ্রহ করতে হবে সে-দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে। সে যেন পৌত্তলিক হয়, চলবে না মুসলমান হলে। কেন না, যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে হবে সেইসব কারিগরেরা সকলেই পৌত্তলিক। প্রথম-দিকে এদের আস্থা অর্জন করার জন্য তার মধ্যে যে-সব গুণ থাকা আবশ্যিক তার

মধ্যে অগ্রগণ্য সুমিষ্ট ব্যবহার ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যান্য দালালদেরও অনুরূপ গুণাবলী দেখে নির্বাচন করা ভাল। ব্রোকার জেনারেল বা দালাল-প্রধানের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করবেন তারা। ওইসব প্রদেশে রাখতে হবে একটি ক'রে যোগাযোগ রক্ষাকারী দপ্তর।

সামগ্রী-উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফাঁকিবাজি ও ভেজাল ধরার মতো বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়াও এ দুই ব্যক্তির পক্ষে জরুরী। আগেই বলেছি, এ ধরনের ঘটনা ঘটে, হয় কারিগর ও বণিকদের কারসাজির দরুন নয়তো ক্ষুদে দালালদের তাদের প্রতি চোখ বুজে থাকা মনোভাবের দরুন। এ ধরনের ভেজাল ও ফাঁকিবাজি প্রচুর ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিতে পারে প্রতিষ্ঠানকে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত দালালদের পোয়াবারো। অনেক সময়ে এই সূত্রে দশ থেকে বার শতাংশ পর্যন্ত লাভ ওঠায় তারা। যদি পরিচালক ও দালাল-প্রধান জোট বেঁধে চক্রান্ত করে তবে এ ধরনের ঠকামি রোধ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই শক্ত। কিন্তু যদি দুজনে তারা বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ হয় তবে ব্যক্তিগত দালালদের বদল ক'রে সহজেই আটকে দেয়া যায় এ ঠকামি।

ওপর থাকের এই কর্মচারীরা যে কৌশলে প্রতিষ্ঠানকে ঠকায় তা এই রকমের। যখন কোন জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হয়, প্রতিষ্ঠানের চিঠিপত্র ও জাহাজে থাকা পণ্য-সামগ্রীর বিল তুলে দেয়া হয় বিশেষ জাতি (কর্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠানটি)-র স্থানীয় পরিচালক বা কমাণ্ডারের হাতে। এই পরিচালক তখন তার মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের সমবেত করেন, ডেকে পাঠান দালালকে, তুলে দেন তার হাতে জাহাজে আসা পণ্য-সামগ্রীর বিলের একটি প্রতিলিপি। দালাল তখন সে-খবর জানিয়ে দেন এমন দু-তিনজন পাইকার সওদাগরকে, যারা থোক আকারে এ ধরনের পণ্য-সামগ্রী কেনায় অভ্যস্ত। যদি দালাল ও পরিচালক এ থেকে নিজেরা লাভ ওঠাবার চক্রান্ত ক'রে জোট বাঁধেন তবে যেমনটি করা উচিত সেইমতো বিক্রীর ব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পন্ন করার পরিবর্তে দালাল সওদাগরদের গোপনে জানিয়ে দেবেন তারা যেন এই রকম দর দেন সামগ্রীর এবং অটল থাকেন তাতে। এরপর পরিচালক ডেকে পাঠাবেন দালাল ও ওই দু-তিনজন সওদাগরকে। মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের সুমুখে জানতে চাইবেন জাহাজে থাকা ওই সব মালের জন্য কি দাম দিতে চান তারা। সওদাগরেরা তখন যোগসাজস মাফিক তাদের দর জানিয়ে দিয়ে তাতে অটল থাকলে পনের দিনের জন্য বিক্রী মুলতুবি রেখে দেন পরিচালক। কখনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই

ভাবে তার চেয়ে কিছু দিন কম বা বেশি। এ সময় মধ্যে তিনি সওদাগরদের মাল পরিদর্শনের জন্য জাহাজে উপস্থিত হতে বাধ্য করেন বার বার। এবং আপন মুখ রক্ষার ও নিরাপত্তার জন্য গ্রহণ ক'রে চলেন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ। শেষে সওদাগরদের দেয়া দরেই অনুমতি দেন তাদের কাছে মাল বিক্রীর।

উঁচু থাকের এই দুই কর্মচারীর মুঠিতে ন্যস্ত থাকে প্রচুর ক্ষমতা। মওকাও মেলে প্রচুর। শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতির দরুন প্রকৃত ঘটনা তাদের কাছে গোপন করাও হয় সহজ। তাই কাজ চালাতে হয় তাদের প্রবল প্রলোভনের ঘেরের মধ্যে থেকেই। এ'সত্ত্বেও এ ধরনের অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। আর তা করা যেতে পারে অতি সতর্কতার সাথে এই দুই কর্মচারীকে নির্বাচন ক'রে। এবং যে অজুহাত দেখিয়ে ডাচ পরিচালক ও দালালরা এ অপকর্মটি ক'রে থাকেন, অর্থাৎ বিলম্বের দরুন যে খরচা বৃদ্ধি ঘটে তা এড়ানোর বাধ্যবাধকতা থেকেই করা হল এমনটি— একথা বলার সুযোগ বন্ধ ক'রে দিয়ে।

ডাচদের নিম্নোক্ত ত্রুটির জন্যেই এ ধরনের কৈফিয়ৎ দেয়ার সুযোগ মেলে এ দুই কর্মচারীর। বাটাভিয়া থেকে যে-সব পণ্য সরবরাহ করার নির্দেশ আসে তার মধ্যে যত-যা তারা মুঘল সাম্রাজ্য থেকে রপ্তানি করতে চান সেগুলি তৈরির বরাত দেয়া হয় বার্ষিক মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে। এভাবে অগ্রিম পণ্য নেয়ার দরুন গুণতে বাধ্য হয় কখনো ১২ কখনো বা ১৫ শতাংশ বেশি। আর এই ধারে কেনা মাল যখন জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে উদ্দিষ্ট বন্দরে এসে পৌঁছায় তা বিক্রির জন্য পড়ে যায় তখন তাড়াহুড়া। সওদাগররা তখন যে দর দেয় বাধ্য হয় তাতেই ছেড়ে দিতে তা। কেননা, তখন অর্থের জরুরী দরকার ধারে নেয়া পণ্যের দাম শোধ ক'রে আগামী বছরে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে।

এই নীতির দরুনই পরিচালক ও দালাল পেয়ে যান সওদাগরদের সাথে জোট বাঁধার সুযোগ। কোম্পানীর জরুরী অর্থ চাহিদার পরিস্থিতিটিকে কাজে লাগিয়ে ক'রে নেন নিজেদের পকেট ভরাট। এর ফলে শুধু যে কোম্পানীর লাভের হার কমে যায় তা-ই নয়, এই সংকীর্ণ লাভ থেকে গুণতে হয় একাংশ আবার ধারে পণ্য নেয়ার সুদ হিসাবে। এই সুদও আবার পরিচালক ও দালাল পরিস্থিতি অনুযায়ী যেরূপ বেশি হারে গুণতে রাজী হন চড়ে যায় সেই মতো। ফরাসী জাহাজগুলি যদি ডাচদের মতো একই পণ্য নিতে চান তবে তাদের উচিত হবে জাহাজ বোঝাই পণ্যের সাথে অর্থও নিয়ে যাওয়া। পণ্য বিক্রীর অর্থের ওপর নির্ভর

না ক'রে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সেই অর্থ থেকেই দেবেন তারা বিভিন্ন প্রদেশে পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত কারিগরদের সেজন্য অগ্রিম। দেবেন তা থেকেই আগামী বছরে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন খরচের আংশিক যোগান। এভাবে অগ্রিম দিয়ে কোম্পানী সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে ধারে মাল নেয়ার দরুন ডাচদের মতো শতকরা ১২ থেকে ১৫ হারে সুদ গোনার দায়। এই নীতি সাহায্য করবে তাদের সব থেকে শস্তা দরে সব থেকে সেরা মানের পণ্য পেতে। সাথে সাথে টাকা মেলার দরুন কারিগররাও প্রত্যেকে কাজে মনোযোগী হয়ে উঠবে অধিক আগ্রহ নিয়ে।

যে-সব পণ্য চালান যাবে বোঝাইয়ের জন্য সেগুলি জমায়েত করা দরকার জাহাজ বন্দরে এসে ভেড়ার আগেভাগেই। মাল বোঝাই চটপট হয়ে গেলে ফেরার জন্য অনুকূল আবহাওয়ার পূর্ণ সুযোগ নেয়া সম্ভব হবে জাহাজগুলির পক্ষে। কোম্পানীর তখন আর প্রয়োজন পড়বে না কম দামে তিন-চার জন পাইকারী সওদাগরের কাছে পণ্য বেচার। ওই সব একচেটিয়া সওদাগরদের কাছে মাল না বেচে কোম্পানীর দালালরা তখন ক'রে চলতে পারবে বিদেশী বা দূরাগত বণিকদের জন্য অপেক্ষা। তারাই তখন নিয়ে যাবে এসব পণ্য। কিংবা সামর্থ্য থাকার দরুন কোম্পানীর দালালরাই তখন বেচতে পারবে সেগুলি বিভিন্ন দূর অঞ্চলে পাঠিয়ে সেখানে।"

এখানে জানিয়ে রাখি, ভারতে মুদ্রার পরিবর্তে বাট আকারে সোনা রূপা নিয়ে যাওয়াই লাভজনক। কেননা, সোনা-রূপার মূল্য ধার্য করা হয় সেখানে পুরোপুরি তার বিশুদ্ধতার মানের ভিত্তিতে। তাছাড়া মুদ্রার আকারে সোনা-রূপা নিয়ে গেলে, মুদ্রা তৈরী করাতে যে খরচা গুণতে হয়েছে তা লোকসানের খাতে চলে যায় পুরোটাই (প্রথম পর্ব, ২য় পরিচ্ছেদ দেখুন)।

দালাল যদি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে মুঘল টাঁকশাল অধিকর্তার সঙ্গে ষড় ক'রে কি বাট কি মুদ্রা দুয়েরই সোনা-রূপার বিশুদ্ধতার মান যেমনটি আছে তার তুলনায় কম দেখিয়ে ঠকাতে পারে কিন্তু। তবে কোম্পানীর পরিচালক যদি ন্যায়নিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান হন তাহলে অনায়াসে রোধ করতে পারেন এধরনের জুয়াচুরি। অভাব নেই সেখানে ব্যক্তিগত সোনা-রূপা পরিশোধন কারকদের। কি ক'রে সোনা-রূপার মান নির্ধারণ করতে হয় তা বেশ ভাল ভাবেই জানে তারা। এরূপ একজনকে ডেকে এনে, নিজে সামনে বসে থেকে, সহজেই তিনি জেনে নিতে পারেন তার সঠিক বিশুদ্ধতার মান।

ডাচ কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক **Sieur Waikenton** নিয়েছিলেন ঠিক এই পদক্ষেপটিই। সেখানে প্রতি বছর ছ থেকে সাত হাজার বেল রেশম সংগ্রহ করতেন তিনি কোম্পানীর হয়ে। স্বর্ণ পরিশোধনকারীকে দিয়ে এভাবে যাচাই করিয়ে তিনি ধরে ফেললেন, টাঁকশালের দারোগার সাথে যড় রয়েছে তার দালালের। জাপান থেকে আসা সোনা ও রূপার বাট ও মুদ্রার ওপর এভাবে ঠকিয়ে চলেছে তারা এক থেকে দুই শতাংশ। কোম্পানীর বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে তারা।

টাঁকশালের দারোগা বা ওজনকারীর সঙ্গে জোট বেঁধে ভারি বাটখারা কিংবা বেঠিক কাঁটায় সোনা-রূপার গুঁড়ো, বাট ও মুদ্রা ওজন করিয়ে ওই ভাবেও কোম্পানীকে ঠকাতে পারে দালাল। এটিও সহজে রোধ করা সম্ভব। তার উপায় হল সরকার কর্তৃক পরীক্ষিত ও মোহরছাপ দেয়া বাটখারা ও পাল্লা কাছে রাখা। তাই দিয়ে পরিষদের সদস্যদের সহযোগিতায় আপন উপস্থিতিতে সেগুলো ওজন করিয়ে সঠিক ওজন পরিচালকের জেনে নেয়া।

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও তার কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে যেটির ওপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ ক'রে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সেটি বলি এবার। বণিক, উপ-বণিক, করণিক, উপ-করণিক প্রভৃতি পরিচালক ও দালালের অধীনস্থদের এবং এ দুই কর্মকর্তার ওপর নিষেধ আরোপ করা দরকার যাতে কোনরকম ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে না নামেন তারা। কারিগরদের সঙ্গে পরিচয়, আগামী বছরের জন্য কোথায় কি কি ধরনের পণ্যের চাহিদা রয়েছে বিভিন্ন কুঠির থেকে আসা চিঠিপত্র থেকে তার খবর জানবার সুযোগ নিয়ে এরা সকলেই উৎসাহী হয়ে পড়েন এই মওকায় কিছু লাভ পিটে নেয়ার জন্য। কিনে ফেলেন নিজেরাই ওই সব পণ্য-সামগ্রী। প্রতিষ্ঠানের জাহাজেই পাঠিয়ে দেন তা নিজ নিজ প্রতিনিধিদের কাছে। এ ভাবে বাণিজ্য ক'রে মেলা লাভের কড়ি ভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে তার পর।

পরিচালক নিজেই যখন এধরনের ব্যবসায়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন তখন হয় তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে চোখ বুজে থেকে, নয়তো চরম শিথিল মনোভাব নিয়ে, দিয়ে চলেন অতি অল্প মাইনের এই সব কর্মীদের এ পথে দু পয়সা রোজগার ক'রে নেয়ার সুযোগ। জাহাজের কাপ্তেনও জোট বাঁধেন এদের সাথে। তাদের মাল পাচারের সুযোগ দিয়ে তিনিও কিছু ফায়দা উঠিয়ে নেন আড়ালে। এই সব কর্মচারীদের মূলধন যেহেতু অতি সীমিত, তাই জাহাজ ফিরে আসার বেলাই

যাতে সামগ্রীর দাম পেয়ে যান বিশেষ তৎপর থাকেন সেদিকে। বাজার দরের চেয়ে ৮।১০ শতাংশ কম মূল্যে প্রেরিত সামগ্রী বেচে দেয়ার নির্দেশ পাঠান প্রতিনিধিদের কাছে সেজন্যে। এরূপ কম দামে বেচা তাদের পক্ষে অনায়াসে সম্ভব কেননা, কি সুরাট কি গোমরুন কোথাও কোন শুল্ক গোনে না তারা। এবং লাভবান হয়ে থাকে এই উপায়ে শতকরা ২৬-এর মতো। তাদের এরূপ ক্রিয়াকলাপ ফলে প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত হন বিশেষভাবে বিদেশী বণিকরাও।

এ জাতীয় বিশৃঙ্খল পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে হলে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে তাদের ভুল ত্রুটির পরিণতি থেকে, গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘকালের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ক্ষতির বহর উপলব্ধি ক'রে সে-সব রোধ করার জন্য যে সব বিধিনিয়ম আশ্রয় নিয়েছে তারা সেগুলিকেও। মনে রাখতে হবে হরমুজ, বসর', মোচা বা অন্য যে কোন স্থানেই হোক না কেন অপরের পণ্য সামগ্রী প্রতিষ্ঠানের জাহাজে পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে লাভ ক'রে চলেন কখনোই তা অজ্ঞাত থাকতে পারে না পরিচালকের কাছে। লোহিত সাগর উপকূলস্থ মোচার বেল', যে সব সওদাগর সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করেন তাদের শুল্ক ছাড় দেয়া হয়ে থাকে একটি বেলের ওপর। এ কারণে তাদের পাঠান বেলগুলি মধ্যে সর্বদা এমন একটি বেল দেখা যায় যেটি অন্যগুলি থেকে পাঁচ কি ছ গুণ বড, দশ কি বারোজন লোকের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে সেটি বয়ে নিয়ে যাওয়া।

কোন কোন জাহাজের মাশুল ষাট হাজার টাকা অব্দি। পরিচালক ও দালালের মধ্যে যোগসাজশ থাকলে কখনো এই মাশুলের এক তৃতীয়াংশ, কখনো বা অর্ধেক পর্যন্ত লাভ হিসাবে নিজেদের পকেটে ভরার সুযোগ করে নেয় তারা। এছাড়াও প্রত্যেক জাহাজের বেলাই আবার পরিচালক ও তার পত্নী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের চাকর-চাকরানী, বান্দা-বাঁদীদের মধ্যে অতি বিশ্বাসভাজনদের পারিতোষিক হিসাবে বিতরণ ক'রে থাকেন কিছু না কিছু পরিমাণ মাল পাঠাবার অনুমতি পত্র। কাউকে ছ বেল, কাউকে আট, কাউকে দশ, কাউকে বা তার চেয়ে কম বা বেশি। এসব দেশে বেলের মাশুল দেয়া হয় তাতে থাকা সামগ্রীর মূল্যানুপাতে। এক একটি বেলে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের সামগ্রী থাকে অনেক সময়ে। এসবের ক্ষেত্রে সওদাগররা যথাসাধ্য চড়া হারেই মাশুল দিতে রাজী থাকেন সাধারণতঃ। কিন্তু এই সব চাকর-বাকররা অনুমতি পত্রের দৌলতে ওই সব মাল নিয়ে নেন অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক মাশুল ছাড় ক'রে দিয়ে।

জাহাজের কোষাধ্যক্ষরাও অংশ নিয়ে থাকেন এতে। বণিক ও উপ-বণিকরা অবশ্য মাথা ঘামান না এ ধরনের তুচ্ছ লাভ নিয়ে। তারা যে যার নিজের মাল জাহাজে বোঝাই করতে পারলেই খুশী। দামী সামগ্রী পাঠাবার বেলা খরচ বাঁচাবার জন্য সওদাগরেরা অবলম্বন করে থাকেন আরো একটি কৌশল। যেমন ধরুন কেউ হয়তো পাঠাতে চাইছেন দক্ষিণী টুপী যার দাম কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০০ একু (৮০০ রূপিয়া) পর্যন্ত। কিংবা বুরহানপুরের ওড়নি যেগুলি পারস্য, কনস্তান্তিনোপল এবং এসিয়া ও ইওরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন অবগুণ্ঠন রূপে। এ ধরনের সামগ্রী যে বন্দর থেকে জাহাজে বোঝাই করা হয় সেখানকার রাজাকে শুল্ক দিতে হয় সেজন্য বেশ চড়া হারে। তাই কোন সওদাগরের ওরূপ কয়েক বেল মাল পাঠাবার থাকলে যোগ-সাজস করেন তিনি জাহাজের কাপ্তেন ও কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে। যেই সে-মাল জাহাজে তোলা হয় অমনি তার বেলের ওপর এঁকে দেন তারা কোম্পানীর ছাপ। যথা-স্থানে পৌঁছবার পর কোম্পানীর মালের সাথেই তা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার গুদামে। তারপর রাতে গোপনে পাচার ক'রে দেয়া হয় যে-সওদাগরের কাছে ওই মাল পাঠান হয়েছে তার বাড়িতে।

আশ্রয় নিয়ে থাকেন এরা আরো এক ধরনের চাতুরীর। পরিচালকের সাথে বন্ধুত্ব থাকলে সেই সুযোগ নিয়ে তার সাথে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নেন সওদাগর। তিনি যে মালগুলি জাহাজ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলি যেন কোম্পানীর কাছ থেকেই কেনা—করেন তারপর এরূপ ছলনা। কোম্পানীর মাল সব ধরনের বন্দর শুল্ক রহিত। তাই, কোম্পানীর কাছ থেকে যারা মাল কিনেছে তাদের মতোই মাত্র দুই শতাংশ কর গুণে রেহাই পেয়ে যান তিনি।

এ-সব গলদ দূর করা যেতে পারে মাত্র এক উপায়েই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কুঠিতে এজন্য নিয়োগ করা প্রয়োজন একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি কর্তৃত্ব করবেন রাজার প্রতিভূ রূপে তারই কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ ক'রে। হবেন না কোম্পানীর পরিচালকের অধীন। তার অধিকার থাকবে পরিচালকের ও তার অধীনস্থ কর্মীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার।

ইংরাজরা তাদের কুঠিগুলিতে যদি এরকম একজন পদাধিকারীকে রাখতেন তাহলে করতে পারতেন তারা অনেক বেশি লাভ। কিন্তু তাদের কর্মচারীরা এমন ভাব দেখিয়ে থাকেন যে লণ্ডনে শিক্ষানবিশী শেষ এবং তাদের কর্তার কাছ থেকে সাত বছর ভাল ভাবে সেবা করেছেন এই মর্মে প্রশংসা পত্র লাভের

পর তারা যে-সব সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন তা প্রত্যাহার ক'রে নেয়ার ক্ষমতা কোন উর্ধ্বতনেরই নেই।

সম্ভব নয় অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবসার ওপর অতি কঠোর ভাবে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা। ডাচরা তবুও খুব কড়াকড়ি ভাবেই অনুসরণ ক'রে চলেছে এর। এত কড়াকড়ি ভাবে যে, কোম্পানীর কোন জাহাজ যখন আমসটারডম ত্যাগ করে তখন একজন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট জাহাজের কাপ্তেন সহ সমস্ত কর্মীকে দিয়ে পবিত্র শপথ পাঠসহ অঙ্গীকার করিয়ে নেন যে তারা শুধু বেতন লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন, নিজে কোনরূপ ব্যবসা করবেন না। এ সময়ে দুমাসের বেতনও অগ্রিম দেয়া হয় তাদের। কিন্তু বেতনের পরিমাণ ক্ষেত্রে কোম্পানী যে-ধরনের নীতির অনুকরণ করেন তার ফলে শপথ নেয়া সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাধ্য হয় তারা গোপনে ব্যবসা ক'রে চলতে।

নিজেদের বিবেক সাফ রাখার জন্য এক্ষেত্রে তারা যে পন্থাটির অনুসরণ ক'রে থাকেন তা এই। ভারতে পা দিয়ে যেই তারা কোন ভাল পদের একটি চাকুরি পেয়ে যান অমনি ক'রে বসেন একটি বিয়ে। তারপর গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যান আপন স্ত্রীর নামে। তবে, এজন্যও অনুমতি মেলে না সব সময়ে। পড়ে যান কখন কখন ধরাও।

কুঠিগুলির নিচু থাকের কর্মচারীদের ধাপে ধাপে পদোন্নতি ঘটান উচিত উপকরণিক থেকে পরিচালক পদে। এটি করলে, পদোন্নতির প্রত্যাশায় দুর্নীতি মুক্ত জীবন যাপনের দিকে উৎসাহী হয়ে উঠবে তারা। উচ্চতর পদে কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য মনোযোগী হয়ে উঠবে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান আহরণের দিকে। এই পদোন্নতির ব্যাপারে যাতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখান না হয় সেদিকটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়াও অতি জরুরী।

চোদ্দ ॥

হীরা প্রসঙ্গ : কোন কোন খনি ও নদী-শয্যায় তা মেলে : রম্মলকোটের হীরা-খনিতে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

রত্ন-পাথরের মধ্যে হীরেই হল সব থেকে মূল্যবান। আমিও আবার সব থেকে বেশি মনোযোগী এই পদার্থটির ব্যাবসার দিকেই। তাই, এ ব্যাপারে বিশদ জ্ঞান অর্জনের জন্য ঠিক করলাম, ঘুরে ঘুরে দেখে আসব সব কটি হীরে খনি। এমন কি, যে দুটি নদী গর্ভে হীরে মেলে তার একটিকেও। আমার কোন ভ্রমণ কালেই বিপদের ভয় আমার ইচ্ছাপূরণে বাধা ঘটাতে পারেনি।• পারল না এবারেও। খনি অঞ্চলগুলির এক ভয়ঙ্কর চিত্রই তুলে ধরা হয়েছিল আমার কাছে। সেগুলি নাকি বর্বর অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। যেতে হয় সেখানে নাকি অতি বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে। কিন্তু এসব বর্ণনা পারল না আমার মনের ইচ্ছার হাত-পা গুটিয়ে দিতে। গেলাম একে একে চারটি খনিতে (রম্মলকোট, কোল্লুর বা কোলার, সোমেলপুর এবং কৃষ্ণা নদী ও রম্মলকোটের মধ্যবর্তী অপর কোন খনি অঞ্চল)। ঘুরে এলাম দুটি নদীর মধ্যে একটি নদী অঞ্চলেও (পেন্নের নদী। অন্যটি সম্ভবতঃ বোর্নিও দ্বীপে অবস্থিত)। পোয়াতে হয়নি আমাকে কিন্তু কোন অসুবিধা, হতে হয়নি কোনরকম বর্বরতারই মুখোমুখি। আসলে, যারা আমায় ওই সব কথা শুনিয়েছিল তাদের কারোরই ছিল না এ দেশের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়। বর্তমানে আমি দাবী করতে পারি, ওই সব অঞ্চলে অন্যদের যাবার পথ সুগম ক'রে তুলেছি আমি। ইওরোপীয়দের মধ্যে আমিই প্রথম যে কিনা খনি এলাকায় যাবার পথ-পরিচয় তুলে ধরল ফ্রাঙ্কদের কাছে (একথা সঠিক নয়। ট্যাভারনিয়ার জানতেন না যে তার পূর্বে অন্ততঃ দুজন ইওরোপীয়, সিজার ফ্রেডেরিক ও মেথোল্ড গিয়েছিলেন সে অঞ্চলে)। আর পৃথিবীতে শুধু এই স্থান গুলিতেই যা মিলে থাকে হীরে (এও সত্য নয়। এমন কি তার সময়েও আরো হীরা খনির অস্তিত্ব ছিল ভারতে। তাছাড়া এখানে সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হয়েছেন তিনি বোর্নিওর কথাও)।

প্রথম যে খনি অঞ্চলটি ঘুরতে গেলাম সেটির অবস্থান বিজাপুর রাজ্যের অধীন

কর্ণাটক প্রদেশে। এলাকাটির নাম রাওলকুণ্ডা (রম্মলকোট)। গোলকুণ্ডা থেকে পাঁচদিনের পথ দূরে (১৮ পরিচ্ছেদে এই দূরত্ব দেয়া হয়েছে ১৮ গোশ বা ৬৮ ফ্রেঞ্চ লীগ। প্রকৃত দূরত্ব ১২০ মাইল)। বিজাপুর থেকে আট বা ন দিন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর—এ দুই রাজ্যের রাজা এর আগে ছিলেন মুঘল সম্রাটের অধীন, প্রকৃতপক্ষে দুই প্রাদেশিক শাসনকর্তা শুধু। পরে বিদ্রোহ ক'রে সিংহাসন করায়ত্ত করেন তারা। এজন্যই লোকে আগে বলত, হীরে মিলে থাকে মুঘল সাম্রাজ্যে। এখনও কিছু কিছু লোক বলে একথা। মাত্র দুশো বছরের মতো আগে আবিষ্কৃত হয়েছে রম্মলকোটের এই হীরা খনিটি। লোকমুখে যতদূর যা শোনা গেল তা থেকে অন্তত: এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি আমি। (তার এই সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলে মনে করা ঠিক হবে না)।

যে অঞ্চল জুড়ে হীরে মেলে সেখানকার মাটি বালুভরাট। পুরো এলাকাটিই ছোট পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে ফন্টেইনব্লুর আশেপাশের অঞ্চলের সাথে। প্রায় প্রতিটি পাথরের গায়ে অনেকগুলি ক'রে ছেঁদা। কোনটি আধ আঙুল চাওড়া, কোনটি বা আঙুল খানেক। তার ভেতরে জমে থাকা বালি ও মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার ক'রে চলে কামিনরা ছোট ছোট লোহার আঁকড়া দিয়ে। জমা ক'রে চলে ওই বালি ও মাটি এক একটি পাত্রে। এরপর তার ভেতর খুঁজে চলে হীরে। পাথরের গায়ের ছেঁদাগুলির প্রত্যেকটিই সোজা নয়। কোনটি বা বেঁকে ওপরের দিকে উঠে গেছে, কোনটি বা বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। ফলে ভেতরের মাটি বার করার জন্য হরদম পিটিয়ে ভেঙে নিতে হয় পাথরগুলিকে ওই ছেঁদার গতি অনুসারে। এ মাটি জমা হবার পর ধুয়ে চলা হয় বার দু তিনেক, খুঁজে চলা হয় তার ভেতরে হীরে। সব থেকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রঙের হীরে মিলে থাকে এ খনিটি থেকেই। কিন্তু ছেঁদাগুলি থেকে সহজে মাটি ও বালি বার করার জন্য কামিনরা যেরূপ প্রচণ্ডভাবে পাথরটিকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে ভাঙে তাতে হীরেগুলির গায়ে চোট লেগে চিড় বা খুঁতের সৃষ্টি হয় প্রায়ই। এ কারণেই এই খনি থেকে মেলা হীরের বেশির ভাগই পাতলা। কেননা, যখনই দেখা যায় কোন একটি হীরের গায়ে কোন চিড় বা দাগ রয়েছে তখনই সেটিকে কেটে করা হয়ে থাকে পাতলা ও দু ফালি। এ কাজে ভারতীয়রা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি পটু। এ ধরনের হীরে গুলিকেই সচরাচর foible বা পাতলা বলে আখ্যা দিয়ে থাকি আমরা। এরূপ কাটার ফলে দারুণভাবে বেড়ে যায় এর জলুষ। পাথরটি যদি স্বচ্ছ ও নিখুঁত

থাকে তবে শাণে ক্ষয়িয়ে তার ওপর ও তলের দিকটি মসৃণ ক'রে দেয়া হয় শুধু, নেয়া হয় না কেটে কোনরকম আকৃতি দেয়ার ঝুঁকি। ভয়, পাছে কমে যায় তার ফলে সেটির ওজন। যদি সেটিতে ছেঁদা বা দাগ থাকে, ক্ষুদে আকারের কালো বা লাল ফুটকি থাকে, তাহলে ঐ খুঁত যাতে চোখে না পড়ে সেজন্য তার সর্বাঙ্গ জুড়ে ক'ষে থাকে পল কাটা। খুঁত অতি ক্ষুদে আকারের হলে এই পলের কোন না কোন একটির কিনারায় তা পড়ে যাওয়ার দরুন ধরা যায় না আর। এই প্রসঙ্গে জানাই, রত্ন ব্যবসায়ীরা লাল ফুটকির তুলনায় কালো ফুটকি থাকা পাথরই পছন্দ করে বেশি। তাই, কোন পাথরে লাল ফুটকি থাকলে সেটিকে কালো চেহারা দেয়া হয় আগুনে তাতিয়ে। এসব চাতুরী বেশ ভাল ভাবেই জেনে গিয়েছিলাম আমি। তাই, এই খনি থেকে পাঠান এক থলি হীরে পরীক্ষা করার বেলা যে পাথরটিতেই পলের কাজ দেখলাম, এবং বিশেষ ভাবে অতি ক্ষুদে আকারের পল বা আয়তক্ষেত্রের কাজ, বুঝতে অসুবিধা হল না যে কিছু না কিছু দাগ বা খুঁত রয়ে গেছে সেগুলিতে।

অগুণতি হীরে কাটালীর দেখা পাবেন এই খনি এলাকায়। প্রত্যেকের কাছেই শুধু যা আমাদের প্লেটের আকারের একটি ক'রে ইস্পাতের চাকা। সেটিতে এক এক বারে একটি ক'রে পাথর পালিশ ক'রে চলা হয় শুধু। চাকাটি ঘুরে চলা কালে অবিরাম জল দিয়ে চলা হয় তাতে, অন্ততঃ যতক্ষণে না স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় পাথরটির আঁশ। তা ফুটে ওঠার পর শুরু হয় চাকাটিতে তেল ঢেলে চলা। কসুর করা হয় না হীরের গুঁড়ো দিতেও। এটি কিন্তু বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। চাকার গতি দ্রুততর করার জন্যই দেয়া হয়ে থাকে এটি। পাথরটির ওপরেও ওজন চাপায় তারা আমাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

একটি হীরের ওপর ১৫০ লিভর ওজনের সীসে চাপান দেয়ার কথা জানা আছে আমার। অবশ্য, সে হীরেটি ছিল বড়, কাটা শেষ হবার পর ওজন দাঁড়িয়েছিল সেটির ১৩০ ক্যারাট। যন্ত্রকলটি ছিল ঠিক আমাদের মতোই, তার বড় চাকাটি ঘুরিয়ে চলছিল চারজন কালা-আদমী মিলে। এত ভার চাপান দিলে হীরেটিতে চিড় ধরে যেতে পারে আমাদের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন ভারতীয়রা। তাদের বেলা সে রকমটি না ঘটার কারণ হয়ত অনবরত চাকায় ওই তেল ও হীরের গুঁড়ো দিয়ে চলা। একটি বাচ্চা ছেলে খুব পাতলা একটি কাঠের চামচ দিয়ে সমানে ঢেলে চলে এগুলি। তাছাড়া তাদের চাকাটিও আমাদের মতো

দ্রুত ঘোরে না। যে কাঠের চাকাটির সাহায্যে ইস্পাতের চাকাটিকে ঘোরান হয় তার ব্যাসার্ধ ক্বচিৎ তিনি ফুটের বেশি।

ইওরোপে আমরা পাথরগুলিকে পালিশ ক'রে যে ধরনের ঔজ্জ্বল্য ফোটাই ভারতীয়রা পারে না তা। এর কারণ আমার ধারণায় এই যে আমাদের চাকাগুলির মতো অতোটা টাল-বিহীন ভাবে ঘোরে না তাদের চাকাগুলি। এই চাকাগুলি ইস্পাত দিয়ে গড়ার দরুণ ঘষে চলতে হয় তাকে এম্যারী বা সিরিশ কাগজ দিয়ে। এজন্য খুলে বার ক'রে নিতে হয় চাকাটিকে প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর। বার বার এভাবে খোলার ফলে এটিকে আর এমন ভাবে আঁটা সম্ভব হয় না যাতে সব সময়ে মসৃণ ভাবে ঘোরে। আমাদের মতো যদি তারা লোহার চাকা ব্যবহার করত, হত না তবে এ ধরনের অসুবিধে। কেন না, এগুলি ঘষার জন্য সিরিশের দরকার হয় না, হয় রেতের। আর ঘষার জন্য চাকাটিকেও খোলার দরকার পড়ে না তার গাছ থেকে। ফলে এ দিয়ে পাথরগুলিকে পালিশ করতে পারত তারা বর্তমানে যেমনটি ক'রে চলেছে তার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে। ওপরে জানিয়েছি, চাকাটিকে প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর সিরিশ বা রেত দিয়ে ঘষ প্রয়োজন। বরং কারিগর ঢিলে বা অলস প্রকৃতির না হলে করবে এটি সে প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর। কেন না, পাথরটির সঙ্গে একটানা ঘর্ষণের ফলে চাকার ওই বিশেষ অংশটি নির্দিষ্ট সময়ের পর হয়ে পড়ে একেবারে আয়নার মতো মসৃণ। ফলে সে জায়গাটিকে যদি আবার সিরিশ বা রেত দিয়ে ঘষে খরখরে ক'রে না নেয়া হয় তবে হীরের গুঁড়ো ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সে। তখন এক ঘণ্টার কাজের জন্য সময় ব্যয় হয় দু ঘণ্টারও বেশি।

কোন কোন হীরে প্রাকৃতিক ভাবেই কঠিন। অনেকটা গাঁটের মতো থাকার দরুনই হয় এমনটি। যেমন দেখা যায় গাছের বেলা। এ ধরনের হীরে কাটতে এতটুকুও আপত্তির ভাব দেখায় না ভারতীয় হীরে-কাটালীরা। ইওরোপে এ ধরনের হীরে কাটতে কিন্তু রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যায় সেখানকার কারিগরেরা। ফলে, এ ধরনের দায়িত্ব স্বভাবতই নিতে চায় না তারা। কিন্তু ভারতীয় কারিগরেরা তাদের বাড়তি ঝঞ্ঝাটের জন্য কিছুটা বাড়তি দক্ষিণা পেলেই সন্তুষ্ট।

শোনোনো যাক এবার খনিগুলির পরিচালন ব্যবস্থার কথা। সব কিছুই করা হয়ে থাকে যথেষ্ট স্বাধীন ভাবে ও সততার সঙ্গে। যাবতীয় বিক্রীর ওপর রাজা কর পেয়ে থাকেন শতকরা দুই হারে। পান এছাড়াও হীরে সন্ধানের অনুমতি

ন্ধানের জন্য খনি-রাজস্ব। কোথায় হীরে মিলবে হীরে সন্ধানীরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে বণিকরা তাদের সহযোগিতায় নেমে পড়েন এ ব্যবসায়ে। দুশো পায়ের মতো আয়তনের এক একটি এলাকা ইজারা নিয়ে যেতে যান হীরের খোঁজে। এ কাজে সচরাচর পঞ্চাশ জনের মতো লোক নিযুক্ত ক'রে থাকেন তারা, দ্রুত সমাধা করতে চাইলে কখনো কখনো একশ জন পর্যন্ত। যেদিন থেকে এই খোঁজার কাজ শুরু হয় সেদিন থেকে বণিক পঞ্চাশ জন কামিনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন গুণে চলেন দুই প্যাগোডা (মন্দির মার্কা সোনামোহর) হারে রাজস্ব। একশজন কামিনের-বেলা চার প্যাগোডা।

বেচারা কামিনের দল কিন্তু মজুরী পায় মাথাপিছু বছরে মাত্র তিন প্যাগোডা। অথচ রয়েছে একাজে তাদের পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। এ রকম সামান্য মজুরী মেলার দরুন এতটুকুও ইতস্তত: করে না এরা অসৎ পন্থার শরণ নিতে। সুযোগ পেলেই উদ্যম করে লুকিয়ে চুরিয়ে হীরে নিয়ে যাবার। সাধারণত: এরা উলঙ্গ। পোশাক বলতে শুধু যা ছোট এক টুকরো কাপড়। একমাত্র গোপনাঙ্গ টুকুই ঢাকা তা দিয়ে। তাই হীরে আত্মসাতের জন্য সাধারণতঃ সেটিকে দক্ষতার সঙ্গে গিলে ফেলে তারা। যে-সব বণিক হীরে সন্ধানের ব্যবসায়ে নেমেছেন তাদের দলপতি একদিন এরূপ এক হীরে-খোঁজালীকে দেখালেন আমায়। সে অনেক বছর ধরে কাজ ক'রে আসছিল তার কাছে। যে হীরেটি চুরি করে সে তার ওজন এক ম্যাংগেলিন বা আমাদের দুই ক্যারাটের কাছাকাছি। চোখের কিনারে লুকিয়ে রেখেছিল সেটিকে সে। কিন্তু চুরির ব্যাপারটি জানা পড়ে যেতেই সেটি উদ্ধার করা হয় তার কাছ থেকে। এজাতীয় অপকর্ম রোধ করার জন্য ১২ থেকে ১৫ জন নজরদার এই সব খোঁজালীর ওপর চোখ রেখে চলে সবসময়ে। সাত-আট ম্যাংগেলিনের চেয়ে বড় আকারের কোন হীরে পাওয়া গেলে সাথে সাথে মালিকের কাছে হাজির করা হয় সেটি। যে সেটি পেয়েছে তাকে প্রতিদানে দেয়া হয় তখন একটি সরপা বা মাথায় পাগড়ী বাঁধার উপযোগী একখণ্ড সূতী কাপড়। দাম যার ২৫ থেকে ৩০ সোল। আর ওই সাথে কিছু চাল ও এক থালা চিনি কিংবা তার পরিবর্তে সাধারণতঃ একটি মন্দিরমার্কা রূপোর আধুলি।

হীরে সওদা করার জন্য যে-সব সওদাগর আসেন খনি অঞ্চলে তারা সে কাজটি সেরে থাকেন যে আবাসে বাসের জন্য ঠাঁই নিয়েছেন সেখানে বসেই। খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে খনির মালিকরা প্রতিদিন সকাল দশটা এগারোটা নাগাদ হীরে দেখানোর জন্য সেগুলি নিয়ে হাজির হন তাদের কাছে। যদি

হীরের সংখ্যা বেশি হয়, দুহাজার থেকে পনের-ষোল হাজার এক্ পর্যন্ত নানান দামের হীরে থাকে, সেগুলি ভালভাবে পরখ ক'রে দেখার জন্য রেখে আসেন তাদের কাছে থলি শুদ্ধু। সাত আট দিন বা দরকার হলে তার চেয়েও বেশি দিন কাছে রেখে সেগুলি যাচাই করেন সওদাগরেরা। পছন্দ হলে কিনে নেন সাথে সাথে, নয়তো দেয়া হয় ফিরিয়ে। কোমর বন্ধনী বা পাগড়ীতে বা জামার পকেটে তখন থলিটি গুঁজে নিয়ে ফিরে যান খনি-মালিকরা। ওই একই হীরের থোক দ্বিতীয়বার দেখা যাবে না আর। মিশিয়ে দেয়া হয় অন্য হীরের সাথে। আনা হয় আরেক নতুন থলি। হয়ত তার মধ্যেও থাকে আগেকার হীরেগুলির কতক। কেনা সাব্যস্ত হলে শরাফকে নির্দেশ দেয়া হয় দাম চুকিয়ে দেয়ার জন্য। যদি আপনি ৩।৪ দিনের মধ্যে দাম চুকিয়ে দেয়ার কথা দেন, কথার খেলাপ করলে যতদিন দেরি করবেন সেজন্য সুদ গুণতে হন মাসিক শতকরা ১½ হারে। সওদাগর প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যক্তি হলে তাদের কাছ থেকে আগ্রা, গোলকুণ্ডা বা বিজাপুরের ওপর হুণ্ডী নিতেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান বিক্রেতা। সুরাটের ওপর হুণ্ডী হলে তো কথাই নেই। ভারতের সব থেকে প্রসিদ্ধ বন্দর সেটি। বিদেশ থেকে জাহাজে ক'রে যে-সব পণ্যসম্ভার আসে তা থেকে আপন পছন্দ বা প্রয়োজন মতো কেনাকাটার পথ এর ফলে সহজ হয়ে যায় তাদের।

এইসব খনি মালিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছোট ছোট ছেলেরা যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে রত্ন কেনা-বেচা করে তা সত্যিই মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করার মতো এক দৃশ্য। দশ থেকে পনের-ষোল বছর পর্যন্ত নানা বয়সের ছেলেরা থাকে এই দলে। শহরের ছকে থাকা একটি গাছতলায় জড়ো হয় তারা প্রতিদিন সকালে। প্রত্যেকের কোমরের দুদিকে দুটি ছোট থলি। একটিতে হীরে ওজন করার পাল্লা-বাটখারা। অন্যটিতে পাঁচ থেকে ছশো মতন মন্দির মার্কা সোনা-মোহর। এখানকার ও অন্যান্য হীরেখনি থেকে যারা হীরে বেচার জন্য আসে তাদের পথ চেয়ে সেখানে অপেক্ষা ক'রে চলে সকলে। বেচার আশায় কেউ এলে নিয়ে আসা হীরেটি তিনি সাধারণতঃ তুলে দেন দলের মধ্যে যে ছেলেটি সব থেকে বড় তারই হাতে। সে-ই তাদের দলপতি। সে সেটি দেখার পর এগিয়ে দেয় তার পাশে বসে থাকা পরবর্তী জনের কাছে। এভাবে সকলের হাত ঘুরে সেটি ফিরে আসে প্রথম জনের কাছে। সকলেই নির্বাক ভাবে পরখ ক'রে দেখে সেটিকে এই রীতিতে।

এরপর সেটি কিনতে চাইলে সেজন্য দর কষাকষি করে চলে দলপতি। বেমক্কা

অতি বেশি দাম দিয়ে সেটিকে কিনে বসলে তার দায় বর্তায় তার ওপরেই। সারা দিন এভাবে কেনাকাটার পর বিকেলের দিকে বসে তার হিসাব মেলাতে, করে রঙ, ওজন ও স্বচ্ছতার মান অনুযায়ী হীরেগুলির শ্রেণীবিন্যাস। নিয়ে যায় সেগুলিকে তারা বড় বড় রত্ন-ব্যবসায়ীদের কাছে। বেচে যা লাভ হয় সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেয় দলের সবাই। শুধু দলপতি পায় যা অন্যদের তুলনায় ¼ শতাংশ বেশি। বয়সে এরকমটি কচি হলেও সবরকম রত্ন-পাথরের মূল্যমান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এদের। যদি এদের কেউ কোন একটি হীরে কিনে ফেলার পর সেটির মান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ½% ক্ষতি স্বীকার করেও বেচে দিতে চায় সেটিকে তাদেরই অপর একজন আগভর হয়ে কিনে নেয় সেটি নগদ টাকা দিয়ে। এক ডজন রত্ন পাথর দেখালে তারা নেহাৎ কমপক্ষে তার ভেতর চার-পাঁচটির ঠিক কোন না কোন খুঁত দেখিয়ে দেবে আপনাকে।

বিদেশীদের প্রতি অতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন ভারতীয়রা। বিশেষ ক'রে যাদের তারা ফ্রাঙ্ক (ফিরিঙ্গী) বলে থাকে তাদের বেলা তো কথাই নেই। খনি এলাকায় পৌঁছবার সাথে সাথে দেখা করতে গেলাম আমি সেখানকার শাসনকর্তার সাথে। বিজাপুর অধিপতির প্রতিভূরূপে তিনিই সে অঞ্চল সহ পুরো প্রদেশটির প্রশাসক। ইসলাম ধর্মের অনুগামী তিনি। জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালেন আমায়। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সমগ্র খনি এলাকাতেই মন্দির খচিত নতুন সোনা-মোহরের চাহিদা। আমি যে তা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে এসেছি সে-সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত মন নিয়েই তিনি আমায় নির্ভর আশ্বাস দিলেন আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে। বললেন, আপনি যেখানে উঠেছেন সেখানেই সব রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন কিছু যাতে খোয়া না যায় রইলাম, সেজন্য আমিই দায়ী। আমার সঙ্গে নিয়ে আসা চাকরবাকররা তো ছিলই, তার ওপর আরো চারজন দিলেন তিনি আমার সোনা মোহর পাহারা দেয়ার জন্য। আদেশ করলেন, তারা যেন রাতদিন সেদিকে চোখ রাখে, পালন ক'রে আমার সবরকম আদেশ। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ডেকে পাঠালেন আবার আমায়। বললেন: কোনরকম ভয়-ভাবনা না ক'রে নিশ্চিন্তে দিন কাটান এখানে আপনি। আয়েস ক'রে পান ভোজন করুন, প্রাণভরে ঘুমোন। শরীরের দিকে যত্ন-আত্তি নিন। এই কথা-গুলি আবার বলার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে। আর হ্যাঁ, আরেকটি কথা বলতে ভুলে গেছি তখন। আপনি যা কিছু কেনাকাটা করবেন তার ওপর

রাজার প্রাপ্য কিন্তু দুই শতাংশ। আপনাকে সতর্ক ক'রে দেই, কতক মুসলমান ব্যবসায়ীর মতো আপনিও যেন আবার এ ব্যাপারে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবেন না রাজাকে। ওই সব ব্যবসায়ীরা স্থানীয়দের সঙ্গে যড় ক'রে সেই ফিকিরেই থাকে সবসময়ে। 'পঞ্চাশ হাজার মন্দির-মোহরের জিনিষ কিনলে বলে—কিনেছি মাত্র দশ হাজারের। আপনিও যেন করবেন না সেরকমটি আবার।' ফিরে এসে যথারীতি কেনাকাটার দিকে মন দিলাম আমি। দেখলাম, এখানে সব রকম হীরেই দামের দিক থেকে গোলকুণ্ডার তুলনায় কুড়ি শতাংশ শস্তা। তার ওপর মাঝে মধ্যে মেলে এখানে সেখানকার চেয়েও বড় আকারের হীরে। তাই মোটারকম লাভের আশায় হয়ে উঠলাম বেশ খুশীই।

একদিন বিকেল নাগাদ এক বেণিয়া এসে হাজির। পরনের পোশাক-আশাক দীন দরিদ্রের মতোই। কোমরে এক চিলতে কাপড়, একটি নোংরা রুমাল জড়ানো মাথায়। অতি বিনীতভাবে আমার দিকে এগিয়ে বসে পড়ল পাশটিতে। এ দেশে পোশাক আশাকের ওপর কেউ কোন নজর বা গুরুত্ব দেয় না একেবারেই। কোমরে যেমন তেমন গজখানেক কাপড় জড়ানো এমন লোকের কাছেও লুকোনো থাকে অনেক সময়ে থলিখানেক হীরে। আমি শিষ্ট ভাবেই স্বাগত জানালাম তাকে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশটিতে বসে থাকার পর দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্ন ফেঁটালে কতক চুনি কেনার দিকে আমার কোন আগ্রহ আছে কিনা? দোভাষী তখন তাকে বললে তা দেখানোর জন্যে। (এ থেকে সূচনা মেলে যে ট্যাভারনিয়ার এদেশের ভাষা জানতেন না কি বুঝতেন না)।

বেণিয়াটি তার কোমরে বাঁধা কষি থেকে বার করল গুটিকতক থলি। তা থেকে বার ক'রে দেখাল আমাকে এক কুড়ির কাছাকাছি চুনি খচিত আংটি। সেগুলি পরখ ক'রে দেখার পর জানালাম: আমি যেমনটি চাই সে তুলনায় এ পাথরগুলি নেহাৎই ক্ষুদে, বড় পাথরই যা কিনতে চাই আমি। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, ইস্পাহানের এক মহিলা মোটামুটি ১০০ একুর মধ্যে একটি চুনি বসানো আংটি আনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমায়। তাই, কিনলাম শেষ অবধি ৪০০ ফ্রাঙ্কের মতো দাম দিয়ে তারই একটি। আমি ভাল ক'রেই জানতাম এ আংটিটির জন্য সে ৩০০ ফ্রাঙ্কের বেশি দাম পাবার আশা করেনি মোটেই। এ সত্বেও ১০০ ফ্রাঙ্ক বেশি খসালাম আমি। কেনন', তার হাবভাব দেখে আমার ধারণা জন্মে গিয়েছিল, সে শুধু এ ধরনের চুনি বেচতে আসেনি আমার কাছে।' আছে তার কাছে এর চেয়েও ভাল জিনিস। চাইছে তা

গোপনে দেখাতে। অপেক্ষায় আছে কখন আমাকে ও দোভাষীকে নিরালায় পাবে সে। নমাজের সময় এসে যেতেই শাসনকর্তা নিযুক্ত প্রহরীদের মধ্যে তিনজন বিদায় নিল তাতে যোগ দিতে। চতুর্থ জনকেও ছল ক'রে সরিয়ে দিলাম বাইরে। পাঠালাম কিছু রুটি কিনে আনার জন্য। এ দেশের সকলেই প্রায় পৌত্তলিক। ভাত খেতেই অতি অভ্যস্ত তারা। রুটি খাবার অভ্যাস একেবারেই নেই। ফলে রুটির দরকার হলে তা মেলে না ধারে কাছে, যেতে হয় অনেক দূর, বিজাপুর রাজ্যের দুর্গের কাছে থাকা সেই মুসলমান মহল্লায়। ফলে এখুনি ফিরছে না সে আর। বেণিয়াটি যেই দেখল আমরা ফাঁকা, দোভাষী ও আমি ছাড়া কেউই আর ঘরে নেই, তখন সে বেশ রহস্যময় ভঙ্গিমায় সরিয়ে নিলে তার মাথায় বাঁধা কাপড়ের চিলতেটিকে। খুলে ফেলল তার সে-দেশের চলতি প্রথা মতো পাক দিয়ে চুড়োর মতো ক'রে বাঁধা চুল। বার করল তার ভেতর থেকে এক ফালি ন্যাকড়া। সেটি মেলতেই ঝলসে উঠল একখণ্ড হীরে। চমৎকার তার রঙ। আকাটা হলেও পালিশ করা। তিন চতুর্থাংশই তার স্বচ্ছ। মাত্র একদিকে একটি ক্ষুদে দাগ রয়েছে, চলে গেছে সেটি কিছুটা গভীর পর্যন্ত। বাকি এক চতুর্থাংশ নানা খুঁত ও লালচে দাগে ভরা। ওজন তার আমাদের ৪৮½ ক্যারাটের সমান।

সেটি হাতে নিয়ে গভীর মনযোগের সঙ্গে আমায় পরীক্ষা করতে দেখে বেণিয়াটি বলে উঠল : নেই এত তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার। কাল সকালে আপনার অবসর মতো পরীক্ষা ক'রে দেখুন ধীরে সুস্থে। বেলা এক প্রহর পার হয়ে যাবার পর কাল শহরের বাইরে দেখা পাবেন আমার। যদি পাথরটি আপনার পছন্দ হয়, নিতে চান, দাম সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন একেবারে। তারপর হীরেটির জন্য কত সে চায় তাও শুনিয়ে দিল আমায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দেই, বেলা এক প্রহর পার হবার পর স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বেণিয়ারা প্রত্যেকেই ফিরে যায় যে যার বাসগৃহে। যেমন স্নানাদি ও প্রাকৃতিক নিত্যকর্ম সমাধার জন্য, তেমন ধর্মীয় প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ পালনের জন্য। বেণিয়াটি আমায় ঠিক ওই সময়ে দেখা করতে বলায় আমি বুঝে নিলাম আমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাত লেন-দেনের দৃশ্য অপরে দেখুক সে চায় না তা। পরদিন এতটুকু হেলা না ক'রে যথাসময়ে বেরিয়ে পড়লাম তার খোঁজে। সাথে নিলাম—যে দাম সে হেঁকেছিল তার পুরোটাই। তবে দু'শো প্যাগোডা আলাদা ক'রে সরিয়ে রাখলুম তা থেকে। দেখা হতে, দর কষা-কষির পর দিলাম তাকে ওই

আলাদা রাখা মোহরগুলি থেকে আরো ১০০ প্যাগোডা। সুরাটে ফেরার পর বেচে দিয়েছিলাম হীরেটিকে এক ডাচ ক্যাপটেনের কাছে। বেশ ভালরকম মুনাফাই হয়েছিল আমার ওই লেনদেন থেকে।

এই হীরেটি কেনার ঠিক তিনদিন পরেই গোলকুণ্ডা থেকে এক সংবাদবাহক হাজির। পাঠিয়েছে তাকে বোয়েতি নামের একজন ঔষধের উপকরণ প্রস্তুত-কারক ও বিক্রেতা। গোলকুণ্ডায় রেখে এসেছিলাম তাকে আমার প্রাপ্য টাকাকড়ি পাওয়া গেলে তা বুঝে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। যদি শরাফ তা রূপার টাকায় দেয়, দেয়া হয়েছিল তা তাকে প্যাগোডায় রূপান্তরের দায়িত্বও। টাকা মেলার ঠিক পরদিনই আক্রান্ত হল সে সাংঘাতিক আন্ত্রিক গোলযোগে। গেল কয়েকদিনের মধ্যেই তারপর মারা। সে-ই অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তারই খবর পাঠিয়েছিল আমার কাছে। ঐ সাথে লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, আমার প্রাপ্য টাকা পেয়ে গেছে সে, তার পুরোটাই রেখে দেয়া হয়েছে আমার ঘরে সীলকরা থলিতে ক'রে। আপন মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে লিখেছে যথাসম্ভব দ্রুত আমায় গোলকুণ্ডায় ফিরে আসতে। তার ভয়, সে মারা গেলে, আমার যে পরিচারকদের তার কাছে রেখে এসেছি তারা হয়ত সরে পড়বে তা নিয়ে। চিঠিটি পেতেই বিদায় গ্রহণের জন্য হাজির হলাম শাসনকর্তার গৃহে। তিনি তো চতুর বাক। জানতে চাইলেন, যে পরিমাণ টাকাকড়ি এনেছিলাম তার পুরোটাই কেনাকাটা হয়েছে কিনা। জানালাম, অর্ধেকটাও খরচ করতে পারি নি, আমার কাছে বিশ হাজার প্যাগোডার ওপর রয়ে গেছে এখনো। তিনি তখন বললেন, যদি আমি চাই তাহলে ক'রে দিতে পারেন তিনি সে-অর্থ লগ্নী করার সুযোগ। কেনাকাটার যেরকম ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তিনি তাতে কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত হব না আমি। এরপর তিনি প্রশ্ন ফোটালেন, আমি যা যা কেনাকাটা করেছি তা তাকে দেখাতে কোন আপত্তি আছে কি না? কি আমি কেনাকাটা করেছি, কি তার আর্থিক পরিমাণ তা কিন্তু সবই তার জানা। কেননা ক্রেতাদের কাছ থেকে দুই শতাংশ রাজস্ব আদায়ের জন্য সে-সবের এক বিবরণী তার কাছে পাঠাতে বাধ্য ব্যবসায়ীরা। আমি তখন যা যা কিনেছি দেখালাম তাকে, কোনটার কি দাম পড়েছে জানালাম তাও। যে বেনিয়াটি রাজস্ব আদায় করে তার খাতার সঙ্গে মিলে গেল আমার দেয়া হিসাব। চুকিয়ে দিলাম সাথে সাথে তার ওপর দেয় দুই শতাংশ রাজস্ব-ও। শাসনকর্তা তখন মন্তব্য করলেন ফিরিঙ্গীরা কিরূপ বিশ্বাসভাজন তা উপলব্ধি করা গেল এবারে। তার

প্রত্যয় আরো গভীর হল যখন আমি ৪৮½ ক্যারাটের সেই হীরেটি দেখালাম তাকে, জানালাম : এটির বিবরণ আপনাদের খাতায় নেই। আমি যে এটি কিনেছি শহরের কেউই জানে না তা। কিন্তু রাজাকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি, এই নিন এজন্য তাঁর প্রাপ্য কর। মুগ্ধ হয়ে গেলেন শাসনকর্তা, উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করলেন আমার এ সততার। বললেন, কি হিন্দু কি মুসলমান এদেশের কোন ব্যবসায়ী-ই দেখাত না এ ধরনের সততা। আপনার ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা সত্যই প্রশংসনীয়। এরপর তিনি সেখানকার বিশিষ্ট ধনী সওদাগরদের ডেকে পাঠালেন, জানালেন তাদের এই ঘটনাটির কথা। আদেশ করলেন তাদের যার যার কাছে থাকা সেরা পাথরগুলি নিয়ে আসার জন্য। নিয়ে এলেন তা তিন চার জন। ফলে এক কি দু'ঘন্টার মধ্যেই সওদা ক'রে ফেললাম বিশ হাজার প্যাগোডা'র। দিলাম সবাইকে তাদের পাওনা চুকিয়ে। শাসনকর্তা তখন বললেন ব্যবসায়ীদের : আপনারা সুযোগ পেলেন একজন সত্যিকার সৎলোকের সঙ্গে ব্যবসা করার। সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে তাকে কিছু উপহার দেয়া উচিত আপনাদের। তারা উদার চিত্তে শাসনকর্তার অনুরোধ রাখলেন, দিলেন আমাকে ১০০ একু-র কাছাকাছি দামের একটি হীরে উপহার। শাসনকর্তা নিজেও সম্মানিত করলেন আমাকে একটি পাগড়ী ও একটি কোমরবন্ধনী উপহার দিয়ে।

কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক ভারতীয় ব্যবসায়ী-ই যে অনন্য ও চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে তাদের যাবতীয় পণ্যসামগ্রী বেচে থাকেন তার বিবরণ শোনাই আপনাদের। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেনা বেচার পুরো পর্বটিই ঘটানো হয় নিঃশব্দে, দু-পক্ষের কোন-রকম বাক্যব্যয় ছাড়াই। ক্রেতা ও বিক্রেতা এজন্য বসে যান মুখোমুখি হয়ে। যে-কোন একজন তার কোমরে বাঁধা কাপড়টি খুলে সামনে রাখেন তা। বিক্রেতা ক্রেতার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেন তা ওই কোমর-বন্ধনীটি দিয়ে। পাশে উপস্থিত থাকা অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ীর সুমুখেই ঐভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর সকলের অজানা ভাবেই উভয়ে পৌঁছে যান দরদামের রাজীনামায়। কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা কেউই মুখের বা চোখের ভাষায় কোন কথা বলেন না, বলেন পুরোটাই হাতের সংকেত সাহায্যে। এ ব্যাপারে তারা যে পদ্ধতিটির অনুসরণ করেন তা এইরকম। যদি বিক্রেতা ক্রেতার পুরো হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিলেন তার মানে এক হাজার। আর হাতের ওপর যতবার চাপ দেবেন—বোঝাবে

তত হাজার মোহর কিংবা টাকা। যখন মাত্র পাঁচটি আঙুল ধরেন—তখন বোঝায় পাঁচশো। একটি আঙুল ধরলে একশো। 'আঙুলের মাত্র দুটি পর্ব' ধরলে বোঝাবে পঞ্চাশ, একটি পর্ব ধরলে দশ। এরূপ গোপন সংকেত প্রক্রিয়ায় দর কষাকষি ক'রে পণ্য বেচে চলে ভারতীয়রা। বহু লোক থাকলে এক এক সময়ে একটি পুলিন্দা হয়তো পাঁচ ছবার হাত বদল হয়ে যায় ঐভাবে—কে কত দামে প্রত্যেকবার কিনল বা বেচল তা অন্য সকলের সম্পূর্ণ অজনাভাবেই। রত্ন-পাথরের ওজনের বেলা, যদি কেউ বে-আইনী ভাবে গোপনে না কেনে, তাহলে কোন ভয় নেই ঠকবার। খোলা বাজার থেকে কিনলে, হীরের ওজন নির্ধারণ করার জন্য রাজা কর্তৃক বিশেষ ভাবে নিযুক্ত একজন কর্মচারী উপস্থিত থাকেন সেখানে। কারো কাছ থেকে কোনরকম পারিশ্রমিক নেন না তিনি এজন্য। ওজন সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে নির্বিবাদে মেনে নেন। কেননা, এ ব্যাপারে কাউকে পক্ষপাতিত্ব দেখানোয় কোন লাভ নেই তার।

কেনাকাটা শেষ হ'তে বিদায় নিলাম খনি এলাকা থেকে। যাতে নদীকূল পর্যন্ত তার অধীন এলাকা নিরাপদে পার হ'তে পারি সেজন্য শাসনকর্তা ছ'জন রক্ষী দিলেন আমার সঙ্গে। এই নদীটিই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের মধ্য-সীমানা (ভীমা শাখানদী সহ কৃষ্ণ নদী)। নদীটি পার হওয়া বেশ দুরূহ। যেমন চওড়া ও গভীর, তেমন খরস্রোতা। পার হবার জন্য না আছে নৌকা না কোন সেতু। কি মানুষ, কি তাদের লটবহর, যানবাহন ও গরু-ঘোড়া সব কিছু এপার-ওপার করার জন্য করা হয় অন্যান্য ভারতীয় নদীর মতো একই যানের ব্যবহার। ১০ থেকে ১২ ফুট ব্যাসার্ধের গোলাকার গামলার মত চেহারা এটির। আমাদের হাম্পারের মতো ওসিয়ার-এর ডাল দিয়ে (সম্ভবতঃ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে) এগুলি তৈরি। বাইরের দিকটি ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে ঢাকা। ভাল ধরনের নৌকা বা সেতুর ব্যবস্থা করা যেত অনায়াসেই। কিন্তু নদীটি দুই রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা ক'রে চলেছে বলে কি বিজাপুর কি গোলকুণ্ডা কোন রাজ্যের রাজাই আগ্রহী নন সেদিকে। দুপারের মাঝিদেরই সারাদিন যত লোক, ভারবাহী পশু ও পণ্যাদি পার করে তার এক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় পেশ করতে হয় দুদিককার উপ-শাসনকর্তার কাছে। নদীর দু'পারে কূল থেকে সিকি ক্রোশের মধ্যেই সে দুজনের বাসভবন।

গোলকুণ্ডায় যেদিন পৌঁছলাম তার তিনদিন আগেই মারা গেছেন বোয়েন্তি। যে ঘরটিতে তাকে থাকতে দিয়েছিলাম দুটি সীল মোহর দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা

হয়েছে সেটিকে। একটি সীল সেখানকার কাজী বা প্রধান বিচারকের। অন্যটি শাহ্-বন্দরের। তিনিই হলেন সওদাগরদের তত্ত্বাবধায়ক। বিচার বিভাগীয় একজন কর্মচারী প্রহরা দিয়ে চলেছেন ঘরটির দরজা ও আমার রেখে যাওয়া পরিচারকদের ওপর। আমি পৌঁছবার সাথে সাথে সে-খবর জানানো হল কাজী ও শাহ্-বন্দরকে। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডেকে পাঠালেন আমাকে।

দেখা ক'রে তাদের অভিবাদন জানাতেই কাজী জানতে চাইলেন মৃতের কুঠুরিটিতে যে অর্থ রয়েছে তা আমার কি না? আর তা যে প্রকৃতই আমার তার প্রমাণ দিতেও আমি সক্ষম কি না? উত্তরে আমি জানালাম, যে-বিনিময় পত্রগুলি শরাফদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম তার চেয়ে সেরা প্রমাণ এ সম্পর্কে অন্য কিছুই হতে পারে না আর। আমার নির্দেশ অনুযায়ী আমার অনুপস্থিতি মধ্যেই প্রয়াত ব্যক্তিকে তারা দিয়েছে ওই অর্থ। প্রয়াত ব্যক্তিকে আমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম, শরাফরা যদি রূপার টাকা দেন তবে তিনি যেন তা সোনার প্যাগোডায় রূপান্তরিত ক'রে তা পাঠিয়ে দেন আমার কাছে। আমার এ উত্তর শুনে, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ডেকে পাঠালেন তারা বিনিময় পত্রগুলির অর্থ-প্রদানকারী দুই শরাফকে। তারা সমর্থন করলেন আমার কথা। কাজী সাথে সাথে তার সহকারীকে নির্দেশ দিলেন ঘরটি খুলে দেয়ার জন্য। অর্থের থলিগুলির প্রত্যেকটির সীল যথাযথ আছে কিনা তাও পরখ ক'রে দেখার আদেশ দেয়া হল তাকে। পুরো অর্থ আমি ঠিকমতো বুঝে পেয়েছি, কিছুই খোয়া যায়নি একথা তাকে আমি শোনানোর পরই স্থানত্যাগ করলেন তিনি। আমিও কাজী ও শাহ্-বন্দরের কাছে সেকথা ঘোষণা করার জন্য এলাম তার পিছু পিছু। তারা যে-কষ্ট স্বীকার করেছেন জানালাম সেজন্য ধন্যবাদ। ফারসীতে লেখা এ সম্পর্কিত একটি ঘোষণাপত্র তারা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে সই করার জন্য। আমিও খুশী মনে আমার পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ ক'রে সই দিলাম তাতে।

সহকারী জানালেন, বোয়েভিকে সমাধিস্থ করার জন্য যে খরচ হয়েছে তা এবং যে দুই ব্যক্তি সীল করেছেন ও যে কর্মচারী পাহারা দিয়েছেন তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিতে হবে আমাকে। সব মিলিয়ে মোট ৯ টাকা বা ৪½ একু। ইওরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই এত সহজে ছাড় পাওয়া যেত না কখনো।

পনেরো ॥ অন্যান্য হীরাখনি ভ্রমণ ঃ হীরা খোঁজার পদ্ধতি

গোলকুণ্ডা থেকে পূব দিকে সাত দিনের পথ পার হলে দেখা মিলবে আরেকটি হীরে খনির। আঞ্চলিক ভাষায় সেটির নাম গনি (খনি, পারসিক কান-ই), পারসিক ভাষায় কৌলোর।

অন্য খনিটি থেকে আসার বেলা যে নদীটি পার হয়েছিলাম (রাওলকুণ্ডা বা রম্মলকোট থেকে গোলকুণ্ডা আসার বেলা পার হওয়া কৃষ্ণা নদী) তারই কূলে অবস্থিত একটি বড় শহরের কাছেই এ খনিটি। শহরটি থেকে দেড় কোশ দূরে ক্রুশের আকার নিয়ে কতক উঁচু পাহাড় বর্তমান। এই শহর ও পাহাড় মধ্যবর্তী সমতলের বুকে হীরের সেই গোপন ভাণ্ডার। পাহাড় যত বেশি কাছে হীরের আকারও তুলনামূলক ভাবে তত বড়। তবে পাহাড়ের কোলে বেশি উঁচুতে কিন্তু একেবারেই দেখা মেলে না হীরের।

সবে একশো বছরের মতো হল আবিষ্কৃত হয়েছে এ খনিটি (এ তথ্য নির্ভর-যোগ্য নয়)। এক গরিব কৃষক জই (millet) বোনার জন্য ক্ষেত তৈরি করতে গিয়ে পেয়ে গেল সেখান থেকে ২৫ ক্যারাট মতো ওজনের **pointe naive** গোত্রের একটি হীরে। এ ধরনের রত্ন-পাথর জীবনে দেখেনি সে এর আগে। এ সত্ত্বেও সেটির চেহারার জলুষে আকৃষ্ট হল সে। নিয়ে গেল সেটিকে গোলকুণ্ডায়। কপাল ভাল থাকায় যোগাযোগ ঘটে গেল সেখানে এক হীরে ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন হীরেটির ওজন দেখে। কেন না এর আগে ১০ বা ১২ ক্যারাটের চেয়ে বড় আকারের হীরে দেখা যায়নি কখনো (এ মন্তব্য সঠিক নয়)। তাই, বিশেষ উৎসুক হল সে হীরেটি কৃষক কোথায় পেয়েছে সে খবর জানার জন্য। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলও তা।

এই নতুন আবিষ্কারের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশময়। শহরের কতক ধনী ব্যক্তি ছুটল সেখানে হীরের খোঁজে। সেই থেকেই চলেছে হীরে তোলা। এখনো অব্যাহত রয়েছে তা। অন্যান্য যে কোন খনি এলাকার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় বড় বড় হীরে মেলে এখানে। বর্তমানে যে-সব হীরে এখানে পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকগুলিই দশ থেকে চল্লিশ ক্যারাট পর্যন্ত ওজনের, মেলে কখনো কখনো এর চেয়েও বড় আকারের। (এখান থেকে মেলা) অন্যান্য হীরের মধ্যে রয়েছে আকাটা অবস্থায় ৯০০ ক্যারাট ওজনের

হীরেটি। আগেই অন্যত্র বলেছি, ঔরঙজেবকে এটি উপহার দিয়েছিলেন মীর জুমলা। (দু'টি ভুল রয়ে গেছে এই বিবরণ মধ্যে। এ হীরেটি ঔরঙজেবকে নয়, শাহ-জহানকে উপহার দেন মীর জুমলা। দ্বিতীয়তঃ, অন্য তিন তিনটি স্থানে এর ওজন জানিয়েছেন ট্যাভারনিয়ার ৯০০ রতি বা তার বেশি এবং ১৮৭১/২ ক্যারাট।)

বড় বড় আকারের হীরে পাওয়ার জন্য কোল্লর-এর এই খনিটি বিখ্যাত হলেও দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানকার হীরেগুলি সাধারণতঃ স্বচ্ছ নয়। তাছাড়া কোন্‌টি তার কি ধরনের মৃত্তিকা মধ্যে পাওয়া গেছে প্রত্যেকটির রঙের মধ্যেই তার আভাস বর্তমান। সাঁতসাঁতে জলাভূমি এলাকার হলে তার রঙের মধ্যে থাকে কালচে ভাব। মৃত্তিকা লাল হলে রঙের আভাও হয় লালচে। এভাবে মৃত্তিকার অবস্থা অনুযায়ী কখনো বা থেকে হীরের রঙে সবজে ভাব, কখনো বা হলদে ভাব। শহর থেকে পাহাড় মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকাটির মৃত্তিকার বিভিন্নতার দরুনই ঘটে থাকে এমনটি। কাটার পর এই সব পাথরের অধিকাংশের ওপর দেখা যায় চর্বির মতো এক ধরনের থকথকে পদার্থ, ফলে সেটি মোছার জন্য সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখতে হয় একটি রুমাল।

ইওরোপে আকাটা পাথরের রঙ, স্বচ্ছত, দোষ ত্রুটি ইত্যাদি জানার জন্য সেটিকে দিনের আলোয় পরখ করা হলেও ভারতে কিন্তু তার বিপরীত। তারা পরখ করে রাতে। এজন্য দেয়ালে করা একফুট বর্গাকার মতো একটি ফোকরে লম্বা সলতে থাকা একটি পিদিম জ্বালিয়ে হাতের দু-আঙুলের মাঝে পাথরটিকে ধরে পরখ ক'রে চলে সেটিকে তারই আলোয়। যে-ধরনের রঙকে তারা 'দিব্য' ব'লে অভিহিত করে সেটিই হল সবার চেয়ে নিকৃষ্ট। আকাটা অবস্থায় এ ধরনের পাথরকে ধরা একেবারেই অসম্ভব। শাণে পালিশ ও কাটাইয়ের বেলাও জানা পড়েনা অনেক সময়ে। এগুলির রঙ নিখুঁত ভাবে জানার জন্য পরখ করা দরকার তাকে পাতাবহুল কোন গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে। তার সবুজ ছত্র-ছায়ায় সহজেই ধ'রে ফেলা যায় পাথরটি নীল আভাযুক্ত কিনা।

প্রথম যেবার এ খনি অঞ্চলে যাই, দেখি মেয়ে পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে প্রায় ষাট হাজার লোক কাজ ক'রে চলেছে সেখানে। পুরুষরা মাটি খুঁড়ছে, মেয়ে ও শিশুরা বয়ে চলেছে তা। এখানে রাওলকুণ্ডা (রমলকোট)-র তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে খোঁজা হয়ে থাকে হীরে।

হীরের জন্য কোথায় খোঁজ চালানো হবে হীরে-খোঁজালোরা সে-স্থানটি নির্বাচন ক'রে নেয়ার পর, তারই ঠিক পাশটিতে সমতল ক'রে নেয়া হয় একই বা তার

চেয়ে বড় মাপের আরেকটি জমিকে। ঘিরে দেয়া হয় তাকে দুফুট উঁচু এক ঘের-দেয়াল দিয়ে।

নি এই ঘের-দেয়ালের গোড়ায় প্রতি দুফুট অন্তর থাকে জল নিকাশের জন্য একটি ক'রে নালি। জল বার ক'রে দেয়ার প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্ত এঁটে রাখা হয় সেগুলিকে। এভাবে জায়গাটিকে কাজ শুরু করার উপযোগী ক'রে নিয়ে জড়ো করা হয় যাদের হাতে খোঁড়ার কাজে নিয়োগ করা হবে সেই সব মেয়ে পুরুষ শিশু কামিনদের। জমায়েত হন মালিকের সাথে তার আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবরাও। নিয়ে আসেন ওই সাথে মালিক তাদের আরাধ্য দেবতার একটি পাথরে গড়া বিগ্রহও। দাঁড়িয়ে থাকা সেই মূর্তিটিকে রাখা হয় জমিনের ওপরে। উপস্থিত প্রত্যেকে তিনবার ক'রে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায় তাকে। পুরোহিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ ক'রে নিবেদন করেন পূজার্ঘ। এরপর এঁকে দেন প্রত্যেকের কপালে জাফরান ও আঠা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের কাথের সাহায্যে একটি ক'রে চিহ্ন (তিলক)। সেটে দেন তার ওপরে সাত-আটটি ক'রে চালের কণা। এরপর কলসীতে ক'রে সঙ্গে বয়ে আনা জল দিয়ে স্নান ক'রে নেয় প্রত্যেকে। বসে যায় কর্ম শুরু উপলক্ষে মালিকের দেয়া ভোজ খেতে। সকলে যাতে উদ্দীপিত হয়ে উৎসাহ নিয়ে বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করে সেজন্যই এ ভোজের আয়োজন: ভোজে আহার্য বলতে শুধু যা প্রত্যেককে কিছুটা ক'রে ভাত। পরিবেশন করে তা ব্রাহ্মণে। কেননা, পুরোহিত সম্প্রদায়ের কেউ পরিবেশন করলে (বর্ণ নির্বিশেষে) প্রত্যেক পৌত্তলিকই খেতে পারে সে অন্ন। এদের একাংশ এরূপ অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত যে খান না তারা আপন স্ত্রীর হাতের রান্নাও, ক'রে নেন নিজেই নিজের রান্নাটা। যে থালায় ক'রে প্রত্যেককে ভাত দেয়া হয় সেটি আমাদের কাঠবাদাম ধরনের কোন একটি গাছের পাতা কাঁটা দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরি। দেয়া হয় এই ভাতের সঙ্গে একটি ক্ষুদে তামার বাটিতে ক'রে সিকি পাউণ্ড খানেক ঘি আর খানিকটা গুড়।

ভোজ অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর হয় কর্মের শুভারম্ভ। মরদরা খুঁড়ে চলে মাটি। মেয়ে ও শিশুরা বয়ে চলে তা। জমা করে দেয়াল-ঘেরা সেই জমিনটি মধ্যে। দশ, বারো এমনকি চৌদ্দ ফুট পর্যন্ত গভীর ক'রে কাটা হয় এই মাটি। মোট কথা, যতক্ষণ না জল ওঠে ততদূর গভীর পর্যন্ত। জল উঠলে তারপরও গভীর ক'রে লাভ নেই কোন। সব মাটি কেটে দেয়াল ঘেরা জমিন মধ্যে জমা করা শেষ হলে শুরু হয় তাতে জল ঢালা। মেয়ে-পুরুষ-শিশু সবাই

মিলে কলসীতে ক'রে বয়ে আনে ওই জল তাদেরই কাটা ওই খাদ থেকে। তারপর মাটির স্তূপকে নরম করবার জন্য ওইরূপ ভেজানো অবস্থায় ফেলে রাখা হয় এক কি দুদিন তার কাঠিন্য অনুসারে। মাটি পুরোপুরি গলে গিয়ে যখন প্রায় কর ডালের চেহারা নেয় তখন খুলে দেয়া হয় দেয়ালের চারদিকে থাকা নালিগুলোকে যাতে সব পাঁক বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু কাঁকর ও নুড়ি, সেজন্য ঢেলে চলা হয় আরো আরো জল। এখানকার এই মাটি এমন ধরনের যে এভাবে দু-তিনবার না ধোয়ালে সাফ হয় না সবটা। সে কাজ শেষ হলে পড়ে থাকা কাঁকর ও নুড়ির তলানিকে শুকোবার জন্য ফেলে রাখা হয় ওইভাবে। খুব একটা বেশি সময় লাগে না এজন্য। এরপর যা দিয়ে আমরা শস্য ঝাড়ি সেই রকমের একটি ঝুড়িতে (কুলায়) সেগুলি তুলে নিয়ে ঝেড়ে চলে শস্যের মতো। সূক্ষ্ম বালি উড়ে আলাদা হয়ে যায়, ঝুড়িটিতে পড়ে থাকে শুধু মোটা কাঁকর ও নুড়ি। সেগুলি তখন আলাদা স্তূপ করা হয় জমিনের ওপরে।

এভাবে সব কাঁকর ঝাড়া হয়ে গেলে 'চকুনি-কোদাল'-এর সাহায্যে যথাসম্ভব সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় সেগুলিকে। তারপর আধফুট মতো চওড়া এক একটি বড় কাঠের মুগুর নিয়ে সকলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় ওই কাঁকরগুলির ওপরে। তাই দিয়ে পিটিয়ে চলে সেগুলি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। প্রতিটি অংশ এভাবে অন্ততঃ তিনবার ক'রে পেটায় তারা। তারপর আবার সেই ঝোরায় ক'রে আগের মতো ঝাড়া হয় সেগুলিকে। তারপর নিজের সার বেঁধে একদিকে বসে অবশিষ্ট থাকা কাঁকরগুলিকে সামনে ছড়িয়ে সেগুলি নেড়ে চেড়ে খুঁজে চলে তার মধ্যে হীরে। এসময়টিতে করে তারা রাওলকুণ্ডা (রম্মলকোট)-র মতো একই পদ্ধতির অনুসরণ। আর এ হেন পদ্ধতিতে হীরে খোঁজার দরুণই দেখা দেয় সেগুলিতে এত বেশি চিড় ও খুঁত।

রাজশুল্ক, এই সব কামিনদের বার্ষিক মাইনে, বড় আকারের হীরে পেলে সেজন্য সেই বিশেষ কামিনকে দেয় পুরস্কার ইত্যাদি সবই এখানে রাওলকুণ্ডার অনুরূপ। আগে এখানে মেলা হীরের ওপর ভাগ সবজে রঙা হলে কিনতে আপত্তি করত না কেউ। কেননা কাটার পর দেখা যেত সেগুলির আসল রঙ যেমন সাদা তেমনি সুন্দর।

তিরিশ কি চল্লিশ বছরের মতো আগে গোলকুণ্ডা ও রাওলকুণ্ডার মাঝে আবিষ্কৃত হয়েছিল আরো একটি হীরে খনি। কিন্তু জুয়াচুরি ঠেকাবার জন্য শেষ পর্যন্ত দিলেন সেটিকে বন্ধ ক'রে রাজা। এই জুয়াচুরি রহস্য সংক্ষেপে শোনাই

আপনাদের। এই খনিতে যে-সব পাথর মিলত তার ওপর ভাগও সবুজ আভাযুক্ত। এছাড়া যেমন সুন্দর তেমনি স্বচ্ছ। অন্যান্য খনিতে মেলা হীরের চেয়েও মনোহর দর্শন। কিন্তু শাণে পালিশ করতে গেলেই যেত সেগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে। অবশ্য, একই খনিতে মেলা একই জাতের অন্য কোন পাথর দিয়ে ঘসে ঘসে সেটিকে পালিশ করলে কিন্তু এমন দশা হত না তার, হত এমনটি শুধু শাণে চড়ালেই। ফলে, পাছে ব্যবহারকালে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এই ভয়ে এভাবে পালিশ করা হীরে না কেনার ব্যাপারে সজাগ হয়ে গেল সবাই। এই ঠকে যাবার আশঙ্কা রোখার জন্যই খনিটিকে বন্ধ ক'রে দিলেন রাজা শেষমেশ।

মেসার্স ফ্রেমলিন ও ফ্রান্সিস ব্রিটেন যে-সময়ে সুরাটে ইংরাজ কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন ওই সময়ে এডওয়ার্ড ফার্ডিন্যাণ্ড নামের এক স্বাধীন ইহুদী ব্যবসায়ী তাদের দুজনের সঙ্গে মিলিত ভাবে কিনলেন এই খনি থেকে একটি হীরে। সুব তারই সামান্য কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছে খনিটি। হীরেটি যেমন স্বচ্ছ তেমনই সুন্দর আকৃতির। ওজন ৪২ ক্যারাট। এডওয়ার্ড ইওরোপে আসার কালে অপর দুজন তার ওপর দায়িত্ব দিলেন মওকা মতো দামে সেটিকে বেচার জন্য। লেগহর্নে পৌঁছে এডওয়ার্ড সেটি দেখালেন তার কতক ইহুদী বন্ধুকে। পঁচিশ হাজার পিয়েস্ত্রা অব্দি দরও পেলেন তাদের কাছে। কিন্তু তিরিশ হাজার টাকার দরুন তাদের কাছে আর বেচা সম্ভব হল না শেষ অব্দি। নিয়ে গেলেন তখন সেটিকে ভেনিসে, কাটাবার জন্য। বেশ সুন্দর ভাবেই কাটা হল সেটি, ঘটল না সেটির কোনরকম কিছু ক্ষতি। কিন্তু যেই পালিশ করার জন্য শাণে চাপানো হল অমনি ভেঙে ন'টুকরো। আমাকেও একবার ঠকানো হয়েছিল এরকম একটি হীরে দিয়ে। ওজন ছিল সেটির দু ক্যারাট। শাণে চাপানোর পর, আধাআধি কাজ শেষ হবার মুখে ভেঙে হয়ে গেল সেটি ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরো।

ষোল ॥ পূর্ব ধারাবাহিকতা : অন্যান্য হীরাখনি অঞ্চল ভ্রমণ

এলাম এবার তৃতীয় খনিটিতে। এটিই খনিগুলির মধ্যে সবার চেয়ে প্রাচীন। অবস্থান এর বাঙলা রাজ্যে। সৌমেলপুর খনি রূপে নাম দেয়া যেতে পারে

এটির। ওই নামের একটি বড শহরের কাছেই এই খনিটি। কিংবা বলতে পারেন কোয়েল খনি। কেননা, ওই নামের নদীর বালুতেই মিলে থাকে এই হীরে। যে এলাকার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এ নদীটি তা ভিন্ন এক রাজার রাজ্য, মুঘলদেরই করদ ছিলেন তিনি এর আগে। শাহ-জহান (অর্থাৎ খুরম বিদ্রোহ ক'রে আপন পিতা) জহাঙ্গীরের সাথে যখন যুদ্ধ শুরু করেন ওই সময়ে স্বাধীন হন এই রাজা। সিংহাসনে আসীন হবার পরে পরেই রাজার কাছে বকেয়া কর দাবী করলেন শাহ-জহান। রাজার এত কিছু সম্পদ ছিল না যে একসঙ্গে মিটিয়ে দেবেন সব প্রাপ্য। তাই রাজ্য ছেডে প্রজাদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি পাহাডী অঞ্চলে। এদিকে কর দিতে রাজা প্রাথমিক অস্বীকৃতি জানাবার খবর পেয়ে তার বিরুদ্ধে সেনা পাঠালেন শাহ-জহান। রাজা যে রাজ্য রক্ষার জন্য লডাই না ক'রে আগেভাগে পালিয়ে যাবেন রাজ্য ছেডে তা কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। এ রাজ্যে অভিযান করলে অঢেল হীরে পাওয়া যাবে এরকমটি বুঝিয়ে অভিযানে প্রলুব্ধ ক'রে তোলা হয়েছিল সম্রাটকে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক তার বিপরীতটি। সেনারা সেখানে পৌঁছে না পেল রাজা কিংবা তার কোন প্রজার দেখা, না পেল একটি শস্য কণা। রাজার নির্দেশ ছিল, যতটা সম্ভব শস্য যেন সঙ্গে নেয়া হয়, যা নেয়া সম্ভব হবে না তা যেন পুডিয়ে ফেলা হয় সাথে সাথে। তার এ আদেশ এরূপ নিটোল ভাবে পালন করা হয়েছিল যে সে-রাজ্যে প্রবেশ ক'রে ঘোর খাদ্য সঙ্কটে পডে গেল মুঘল বাহিনী। মারা গেল অন্নের অভাবে অধিকাংশ সেনা। ঘটনার শেষ পরিণতি হিসাবে রাজা আবার ফিরে এলেন তার রাজ্যে, পেলেন নামমাত্র কর দিয়ে মুঘলদের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিয়ে রাজ্য ভোগ ক'রে চলার সুযোগ। (এটি খুব সম্ভবত ১৬৪১-৪২ এর ঘটনা। ওই সময়ে পালমৌর চেরো উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন শায়েস্তা খান)।

আগ্রা থেকে ওই খনি অঞ্চলে যাবার পথের নিশানা ও দূরত্ব এইরকম : আগ্রা থেকে হলবাস (এলাহাবাদ) ১৩০ কোশ। তারপর হলবাস থেকে বনারৌস (বনারস) ৩৩ কোশ। এবং বনারৌস থেকে সসেরান (সসারাম) ৪ কোশ।

আগ্রা থেকে সসারাম পর্যন্ত যেতে হবে আপনাকে একটানা পূবদিকে। এরপর বাঁক নিতে হবে দক্ষিণে। ২১ কোশ পাডি দেয়ার পর পৌঁছবেন একটি বড় শহরে। এ শহরটি ওপরে বলা ওই রাজারই রাজ্য এলাকা মধ্যে। শহর থেকে চার কোশ এগিয়ে যাবার পর দেখা পাওয়া যাবে একটি দুর্গের। নাম তার রোহতাস। এটি এসিয়ার সেরা শক্তিশালী দুর্গগুলির একটি। পাহাড় চূড়ায়

অবস্থিত এই দুর্গটিতে রয়েছে দুটি যুদ্ধমঞ্চ (bastion) ও ২৭টি কামান। জল ভরাট তিনটি পরিখা দিয়ে ঘেরা এটি। পরিখাগুলিতে রয়েছে ভাল ভাল সব মাছ। পাহাড় শীর্ষে যাবার একটিই মাত্র পথ। শীর্ষে আধকোশের মতো বিস্তীর্ণ এক সমতল-ভূমি। ফলানো হয় সেখানে গম, জোয়ার প্রভৃতি ও ধান। চাষের জন্য জলের যোগান মেলে সেখানে থাকা কুড়িটিরও বেশি ঝরনা থেকে। পাহাড়টি নিচ থেকে চূড়া অব্দি চারিদিক অসংখ্য খাড়া দুরারোহ টিলা ও খাদ দিয়ে ঘেরা। সেগুলির প্রায় সবটাই জঙ্গলাকীর্ণ। রাজারা সাধারণতঃ সাত থেকে আটশো সেনা রাখতেন এখানে। বর্তমানে এটি মুঘলদের দখলে। প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলার নৈপুণ্য ফলেই এটি এসেছে তাদের মুঠোয়। এই মীর জুমলার বিষয়ে বহু স্থানে বলেছি এর আগে। এখানকার শেষ রাজা মারা যান তিনটি ছেলে রেখে। দেখা দিল তাদের মধ্যে ঘোর শত্রুতা। বড় ভাইকে করা হল বিষ প্রয়োগ। দ্বিতীয় জন যোগ দিলেন মুঘল দরবারে। সম্রাট দিলেন তাকে চার হাজার ঘোড়সওয়ার মনসব। ছোট জন থেকে গেলেন আপন এলাকাতেই, পিতার মতো নামমাত্র কর দিয়ে ভোগ ক'রে চললেন তা। প্রত্যেক ভারত-অধিপতিই, এমনকি তৈমুর লঙের বংশধরেরাও, অভিযান চালিয়েছেন এ দুর্গে, কিন্তু পারেননি কেউই জয় করতে একে। আর, এই রাজাদের মধ্যে দুজন তো মারা গেছেন সসারামেই (কালঞ্জরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত শেরশাহ, তার পিতা হসন-শূরী এবং পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহ, যিনি গোয়ালিয়রে মারা যান—তিনজনেরই মরদেহ সমাধিস্থ রয়েছে সসারামে)।

রোহতাস দুর্গটি থেকে সৌমেলপুরের দূরত্ব তিরিশ কোশ। এটি একটি বড় শহর। তবে ঘর-বাড়িগুলি সবই কাদামাটির। মাথার ছাউনি নারকেল-পাতার (সম্ভবতঃ তালপাতার)। রাজা বাস করেন শহর থেকে আধকোশ দূরে, একটি চমৎকার, চোখে পড়ার মতো জায়গায়, তাঁবুতে। দুর্গের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে কোয়েল নদীটি। হীরে মেলে এই নদী-শয্যা থেকেই। দক্ষিণের উঁচু পাহাড় চূড়ায় জন্ম নিয়ে এদিক পানে বয়ে এসেছে নদীটি, মিশেছে শেষে গঙ্গায় (মিশেছে এটি শোণ নদীর সঙ্গে এবং শোণ নদী গঙ্গার সঙ্গে)।

কীভাবে এই নদী-শয্যা থেকে হীরে সংগ্রহ করা হয় তা বলি এবার। মোটামুটি ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাপক বর্ষার মরশুম বিদায় নেয় এখানে। তাই, জানুয়ারী মাসের শেষ অবদি অপেক্ষা ক'রে চলে হীরে খোঁজালীরা। ওই সময়ে নদীর জল প্রায় তলানিতে ঠেকে। বহু স্থানেই জলের গভীরতা দু ফুটের বেশি নয় তখন।

নদী শয্যার প্রধান ভাগই জলশূন্য। তাই জানুয়ারীর শেষাশেষি বা ফেব্রুয়ারীর শুরুতে কি কচি কি বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম প্রত্যেকেই এসে জড়ো হয় সেখানে হীরে খোঁজার জন্য। সংখ্যায় এরা হাজার আটেকের মতো। কতক এদের সৌমেলপুরের বাসিন্দা, কতক এই নদীরই ওপর অঞ্চলে থাক ২০ কোশ দূরবর্তী অপর একটি শহরের। বাকিরা আসে সমতল অঞ্চলের ছোট ছোট সব গ্রাম থেকে।

অভিজ্ঞমাত্রেরই জানা রয়েছে, যখন নদী-শয্যার কোথাও যাকে আমরা 'বজ্র-শিলা' বলি সেই ধরনের ছোট ছোট শিলাখণ্ড দেখা যায়, সেখানকার বালি থেকেই হীরে মেলে সাধারণতঃ। এই হীরে খোঁজা আরম্ভ করা হয় সৌমেলপুরের কাছে থাকা নদী-শয্যা থেকে। তারপর ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া হয় ওপর দিকে একেবারে তার উৎস পর্যন্ত। যে পাহাড় থেকে এ নদীটি জন্ম নিয়েছে সেটি এই শহর থেকে পঞ্চাশ কোশ দূরে। যে-সব স্থানে হীরে আছে বলে সিদ্ধান্ত করা হয় সে সব স্থানে নিচের বলা পদ্ধতি মতো বালি খুঁড়ে চলে তারা। সবার আগে খোঁটা, ডালপালা ও মাটি দিয়ে বাঁধ দিয়ে জায়গাটিকে ঘিরে সেঁচে বার ক'রে দেয়া হয় সব জল। শুকিয়ে নেয়া হয় জায়গাটিকে। তারপর খুঁড়ে সরিয়ে নেয়া হতে থাকে বালি। তবে খোঁড়া হয় না কখনো দু ফুটের চেয়ে বেশি গভীর পর্যন্ত। বালিগুলি সরিয়ে নিয়ে গাদা করা হয় নদী কূলেরই কোথাও এজন্য প্রস্তুত দেড় ফুটের মতো ঘের-দেয়াল তোলা কোন একটি জমিতে। ঘের দেয়ালের গোড়ায় করা হয় অনেকগুলি নালি। প্রয়োজন মতো বালি সেখানে জমা করার পর তার ওপর ঢালা হতে থাকে জল। আগে বলা খনিটিতে ঠিক যে পদ্ধতিতে তা ধোয়া, ভাঙা ও হীরে খোঁজা হয়ে থাকে ঠিক সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয় তারপর এখানে।

যে ধরনের হীরেকে pointe naive বলা হয়ে থাকে ওই প্রজাতের সুন্দর সুন্দর হীরের সবগুলিই এখানকার। তবে, বড হীরে কদাচিৎ মেলে এখানে। বহু বছর হল এ প্রজাতের হীরে ইওরোপে যায় না আর। তাই, বহু রত্ন ব্যবসায়ীরই ধারণা খনিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বুঝি। আদপেই কিন্তু তা নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন এ নদীটি থেকে হীরে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি দীর্ঘকাল।

কর্ণাটক প্রদেশে আরো একটি খনি থাকার কথা জানিয়েছি আগেই। একটি না বলে দুটি খনি বলাই সঠিক হবে তাকে। কেননা, কাছাকাছি দুটি খনি সেখানে। কিন্তু তা থেকে মেলা হীরের সবগুলিই কালচে কিংবা হলদেটে, রঙও

ভাল নয় তার। তাই সেগুলিকে চালু না রেখে বন্ধ ক'রে দেন গোলকুণ্ডা অধিপতির প্রধান সেনানায়ক ও মহামন্ত্রী মীর জুমলা।

এছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ বোর্নিওর সুক্কাদন নদী-শয্যা থেকেও মিলে থাকে সুন্দর-দর্শন হীরে। সেগুলিও কোয়েল নদী-শয্যা থেকে এবং উপরোক্ত অন্যান্য খনি থেকে মেলা হীরের মতোই সুকঠিন।

সতেরো ॥ হীরা ওজন কল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওজন-মান : প্রচলিত সোনা ও রূপার মুদ্রা : হীরাখনি অঞ্চলের পথ-পরিচয় : হীরার মূল্যায়ন রীতি

রমলকোণ্ডের খনিতে হীরের ওজন ধার্য করা হয়ে থাকে ম্যাঙ্গেলিন পরিমাপ ভিত্তিতে। এক ম্যাঙ্গেলিন $১\frac{৩}{৪}$ ক্যারাট বা ৭ গ্রেনের সমান। গনি বা কোল্লুর খনি এলাকায় চল রয়েছে আবার রত্তি-র। এক রতি $\frac{৭}{৮}$ ক্যারাট বা $২\frac{৭}{৮}$ গ্রেনের সমান। এই শেষোক্ত পরিমাপ পদ্ধতিটিই সারা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে চালু। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর-রাজ্যে তার সঙ্গে পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে ম্যাঙ্গেলিনও। কিন্তু এ দুই অঞ্চলের ম্যাঙ্গেলিন $১\frac{৩}{৮}$ ক্যারাটের সমান। পর্তুগীজরাও এই একই নামের ওজন-পদ্ধতি ব্যবহার করে গোয়ায়। কিন্তু সেখানকার এক ম্যাঙ্গেলিন আবার ৫ গ্রেনের সমান।

বাঙলা রাজ্যের খনি এলাকাটি অপর এক রাজার রাজ্য মধ্যে হলেও তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন বলে সেখানে হীরের কেনা-বেচা চলে 'রুপিয়া'-র ভিত্তিতে। বিজাপুর রাজ্যের দুটি খনি এলাকা মধ্যে রমলকোটে লেন-দেন চলে নয়া প্যাগোডা বা নতুন মন্দির প্রতিকৃতি বিশিষ্ট মুদ্রা ভিত্তিতে। এখানকার রাজা মুঘলদের অধীন নন, পুরোপুরি স্বাধীন। তাই নিজের নামেই তৈরি ক'রে থাকেন তিনি এই মুদ্রা। নতুন প্যাগোডার দাম সমান থাকে না সব সময়ে। কখনো তার মূল্য $৩\frac{১}{২}$ রুপিয়ার সমান, কখনো কিছু কম বা বেশি। এই ওঠা নামা নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেজী ও মন্দা ভাবের ওপর। তাছাড়া রাজা ও শাসনকর্তাদের সাথে শরাফদের রাজীনামার ওপরও নির্ভর করে আংশিক। গোলকুণ্ডা রাজ্যের অধীন কোল্লুর বা গনি খনি এলাকায় লেনদেন হয়ে থাকে নতুন

প্যাগোডাতেই। মূল্য বিজাপুরের সাথে সমান। কিন্তু কখনো কখনো ১ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত বেশি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় এই মুদ্রা। কেননা, এর সোনা সরেস মানের এবং এই খনি এলাকার ব্যবসায়ীরা এছাড়া অন্য আর কোন মুদ্রা গ্রহণ করেন না একেবারেই।

এই প্যাগোডা মুদ্রা তৈরি ক'রে থাকে ইংরাজ ও ডাচরা। চুক্তির মাধ্যমেই হোক কিংবা জোর ক'রেই হোক এজন্য তারা অনুমতি আদায় ক'রে নিয়েছে রাজার কাছ থেকে। তৈরি করে এটি তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দুর্গে। ডাচদের তৈরি মুদ্রার সোনা সরেস মানের বলে ইংরাজদের তৈরি মুদ্রার তুলনায় ১ থেকে ২ শতাংশ বেশি দাম পড়ে তার। খনি মালিকদের আকর্ষণও এই মুদ্রাটির প্রতিই বেশি। তবে, খনি এলাকার অধিবাসীরা মোটেই সভ্য নয়, একেবারে আদিম প্রকৃতির এবং গোলকুণ্ডা থেকে খনি অঞ্চলে যাবার পথ রীতিমতো বিপজ্জনক—এ জাতীয় মিথ্যা রটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই যান না সেখানে। হীরে নেন এসে গোলকুণ্ডাতেই সাধারণতঃ। সেখানে খনি মালিকদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, তাদের কাছে হীরে পাঠিয়ে দেন তারা। লেন-দেন চলে থাকে সেখানে পুরনো প্যাগোডায়। এগুলি রীতিমতো ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রা। বহু শতাব্দী পূর্বে, এমন কি মুসলমানরা এদেশে পা রাখার মতো ঠাই মেলারও আগে দেশীয় বিভিন্ন রাজা কর্তৃক এগুলি তৈরি। এই পুরনো প্যাগোডার দাম সাড়ে চার রুপিয়া, তার মানে নতুন প্যাগোডার চেয়েও এক রুপিয়া ক'রে বেশি। অথচ এগুলিতে কিন্তু বেশি সোনা নেই, সুতরাং ওজনেও নতুনের চেয়ে ভারি নয়। এর মূল কারণ না শোনালে অনেকেই হয়ত থ মেরে যাবেন এ খবরে। আসলে, রাজা যাতে এ মুদ্রাগুলি বাজার থেকে তুলে নিয়ে নতুন মুদ্রায় রূপান্তরিত না করেন সেজন্য তাকে প্রতিবছর মোটা অর্থ দিয়ে থাকেন শরাফ বা মহাজনরা। কেননা, এগুলি চালু থাকার দরুন মোটা আকারে রোজগারের সুযোগ মেলে তাদের। এর কতকের পিঠে থাকা প্রতিকৃতিই লোপাট হয়ে গেছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে, কতকের সোনা নিকৃষ্ট মানের, কতকের ওজন কম। তাই কোন ব্যবসায়ীই শরাফদের দিয়ে যাচাই না করিয়ে নিতে সাহস পান না এগুলি। তার অন্যথা করলে রয়েছে প্রচুর লোকসানের ভয়। সেগুলি আবার অন্যকে গছাতে গেলেই পড়তে হবে বিপদে। খোয়াতে হবে ১ থেকে ৬ শতাংশ। তার ওপর শরাফকেও আবার দিতে হবে ¼ শতাংশ তার পারিশ্রমিক হিসাবে। এ মুদ্রা যখন আপনি খনি-মালিকদের দেবেন, তারাও তা গ্রহণ করবে শরাফের উপস্থিতিতে ;

কোন্ মুদ্রাটি ভাল, কোন্‌টি খারাপ তা তাদের দিয়ে পরখ করিয়ে নিয়ে তবেই। পারিশ্রমিক হিসাবে তার কাছ থেকেও তারা আদায় করবে আবার ¼ শতাংশ। যখন কাউকে হাজার প্যাগোডা দেয়ার দরকার তখন সময় বাঁচানোর জন্য শরাফ সেগুলি আপনার তহবিল থেকে পরখ ক'রে পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নেবার কালে মুদ্রাগুলিকে ছোট একটি থলিতে পুরে নিজের সীল এঁটে দিয়ে যাবে তার মুখে। যখন আপনি প্রাপক ব্যবসায়ীকে হীরের দাম মেটানোর জন্য তা দিতে যাবেন, সঙ্গে নিয়ে যান সীল করা থলি সহ সেই শরাফকে। তার করা সীল অটুট আছে দেখলে সে তখন সেই ব্যবসায়ীকে জানিয়ে দেবে, থলিতে থাকা মুদ্রাগুলি তার পরখ করা, কোন খারাপ মুদ্রা তাতে থাকলে রইল সে নিজেই সেজন্য দায়ী।

রুপিয়ার বেলা মুঘল সম্রাট ও গোলকুণ্ডার রাজা দুজনের মুদ্রাই নির্বিবাদে গ্রহণ করেন খনি মালিকরা। কেননা, সম্প্রীতি থাকাকালে গোলকুণ্ডার রাজার তৈরি মুদ্রাগুলি আসলে মুঘল সম্রাটেরই মুদ্রা।

যেরকমটি মনে করা হয় তার চেয়ে ভারতীয়দের বোধবুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও চাতুর্য বেশি। প্যাগোডা স্বর্ণ মুদ্রাগুলি কড়ে আঙুলের নখের মতোই আকারে ছোট হলেও বেশ পুরু। তাই সম্ভব নয় লোকের নজর ফাঁকি দিয়ে তা থেকে সোনা ছেঁটে নেয়া। এজন্য তার ধারা গায়ে সূক্ষ্ম ছেঁদা ক'রে ওই পথে প্রত্যেকটি মুদ্রা থেকে কিছু-সোনা মুঠোর রেণু বার ক'রে নেয় তারা। তারপর (মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে) ওই ছেঁদা গুলি এমন নিপুণভাবে ভরাট ক'রে দেয় যে তা থেকে সোনা বার ক'রে নেয়ার কথা একেবারেই ধরা পড়ে না সাদা চোখে। যদি আপনি সেখানকার কোন গাঁ থেকে কোন জিনিস কেনে তার বিনিময়ে কিংবা নদী পার হতে গিয়ে মাঝির প্রাপ্য মেটানোর জন্য তার হাতে রূপার মুদ্রা দেন—সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে মুদ্রাটিকে ছুঁড়ে দেবে তারা তার ভেতরে। যদি আগুন থেকে বার করার পরও তার রঙ অমলিন থাকে তবেই নেবে সেটিকে, যদি কালচে হয়ে যায় ফিরিয়ে দেবে আপনাকে। কেননা, ভারতের সব রূপার মুদ্রাই অতি বিশুদ্ধ মানের রূপা দিয়ে তৈরি। আর ইওরোপ থেকে যত যা রূপা (ও রূপার মুদ্রা) সে-দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকেও (পরিশোধন সহ) রূপান্তরিত করিয়ে নিতে হয় স্থানীয় মুদ্রায়। প্রসঙ্গক্রমে আরো জানাই, যারা (মুদ্রার সাহায্যে কেনাকাটা করতে গিয়ে) বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের অনেকের ধারণা এ সমস্যা এড়াবার ভাল উপায় হচ্ছে খনি এলাকায় মশলা, তামাক, আয়না ও অন্যান্য খুঁটিনাটি পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া এবং তারই বিনিময়ে হীরে সংগ্রহ

করা। আমার প্রথমবারের পর্যটনকালে এক সওদাগর বন্ধু অন্ততঃ সেই ধারণাতেই বিশ্বাসী ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন আমায়। কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। খনি এলাকায় যারা হীরে বেচেন তারা তার বিনিময়ে নিতে আগ্রহী শুধু ভাল মানের সোনাই নয়, একেবারে সেরা মানের সোনা।

যে সড়কপথ ধরে খনিগুলিতে যেতে হয় সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলি এবার। আগেই বলেছি, ইদানীংকালে রটান কিছু আজগুবি গল্প-গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে এই সব এলাকাকে বিপদজনক ও দুরূহ বলে। এই সব অঞ্চল নাকি বাঘ ও সিংহে ভরা, অধিবাসীরাও নাকি বর্বর প্রকৃতির। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিন্তু তাদের ওই রটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। নেই ঐ সব বন জন্তু, অধিবাসীরাও বিদেশীদের প্রতি পূর্ণ শুভেচ্ছা মনোভাব পরায়ণ ও ভদ্র।

গোলকুণ্ডা যাবার বেলা তার অবস্থান ও পথঘাটের হদিশ ভাল ভাবে না জানলেও অসুবিধা নেই কিছু। কিন্তু গোলকুণ্ড থেকে প্রধান খনি এলাকা রম্মলকোট যেতে হলে, তার পথঘাটের হদিশ খুব কম লোকেরই জানা বলে সে সম্পর্কে আগে থেকে ভাল ধারণা থাকা দরকার। আমি যে পথ ধরে সেখানে গিয়েছিলাম তাই শুনিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। ওই অঞ্চলে দূরত্ব নিরূপণ করা হয় গোশ পরিমাপ ভিত্তিতে। এক গোশ চার ফ্রেঞ্চ লীগের সমান (অর্থাৎ প্রায় আট মাইল)।

রম্মলকোট যাবার জন্য গোলকুণ্ডা থেকে যাত্রা ক'রে পৌঁছলাম প্রথমে এক গোশ পথ পাড়ি দিয়ে কনপুর। তারপর আড়াই গোশ পাড়ি দিয়ে পরকোয়েল। সেখান থেকে এক গোশ পথ চলে উপস্থিত হলাম ককেনোল। ককেনোল থেকে তিন গোশ পাড়ি দেয়ার পর এলাম কনোল-কণ্ডনোর। তারপর এক গোশ এগোতে হাজির হলাম সেতাপুর। সেতাপুর থেকে দু গোশ এগোবার পর দর্শন পেলাম (কৃষ্ণা) নদীটির। (বিরাম পর্বগুলি সম্ভবত: এইরূপ : গোলকুণ্ডা, কোনদোর, বুরগল, কোয়লকোণ্ড, কৌদানুল, সইদুপুর, কৃষ্ণা নদীকূল)

এই নদীটিই গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের মধ্য সীমানা।

নদী পার হবার পর এলাম অলপুর, পৌনে এক গোশ পেরিয়ে। তারপর আরো পৌনে এক গোশ পিছু ফেলে কনোল। এরপর আড়াই গোশ পাড়ি দিতেই পৌঁছে গেলাম রাওলকুণ্ডা (রম্মলকোট)। তার মানে গোলকুণ্ডা থেকে এই খনি এলাকার দূরত্ব মোট ১৭ গোশ বা ৬৮ ফ্রেঞ্চলীগ। (এই বিরাম পর্ব গুলি যথাক্রমে : কৃষ্ণা নদী, আলমপুর, করনুল, রম্মলকোট

[গোলকুণ্ডা—রম্মলকোট দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে কথিত মতো ১৭ গোশ হলেও বর্ণনা মধ্যে দেয়া বিরাম মধ্যবর্তী দূরত্বগুলি যোগ করলে পাওয়া যায় মাত্র ১৪½ গোশ। সুতরাং মনে হয়, কতক বিরাম-পর্বের দূরত্ব দেয়া হয়েছে প্রকৃত দূরত্ব অপেক্ষা কম। লিপিপ্রমাদই মনে হয় এজন্য দায়ী।]

গোলকুণ্ডা থেকে গনি বা কৌলোর খনি এলাকার দূরত্ব ১৩¾ গোশ বা ৫৫ ফ্রেঞ্চলীগ। গোলকুণ্ডা থেকে অলমাস্পিন্দে ৩½ গোশ। অলমাস্পিন্দে থেকে কপের দুই গোশ। কপের থেকে মন্টেকৌর ২½ গোশ, মন্টেকৌর থেকে নজেলপর ২ গোশ। নজেলপর থেকে এলিগদা ১½ গোশ। এলিগদা থেকে সর্বরোন—১ গোশ। সর্বরোন থেকে মেল্লসেবউ—১ গোশ। মেল্লসেরউ থেকে পোনোকউর ১¾ গোশ। [সঠিক দূরত্ব ১৩¾ গোশ বলা হয়েছে। প্রতি বিরাম পর্বের দূরত্ব যোগ করলে দাঁড়ায় ১৫½ গোশ। প্রথম পর্বের দেয়া দূরত্ব স্পষ্টতঃই ভুল, প্রকৃত দূরত্ব ১০ মাইল বা ২½ গোশের বেশি নয়।]

এবার আমি এমন একটি বিষয়ের ওপর কিছু বলতে চাই যে-সম্পর্কে বলতে গেলে কোন কিছু ধারণাই নেই ইওরোপীয়দের।

তিন ক্যারাট ও তদূর্ধ্ব হীরার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি

এখানে আমি তিন ক্যারাটের চেয়ে কম ওজনের হীরে সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনে। সেগুলির দাম সকলেরই প্রায় ভালভাবে জানা।

হীরের বেলা প্রথমেই প্রয়োজন তার ওজন নির্ধারণ। তারপর দেখতে হবে সেটি নিখুঁত কিনা। পাথরটি পুরু ও বর্গাকার এবং অক্ষত কিনা তার কোণ-গুলি। নির্মল ও জলুষ জাগানো কিনা তার রঙটি। দাগ ও চিড় মুক্ত কিনা। যদি সেটিকে বহু কোণাকৃতি ভাবে কাটা হয়ে থাকে, যাকে রত্ন-ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় সাধারণতঃ 'গোলাপ' আকৃতি বলা হয়, তাহলে দেখা দরকার তার আকারটি নিটোল গোল অথবা ডিমেল ধরনের। সেটি সুবিস্তারী সুসম চেহারার অথবা অসম আকৃতির ডেলা গোত্রীয়। এছাড়াও ভালভাবে নজর দিয়ে দেখা দরকার তার রঙ সর্বত্র সুসম কিনা, কোথাও কোনরকম অস্বচ্ছতা, ফুটকি কিংবা অন্য রকমের কোন খুঁত আছে কিনা।

ওপরে বলা ধরনের একটি নিখুঁত হীরের ওজন এক ক্যারাট হলে দাম তার

১৫০ লিভর (১০০ রূপিয়া) বা তারও বেশি। এবার যদি এরকম নিখুঁত বারো ক্যারাট ওজনের হীরের দাম কষতে হয় তবে তা বার করতে হবে এইভাবে : হীরেটি যত ওজনের প্রথমে ঠিক তত দিয়ে গুণ করুন তাকে। এটির বেলা হবে তা ১২×১২=১৪৪। এবার এক ক্যারাটের হীরের দাম ১৫০ লিভর দিয়ে করুন তাকে গুণ। পেলেন ২১,৬০০ লিভর। এই-ই হবে ১২ ক্যারাট ওজনের নিখুঁত একটি হীরের দাম।

নিখুঁত হীরের দাম জানলেই চলবে না শুধু, জানা প্রয়োজন যে-সব হীরে ওই রকমটি নয়-তার দামও। তার বেলাও দাম ধার্য করা হয় ওই একই রীতিতে, এক ক্যারাট ওজনের হীরের দামকেই ভিত্তি ক'রে। ধরুন, একটি হীরের ওজন ১৫ ক্যারাট। কিন্তু সেটি নিখুঁত নয়। রঙটি যেমন ভাল নয় তার, আকারটিও বদখত, কিংবা দাগ ও অন্যান্য খুঁতে ভরা। মান ও সৌন্দর্যের তারতম্য অনুসারে এধরনের একটি এক ক্যারাট ওজনের হীরের দাম হতে পারে ৬০, ৮০ কিংবা বড় জোর ১০০ লিভর। ধরা যাক, এই হীরেটির যা মান সে ক্ষেত্রে এক ক্যারাটের হলে দাম হত তার ৮০ লিভর। তাহলে ১৫ ক্যারাট ওজনের হীরেটির দাম দাঁড়াবে ১৫×১৫×৮০ লিভর বা ১৮০০০ লিভর।

নিখুঁত ও অ-নিখুঁত হীরের মধ্যে দামের কিরূপ দুস্তর ব্যবধান সহজেই অনুমান করা চলে এ থেকে। এই পনের ক্যারাট ওজনের পাথরটিই যদি নিখুঁত পর্যায়ের হত তাহলে তার দাম দাঁড়াত ১৫×১৫×১৫০ লিভর বা ৩৩,৭৫০ লিভর। তার মানে, খুঁত থাকা পাথরটির চেয়ে ১৫,৭৫০ লিভর বেশি।

এই পদ্ধতিতে দাম কষলে পৃথিবীর সব থেকে বড় কাটা হীরে দুটির দাম কত দাঁড়ায় তা একটু দেখানো যাক এখানে। এই হীরে দুটির একটি রয়েছে এশিয়াতে, মুঘল সম্রাটের কাছে। অন্যটি ইওরোপে, তুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউকের রত্নাগারে।

মুঘল সম্রাটের হীরেটির ওজন ২৭৯$\frac{9}{16}$ ক্যারাট। এটির রঙ ত্রুটিবিহীন, আকারটিও সুন্দর। নিচের দিককার পরিধির এক কিনারে একটি ক্ষুদে চিড় শুধু যা। এ চিড়টি না থাকলে প্রথম ক্যারাটের দাম স্বচ্ছন্দে ধরা যেত ১৬০ লিভর। কিন্তু ওটি থাকায় ধরলাম না আমি ১৫০ লিভরের বেশি। ফলে, ওপরে বলা সূত্রানুসারে এটির দাম দাঁড়ায় ১,১৭,২৩,২৭৮ লিভর ১৪ সোল ৩ লিয়ার্ড। যদি এটির ওজন পুরো ২৭৯ ক্যারাট হত তাহলে দাম দাঁড়াত ১,১৬,৭৬,১৫০ লিভর। তার মানে, মাত্র তার চেয়ে $\frac{9}{16}$ ক্যারাট বেশি থাকা সত্ত্বেও ওই বেশিটুকুর দাম ৪৭,১২৮ লিভর ১৪ সোল ৩ লিয়ার্ড।

তুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউকের কাছে থাকা হীরেটির ওজন ১৩৯½ ক্যারাট। রঙটি যেমন স্বচ্ছ ও সুসম, আকারটিও তেমনটি চমৎকার। এটির সর্বাঙ্গ বহু-কোণাকৃতি করে বা 'গোলাপ' আকারে কাটা। এ সত্ত্বেও রঙের আভা অনেকটা সিট্রোন লেবু ঘেঁষা বলে প্রথম ক্যারাটের দাম ধরছি আমি ১৩৫ লিভর। এক্ষেত্রে এটির দাম দাঁড়ায় ২৬,০৮,৩৩৫ লিভর।

উপসংহারে জানাই, খনি মালিকরা তাদের ভাষায় ডায়মণ্ড-কে বলে ইরি (হীরা)। তুর্কী, ফার্সী ও আরবী ভাষায় বলা হয় অলমাস। ইওরোপের সব কটি ভাষাতেই ডায়মণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন নাম নেই এর।

বার কয়েক হীরে খনি অঞ্চল ভ্রমণ সূত্রে এ সম্পর্কে যা কিছু জানার সুযোগ হয়েছে আমার তা সবই জানালাম এখানে। যদি আমার আগে আর কেউ এ সম্পর্কে কোন কিছু লিখে থাকেন তাহলে জানবেন যে-সব তথ্য তাদের কাছে আমি প্রকাশ করেছি তারই ভিত্তিতে তা লিখেছেন তারা। (ট্যাভারনিয়ারের এ মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা, তার আগেই মেথোল্ড ভ্রমণ ক'রে গেছেন খনি অঞ্চল। এমনকি সিজার ফ্রেডেরিকও সম্ভবতঃ এসেছিলেন রম্মলকোটে। তিনি তার বিবরণ লিখে গেছেন ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে)।

আঠেরো ।। রঙীন রত্ন-পাথর : কোন্ কোন্ দেশে তা মেলে

রঙীন রত্ন পাথরের সন্ধান মেলে শুধু বা দুটি দেশ থেকেই পূব-জগতের। সে দুটি দেশ হল পেগু রাজ্য ও সিংহলদ্বীপ। প্রথম স্থানে তা মেলে একটি পাহাড় থেকে। এই পাহাড়টি (ওই রাজ্যের রাজধানী) অব থেকে উত্তর-পূব দিকে ১২ দিন বা কিছুটা কম-বেশি পথ দূরে। নাম কপেলন (ক্যাতপিয়েন)। এ খনিটি থেকেই মিলে থাকে সর্বাধিক পরিমাণ **ruby** (চুনি), **Spinelles** বা **mothers of ruby, yellow topaz** (পুষ্পরাগ), **blue and white Saphire** (নীলকান্ত ও শুভ্রকান্ত মণি), **hyacinth** (রক্তমুখী নীলা), **amethyst** (পান্নাসদৃশ মণি) ও অন্যান্য সব রঙীন পাথর। এইসব কঠিন পাথরের সাথে মেলে কতক নরম পাথরও। স্থানীয় ভাষায় সেগুলিকে বলা হয়ে থাকে বকন। মূল্যবান পাথর বলে মনে করা হয় না এগুলিকে।

বিভিন্ন পর্যটন কালে মসুলিপত্তম ও গোলকুণ্ডায় থাকাকালীন সুযোগ হয়েছে আমার সেখান থেকে সওদাগরদের নিয়ে আসা রুবি (চুনি) বেচার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার। ভাল জাতের বলে চালানো যেতে পারে এমন এক রতি ওজনের চুনি বিক্রী হতে দেখেছি ২০ প্যাগোডায়। ২½ রতি ওজনের চুনি ৮০ প্যাগোডায়। ৩¼ রতি ওজনের ১৮৫ প্যাগোডায়। ৪½ রতি ওজনের ৪৫০ প্যাগোডায়। ৫ রতি ওজনের ৫২৫ প্যাগোডায়। আর ৬¼ রতি ওজনের ৯২০ প্যাগোডায়। এই লেন-দেন হয়ে থাকে সুদা পুরনো প্যাগোডা ভিত্তিতে। ওজন ছ রতির বেশি এবং পাথরটি নিখুঁত মানের হলে যে দামই হাঁকা হয় বিক্রি হয়ে যায় সে দামেই।

সিংহল দ্বীপে চুনি ও অন্যান্য রত্ন পাথর মেলে একটি নদী-শয্যা থেকে। দ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে থাকা উত্তুঙ্গ পাহাড়মালা থেকে জন্ম নিয়েছে এ নদীটি। বর্ষার মরশুমে ফুলে ফেঁপে বিশাল চেহারা ধারণ করে সেটি। তিন বা চার মাস পর হয়ে আসে ক্ষীণস্রোতা। তখন দরিদ্র মানুষের দল খুঁজে ফেরে এইসব পাথর ওই নদী-শয্যার বালুতে। মেলে রুবি, স্যাফায়ার ও টোপাজ (নিচু নীলা ও পুষ্পরাগ)। এই নদী-শয্যা থেকে মেলা পাথরগুলি পেগুর তুলনায় অনেক সুন্দর ও স্বচ্ছ।

বলতে ভুলে গেছি, পেগু থেকে যে পাহাড়মালাটি কাম্বোয়া (কম্বোডিয়া) রাজ্যের দিকে চলে গেছে সেখানকার কতক বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেও চুনি মেলে কিছু পরিমাণে। তবে অন্য প্রজাতের তুলনায় ব্যালাস চুনিই বেশি। মেলে এছাড়া স্পিনেল, স্যাফায়ার ও টোপাজ। অনেক সোনা খনিও রয়েছে এই পার্বত্য অঞ্চলে। আসে ওই এলাকাগুলি থেকে **rhubarb**-ও। এ অঞ্চলের **rhubarb**-এর প্রচুর কদর। কেননা, এশিয়ায় যেগুলি জন্মায় তার মতো নষ্ট হয়ে যায় না এগুলি তাড়াতাড়ি।

ইওরোপের দুটি দেশ থেকে রঙীন রত্ন পাথর মেলে সাধারণতঃ। সে দুটি দেশ হল বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরী। বোহেমিয়ায় একটি খনি আছে মেলে যেখান থেকে বিভিন্ন আকারের নুড়ি। কতক তার ডিমের আকারের সমান, কতক হাতের মুঠির মতো বড়। সেগুলি ভাঙলে মেলে তার কোন কোনটির ভেতর থেকে চুনি (প্রকৃতপক্ষে গারনিট বা তামড়ি)। এগুলি পেগুর চুনির মতোই কঠিন ও সুন্দর-দর্শন। হাঙ্গেরীতে একটি খনি আছে মেলে যেখান থেকে ওপল (দুধকান্ত মণি)। পাওয়া যায় না এটি পৃথিবীর আর কোথাও। (ভারতের পুনা, বিজাপুর ও

সীতাবনদীতে ঔপল পাওয়া যেত বলে উল্লেখ মেলে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া থেকেও পাওয়া যাচ্ছে অতি উৎকৃষ্ট ধরনের ঔপল)।

ট্যারকোয়াজ (আকাশী নীল অস্বচ্ছ পাথর) বর্তমান একমাত্র পারস্যেই। সেখানে রয়েছে এর দুটি খনি। একটির নাম পুরনো পাহাড়, সেটি মেসহদ থেকে তিনদিনের পথ দূরে, উত্তর-পশ্চিমে। অন্যটির নাম নতুন পাহাড়। সেটি অন্যটি থেকে পাঁচদিনের পথ দূরে।

এম্যারল্ড বা পান্না প্রথম পূব জগতেই পাওয়া গিয়েছিল এরূপ এক ভুল ধারণা বহুকাল ধরে চলিত রয়েছে কিছু লোকের মধ্যে। আসলে, আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্বের কথা জানা না থাকার দরুন, তা আবিষ্কৃত হবার আগ পর্যন্ত ওই রকমটি ছাড়া অন্যরকম কিছু ভাবতেই পারেননি কেউ। প্রচলিত এই ভুল ধারণার দরুনই বর্তমান কালেও অধিকাংশ রত্ন ব্যবসায়ী ও কারিগর চড়া ঘন রঙা পান্না দেখলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে পূবদেশীয় পান্না রূপে অভিহিত করতে। এদ্বারা ভুলই ক'রে থাকেন তারা, কেননা, পূবজগতে কস্মিন কালেও উৎপাদিত হয়নি এ বস্তুটি। (পান্নার প্রাচীন উৎস সম্পর্কে ট্যাভারনিয়ারের কোন ধারণা না থাকার কথাই সূচিত হয় এ থেকে। **Beryl** জাতীয় সাধারণ নীলাভ সবুজ পাথর সুপ্রচুর মেলে ভারতে। **Emerald** বা পান্না সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে সুপরিচিত এবং কদরও তার যথেষ্ট। তবে জানা যায় না এদেশে তা মেলার কথা। এটির উৎস ছিল প্রকৃত পক্ষে মিশর। ভারতে এটির যোগান আসত সেখান থেকেই। প্লিনী, কসমস, মাসুদী এবং নবম শতাব্দীর মুসলমান পর্যটকদের বিবরণই এর সাক্ষী। সাইবেরিয়া অঞ্চলে পান্নার অস্তিত্বের খবর বর্তমান শতাব্দীর আগে জানা ছিল না খুব সম্ভবতঃ।)

উনিশ ॥ মুক্তা ও পৃথিবীর মুক্তা-অঞ্চল

পূব ও পশ্চিম দুই সাগর এলাকাতেই মুক্তার অস্তিত্ব বর্তমান।

পূব সাগর এলাকার মুক্তা অঞ্চলের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পারস্য উপসাগরের বুকে থাকা বহরেন দ্বীপের। এ দ্বীপটির চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে মুক্তা ভেরির অস্তিত্ব। এটি পারস্যের শাহর এক্তিয়ারে।

পূব সাগরের দ্বিতীয় মুক্তা-অঞ্চলটি বহরেন দ্বীপেরই বিপরীত দিকে, আরব

ফেলিক্সোর উপকূলে, অল কতীফ শহরটির কাছে। এ অঞ্চল ও তার আশে-পাশের অঞ্চলগুলির অধিপতি একজন আরব সুলতান।

ভারতীয়রা মুক্তার ব্যাপারে আমাদের মতো খুঁতখুঁতে নয় বলে এ দুই অঞ্চলে সংগৃহীত মুক্তার সিংহভাগই বিক্রি হয়ে থাকে ভারতবর্ষে। কি গোল কি অন্যান্য বিচিত্র আকৃতির সব রকমই অনায়াসে চলে যায় সেদেশে। ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে সাদা অপেক্ষা ঈষৎ হলদেটে আভা থাকা মুক্তাই বেশি পছন্দ করে সবাই।

আরব দেশীয় সুলতানের কাছে থাকা অপূর্ব মুক্তাটির কথা এই প্রসঙ্গে শোনানো যাক এখানে। এই সুলতানই মসকাত দখল ক'রে নিয়েছেন পর্তুগীজদের কাছ থেকে। এই বিজয়ের পর ইমেনহেক্ত উপাধি সহ নিজেকে বিশেষিত করেছেন তিনি মসকাতের সুলতান বলে। ইতিপূর্বে ছিলেন তিনি নোরেন্নয়ের সুলতান, নাম আসফ-বিন আলী। এটি একটি ছোট এলাকা হলেও অ্যারাবীয়া ফেলিক্সের মধ্যে সেরা অঞ্চল। এই সুলতানই পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর মুক্তাটির মালিক। ওজনের দিক থেকে অবশ্যই এটি সেরা নয়, ওজন এর মাত্র ১২১/১৬ ক্যারাট। আবার নিটোল গোলাকৃতির জন্যও সেরা নয় এটি। এর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুপম সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে এর নির্মল ও স্বচ্ছ গড়ন। এটি এত নির্মল এত স্বচ্ছ যে তাকালে মনে হবে যেন আলো ভেদ ক'রে চলে যাচ্ছে তার মধ্য দিয়ে। অ্যারাবীয়া ফেলিক্স ও পারস্যের মাঝে থাকা হরমুজের সুমুখবর্তী উপসাগর এলাকার বিস্তৃতি ১২ লীগও হবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া আরব ও পারসিকদের মধ্যে এসময়ে সুসম্পর্ক থাকার দরুন হরমুজের খানের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন মসকাতের সুলতান। অতি জাঁকজমকের সাথে তাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন খান। আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে ইংরাজ, ডাচ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গীরাও। ছিলাম আমিও। ভোজ শেষ হবার পর গলায় ঝুলিয়ে রাখা একটি ক্ষুদে থলি থেকে সুলতান বার করলেন মুক্তাটি। দেখালেন খান ও উপস্থিত অন্যান্য সবাইকে। পারস্যের শাহকে উপহার দেবার বাসনা থেকে খান কিনে নিতে চাইলেন সেটি, যাচলেন ২০০০ তোমান সেজন্য। কিন্তু সুলতান রাজী হলেন না সেটিকে হাতছাড়া করতে। মুঘল সম্রাটও সেটি কেনার জন্য এক বেনিয়া সওদাগরকে পাঠান তার কাছে। ওই সওদাগরের সঙ্গে একই জাহাজে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সম্রাট এই মুক্তাটির জন্য দিতে চেয়েছিলেন সুলতানকে ৪০,০০০ একু (৮০,০০০ টাকা)। কিন্তু তবুও হাতছাড়া করলেন না তিনি।

এই ঘটনাটি বলে দেয়, সেরা রত্নাদি সব সময়ে ইওরোপে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং আমি যেমনটি করেছি তেমনটি এশিয়াতে নিয়ে যাওয়াই লাভজনক। অনিন্দ্য সৌন্দর্য সম্পন্ন রত্নাদি ও মুক্তার বিশেষ কদর রয়েছে সেখানে। তবে চীন ও জাপানের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে কদর নেই এসবের।

পূব সাগরের অপর একটি মুক্তা-অঞ্চল হল সিংহল (আধুনিক শ্রীলঙ্কা)-এর মানার নামের বড় শহরটির নিকটবর্তী সাগর এলাকা। সব মুক্তা-অঞ্চলের মধ্যে এখানে মেলা মুক্তাই সৌন্দর্যের দিক থেকে সবার সেরা। যেমন রঙের দিক থেকে তেমনি নিটোল গোল আকৃতির দিক থেকে। তবে তিন কি চার ক্যারাটের চেয়ে বড় আকারের মুক্তা কদাচিত মেলে এখানে।

মুক্তা অঞ্চল বর্তমান জাপানের সাগর উপকূলেও। রঙের দিক থেকে অতি মনোরম, আকারও ভাল। তবে গড়নের দিক থেকে আদপেই নিটোল বা নিখুঁত নয়। এসত্ত্বেও সেখানে সংগ্রহ করা হয় না তা। কারণ আগেই বলেছি, রত্নাদির প্রতি কোন আকর্ষণ নেই জাপানীদের।

বাহরেন ও অল-কতীফ-এর মুক্তা ঈষৎ হলদে ঘেঁষা হলেও মানারের মুক্তার মতোই উঁচু কদর তার। আগেই বলেছি তার কারণ। পূবের দেশগুলিতে পাকা পরিণত মুক্তা বলে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে এ ধরনের আভা বিশিষ্ট মুক্তাকে। বলা হয়ে থাকে, কখনো নাকি পরিবর্তন ঘটেনা এর রঙের।

এবার পশ্চিম সাগরের মুক্তা অঞ্চলের কথা বলি আপনাদের। তার সব কটিই মেক্সিকোর সুবিস্তৃত উপসাগর এলাকায়, নিউ স্পেনের উপকূল বরাবর। পূব থেকে ক্রমশ: পশ্চিমে পর পর পাঁচটি মুক্তা-ভেরি রয়েছে সেখানে।

প্রথমটি কিউবাগুয়া দ্বীপের কাছে (ভেনেজুয়েলার অধীন এ দ্বীপটি)। তিন লীগ পরিধির এই দ্বীপটি মূল ভূখণ্ড থেকে পাঁচ লীগের মতো দূরে। অতি অনুর্বর এলাকা। যেমন খাদ্যসামগ্রী থেকে সবকিছুরই অনটন, অভাব তেমনি পানীয় জলেরও। সব কিছুই মূল ভূখণ্ড থেকে সংগ্রহ করতে হয় অধিবাসীদের। অতি বিশিষ্ট মুক্তা অঞ্চল রূপে সারা পশ্চিমে এ দ্বীপটির প্রসিদ্ধি। তবে এখানে মেলা সব থেকে বড় মুক্তার ওজনও পাঁচ ক্যারাটের উর্ধ্বে নয়। দ্বিতীয় ভেরিটি মাণ্ডারাইট (মার্গারিটা) বা মুক্তা-দ্বীপের উপকূলে। কিউবাগুয়া থেকে মাত্র এক লীগ দূরে। পানীয় জল বাদে আর কোন কিছুরই অনটন নেই এখানে। সেটি সংগ্রহ করে তারা নিউ কাদিজের নিকটবর্তী কিউমানা নদী থেকে। আমেরিকায় থাকা পাঁচটি মুক্তা অঞ্চলের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ না হলেও,

প্রধান রূপে বিবেচিত। রঙ ও আকার দুদিক থেকেই এখানকার মুক্তা অন্য কটির চেয়ে উঁচু মানের। চমৎকার নাসপাতি গড়নের ও সুন্দর রঙা ৫৫ ক্যারাট ওজনের যে মুক্তাটি মুঘল সম্রাটের মামা শায়েস্তা খানের কাছে আমি বেচি সেটি এখানকারই।

যে পূব জগতে মুক্তার ছড়াছড়ি সেখানে ইওরোপ থেকে মুক্তা যাবার কথা শুনে অবাক হয়ে যান অনেকেই। এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে পূবের ভেরিগুলি থেকে মেলে না মোটেই পশ্চিমের মতো বড় বড় মুক্তা। এছাড়া এশিয়ার রাজা-রাজড়া অভিজাতরা ইওরোপের তুলনায় দামও দেয় ঢের ভাল। শুধু মুক্তার জন্যই নয়, সব ধরনের রত্ন পাথরের জন্যই। বিশেষ ক'রে তা যদি সাধারণ গোত্রের না হয়ে, হয় অসাধারণ। হীরার বেলা খাটে না এ কথা।

তৃতীয় মুক্তা-ভেরিটি মূল ভূখণ্ডের কাছে কয়োগোটা-এ। চতুর্থটি সেই একই উপকূলের রিও ডিলা হাচায় (কর্ণাট্টয়া)। পঞ্চম বা শেষ ভেরিটি চতুর্থটি থেকে ৬০ লীগ দূরে সেইন্ট মার্থের তিন ভেরি থেকেই মেলে বড় আকারের মুক্তা। তবে বি-সম গড়নের। রঙও তার সীসের মতো।

পরিশেষে জানাই, স্কটল্যাণ্ড থেকে এবং বাভারিয়ার নদী অঞ্চল থেকে যে-সব মুক্তা মেলে তা দিয়ে কণ্ঠহার তৈরি হলেও এবং তা হাজার একু বা তার ঊর্ধ্ব দামে বিক্রী হলেও পূব-জগত ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুক্তার সঙ্গে কোন তুলনাই করা চলে না তার।

ইতিপূর্বে মুক্তা সম্পর্কে যারা লিখে গেছেন তাদের কেউই হয়ত জানাননি এ খবরটি আপনাদের। বছর কতক আগে জাপানের উপকূল ভাগের একটি বিশেষ এলাকায় সন্ধান পাওয়া গেছে একটি মুক্তা অঞ্চলের। আমার সুযোগ হয়েছিল সেখান থেকে ডাচদের নিয়ে আসা কতক মুক্তা নিজ চোখে দেখার। সেগুলির রঙ অতি সুন্দর এবং কতক তার বড় আকারের হলেও সবগুলিই বি-সম গড়নের। আগেই জানিয়েছি, মুক্তার কোন কদর নেই জাপানে। নইলে, যদি তারা মুক্তা সন্ধানের দিকে ঝুঁকতো তাহলে মনে হয় নিশ্চয়ই পেয়ে যেত ভাল মুক্তারও গুটি কতক ঘাঁটির খোঁজ। (ইদানীং কালে জাপানীরা কিন্তু জোরসোর ভাবে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তার চাষ ক'রে চলেছে সে-দেশে)।

সবার শেষে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা যাক মুক্তা সম্পর্কে। বিশেষ ক'রে তার রঙের বিভেদ নিয়ে। এদের কতকের রঙ অতি শুভ্র। কতকের রঙ হলদে আভা যুক্ত। কতকের কালো। কতকের আবার সত্যি বলতে কি

ঠিক সীসের মতো। শেষ প্রজাতের মুক্তা দেখা যায় শুধু যা আমেরিকাতেই। পুবের তুলনায় এখানকার সাগর তল অধিক পাঁকে ভরা বলে তারই দরুন মুক্তা-গুলির এমন রঙ। একবার স্প্যানিশ গ্যালিয়নে ক'রে বাণিজ্য শেষে ফেরার বেলা বিশিষ্ট রত্ন ব্যবসায়ী প্রয়াত মঁসিয়ে দ্যু জরডিন নিয়ে এলেন নিকষ কালো রঙা ছটি নিটোল গোল মুক্তা। ওজন সব কটি মিলিয়ে বারো ক্যারাট। অন্যান্য কতক সামগ্রীর সাথে সেগুলিও দিলেন আমায় পুবের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কেউ একটিবার ফিরেও তাকালো না সেগুলির দিকে। থেকে গেল অবিক্রীত, নিয়ে এলাম দেশে ফিরিয়ে। যে মুক্তাগুলিতে হলদে আভা দেখা যায় সেগুলির ওই রকম রঙের মূল কারণ হল এই। মুক্তা ঝিনুক বা শুক্তি সংগ্রহকারীরা সেগুলিকে স্তূপ হিসাবে বিক্রী করে সাধারণত। ব্যবসায়ীরাও সেগুলিকে ওই ভাবে ফেলে রাখে, যতদিন না আপনা থেকে ফাঁক হয়ে যায় তার বন্ধ মুখগুলি। এজন্য অপেক্ষা করতে হয় কখন কখন চোদ্দ কি পনের দিন পর্যন্তও। ফলে তার দেহ-মেদের রঙ যায় পালটে। হয়ে ওঠে পচে পূতি গন্ধময়। আর, সেই মেদলগ্ন হয়ে থাকার দরুনই মুক্তার রঙ হয়ে যায় অমন হলদে আভা বিশিষ্ট। মুক্তাগুলির ওই রকম রঙের এই-ই যে প্রকৃত কারণ এতটুকুও ভুল নেই এতে। দেখা গেছে, যে শুক্তিগুলির মেদের রঙ পালটায়নি, অবিকৃত থেকে গেছে, তার ভেতরকার মুক্তাগুলির রঙ সবসময়েই সুশুভ্র। শুক্তিগুলির মুখ আপনা থেকে ফাঁক হবার জন্য অপেক্ষা ক'রে চলার কারণ, নয়তো জোর ক'রে খুললে জখম হতে বা ভেঙে যেতে পারে ভেতরে থাকা মুক্তাটি। মানার উপসাগর এলাকার শুক্তিগুলির মুখ পারস্য উপসাগরের শুক্তিগুলির তুলনায় পাঁচ ছদিন আগেই ফাঁক হয়ে যায় আপনা থেকে। এর কারণ, মানার উত্তর অক্ষাংশের ১০ ডিগ্রীতে (প্রকৃতপক্ষে, প্রায় ৮° থেকে ৯°) অবস্থিত বলে সেখানকার উত্তাপ পারস্য উপসাগর এলাকা বা বহরেনের চেয়ে অনেক খর। কেননা, বহরেনের অবস্থিতি সেক্ষেত্রে ২৭° ডিগ্রীতে। ফলে মানারে সংগৃহীত মুক্তার মধ্যে হলুদাভের দর্শন মেলে কখনো ক্বচিৎ। উপসংহারে জানাই, পুব জগতের অধিবাসীরা প্রায় আমাদের মতোই শুভ্র বর্ণের অনুরাগী। সব সময়েই আমি দেখেছি, তাদের ঝোঁক শুভ্রতম মুক্তা, শুভ্রতম হীরা, শুভ্রতম রুটি এবং শুভ্রতম রমণীর প্রতি। (অন্যত্র হলুদাভ মুক্তার প্রতি ঝোঁকের কথা বলা হলেও তা এই মন্তব্যের বিরুদ্ধ ধর্মী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা বিশাল এক জনসমাজ মধ্যে দুই প্রবণতাই বর্তমান থাকতে পারে সমান ভাবে।)

মুক্তা চয়ন রীতি: মুক্তার ওজন ও মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি

পূব-সাগরে মুক্তা চয়ন করা হয়ে থাকে বছরে দু বার। প্রথমে মার্চ ও এপ্রিল মাসে, তারপর আবার অগাষ্ট ও সেপ্টেম্বরে। বেচা-কেনা চলে জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। তবে করা হয় না কিন্তু প্রতি বছরেই এ চয়ন। যারা সাগর থেকে শুক্তি বা মুক্তা ঝিনুক সংগ্রহ করে তারা আগেভাগে যাচাই ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে নেয় এ মরশুমে এগুলি সংগ্রহ করা লাভপ্রদ হবে কিনা। এজন্য মুক্তা-ভেরি অঞ্চলে পাঠানো হয়ে থাকে প্রথমে সাত-আট খানি নৌকা। প্রত্যেকে তারা সাগর থেকে সংগ্রহ করে হাজার খানেকের মতো মুক্তা-ঝিনুক। যদি না প্রতি হাজার ঝিনুক থেকে অন্ততঃ ৫ ফনম বা আধ একু মূল্যের মুক্তা মেলে তাহলে ধরে নেয়া হয় ঝিনুক তুলে কোন লাভ হবে না এ মরশুমে। এসব হতদরিদ্রদের যে অর্থ ও শ্রম এজন্য বিনিয়োগ করতে হবে উশুল হবে না তা ঝিনুক বেচে। এ কাজে নামার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ও কাজ চলাকালে প্রয়োজনীয় অন্ন সংস্থানের জন্য ধার ক'রে টাকা যোগাড় ক'রে তারা, গুণতে হয় সেজন্য মাসিক তিন থেকে চার শতাংশ হারে সুদ। তাই, হাজারি ঝিনুক পিছু অন্ততঃ পাঁচ ফনম না পেলে ঝিনুক চয়নে নামা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। ব্যবসায়ীরা অবশ্য, অভাবী না হওয়ার দরুন, দাঁও মারার জন্য কপাল ঠুকে ঝুঁকি নিয়ে কেনে ঝিনুক, ভেতরে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যদি কখনো কোন ঝিনুকের মধ্যে বড় মুক্তা মেলে, খুলে যায় তার কপাল। তবে, ঘটে সে সৌভাগ্য খুবই কম। বিশেষ ক'রে মানার মুক্তা অঞ্চলে। কেননা, বড় মুক্তা মেলেই না একরকম সেখানে। বেশির ভাগই ক্ষুদে ক্ষুদে, বেচা হয় তা চূর্ণ হিসাবে ব্যবহারের জন্য আউন্স দরে। অল্প কতক প্রতিটি আধ গ্রেন থেকে এক গ্রেন ওজনের। দুই কি তিন ক্যারাট ওজনের কোন মুক্তা পেলে সে তো রীতিমতো এক ঘটনা। কোন কোন বছর হাজার ঝিনুক প্রতি আয় হয় ৭ ফনম পর্যন্ত, পুরো ঝিনুক সংগ্রহ থেকে মেলে এক লক্ষ পিয়েস্তা বা তার কিছু বেশি। পর্তু-গীজরা যখন মানার অঞ্চলে আধিপত্য করতেন প্রত্যেক নৌকা পিছু করা হতো তখন টোল আদায়। ডাচরা তাদের কাছ থেকে আধিপত্য ছিনিয়ে নেবার পর

থেকে ক'রে চলেছেন প্রত্যেক ডুবুরী পিছু আট পিয়েস্ত্রা ক'রে আদায়। কখনো কখনো ৯ পিয়েস্ত্রা। তেজী বছরগুলিতে এর ফলে ১৭,২০০ রিয়াল পর্যন্ত রাজস্ব আসে এথেকে তাদের। এই হতদরিদ্র লোকদের কাছে পর্তুগীজ ও পরে ডাচদের এভাবে কর আদায়ের কারণ আর কিছুই না। মালাবারী শত্রুদের হাত থেকে এদের রক্ষা করার জন্য করতে হয় প্রহরার ব্যবস্থা। মালাবারীরা সুযোগ পেলেই সশস্ত্র নৌকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ওপর, বন্দী ক'রে বানায় এদের দাস।

জেলেরা যাতে নিরাপদে শুক্তি সংগ্রহ করতে পারে এজন্য যে দিকটি থেকে মালাবারীরা আসে সে দিকটা দু-তিন খানি সশস্ত্র নৌকা নিয়ে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে চলে ডাচরা। জেলেদের প্রায় সকলেই পৌত্তলিক। তবে রয়েছে কতক মুসলমানও, আছে তাদের নিজস্ব নৌকাও। এ দুই (ধর্মীয় সম্প্রদায়ের) লোকেরা মেলামেশা করে না একে অপরের সঙ্গে। প্রথমোক্তদের তুলনায় শেষোক্তদের কাছ থেকে নেয়া হয়ে থাকে বেশি কর। পৌত্তলিকরা যে পরিমাণ কর দেয় তা তো গুণতেই হয় মুসলমানদের, তাছাড়াও দিতে হয় আবার একটি দিনের শুক্তি। কোন্ দিনেরটি নেয়া হবে তা ঠিক ক'রে থাকেন ডাচরাই।

বৃষ্টিপাত যত প্রবল হয় মুক্ত-ভোরের উৎপাদনও হয়ে থাকে তদনুপাতে ভাল। অনেকের আবার ধারণা, যে ঝিনুক যত গভীর জলে থাকে তার মুক্তাও হয় তত শুভ্র। সূর্যের আলো জল ভেদ ক'রে বেশি গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না বলে সেখানকার জল থাকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, তাই মুক্তাও হয় বেশি শুভ্র। কিন্তু এ ভুল ধারণাটি শোধরানো দরকার।

শুক্তি চয়ন করা হয়ে থাকে সাধারণতঃ উপকূলের কাছে চার থেকে বার হাত পর্যন্ত গভীর জলে। কখনো কখনো জড়ো হয় এজন্য ২৫০-র এর মতো নৌকা-ও। বেশির ভাগ নৌকাতেই থাকে একজন ক'রে ডুবুরী, নৌকাটি খুব বড় হলে দুজন। সূর্য ওঠার আগেই উপকূল থেকে নৌকা ভাসায় তারা প্রতি-দিন। ভূ-ভাগ থেকে নিয়মিত সাগরমুখি হাওয়া বয় ওই সময়ে, থাকে তা সকাল দশটা পর্যন্ত। বিকেলের দিকে ফেরে সবাই সাগর থেকে প্রবাহিত হাওয়ায় ভর দিয়ে। এ বাতাস দেখা দেয় ভূ-ভাগ থেকে বয়ে চলা বাতাস বন্ধ হবার পরেই, সকাল ১১টা থেকে ১২ টার মধ্যে। মুক্তা-অঞ্চল উপকূল থেকে পাঁচ-ছ কোশ ভেতর সাগরে। নৌকাগুলি সেখানে পৌঁছলে শুরু হয় নিচে বলা পদ্ধতি মতো শুক্তি চয়ন।

শুক্তি-চয়নের জন্য জলে নামার আগে ডুবুরীরা তাদের বাহুর গোড়ায় বেঁধে নেয় একটি ক'রে দড়ি। তার অন্য প্রান্তটি থাকে নৌকায় যারা বসে থাকেন তাদের হাতে। পায়ের বুড়ো আঙুলেও বেঁধে নেয়া হয় ১৮ থেকে ২০ পাউণ্ড ওজনের একটি পাথর। পাথরটির সঙ্গেও আটকানো থাকে একটি দড়ি, তার অন্য প্রান্তটিও থাকে নৌকায় বসে থাকা লোকদের হাতে। সঙ্গে নেয় জালের তৈরি একটি থলিও। তার মুখটি যাতে খোলা থাকে সেজন্য রয়েছে সেখানে একটি গোলাকার অংটার বেড়। এটিও দড়ি দিয়ে নৌকার সঙ্গে সংযুক্ত। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে একেবারে তার তলায় চলে যায় ডুবুরী। বুড়ো আঙুলের সঙ্গে আটকানো পাথরটি সাহায্য করে তাকে দ্রুত তলে পৌঁছে যেতে। পৌঁছে, খুলে ফেলে সে পাথরটি। নৌকায় থাকা লোকেরা টেনে ওপরে তুলে নেয় সেটিকে। যতক্ষণ দম বন্ধ ক'রে সাগরতলে থাকতে পারে ডুবুরী ততক্ষণ সংগ্রহ ক'রে চলে শুক্তি। কুড়িয়ে কুড়িয়ে ভরে চলে সেগুলো ওই জালির থলিটির ভেতর। তারপর দম ফুরিয়ে গেলেই হাতে বাঁধা দড়িতে টান দিয়ে সংকেত জানায় তাকে ওপরে টেনে তোলার জন্য। তখন নৌকায় অপেক্ষা ক'রে চলা লোকেরা যত দ্রুত সম্ভব টেনে ওপরে তুলে নেয় তাকে। মানারের অধিবাসীরা অন্যদের তুলনায় অনেক দক্ষ ডুবুরী. বহরেন কিংবা অল-কাতিফের ডুবুরীদের চেয়ে তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারে জলের নীচে। নাকে কানে জল ঢোকা রোধের জন্য নাকে চাপ এবং কানে তুলো গুঁজেও নেয় না এরা পারস্য উপসাগরের ডুবুরীদের মতো।

ডুবুরীকে তুলে নেয়ার পর টেনে তোলা হয় শুক্তি ভরা জালিটি। সেটি তুলে শুক্তি খালাস করতে ও ডুবুরীটির দম ফিরে পেতে কেটে যায় সাত আট মিনিট। তারপর আবার সে নেমে যায় সাগর জলে। সারা দিনে দশ কি বারো ঘন্টা এইভাবে বারবার সে ডুব দেয় সাগরে, ক'রে চলে শুক্তি চয়ন। দিন শেষে ফিরে আসে উপকূলে। যারা অভাবী তারা সঙ্গে সঙ্গেই বেচে দেয় শুক্তি-গুলি। যাদের রয়ে সয়ে বেচার মতো খাদ্য সংস্থান রয়েছে তারা পুরো সংগ্রহ পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা জমা ক'রে চলে অনেক সময়। মুখ জোর ক'রে না খুলে ফেলে রাখা হয় সেভাবেই তাদের, পচে যাবার পর আপনা থেকেই হাঁ হয়ে যায় তা। কতক শুক্তি আমাদের রউয়েন শুক্তির মতোই আকারে অন্যগুলির চেয়ে চারগুণের মতো বড়। কিন্তু এদের মাংস যেমন বিস্বাদ তেমনি দুর্গন্ধযুক্ত। তাই খায় না কেউ তা।

সারা ইওরোপে মুক্তা বিক্রী হয়ে থাকে ক্যারাট ওজন ভিত্তিতে। এক ক্যারাট চার গ্রেণের সমান, ঠিক যেমনটি ধরা হয়ে থাকে হীরের বেলা। কিন্তু এসিয়ায় ভিন্ন ধরনের ওজন চালু। পারস্তে মুক্তা ওজন করা হয় আব্বাস ভিত্তিতে। এক আব্বাস আমাদের ক্যারাটের তুলনায় $\frac{1}{8}$ ভাগ কম। ভারতে, সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জুড়ে, ওজন করা হয় তা রতি ভিত্তিতে। রতিও আব্বাসের মতোই ক্যারাট থেকে এক-অষ্টমাংশ কম।

সমগ্র এশিয়া মধ্যে গোয়াতেই হত আগে, হীরা, চুনি, নীলা, পুষ্পরাগ ও অন্যান্য রত্নাদির সর্বোচ্চ বিক্রিবাটা। খনি থেকে মেলা সেরা রত্নাদি বেচার জন্যে খনি মালিক ও রত্ন-বণিকেরা জমায়েত হতেন সেখানেই। সুযোগ পেতেন সেখানে তারা স্বাধীনভাবে সেগুলি বেচার। নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে কিন্তু পেতেন না সে সুযোগ তারা। স্থানীয় রাজা-রাজড়াদের সেগুলি দেখালে বাধ্য করতেন তারা নিজেদের ধার্য করা দামে তা বেচতে। বিরাট বেচা-কেনা চলত গোয়ায় মুক্তারও ওই সময়ে। যেমন পারস্য উপসাগরের বহরেন দ্বীপের মুক্তা তেমনি সিংহল দ্বীপের উপকূলস্থ মানার উপসাগরের মুক্তা। বাদ যেত না আমেরিকা থেকে আমদানি করা মুক্তাও। গোয়া ও ভারতের অন্যান্য পর্তুগীজ বসতিগুলিতে মুক্তা বেচার জন্য ব্যবহার করা হত তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের ওজন পদ্ধতি। ইওরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার অন্য আর কোনও মুক্তার বাজারে চল ছিল না তার। এই সঙ্গে আফ্রিকার নাম করলাম না এই কারণে যে এই ব্যবসাটি সেখানে অজানা। পৃথিবীর ওই বিশেষ অঞ্চলটির নারীরা রত্নের পরিবর্তে স্ফটিক, নকল প্রবালের পুঁতি বা হলদে স্ফটিক দিয়ে তৈরী কণ্ঠহার ও হাতে-পায়ের অন্যান্য অলঙ্কার ব্যবহার ক'রেই খুশী।

ভারতীয় বসতিগুলিতে পর্তুগীজদের ব্যবহৃত ওই ওজন পদ্ধতিটির নাম চেগো। মুক্তার বিক্রীবাটা এই ওজন ভিত্তিতে করলেও কিনতেন কিন্তু যে-বণিক যে-দেশ থেকে তা নিয়ে এসেছেন সেখানে চলিত ক্যারাট, আব্বাস কিংবা রতি ওজন ভিত্তিতেই। ক্যারাটের সঙ্গে চেগোর আনুপাতিক সম্পর্ক ধরা হত এই রকম:

ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো
১	৫	১১	৮৪	২১	৩০৬	৩১	৬৬৭$\frac{1}{4}$
২	৮	১২	১০০	২২	৩৩৬	৩২	৭১১
৩	১১$\frac{1}{4}$	১৩	১১৭	২৩	৩৬৭$\frac{1}{4}$	৩৩	৭৫৬$\frac{1}{4}$

ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো	ক্যারাট	চেগো
৪	১৬	১৪	১৩৬	২৪	৪০০	৩৪	৮০২ ৩/৪
৫	২১	১৫	১৫৬	২৫	৪৩০	৩৫	৮৫০ ১/২
৬	২৭	১৬	১৭৭ ৩/৫	২৬	৪৬৯ ১/৪	৩৬	৯০০
৭	৩৪	১৭	২০০ ১/২	২৭	৫০৬ ১/৪	৩৭	৯৫০ ১/২
৮	৪৪	১৮	২২৫	২৮	৫৪৪ ১/২	৩৮	১০০২ ২/৩
৯	৫৬	১৯	২৫০ ১/২	২৯	৫৮৪	৩৯	১০৫৬
১০	৬৯	২০	২৭৭ ৩/৪	৩০	৬২৫	৪০	১১১১ ১/৯

* চেগোকে ওজন পদ্ধতি রূপে আখ্যা না' দিয়ে মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বা সূত্র রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত।

একুশ ॥ লেখকের দেখা ইওরোপ ও এশিয়ার সব থেকে বড় হীরা : ফ্রান্সের সম্রাটের কাছে বিক্রী করা রত্ন সম্ভার : বিশিষ্ট চুনি ও দুধকান্তি মণি : সব থেকে বড় মুক্তা

ইউরোপ ও এশিয়ায় বর্তমান যে কয়টি অতি বড় ও সুন্দর দর্শন হীরা ও মাণিক্য দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, প্রতিকৃতি সহ এবার তারই বিবরণ শোনাব আপনাদের। প্রতিকৃতির ক্রম অনুসারে দিয়ে যাচ্ছি এর বর্ণনা। প্রথমেই বলছি আমার জানা সব থেকে বড় আকারের হীরেটির কথা।

ছবিতে থাকা প্রথম হীরাটির মালিক মুঘল সম্রাট। তার অন্যান্য রত্ন-সম্ভারের সাথে এটি দেখার পরম সুযোগ দিয়ে তিনি সম্মানিত করেছিলেন আমাকে। কাটার পর পাথরটি যে আকৃতি লাভ করে তারই চিত্র দেয়া হয়েছে এখানে। দেয়া হয়েছিল আমাকে এটি ওজন করার অনুমতিও। তা ক'রে জানলাম এটি ৩১৯ ১/২ রতির। তার মানে আমাদের ২৭৯ ৯/১৬ ক্যারাটের সমান। আগেই অন্যত্র জানিয়েছি, আকাটা অবস্থায় এটির ওজন ছিল ৯০৭ রতি, তার মানে আমাদের ৭৯৩ ৫/৮ ক্যারাট। একটি ডিমকে মাঝ থেকে দুফালি করলে যেমনটি দেখায় এ পাথরটির আকৃতি ঠিক তেমনটি।

দ্বিতীয় হীরাটি তুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউকের। তার অনুগ্রহে পেয়েছি এটিকে

আমি একাধিকবার দেখার সুযোগ। ওজন এর ১৩৯½ ক্যারাট। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর রঙটি সিট্রোন ঘেঁসা।

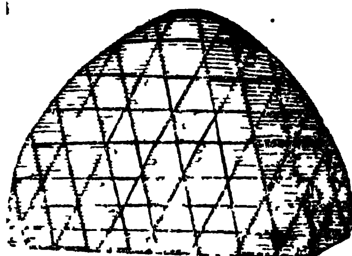
তৃতীয় পাথরটির ওজন ১৭৬⅛ ম্যাঙ্গেলিন বা আমাদের ২৪২ ৫/১৬ ক্যারাট। আগেই বলেছি, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে চলিত রয়েছে এই ম্যাঙ্গেলিন ওজন পদ্ধতি। এবং এক ম্যাঙ্গেলিন আমাদের ১⅜ ক্যারাটের সমান। ১৬৪২ অব্দে গোলকুণ্ডায় গেলে এটি দেখানো হয় আমাকে। ভারতবর্ষে হীরে বিক্রেতাদের কাছে থাকা যে সব হীরে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার তার ভেতর এটিই সব থেকে বড়। সীসে দিয়ে এর একটি অনুকৃতি করে নেয়ার অনুমতি দেন আমাকে এটির মালিক। সেটি পাঠিয়ে দেই আমি সুরাটে আমার দুজন বন্ধুর কাছে, মূল হীরেটির সৌন্দর্য ও দামের বর্ণনা সহ। দাম পাঁচ লক্ষ রুপিয়া বা সাড়ে সাত লক্ষ লিভর। তাঁরা আমায় লিখে পাঠালেন, যদি এটি স্বচ্ছ ও সুন্দর রঙের হয়ে থাকে তাহলে যেন দর দেয়া হয় চার লক্ষ রুপিয়া। কিন্তু সে দামে এটি আশা করা যায় না কেনবার। আমার ধারণা, যদি তারা সাড়ে চার লক্ষ পর্যন্ত দাম দিতে রাজী হতেন, তাহলে হয়ত পাওয়া যেত এটিকে।

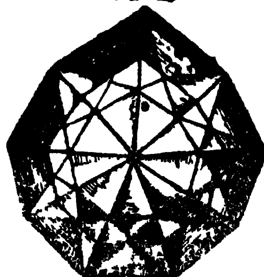
চতুর্থ হীরেটি কিনি আমি আহমদাবাদ থেকে আমার এক বন্ধুর জন্য। এটির ওজন ১৭৮ রতি বা আমাদের ৯০ ক্যারাট (প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ১৫৫¾ ক্যারাটের সমান)।

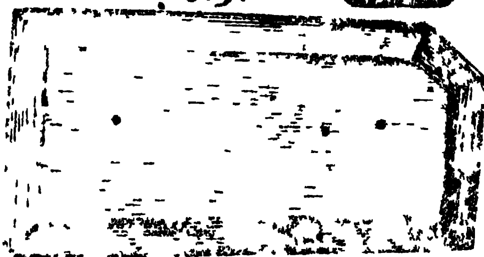
পঞ্চম হীরেটি দুপাশ কাটার পর যে চেহারা নিয়েছে তারই চিত্ররূপ। এটির ওজন দাঁড়ায় এ সময়ে ২৪¼ ক্যারাট। রঙ পুরো নিখুঁত। সমতল দিকটির কিনারায় ত্রুটি ক্ষত বর্তমান, তবে পুরু কাগজের ফর্দের মতোই তার গভীরতা। পাথরটি কাটবার বেলা উড়িয়ে দেয়া হয় সে-ত্রুটি। উড়িয়ে দেয়া হয় ওই সাথে পাথরটির ওপরের দিকে থাকা দাগটিকেও। থেকে গেছে তা সত্ত্বেও সেখানে অতি ক্ষুদে একটুখানি অস্বচ্ছ ভাব।

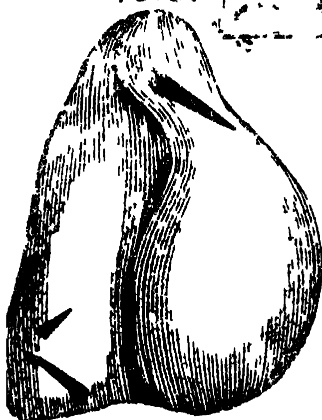
ষষ্ঠ হীরেটি কিনি আমি কোল্লুরের খনি থেকে ১৬৫৩ অব্দে। যেমন সুন্দর তেমন নিখুঁত। খনিতেই কাটা হয়েছিল এটিকে। পাথরটি বেশ পুরু, ওজন ৩৬ ম্যাঙ্গেলিন বা আমাদের ৬৩⅜ ক্যারাটের সমান। (গোলকুণ্ডা বা কোল্লুরের ৩৬ ম্যাঙ্গেলিনে হবার কথা ৪৯½ ক্যারাট, এবং ৪৬ ম্যাঙ্গেলিনে ৬৩¼ ক্যারাট। কেননা এখানকার এক ম্যাঙ্গেলিন—১⅜ ক্যারাট। রামলকোটের প্রতি ম্যাঙ্গেলিন ১¾ ক্যারাটের সমান বলে সেখানকার ৩৬ ম্যাঙ্গেলিনে হতে পারের ৬৪ ক্যারাট। দ্বিতীয় পর্ব ১৭ পরিচ্ছেদ দেখুন)।

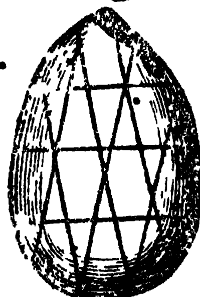
ট্যাভার্নিয়ারের দেখা হীরক

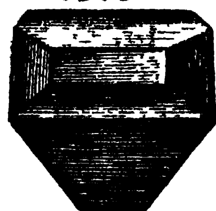


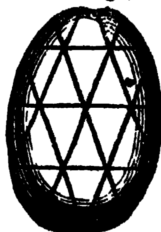


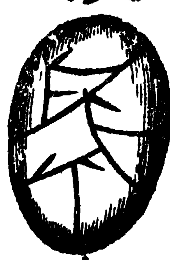






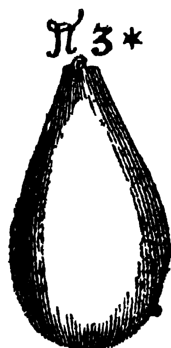


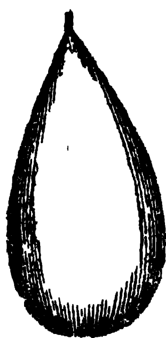




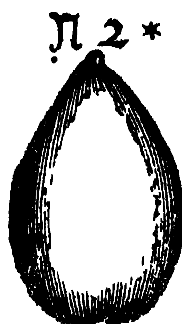
ট্যাভার্নিয়ারের দেখা হীরা।

π 3*





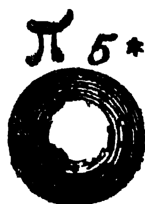
π 2*



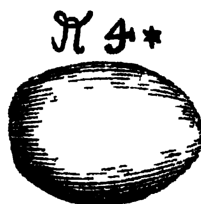
π 1*



π 5*



π 4*



সপ্তম ও অষ্টম হীরে দুটি কেটে দুফালি করা একটি হীরের দুই অংশ। অখণ্ড থাকা কালে এটির ওজন ছিল ৭৫৫/৮ ম্যাঙ্গেলিন বা ১০৪ ক্যারাট (গোলকুণ্ডায় চলিত ম্যাঙ্গেলিনের হিসাবে প্রকৃতপক্ষে ১০৩ ১৫/১৬ ক্যারাট)। রঙটি সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ভেতরে প্রচুর ময়লা। ফলে এত বড় একটি হীরেকে তার যোগ্য চড়া দাম দিয়ে কিনতে সাহসী হল না কোন বেণিয়া। শেষ অবধি কিনল এটিকে বাজু নামের একজন ডাচ। তিনি কাটিয়ে দু ফালি করলেন এটিকে। তখন দেখা গেল, ঘাস-পাতার পচলা ধরনের প্রায় আট ক্যারাটের মতো আবর্জনা রয়েছে তার ভেতরে। ছোট ফালিটি পুরো স্বচ্ছ ও নির্মল, শুধু যা এক স্থানে সহজে চোখে না পড়ার মতো সামান্য একটু দাগ। কিন্তু অন্যটিতে অনেক গভীর পর্যন্ত এ দাগগুলি। তাকে ভাগ করতে হল তাই সাত আটটি টুকরোয়। পাথরটিকে ফালি করার জন্য দুঃসাহাসিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন ডাচ ভদ্রলোক। তার ভাগ্য অতি ভাল যে ভেঙে শত টুকরো হয়ে যায়নি সেটি। কিন্তু এত ক'রেও তিনি লাভের মুখ দেখতে পেলেন না তা থেকে। এ ঘটনা থেকে একটি বিষয় অন্ততঃ জলের মতো পরিষ্কার যে বেণিয়ার যেখানে লোভের কামড় বসাতে পিছিয়ে গেছে সেখানে ফিরিঙ্গিদের তা থেকে মুনাফার আশা করাটাই বোকামি।

শেষ বারের ভারত-পর্যটন থেকে ফিরে লেখক ফ্রান্সের রাজার কাছে যে কুড়িটি হীরা বেচেন তারই চিত্র দেয়া হল এখানে (দ্বিতীয় চিত্র)। সেগুলির ওজন, বিস্তার ও ঘনত্ব তিনই দেখান হয়েছে চিত্র মধ্যে।

দ্বিতীয় চিত্রটিতে রয়েছে পৃথিবীর কুড়িটি পরম সুন্দর চুনি ও একটি পুষ্পরাগের ছবি। পুষ্পরাগটি মুঘল সম্রাটের। ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা দিচ্ছি এগুলির।

এক ।। এ চুনিটির অধিকারী হলেন পারস্যের শাহ। স্থূলত্ব ও আকার দুদিক থেকেই এটি একটি ডিমের তুল্য। এফোঁড় ওফোঁড় ছেঁদা করা হয়েছে এটিকে। অতি ঝলমলে রঙের। যেমন সুন্দর তেমনি নির্মল। একটি মাত্র খুঁত বর্তমান এক পাশে। রত্নাগারের তত্ত্বাবধায়করা কিছুতেই রাজী হলেন না এটির দাম প্রকাশ করতে। অনিচ্ছা দেখালেন ওজন জানাতেও। যারা শাহের রত্নাদির নথিপত্র রাখেন তারা শুধু জানালেন, বহু বছর ধরে রয়েছে এটি শাহের কাছে।

দুই ।। এই বড় পাথরটিকেও মনে করা হয় চুনি বলে। এটি কেনেন মুঘল সম্রাটের মেসো জাফর খান। দাম পড়েছিল ৯৫ হাজার রুপিয়া। সম্রাটের ওজন উৎসব কালে তাকে উপহার দেয়া হয় এটি অন্যান্য অনেক সামগ্রীর সঙ্গে।

সম্রাটের জহুরীরা এটির মূল্য নিরূপণ করলেন কেনা দামের চেয়ে সামান্য কিছু কম। ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বৃদ্ধ এক ভারতীয়। পূর্বে তিনিই ছিলেন প্রধান জহুরী, কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ হটানো হয়েছিল তাকে সে পদ থেকে। তিনি সেটি হাতে নিয়ে পরখ ক'রে বললেন এটি মোটেই ব্যালাস রুবি নয়, ঠকানো হয়েছে জাফর খানকে। পাঁচশো রূপিয়ার বেশি দাম হতে পারে না এর। সম্রাটের কানে সে খবর দেয়া হতে তিনি ডেকে পাঠালেন ওই বৃদ্ধকে। ডাকা হল অন্য সব জহুরীদেরও। অন্যান্য জহুরীরা আঁকড়ে রইলেন নিজেদের সিদ্ধান্তেই, বললেন পাথরটি ব্যালাস রুবিই। রত্ন বিষয়ে কেউই সম্রাট শাহ-জহানের চেয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন না সারা মুঘল সাম্রাজ্যে। পুত্র ঔরঙ্গজেব তখন তাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন আগ্রায়। বন্দী সম্রাটের মতামত জানার জন্য তার কাছে পাথরটি পাঠালেন তিনি। সযত্নে খুঁটিয়ে সেটিকে দেখার পর তিনি রায় দিলেন: বৃদ্ধের কথাই ঠিক, এটি ব্যালাস রুবি বা চুনি নয়, ৫০০ রূপিয়ার বেশি হতে পারে না এর দাম। পাথরটি ঔরঙ্গজেবের কাছে ফিরে এলে তিনি বাধ্য করলেন বিক্রেতা ব্যবসায়ীকে এটি ফিরিয়ে নিয়ে এ বাবদ জাফর খানের কাছ থেকে নেয়া অর্থ ফেরত দিতে।

তিন ও চার॥ এ দুটি বিজাপুরের সুলতানের কাছে থাকা একটি রুবির প্রতিকৃতি। চতুর্থ চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে আঙটির ওপরের দিকে থাকা এর উচ্চতা। তৃতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে আঙটির যে ফোকরটিতে পাথরটি বসানো রয়েছে তারই ঘের। পাথরটির ওজন ১৪ ম্যাঙ্গেলিন। বিজাপুরের এক ম্যাঙ্গেলিন ৫ গ্রেণ (বা ১¼ ক্যারাট) হবার দরুন আমাদের হিসাবে এর ওজন ১৭½ ক্যারাট [অন্যত্র বলা হয়েছে বিজাপুরের ম্যাঙ্গেলিন ১⅜ ক্যারাটের সমান (৫½ হীরক গ্রেণ), সুতরাং ১৪ ম্যাঙ্গেলিন=১৯¼ ক্যারাট।] অবতল ক'রে কাটা এর তলের দিকটি। সম্পূর্ণ নির্মল প্রথম শ্রেণীর পাথর একটি। ১৬৫৩ অব্দে ১৪,২০০ নতুন প্যাগোডা দাম দিয়ে সুলতান কেনেন এটিকে। এক নতুন প্যাগোড়া ৩½ রূপিয়ার সমান।

পাঁচ॥ এই রুবিটি আমি শেষ বারের ভারত ভ্রমণ কালে বনারস গেলে সেখানে এক বেণিয়া সওদাগর দেখান আমাকে। ওজন এর ৫৮ রতি বা ৫০¾ ক্যারাট (এক রতি=⅞ ক্যারাট)। পাথরটি মানের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর। গড়নের দিক থেকে **almond cabuchon** বা কাগজিবাদাম আকৃতির এবং তলের দিকে সামান্য গহ্বর থাকা। মাথার দিকটিতে করা হয়েছে একটি

ছেঁদা। আমি দাম দিয়েছিলাম ৪০,০০০ রুপিয়া পর্যন্ত, কিন্তু সে হাঁকলো পঞ্চাশ হাজার। মনে হয় পঞ্চাশ হাজারে উঠলে দিয়ে দিত সে এটিকে।

ছয়॥ মুঘল সম্রাটের কাছে থাকা বড় টোপাজ বা পুষ্পরাগটির প্রতিকৃতি এটি। শেষবারের ভারত ভ্রমণ কালে যতদিন আমি দরবারে ছিলাম ব্যবহার করতে দেখিনি তাকে দ্বিতীয় আর কোন বর্ষে। এই টোপাজটির ওজন ১৮১½ রতি বা ১৫৭¼ ক্যারাট (প্রকৃতপক্ষে হবার কথা ১৫৮½ ক্যারাটের কাছাকাছি)। ১,৮১,০০০ রুপিয়ায় সম্রাটের জন্য কেনা হয়েছিল এটিকে গোয়া থেকে।

সাত॥ সুন্দর সুন্দর রত্ন-পাথর পৃথিবী মধ্যে শুধু যে এশিয়ার এই বিশিষ্ট সম্রাটদের কাছেই রয়েছে, তা নয়। চিত্রে উপস্থিত ৭ম, ৮ম ও ৯ম-টির মতো বড় রুবি বা চুনি মহামহিম মুঘল সম্রাটের সিংহাসনে একটিও চোখে পড়েনি আমার। এগুলির অধিকারী হলেন আমাদের মহামান্য রাজা, যার তুল্য প্রতাপশালী ও নরশ্রেষ্ঠ নৃপতি নেই পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ।

আমাদের জানা সব থেকে বড় মুক্তার চিত্র ও বিবরণ

চিত্রে উপস্থিত প্রথম মুক্তাটি পারস্যের শাহের। ১৬৩৩ অব্দে কেনেন তিনি এটি এক আরবের কাছ থেকে। মিলেছিল এটি অল-কতীফের মুক্তা-ভেরিতে। দাম পড়েছিল ৩২০০০ তোমান বা ১৪ লক্ষ লিভর। এক তোমান আমাদের মুদ্রার ৪৬ লিভর ৬ দেনিয়েরের সমান (একক্ষেত্রে ৩২০০০ তোমান=১৪,৭২,৮০০ লিভর)। এযাবৎ মেলা মুক্তার মধ্যে এটিই সব থেকে বড় ও চরম নিখুঁত। কোথাও এতটুকু কোন খুঁত নেই এটিতে।

দ্বিতীয় বড় মুক্তাটি দেখার সুযোগ হয়েছে আমার মুঘল দরবারে। সম্রাটের সিংহাসনের চূড়ায় বর্তমান রত্ন নির্মিত ময়ূরটির গলায় শোভা পাচ্ছে এটি।

তৃতীয় মুক্তাটি বিক্রি করি আমি শেষবারে ভারত পর্যটন কালে মুঘল সম্রাটের মামা ও বাঙলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খানের কাছে। এটির ওজন ৫৫ ক্যারাট। রংটি কিছুটা যেন নিষ্প্রভ। ইওরোপ থেকে এযাবৎ এশিয়ায় নিয়ে যাওয়া মুক্তা-রাজির মধ্যে এটিই সব থেকে বড়।

চতুর্থ মুক্তাটি রঙ ও আকৃতি দুদিক থেকেই পুরো নিখুঁত। আকৃতিটি জলপাইয়ের মতো। পান্না ও চুনি দিয়ে গড়া একটি কণ্ঠহারের ঠিক মাঝামাঝি বসানো হয়েছে মুক্তাটিকে। কণ্ঠহারটি মুঘল সম্রাটের, মাঝে মাঝে পরেন তিনি সেটিকে। তখন তার কোমরের কাছে ঝুলতে থাকে এটি।

পঞ্চম মুক্তাটি নিটোল গোল আকারের। আমার জানা নিটোল গোল আকারের মুক্তার মধ্যে এটিই সব থেকে বড়। এটিও মুঘল সম্রাটের। এর তুল্য দ্বিতীয়টি মেলেনি আর। এ কারণেই সম্রাট ব্যবহার করেননা এটিকে। কোন অলঙ্কার খচিত না ক'রে রেখে দিয়েছেন আলগা-ই। যদি এর জুড়ি পাওয়া যেত তাহলে কর্ণাভরণ রূপে ব্যবহার করতেন সে দুটিকে। সে ক্ষেত্রে দুটি ক'রে চুনি বা পান্নার মাঝে বসানো হ'ত এক একটিকে। চলিত রীতি অনুসারে কি গরিব কি ধনী প্রত্যেকেই সেদেশে কানে ঝুলিয়ে থাকেন দুটি রঙীন পাথরের মাঝে মুক্তা বসানো কর্ণাভরণ।

বাইশ ॥ কস্তুরী, বেজোয়ার ও অন্যান্য ওষধি গুণ সম্পন্ন শিলা

পৃথিবীতে যত কিছু দুর্লভ পণ্যসামগ্রী বর্তমান তার মধ্যে কস্তুরী ও বেজোয়ার দুটি। আবার এশিয়া মহাদেশ আমাদের যে-সব সামগ্রী যোগান দেয় তার মধ্যে এ দুটিই সব থেকে মূল্যবান।

সেরা জাতের কস্তুরীর যোগান মেলে ভূটান থেকে। আবার সব থেকে বেশি পরিমাণ কস্তুরীর যোগানদারও এ রাজ্যটিই। সেখান থেকে এ সামগ্রীটি পাঠানো হয় বাঙলার প্রধান শহর পাটনায়, সে দেশের অধিবাসীদের কাছে তা বেচার জন্য। পারস্যে যত পরিমাণে কস্তুরী বেচা হয় তার সবটাই আসে সেখান থেকে। সেখানকার (পাটনার) কস্তুরী ব্যবসায়ীরা সোনা বা রূপার চেয়ে হলুদ রঙা স্ফটিক ও প্রবালের সঙ্গে এর বিনিময় করতেই বেশি আগ্রহী। কেননা, প্রচুর লাভ করার সুযোগ পায় তারা এ দুটি সামগ্রী বেচে। শখের বশে কস্তুরী মৃগের একটি চামড়া সংগ্রহ করেছিলাম আমি, নিয়ে এসেছিলাম সেটি সাথে ক'রে ফ্রান্সে।

প্রাণীটিকে হত্যা করার পর কেটে বার ক'রে নেয়া হয় তার পেটের নিচে থাকা কস্তুরীর থলিটিকে। আকারের দিক থেকে একটি ডিমের সমান এটি। থাকে নাভির তুলনায় জননাঙ্গেরই অধিক কাছাকাছি। কেটে নেয়ার পর এটির রূপ ঠিক জমাট বাঁধা রক্তের মতোই। ভেজাল মেশাবার মতলব দেখা দিলে সংগ্রহকারীরা 'বধ করা প্রাণীটির যকৃতের অংশবিশেষ ও রক্ত একসঙ্গে মিশিয়ে

তারই কিছুটা ঢুকিয়ে দেয় এই থলির মধ্যে। বার ক'রে নেয় তার পরিবর্তে কিছুটা কস্তুরী তা থেকে। থলি মধ্যে ওই পদার্থগুলি ঢোকানোর দরুন জন্মায় তার মধ্যে ক্ষুদে ক্ষুদে এক ধরনের পোকা। খেয়ে চলে তারা আসল কস্তুরীকে। ফলে, সেটি কিনে নিয়ে খোলার পর দেখা যায় ভেতরে থাকা কস্তুরীর বেশির ভাগই গেছে নষ্ট হয়ে। অনেকে আবার কস্তুরীর একাংশ বার ক'রে নিয়ে ভরে দেয় তার ভেতরে সম ওজনের ক্ষুদে ক্ষুদে সীসের টুকরো। যে-সব ব্যবসায়ী এগুলি কেনে ও বিদেশে রপ্তানি করে, মন্দের ভাল হিসাবে তাদের কাছে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়টিই অধিক কাম্য। কেননা, এর ফলে অন্ততঃ পোকা জন্মায় না থলির ভেতর। চলে এই সাথে আরো এক ধরনের ঠকামি যা ধরা রীতিমতো দুঃসাধ্য। প্রাণীটির পাকস্থলীর চামড়া দিয়ে বানানো হয়ে থাকে কস্তুরীর থলির মতো ছোট ছোট থলি। সেলাই করা হয় সেগুলি একই চামড়ার সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে। তারপর আসল থলিগুলি থেকে বার ক'রে নেয়া কস্তুরী অপমিশ্রণ সহ ভরে দেয়া হয় তার ভেতরে। দেখে জানবার উপায় নেই যে সেগুলি নকল থলি।

কস্তুরীর থলিটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়ার সময় যদি তাকে সাথে সাথে সেলাই ক'রে ফেলা হয়, কিংবা ভেজাল মেশাবার উদ্দেশ্যে থলি থেকে কস্তুরী বার করার সময়ে যদি তাতে হাওয়া ঢোকার এবং গন্ধের তীব্রতা উবে যাবার অবকাশ দেয়া না হয়—তাহলে একথা ঠিক যে থলিটি কারো নাকের কাছে ধরলে গন্ধের ঝাঁঝালো তীব্রতার দরুন সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরবে তার নাক থেকে। এই কারণে, মস্তিষ্কের যাতে কোনরূপ ক্ষতি না ঘটায় সেজন্য প্রয়োজনীয়তাও রয়ে গেছে আবার এর গন্ধের তীব্রতাকে হ্রাস ক'রে তাকে মানানসই ক'রে নেয়ার। যে চামড়াটি ফ্রান্সে নিয়ে আসি আমি সেটি যে গন্ধ ছড়াতো তা এত তীব্র যে দুষ্কর হয়ে পড়েছিল সেটিকে ঘরে রাখা। বাড়ির সবার মাথা ধরে যেত সেই গন্ধের তীব্রতায়। বাধ্য হলাম শেষমেশ তাকে ওপরের এক চিলেকোঠায় রেখে দিতে। তবুও মিলল না রেহাই। তখন আমার চাকররা কস্তুরীর থলিটি কেটে ফেলে দিল তা থেকে। তা সত্ত্বেও গন্ধ কিন্তু উবে গেল না পুরোপুরি। মোটামুটি ৫৬° অক্ষাংশ পার না হওয়া অব্দি দেখা পাবেন না আপনি এ প্রাণীটির। ৬০° অক্ষাংশে একেবারে অগুণতি। বিশেষ ক'রে সে অঞ্চল সপ্রচুর অরণ্য ভরা বলে। শীতকালে প্রচুর তুষার পাত হয়ে থাকে এদের বাস এলাকায়। দশ থেকে বার ফুট পুরু হয়ে জমে যায় তা। ফলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। তাই আপন বসতি এলাকা ছেড়ে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে খাদ্যের খোঁজে চলে আসে তারা দক্ষিণ

দিকে ৪৪° কি ৫৫° ডিগ্রী পর্যন্ত। হানা দেয় গম, জোয়ার ও নতুন ধানের ফসল ক্ষেতে। চাষীরা ফাঁদ পেতে তাদের ধরে এ সময়ে। তীর ছুঁড়ে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়েও মারে এদের। কতক লোক আমায় জানিয়েছে, উপোসী থেকে থেকে এসময়ে এদের শরীরের হাল এমন ক্ষীণ ও কাহিল যে দৌড়ে পিছুতাড়া ক'রে পর্যন্ত এদের ধরা যায় তখন। সংখ্যায় এরা যে বেশ বিরাট কোন সন্দেহ নেই এতে। কেননা, এদের প্রত্যেকের দেহ থেকে মাত্র একটি করেই কস্তরীর থলি মেলে। তাও খুব বড হলে মুরগির ডিমের আকারের, পাওয়া যায় তা থেকে আধ আউন্স কস্তরী শুধু বা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিন বা চারটি থলি মিলিয়ে এক আউন্স।

ভূটান রাজ্যের বিবরণ পরবর্তী খণ্ডে শোনাব আপনাদের। ঠকামির দরুন পাছে কস্তরীর বিক্রীবাটা বন্ধ হয়ে যায় এই আশঙ্কায় সেখানকার রাজা জারী করেছেন এক নতুন আইন। কেননা, ভূটানই এর একমাত্র যোগানদার নয়। মেলে তা টঙকুইন কিংবা কোচিন চীন থেকেও। তবে প্রচুর নয় বলে দামও বেশি। যাই হোক, কিছুকাল আগে জারী করা এই নতুন আইন অনুসারে দেহ থেকে থলিটি বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথেই তার মুখ সেলাই করতে পারবে না কেউ। সেলাই-বিহীন অবস্থাতেই নিয়ে আসতে হবে তা সরকারের কাছে, রাজধানী ভূটান শহরে। সেখানে তা পরখ ক'রে দেখার পর সেলাই ক'রে এঁটে দেয়া হবে রাজকীয় সীল মোহর। আমি যে থলিগুলি কিনেছিলাম তা এই ধরনের। তবে, রাজার তরফ থেকে এরূপ সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া সত্বেও কিন্তু বন্ধ হয়নি ঠকামি। চাষীরা থলি থেকে বার ক'রে নেয় কস্তরী লুকিয়ে চুরিয়ে। ভরে দেয় তার বদলে সম ওজনের সীসের ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরো। তবে, ব্যবসায়ীরা এ ঠকামি সয়ে যায় নির্বিবাদে। কেননা, এর ফলে ওজনে কম মিললেও কোন ক্ষতি হয় না অন্তত: কস্তরীর। পাটনা ভ্রমণ কালে একবার সেখান থেকে কস্তরীর ৭৬৭৩টি থলি কিনি আমি। ওজন ছিল তার সব শুদ্ধ ২,৫৫৭$\frac{1}{2}$ আউন্স। এছাড়া থলিবিহীন অবস্থাতেও কিনেছিলাম ৪৫২ আউন্স।

বেজোয়ার মেলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের উত্তর-পূব দিককার একটি জেলা থেকে। উৎপন্ন হয় এটি ছাগের পেটে, বিশেষ এক ধরনের গাছের পাতা খাবার দরুন। এ গ'ছটির নাম মনে নেই এখন আর। এই গাছের ডালের চতুর্দিকে ও ডগায় জন্মে ক্ষুদে ক্ষুদে কুঁড়ি। পাতার সঙ্গে ওই কুঁড়িগুলিও খেয়ে ফেলে ছাগেরা। ফলে এদের পেটে জমাট বাঁধা অবস্থায় জমা হতে থাকে বেজোয়ার। কুঁড়ি ও

গাছের ডগার আকৃতির প্রকার অনুযায়ী আকৃতি পায় বেজোয়ারগুলি। এজন্যই বেজোয়ারের আকৃতির ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি আমরা। ছাগের পেট হাতড়ে চাষীরা বলে দিতে পারে মোট কতগুলি বেজোয়ার জমা হয়েছে সেখানে। বেচার বেলা সেই অনুযায়ী ছাগটির দাম হাঁকে তারা। বেজোয়ারের দাম তার আকার অনুসারে। তবে আকারে ছোট বা বড়র জন্য কোন তারতম্য ঘটেনা তার গুণের। কিন্তু মূল্যে তারতম্য থাকার দরুন ঠকামি চলে তার আকার নিয়ে। অনেকে গদ ও অন্যান্য বস্তু মিশিয়ে বেজোয়ারের রঙের অনুরূপ এক ধরনের কাথ তৈরী ক'রে তা দিয়ে বেজোয়ারের আকার বাড়ায়। এমনকি কতবার প্রলেপ দিলে তার রঙ ঠিক আসল বেজোয়ারের মতো হবে সে হিসাবও তাদের নখদর্পণে। তবে এ ধরনের ঠকামি সহজেই ধরে ফেলা যায় দুটি উপায়ে। বেজোয়ারটির ওজন দেখে নিয়ে ফেলে রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য তাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে। যদি জলের রঙের কোন পরিবর্তন না ঘটে এবং ওজনে হালকা না হয়ে যায় বেজোয়ারটি, তাহলে বুঝতে হবে যে কোন ভেজাল নেই সেটিতে। দ্বিতীয় উপায় হল একটি সুঁচালো লোহার শিককে গরম ক'রে বেজোয়ারটির ওপরে ধরা। যদি ভেতরে ঢুকে যায় ও ওপরের দিকটা ভাজা ভাজা হয়ে যায় বেজোয়ারের, বুঝতে হবে সেটি ভেজাল পদার্থ। আগেই বলেছি, বেজোয়ারের আকার যত বড়, দামও তার তত চড়া, বেড়ে চলে তা হীরের দাম বৃদ্ধির নিয়মে। ধরুন, পাঁচ কি ছটি বেজোয়ারে যদি এক আউন্স হয় তবে তার দাম হবে ১৫ থেকে ১৮ ফ্রাঙ্ক। কিন্তু একটি বেজোয়ারের ওজনই যদি এক আউন্স হয় সেক্ষেত্রে ওই এক আউন্সের দাম হবে ১০০ ফ্রাঙ্ক। ৪½ আউন্স ওজনের একটি বেজোয়ার বেচেছিলাম আমি ২০০০ লিভরের মতো চড়া দামে।

পূর্ব ও পশ্চিম, পৃথিবীর উভয় অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে বোজোয়ার উৎপন্ন হয়ে থাকে গরুর পেটে। তার এক-একটির ওজন এমনকি ১৭-১৮ আউন্স পর্যন্ত। দেয়া হয়েছিল এ ওজনের একটি এনে তুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউককে। কিন্তু এ ধরনের বেজোয়ারের প্রতি নেই কারো কোন আগ্রহ। এর তিরিশ গ্রেণের চেয়ে অন্য বেজোয়ারের ৬ গ্রেণের কার্য ক্ষমতা ঢের বেশি।

বেজোয়ার মেলে বানরের পেট থেকেও। অনেকে মনে করেন এর কার্যক্ষমতা আরো অনেক বেশি। এর দু গ্রেণে হয়ে থাকে ছাগ-জাত ছ গ্রেণের সমান ফল লাভ। তবে, এ বেজোয়ার বেজায় দুর্লভ। মকসর দ্বীপে যে প্রজাতের বানর রয়েছে বিশেষ ক'রে তাদের পেটেই জন্মে এগুলি। ছাগের পেট থেকে মেলা

বেজোয়ার বিভিন্ন গড়নের হলেও এগুলির গড়ন গোল। বানরের পেটে উৎপন্ন বলে মনে করা বেজোয়ার অন্যান্যর তুলনায় দুর্লভ বলে দামও তার ঢের চড়া, আগ্রহও তার প্রতিই সকলের বেশি। কখনো সুপারি আকারের একটি পাওয়া গেলে তার দাম হাঁকা হয় ১০০ একুরও ওপরে! অন্যান্য জাতির তুলনায় পর্তুগীজরাই বেশি গুরুত্ব আরোপ ক'রে থাকেন বেজোয়ারের ওপর। কেননা, কেউ না কেউ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে তাকে বিষ প্রয়োগ করতে পারে এ আতঙ্কের দরুন সর্বক্ষণ তারা নিজেকে বাঁচাবার জন্য সজাগ। (বেজোয়ারের কোন ওষধি গুণ রয়েছে এ ধারণা সমর্থিত হয় না বর্তমানে।)

বিরাট কদর আরো একটি পাথরের। এটির নাম সজারু-পাথর (Porcupine Stone)। হয়ে থাকে এটি ওই বিশেষ প্রাণীটির মাথায়। বিষ প্রতিষেধক হিসাবে এটি বেজোয়ারের চেয়েও অধিক শক্তিশালী। এটিকে পনেরো মিনিটের মতো জলে ডুবিয়ে রাখলে জলের স্বাদ এমন তিতো হয়ে যায় যার দ্বিতীয় তুলনা মেলা ভার। কখনো কখনো এ প্রাণীটির পেট থেকেও মেলে এধরনের গুণ সম্পন্ন পাথর। সেগুলিও মাথা থেকে মেলা পাথরের মতোই সমান শক্তিশালী। পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে শুধু এটুকুই যে জলে ডুবিয়ে রাখলে এটির ওজন বা আয়তনের কোন হ্রাস না ঘটলেও অন্যটির বেলা ঘটে থাকে তা। জীবন কাল মধ্যে এ ধরনের পাথর তিনটি কিনেছি আমি। একটির দাম পড়েছিল ৫০০ একু বেচেছিলাম এটি পরে (ভেনেসিয়ান) রাজদূত ডোমিনিকো দ্য সনটিসের কাছে পারস্যের বিবরণে জানিয়েছি তার কথা। আরেকটি কিনি ৪০০ একু দিয়ে সেটি আছে আমার কাছে এখনো। তৃতীয়টির জন্য গুণতে হয়েছিল আমায় ৩০০ একু। সেটি উপহার দিয়েছি আমার এক বন্ধুকে।

এবার শোনাই সাপের মণির কথা। এটির আয়তন ডবল (স্প্যানিশ স্বর্ণ মুদ্রা ডবলুন?)-এর প্রায় কাছাকাছি। কতকের আকৃতি অনেকটা ডিমেল ধরনের। মাঝের অংশটি পুরু, দুদিক ক্রমশঃ পাতলা। ভারতীয়দের মুখে শোনা যায়, এগুলি নাকি কোন এক বিশেষ প্রজাতের সাপের মাথায় জন্মায়। আমি কিন্তু মনে করি, পৌত্তলিক পুরোহিত সম্প্রদায় মিথ্যা রটনা দ্বারা এজাতীয় ধারণার সৃষ্টি করেছে সকলের মনে। আসলে পাথরটি কতক ওষধির মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি (থিভেনট বলে গেছেন, কতক উদ্ভিদের শিকড় ভস্ম এক বিশেষ ধরনের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে এটি তৈরি ঃ দেখুন Voyages, p. 49)। প্রকৃত ঘটনা যা-ই হোক না কেন, কোন বিষাক্ত সরীসৃপ কোন মানুষকে কামড়ালে তার

ক্ষতস্থান থেকে সেই বিষ টেনে বার করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে এর। দেহের যে স্থানটিতে কামড়েছে সেখানে যদি ক্ষত না হয়ে থাকে তবে রক্ত বার করার জন্য স্থানটিকে চিরে নেয়া দরকার। তারপর সেখানে প্রয়োগ করা হয় এই পাথরটিকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সব বিষ শুষে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেহ লগ্ন হয়ে থাকে এটি, খসে পড়ে না মোটে। পাথরটিকে পরিষ্কার করার জন্য ডুবিয়ে রাখতে হয় তাকে মেয়েদের বুকের দুধে। যদি তা না মেলে তবে গোরুর দুধে। দশ কি বারো ঘন্টা ওইভাবে ডুবিয়ে রাখলে পাথরটি থেকে সব বিষ বেরিয়ে যায়, মেশে গিয়ে দুধে, ধারণ ক'রে তা বিষের রঙ। একদিন গোয়ার আর্ক বিশপের সঙ্গে আহারের পর তিনি নিয়ে গেলেন আমায় তার সংগ্রহশালায়। অনেক দুর্লভ বস্তু জমা করেছিলেন সেখানে তিনি। অন্যান্য সবকিছুর সাথে দেখালেন তিনি আমায় ওই পাথরও একটি। এর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ব্যক্ত ক'রে আমায় জানালেন, তিনদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি সাপে কামড়ানোর ঘটনায় এটিকে প্রয়োগ ক'রে হাতে নাতে ফল পেয়েছেন তিনি। যাকে কামড়ায় সে তারই পাল্কীবাহক। ঘটনাটি শোনাবার পর তিনি দিলেন সেটি আমায় উপহার। এ পাথর কিনেছি আমি অনেক। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই বিক্রি করে এটি। এ থেকেই আমার ধারণা জন্মেছে যে এটি তৈরী করে তারাই। এ পাথরগুলি খাঁটি কিনা দুটি উপায় আছে তা জানার। প্রথমটি হল সেটি মুখে পুরে দেখে নেয়া। মুখে দেয়ার সাথে সাথে যদি সেটি লাফ মেরে তালুতে আটকে যায় জানবেন সেটি খাঁটি জিনিস। দ্বিতীয় পন্থা হল গ্লাস ভর্তি জলের মধ্যে সেটিকে ফেলা দেয়া। খাঁটি জিনিস হলে সঙ্গে সঙ্গে ফুটতে শুরু ক'রে দেবে জল, তলে থাকা পাথরটির গা থেকে উঠতে থাকবে গুঁড়ি গুঁড়ি বুদবুদ জলের ওপর পর্যন্ত।

ফণাধারী সাপের (কোবরা) মাথায় মণি নামের মেলে আরো একটি পাথর। এ এমন এক প্রজাতের সাপ যার এই ছত্রাঙ্গটি থাকে মাথার পেছনের দিকে শিথিল ভাবে ঝুলন্ত। আর এই ছত্রাঙ্গের পশ্চাতভাগেই থাকে পাথরটি। সব থেকে যেটি ছোট সেটিও মুরগির ডিমের আকারের। আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিরাট বিরাট আকারের সাপ বর্তমান। এমন কি এক একটি ২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা। বাটাভিয়ায় যে সাপের খোলসটি সংরক্ষিত রয়েছে সেটি এই জাতের। ১৮ বছরের একটি মেয়েকে গিলেছিল এ সাপটি। যে-সব সাপ অন্ততপক্ষে দুফুট দীঘল তাদের থেকেই শুধু যা মেলে এ পাথরটি। এটি কঠিন

জাতের পাথর নয়, অন্য কোন পাথরের গায়ে ঘষলে পরিণত হয় কাথে। কারো দেহ বিষে আক্রান্ত হয়ে থাকলে ওই কাথ জলে গুলে নিয়ে খেলে সঙ্গে সঙ্গে সব বিষ বার ক'রে দেয় তা শরীর থেকে। এ প্রজাতের সাপ রয়েছে একমাত্র মেলিন্দ উপকূলে। মোজাম্বিক গামী পর্তুগীজ নাবিক ও সৈন্যরা সেখান থেকে ফেরার বেলা নিয়ে আসে এটি। তখন তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে নিতে পারেন আপনি।

তৃতীয় পর্ব

এক ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় মতবাদ

মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত বিভেদ বর্তমান তা শুধু কোরানের ব্যাখ্যার ভিন্নতাকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী কে এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেও। জন্ম নিয়েছে এভাবে সম্পূর্ণ পরস্পর বিমুখ দুটি সম্প্রদায় তাদের মধ্যে। এর একটির নাম সুন্না, তুর্কীরা এই সম্প্রদায় ভুক্ত। অন্যটির নাম শীয়া, পারসিকরা এই সম্প্রদায়ের। সমগ্র মুসলিম সমাজের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ নিয়ে অধিক কিছু আর বলতে চাইনে আমি এখানে। পারস্য-বিবরণী গ্রন্থে যথেষ্ট বলা হয়েছে এ-নিয়ে। এখানে শোনাব শুধু মুঘল সাম্রাজ্য এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে মিথ্যাধর্মের এ দুই অনুরাগী গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা।

ভারতে ইসলাম আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকালে প্রাচ্যের খ্রীষ্টধর্মীরা যে পরিমাণ আচার-আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন, সে তুলনায় ছিলেন না মোটেই ধর্মনিষ্ঠ। আর, পৌত্তলিকরাও ছিলেন ইসলামকে জোর প্রতিরোধ ক'রে চলার পক্ষে দুর্বল। ফলে, অস্ত্রক্ষমতার সাহায্যে সহজেই দুই পক্ষকে আপন কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে এল মুসলমানেরা। এ ব্যাপারে তারা এরূপ সাফল্য হাসিল করল যে বহু খ্রীষ্টান আর পৌত্তলিকই ক'রে বসল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

মুঘল সম্রাট, তার সমগ্র দরবার সহ, সুন্না সম্প্রদায়ের অনুগামী। গোলকুণ্ডার রাজা শীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। বিজাপুরের রাজার রাজ্যে রয়েছে সুন্নী ও শীয়া দুই-ই। মুঘল সম্রাটের রাজ্যের বেলাও বলা যেতে পারে কিন্তু এই একই কথা। কেননা, তার সেনাবাহিনীতে ঠাঁই নিয়েছে এসে (শীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত) বহু পারসিক। তবে একথাও আবার ঠিক যে তারা সুন্নী মতবাদকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও, সম্রাট ওই মতবাদের অনুগামী বলে, লোক দেখানো ভাবে ওই ধর্মবাদের প্রতিই অনুরক্তি দেখিয়ে থাকে তার অনুগ্রহ লাভের আশায়। এরা মনে করে, বাইরে আমি যে ভাবই দেখাই না কেন মনে মনে আপন মতবাদের প্রতি নিষ্ঠ থাকলেই যথেষ্ট (তকীয়ার শীয়া মতবাদের অনুগামী এরা)।

গোলকুণ্ডা রাজ্যের বর্তমান অধিপতি কুতব শাহ (১৬২৫-৭২), শীয়া মতবাদের

একজন অত্যুৎসাহী অনুগামী। তার দরবারের আমীরদের প্রায় সকলেই পারসিক। তাঁরাও কঠোরভাবে শীয়া অনুশাসন মেনে চলেন এবং পারস্যের মতই বাধা-নিষেধ মুক্ত ভাবে। অন্যত্র আগেই আমি জানিয়েছি, মুঘল সাম্রাজ্যের স্থানীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্যে গোনাগুণতি অতি সামান্য কয়েক-জনই মাত্র উচ্চ ক্ষমতায় আসীন। এই সুযোগের দরুনই বহু পারসিক ছুটে আসেন ভারতবর্ষে। কেউবা দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে, কেউবা পারস্য থেকেও অধিক ক্ষমতা ও সৌভাগ্য অর্জনের আশায়। সহজাত ভাবে চতুর বলে ভাবতে এসে বেশ দক্ষতা দেখায় তারা সামরিক জীবিকায়। ফলে, কি মুঘল সাম্রাজ্য, কি গোলকুণ্ডা বা বিজাপুর রাজ্য, সর্বত্রই উচ্চপদগুলি সর্বদা তাদেরই দখলে।

সুন্নী মতবাদের প্রতি ঔরঙজেবের আগ্রহ ও অনুরাগ বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। বাহ্যিকভাবে এর অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে ডিঙিয়ে গেছেন তিনি তার সব পূর্বপুরুষকেই। এই ধর্মীয় আলখাল্লার আড়ালেই সার্থকভাবে গোপন রেখেছিলেন তিনি তার সিংহাসন দখলের অভিসন্ধিটিকে। সিংহাসন দখলের মতলব চরিতার্থ করার পর তিনি প্রচার করলেন, পিতামহ জহাঙ্গীর ও পিতা শাহ-জহান-এর আমলে ধর্মের প্রতি যে-রকম ঔদাসীন্য দেখান হয়েছে তা দূর ক'রে মহম্মদের অনুশাসনকে তার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই করেছেন এ কাজ তিনি। ধর্মের প্রতি আগের তুলনায় আরো বেশি ক'রে আগ্রহ ও আসক্তি দেখানোর জন্য অনুসরণ ক'রে চলেছেন তিনি দরবেশ বা ফকীরের জীবন। এই মিথ্যা ধর্মীয় আচরণের আড়ালে চতুর ভাবে পূর্ণ ক'রে চলেছেন তিনি সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব করার সাধ। আগেই বলেছি, তার কর্মচারী বাহিনী মধ্যে অসংখ্য পারসিক বর্তমান। এ সত্ত্বেও সুন্নীদের হাতে আলীর পুত্র হসন ও হুসেন-এর মৃত্যু ঘটনাকে স্মরণ ক'রে শীয়ারা যে অনুষ্ঠান পালন করে (মহরম) তা তার সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ (১৬৬৯ অব্দে মহরম উৎসব নিষিদ্ধ করেন ঔরঙজেব)। আর শীয়ারাও সম্রাটকে খুশী করার জন্য, আপন সৌভাগ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, কোনরকম সংকোচ কি কার্পণ্য দেখায় না বাহ্যিকভাবে সুন্নীদের আচার-অনুষ্ঠান পালনেও।

দুই ।। ভারতবর্ষের মুসলমান ফকীর

হিসাব কষা হয়েছে যে ভারতবর্ষে মুসলমান ফকীর রয়েছে আট লক্ষ আর পৌত্তলিক সন্ন্যাসী বারো লক্ষ। ভেবে দেখুন কি বিপুল এই সংখ্যা। আর সকলেই এবা ভবঘুরে, নিষ্কর্মা। ধর্মাসক্তির মিথ্যা ভড়ং ক'বে সাধারণের চোখে অন্ধত্বের ঠুলি পরিয়ে বেড়ানোই এদের কাজ। যা তারা আওড়াচ্ছে তা সবই নির্ভেজাল দেব-বাক্য, বুনে চলে সকলের মনে এরূপ এক অন্ধ বিশ্বাস।

মুসলমান ফকীরদেব মধ্যে রয়েছে আবার বিভিন্ন পথমার্গী। কতক তাদের পৌত্তলিক সন্ন্যাসীদের মতো পুরো নগ্ন। নেই নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান। কোনরকম অপবিত্র আচরণ করতেও বাধে না এতটুকু। সহজ-সরল সাধারণ মানুষদের বোঝায়, দেব কৃপাশ্রিত বলে কোন কিছুতেই পাপ হয় না তাদের।

আবেক ধরনের ফকীব আছে যারা বিভিন্ন রঙের অসংখ্য কাপড়ের টুকরো জোড়াতালি দিয়ে এমন পোশাক গায়ে চড়ায় যেটি ঠিক কি বস্তু দুরূহ হয়ে পড়ে তা ঠাউরে ওঠা। এই অদ্ভুত দর্শন পোশাক তাদের হাঁটুর আধাআধি ঝুলে থেকে আড়াল ক'রে চলে ভেতরের ছেঁড়া-নোংরা অন্যান্য পরনের জিনিস-গুলিকে। সাধারণত দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এই গোত্রের ফকীররা। থাকে এদের একজন দলপতিও। তার পোশাকটি আবার অন্যদের চেয়ে আরো বেশি দুর্দশাগ্রস্ত, অনেক বেশি জোড়াতালি দেয়া। তার ওপর পায়ে আঁটা থাকে আবার দু হাত খানেক লম্বা ও সেই অনুপাতে মোটা একটি শিকল। সেটিকে টানতে টানতে পা ফেলে এগিয়ে চলে সে। প্রার্থনার সময় এটিকে জোরে বাজাতে বাজাতে আকাশ-ফাটা সুরে আউড়ে চলে তা। বেশ আকর্ষণীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গেই করা হয়ে থাকে এটি। সাধারণ মানুষ বেশ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে পড়ে সে-দৃশ্য দেখে। নিয়ে আসে তারা তার ও তার অনুগামীদের সেবার্থে খাবার-দাবার। আস্তানা গাড়ে সে কোন পথের ধারে সাধারণের অবাধে যাতায়াত উপযোগী কোন স্থানে। সেখানেই পরিবেশন করা হয় খাবার-দাবার। শিষ্যরা বিছিয়ে দেয় তার বসার জন্য গালিচা। সেখানে বসে সে দর্শন দেয়, কথা বলে উপদেশ লাভে উৎসুক ব্যক্তিদের সাথে। শিষ্যরা গায়ে

গাঁয়ে ঘুরে প্রচার ক'রে বেড়ায় তাদের গুরুর মহিমা, অলৌকিক ক্ষমতার কথা। লোকে সহজেই বিশ্বাস করে তা, তাকে এক মহান পবিত্র পুরুষ ভেবে পরম ভক্তিভরে ছুটে আসে মুশকিল আসানের আশা নিয়ে। পৌঁছে, পায়ের জুতা খুলে তার নিকটস্থ হয় তারা, ভূঁয়ে লুটিয়ে প্রণিপাত জানায় তাকে, চুমু খায় তার পায়ের পাতায়। অহংকারশূন্য অমায়িক ভাব দেখাবার জন্য ফকীর বাড়িয়ে দেয় তার হাত, সুযোগ দেয় হাতের পাপড়িতে চুমু খেতে। কাছে বসিয়ে শোনে তাদের সমস্যা, দেয় পরামর্শ, উপদেশ। বড়াই ক'রে চলে তার নবী-সুলভ অধ্যাত্ম ক্ষমতা নিয়েও। বিশেষ ক'রে, বন্ধ্যানারীকে সন্তান দানের এবং যুবক যুবতীদের অনুরাগ খণ্ডনের ক্ষমতা নিয়ে।

কোন কোন ফকীরের অনুগামীর সংখ্যা দুশোরও বেশি। তাদের জমায়েত করে সে ভেরি বা শিঙা বাজিয়ে। অনুগামীরা দল বেঁধে এগিয়ে যাবার বেলা সাথে নিয়ে চলে ঝাণ্ডা, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। বিশ্রামের জন্য কোথাও থামলে রাখে সেগুলি গুরুকে ঘিরে মাটিতে খাড়া গেঁথে।

তৃতীয় এক শ্রেণীর ফকীর আছে যারা গরিব ঘরের সন্তান। মোল্লা বা মৌলবী হবার আকাঙ্খা নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ঠাঁই নেয় মসজিদে। অনুমোদিত বৃত্তির ওপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করে তারা। এরা কোরান চর্চা ক'রে সময় কাটায়, ক'রে চলে তাকে কণ্ঠস্থ করার প্রয়াস। আয়ত্ত করে প্রাকৃতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান। তারপর কোন মসজিদের মুখ্য হয়ে ক'রে চলে তাদের আদর্শ অনুযায়ী সৎ জীবন যাপন। অর্জন করে মোল্লা বা উলেমার মর্যাদা। এই গোত্রের ফকীররা ক'রে থাকে বিয়ে-থাও। কেউ কেউ তার ধর্মানুরক্তি বা পয়গম্বর মহম্মদকে অনুকরণের প্রবল তাড়না থেকে ক'রে থাকে তিন চারটি বিয়ে। ভাবে, এ উপায়ে বহু ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে, ইসলামের অনুগামীর সংখ্যা বাড়িয়ে ক'রে চলেছে সে ঈশ্বরের অনন্ত সেবা।

তিন ।। ভারতীয় পৌত্তলিক জনসমাজ

ভারতবর্ষে পৌত্তলিকদের সংখ্যা অতি বিরাট। প্রতি মুসলমান পিছু তারা পাঁচ কি ছ'জন (১৯১১-র জনগণনা অনুসারেও মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যানুপাত ২১ : ৬৯)। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, এত বিরাট যাদের জনসংখ্যা কি ক'রে তারা হার মানল এত অল্প সংখ্যার এক জনগোষ্ঠির কাছে! কেন তারা এমন বাধ্য ছেলের মতো স্বীকার ক'রে নিল মুসলমান রাজাদের প্রভুত্ব! তবে, নিচে বলা কারণগুলির প্রতি মনোযোগী হলেই কেটে যাবে আপনার ওই অবাক ভাব। নেই পৌত্তলিকদের মধ্যে কোন ঐক্য। কুসংস্কারের অন্ধত্ব রীতিপ্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুধা ক'রে তাদের মধ্যে এমন বিভেদের পাঁচিল খাড়া ক'রে দিয়েছে যে তাদের একজন কখনো কোন বিষয়ে একমত নন অন্য আরেক-জনের সঙ্গে (এই বিভেদই ইংরাজ আমল পর্যন্ত প্রত্যেক বিদেশীকে যুগিয়ে এসেছে ভারতবর্ষকে পদানত ক'রে রাখার শক্তি। এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও এর দৌলতেই ক'রে চলেছেন স্বদেশী প্রভুরা রাম রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শোষণমুখি শাসনের নকল গণতান্ত্রিক খেলা)। ফলে কোন একজন পৌত্তলিক অন্ন বা জল পর্যন্ত খান না তার আপন বর্ণ ছাড়া অপর কোন বর্ণের লোকের ঘরে। অবশ্য গৃহপতি যদি তার চেয়ে উচ্চবর্ণের লোক হন তবে স্বতন্ত্র কথা। এই কারণে, ব্রাহ্মণদের গৃহে অন্ন-জল গ্রহণ করতে পারে যে কোন বর্ণের পৌত্তলিক। বিশ্বের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণদের দ্বার অবারিত। ইহুদীদের কাছে গোষ্ঠী বলতে যা বোঝায়, পৌত্তলিকদের কাছে বর্ণও অনেকটা সেই রকম। সাধারণত মনে করা হয়, রয়েছে তাদের মধ্যে ৭২টি বর্ণ বা জাত-এর অস্তিত্ব। কিন্তু তাদের অতি অভিজ্ঞ পুরোহিতদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়ে আমি জেনেছি যে এই সংখ্যা কমিয়ে তাদের মূলতঃ চিহ্নিত করা যেতে পারে চারটি জাত বা বর্ণে। অন্যগুলি এই চারটি মূল বিভাগেরই উপবিভাগ (১৯১১-র জনগণনা অনুসারে জাত-এর সংখ্যা ৭২ অপেক্ষাও অনেক বেশি)।

প্রথম বর্ণ বা জাত বলতে ব্রাহ্মণরা। যারা বিশেষভাবে চর্চা করতেন জ্যোতিষ বিদ্যার সেই প্রাচীন ব্রাকমণি (ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মর্ষি?) বা দার্শনিকদেরই উত্তর

বংশধর এরা। তাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি এখনো বর্তমান। ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ ডুবে থাকেন সে-সবের চর্চাতেই। পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে তারা এত দক্ষ যে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে পূর্বাভাস দানে হয় না তাদের এক মিনিটও এদিক ওদিক। এ বিজ্ঞানটির পরম্পরা রক্ষা ক'রে চলার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় ধাঁচের একটি চর্চাপীঠ গড়ে তুলেছে বনারস নামের শহরটিতে। প্রধানতঃ করা হয়ে থাকে সেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রেরই অনুশীলন। রয়েছে ধর্মানুশাসনে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদরাও। অতি কঠোর ভাবেই ধর্মের বিধি-বিধান পালন ক'রে চলা হয় সেদেশে। এই ব্রাহ্মণরাই হলেন সেখানকার শ্রেষ্ঠ বা শ্রদ্ধেয় বর্ণের লোক। পুরোহিত, এবং ধর্ম ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে এদের ভেতর থেকেই। সংখ্যায় এরা বেশ বিপুল। সকলেই পায় না তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-চর্চার সুযোগ। অধিকাংশই এজন্যে লেখাপড়া না জানা, শাস্ত্র জ্ঞান না থাকা অজ্ঞ। পরিণতিতে অতি মাত্রায় অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া প্রকৃতির। অথচ জনসাধারণের চোখে এসব আকাটরাই এক একজন সাক্ষাৎ বৃহস্পতি কিংবা ধন্বন্তরী।

দ্বিতীয় জাতি বা বর্ণের লোক হল রাজপুত বা ক্ষেত্রী (ক্ষত্রিয়), অর্থাৎ যোদ্ধা বা সামরিক সম্প্রদায়। পৌত্তলিকদের ভেতর একমাত্র এরাই যা সাহসী এবং সেই পেশায় নিযুক্ত থেকে ক'রে থাকে সমর-কুশলী হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন। কিন্তু অগুণতি ছোট ছোট রাজ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত এরা। এই অনৈক্যের দরুনই মুঘল সাম্রাজ্যের করদে পরিণত। তবে এইসব রাজাদের অধিকাংশই মুঘল সম্রাটের অধীনে চাকুরি নিয়েছেন বলে যে সামান্য পরিমাণ কর দেন সে তুলনায় ওই সূত্রে, সম্মানকর মোটা অংকের বেতন আকারে, লাভ ক'রে থাকেন অনেক বেশি। এই রাজারা এবং সামরিক পেশায় নিযুক্ত তাদের রাজপুত প্রজারা মুঘল সাম্রাজ্যের সেরা ও বলিষ্ঠ প্রধান শক্তিস্তম্ভ। এই রাজপুত রাজগোষ্ঠীর রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ-ই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন ঔরঙজেবকে। তবে এই দ্বিতীয় বর্ণের জনগোষ্ঠী বা ক্ষেত্রীদের সকলেই নন কিন্তু সামরিক বৃত্তিজীবি। দেখা যায় না শুধু যা রাজপুতদেরই ভিন্ন পেশা নিতে। এরা সকলেই সমরজীবি, সকলেই অশ্বারোহী সৈনিক। ক্ষেত্রীরা শ্রেণীচ্যুত হয়ে পড়েছে এদিক থেকে। পূর্বপুরুষদের এই সাহসিক পেশাটিকে বর্জন ক'রে মন দিয়েছে তারা ব্যবসাবাণিজ্যে। (এখানে উত্তর ভারতের

ক্ষত্রীদের লক্ষ্য ক'রে এ মন্তব্য করেছেন লেখক। তারা ক্ষত্রিয় বলে দাবী করলেও সকলেই সে বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নিযুক্ত)।

তৃতীয় জাতি বা বর্ণের জনগোষ্ঠী হল বেণিয়া-রা। এদের জীবিকা হল ব্যবসা-বাণিজ্য। কতক ক'রে চলেছে শরাফ-বৃত্তি। তার মানে, অর্থ-বিনিময় বা মহাজনী ব্যবসা। কতক রয়েছে দালালের পেশাতেও। সওদাগরেরা কেনা-বেচা চালান এদেরই মাধ্যমে। এই বর্ণের লোকেরা নিজেদের পেশায় কিরূপ ধড়িবাজ ও নিপুণ আগেই শুনিয়েছি, সে-কথা (প্রথম পর্ব, ১৭ পৃঃ দেখুন)। চরম ধূর্ত ইহুদীদেরও রাখে তারা শেখাবার ক্ষমতা। তারা তাদের সন্তানদের কচি বয়স থেকেই লাগিয়ে দেয় কুড়েমি ছেড়ে বুদ্ধিতে শাণ দেয়ার কাজে। আমরা আমাদের ছেলেদের যে বয়সে খেলাধূলো ক'রে কাটাবার মওকা দেই, তারা সে বয়সে ওভাবে তাদের সময় নষ্ট করতে না দিয়ে বসিয়ে দেয় অংক কষা শিখতে। শেলেট পেন্সিল না ছুঁয়ে মুখে মুখেই এমন পাকা হয়ে ওঠে তারা এ বিদ্যায় যে, চোখের পলকে মনে মনে কষে দেবে যে কোন কঠিন অংক। বাপের সঙ্গে সব সময় ছায়ার মতো ফেরে এরা। বাপ তালিম দিয়ে দিয়ে, প্রতিটি অন্ধিসন্ধি চাল-বোল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গিলিয়ে ঝানু ক'রে তোলে ব্যবসায়! কেউ যদি কোন কারণে রেগে গিয়ে চোটপাট চালায় কোন রা না কেড়ে অশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে তা শুনে যাবে এরা, ফিরে যাবে চুপচাপ শান্ত ভাবে। রাগ জল হয়ে যাবার জন্য চার পাঁচদিন ফাঁক দিয়ে তারপর দেখা দেবে আবার ভিজে বেড়ালটির মতো। প্রাণজ অনুভূতি রয়েছে এমন কোন খাদ্যই স্পর্শ করেনা তারা। কোন প্রাণীকে হত্যার পরিবর্তে আপন প্রাণ দিতেও রাজী। তা সে প্রাণী যত ক্ষুদ্র কিংবা তুচ্ছ হোক না কেন। যায়, ক্ষুদে পতঙ্গ কিংবা কীট মূষিকাদি পর্যন্ত। এ ব্যাপারে তারা তাদের ধর্মানুশাসনের গোঁড়া অনুগত। এমনকি নিজেদের ভেতরও কখনো এরা কোনরকম আঘাত করে না অন্য কারো গায়ে। যায় না যুদ্ধেও। করে না কোন রাজপুতের ঘরেও অন্ন বা জলগ্রহণ। কেননা, রাজপুতরা প্রাণী হত্যা করে, খায় তার মাংস। অবশ্য তা বলে গো-মাংস নয়। ওই প্রাণীটিকে হত্যা করে না কি তার মাংস খায় না কোন পৌত্তলিকই।

চতুর্থ জাত বা বর্ণের লোক হল চন্দ (চাঁড়াল—চণ্ডাল) বা শূদ্র। রাজ-পুতদের মতো এদেরও দেখা যায় যুদ্ধের পেশায়। তবে ফারাক এই, রাজপুতরা

যেখানে যোগ দেয় অশ্বারোহীর দলে, এরা দেয় পদাতিকের দলে। উভয়েই মনে করে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরা গৌরবের; যুদ্ধকালে রণাঙ্গন ছেড়ে পালানো চরম অগৌরবের। এ ধরনের পালানোকে গণ্য করা হয় বংশের মুখে চিরকালের মতো চুনকালি মাখানোর তুল্য রূপে। এ প্রসঙ্গে গল্প শোনাই একটি। শোনা এটি সে দেশের লোকমুখে-ই। এক সৈনিক বেজায় ভালবাসতো তার বউকে। বউটিও ঠিক তেমনিই তার স্বামীকে। কিন্তু একবার কি হল, সৈনিকটি পালালো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে। মরার ভয়ে নয়, সে মারা গেলে বউ তার দুঃখ পাবে, বিধবা হবে এ জন্যে। বউটির কানে পৌছল সে কথা, তার পালানোর কারণ। স্বামী যেদিন ফিরল, দরজা বন্ধ ক'রে, দিল না তাকে বাড়িতে ঢুকতে। বললে, যার কাছে মান সম্মানের চেয়ে বউয়ের ভালবাসা বড় তেমন লোককে সম্ভব নয় তার পক্ষে স্বামী বলে স্বীকার ক'রে নেয়া। বংশের মুখে যাতে চুন-কালি না পড়ে, ছেলেরা যাতে বাপের ব্যাটা না বনে প্রকৃত সাহসী হতে শেখে সেই ব্রত থেকেই করতে চাইনে আমি আর এমন স্বামীর মুখদর্শন। বউটি অটল রইল তার সংকল্পে। সৈনিক বেচারা তখন তার সুনাম ও বউয়ের ভালবাসা ফিরে পাবার জন্য যোগ দিল আবার সেনাদলে। ধৈয ও একাগ্রতা নিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাসিল করল আগের তুলনায় অনেক বেশি সুনাম, দ্বিগুণ খ্যাতি। এরূপ চমকপ্রদ ভাবে আপন কলঙ্ক মোচন ফলে খুলে গেল তার জন্যে আবার তার ঘরের দুয়ার, বউটি উছল হাসিমুখে আবার বরণ ক'রে নিল তার স্বামীকে।

[রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্পর্কে ঠিক এমনতরো একটি কাহিনী শুনিয়ে গেছেন টড ও বার্নিয়ার। ১৭ই এপ্রিল ১৬৫৮-তে যুদ্ধ থেকে গৃহে ফেরার পর ঠিক এরূপ ব্যবহারই পেয়েছিলেন তিনি তার মহিষীর কাছ থেকে।]

যারা এই চার জাত বা বর্ণের মধ্যে পড়ে না, পৌত্তলিক জনসমাজের সেই বাকি অংশকে বলা হয়ে থাকে পৌজিকোর (পঞ্চগৌড়)। জীবিকা নির্বাহ ক'রে থাকেন এরা বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি কর্মের মাধ্যমে। বংশ পরম্পরায় এক একটি পরিবার একই জীবিকা অবলম্বন ক'রে চলার বৈশিষ্ট্যটিকে বাদ দিলে আর কোনরকম প্রভেদ নেই এদের মধ্যে। ধরুন, কোন এক পরিবারের বংশীয় পেশা হয়তো দর্জিগিরি। পরিবারটি হয়তো বেশ ধনী হয়ে উঠেছে এপথে রীতিমতো দু'পয়সা রোজগার ক'রে। কিন্তু শত ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক-

নিয়মে উপায় নেই তার বংশের নবীনদের অন্য কোন পছন্দসই জীবিকায় ব্রতী করার। নেই ভিন্ন কোন প্রযুক্তিকর্মে নিযুক্ত থাকা পরিবারে বিয়ে করার সুযোগ বা প্রথাও। তেমনি, কোন দর্জি পরিবারের কেউ মারা গেলে তার সৎকার কালে সমবেত হন শ্মশানে শুধু যা দর্জি সম্প্রদায়ের লোকেরাই। অন্যান্য শিল্প কারিগর সম্প্রদায়ের বেলাও ঠিক এই একই প্রথা।

মাদ্রাজে এক শ্রেণীর কারিগর বা শ্রমিকদের অভিহিত করা হয়ে থাকে পঞ্চম নামে। ট্যাভারনিয়ার সম্ভবত সেই নামটিকেই গুলিয়ে ফেলেছেন পঞ্চগৌড়ের সঙ্গে। পঞ্চগৌড় বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে উত্তর ভারতের বিশেষ পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বোঝাতে।

বিশেষ জাত বা বর্ণের লোকদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম হালালখোর। এদের জীবিকা হল বাড়ি বাড়ি ঘুরে তার আবর্জনা পরিষ্কার করা। বাড়ির আয়তন অনুসারে মাস কড়ারে মজুরি দেয়া হয় এজন্য তাদের। কি পৌত্তলিক কি মুসলমান, কোন গণ্যমান্য পরিবারে যদি পঞ্চাশ জন চাকর বাকরও থাকে, ঘরদোর সাফ-সুতরার জন্য কেউ তাদের ঝাঁটা ধরবে না ভুলেও। মনে করে, এ কাজ করলে তাদের জাত খোয়া যাবে, অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে তারা। ভারতবর্ষে কাউকে চরম অপমান করার একটি উপায় হল তাকে হালালখোর বলা। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এইসব চাকর বাকররা প্রত্যেকেই সেখানে আপন আপন বিশেষ কর্মটিই ক'রে থাকে শুধু। কেউ যোগাবে শুধু জল, বইবে জল ভৃঙ্গার, কেউ ধরিয়ে দেবে শুধু তামাক। যে ধরনের কাজের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়নি তেমন কোন কাজ মালিক করতে বললে অনড় খাড়া হয়ে থাকবে সে চুপচাপ। ক্রীতদাসদের বেলা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। মনিব যে আদেশ করবে তাই সে মানতে বাধ্য। হালালখোররা বাড়ি-ঘরের আবর্জনা পরিষ্কারের পেশায় রয়েছে বলে, বাড়ির যা কিছু ভুক্তাবশেষ খাবারদাবার পেয়ে থাকে সাধারণতঃ তারাই। ভাত-পাতের বাছ বিচার না ক'রে যে কোন বাড়ি থেকেই তা নেয় তারা, এবং বলতে গেলে একরকম সর্বভুক। আবার, গাধার ব্যবহার ক'রে থাকে সেদেশে শুধু এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই যা। তাদের পিঠে ময়লা চাপিয়ে ফেলে আসে তা বাড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে মাঠে। অন্য কোন ভারতীয় কিন্তু ভুলেও ছোঁয় না এ প্রাণীটিকে। (এ মন্তব্য পুরোপুরি ঠিক নয়। কাপড়ের বোঝা বইবার জন্য ধোপারাও ব্যবহার করে এদের)। পক্ষান্তরে পারস্যে

কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে এ প্রাণীটির। যেমন তল্পিতল্পা বয়ে নেয়ার জন্য, তেমন বেড়ানোর জন্য। শুয়োরও লালন-পালন ক'রে থাকে এই হালালখোররা, খায় তাদের মাংস।

হালাল শব্দটির অর্থ হল বৈধ, ন্যায় সঙ্গত, ধর্ম সঙ্গত বা সততাপূর্ণ। হালালখোর শব্দটির মর্মার্থ তাই—যিনি সৎপথে, ন্যায়পথে বা ধর্মপথে উপার্জন ক'রে জীবন ধারণ করেন কিংবা ভোজন ক'রে থাকেন ধর্মশাস্ত্র সম্মত খাদ্যাদি। কোন অর্থেই তাই হালালখোর শব্দটি নিন্দাসূচক নয়, প্রশংসাসূচক বরং। এ বিশেষণে কাউকে সম্বোধন করলে তার অপমানিত বোধ না ক'রে গর্বিত বা খুশী হওয়াই উচিত। অতএব স্পষ্ট, এরূপ মহৎ বিশেষণটি মেথরদের মতো এক নিচু সম্প্রদায়ের প্রতি নিযুক্ত হওয়ার ফলেই এটি অন্যদের কাছে পরিণত হয়েছে অপমানকর বিশেষণে, ঘটেছে শব্দটির মহত্ত্বের, আভিজাত্যের ক্ষয়, অর্থের অবনমন। অর্থাৎ, মহৎ বা গৌরববাচক বিশেষণে অভিহিত ক'রে যে অবহেলিতকে, সমাজের চোখে নিচু-কে, উঁচু আসনে তোলা যায় না, অচ্ছুতকে স্পৃশ্য বা জলচল ক'রে জাতে ওঠানো যায় না—এটি তার এক চরম উদাহরণ। ঘোচানো যায় না এভাবে তার দুঃখ, দারিদ্র্য, জীবনের দুর্বিসহ বোঝাও। এ জাতীয় নামকরণকে আখ্যা দেয়া যেতে পারে তাই নিজেদের অপরাধকে আড়াল ও অপরাধ-বোধকে প্রবোধ দেয়ার জন্য অতি নিকৃষ্ট স্তরের এক ছলনা বা ভণ্ডামি। সঠিকভাবে জানা না থাকলেও, মেথরদের 'হালালখোর' নামকরণ বোধহয় সম্রাট আকবরেরই কীর্তি। এরূপ নামকরণ দ্বারা তিনি তার 'ইলাহী' ধর্মমতের সঙ্গে চলিত সমাজ ব্যবস্থার সমীকরণ ক'রে হয়েছিলেন বিবেকের দংশন লাঘবে উদ্যোগী। এজন্য বান্দা বা দাস-দের মহিমান্বিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি তাদের 'চেলা' নামকরণ ক'রে। কিন্তু কাণাকে পদ্মলোচন নাম দিলে সে যেমন দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় না, তেমনি 'চেলা' নামের মাহাত্ম্যেও ঘোচেনি দাসদের দাসত্ব, দুঃখ-দুর্দশা নিপীড়ন। ইতিহাসে উপস্থিত এ সব দৃষ্টান্তের পরও গান্ধিজী অস্পৃশ্যদের নামকরণ ক'রে গেছেন 'হরিজন'। কিন্তু এর ফলে অস্পৃশ্যতা দূর না হয়ে, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের গুণগত কোন উৎকর্ষ না ঘটে বরং অবনমন ঘটেছে হরিজন শব্দটির অর্থ-তাৎপর্যের। হয়ে গেছে শব্দটি 'হালালখোর'-এরই সমপর্যায় ভুক্ত। আমার মতে হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা সহ বর্ণবিভেদরূপী বিচ্ছিন্নতার,

অ-মানবিক প্রথার অভিশাপকে দূর করার বাস্তব পন্থা মাত্র দুটিই। এক: আইনের মাধ্যমে সবাইকে ব্রাহ্মণে পরিণত করা ও ব্রাহ্মণের পদবী ব্যবহারের সুযোগ দেয়া। কিংবা, দুই: ক্রমোন্নত জীবিকা ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিকে আইনের মাধ্যমে উচ্চতর বর্ণে ঠাঁই দেয়া, উচ্চতর বর্ণের উপাধি ব্যবহারের সুযোগ দেয়া। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিই হল সর্ব দিক থেকে বাস্তবানুগ, মানানসই পন্থা। একজন নিম্নবর্ণের ব্যক্তি করণিক হলে তাকে কায়স্থ বা করণ সম্প্রদায় ভুক্ত করলে কিংবা সে শিক্ষক বা চিকিৎসক হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত করলে যুক্তি-সঙ্গত ভাবে আপত্তি থাকতে পারে না কারো। কেননা, বর্ণ বিভেদের উৎপত্তি তো জীবিকা বিভেদ থেকেই। তাই, এই পথে বিষে বিষক্ষয় বা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতিতে অনায়াসে সমাজকে বর্ণবিভেদের গ্লানি থেকে মুক্ত করা সম্ভব। ধলা কালোর বর্ণ বৈষম্যের চেয়েও হিন্দু সমাজের জাত পাতের বর্ণ-বৈষম্য অনেক বেশি নক্কারজনক। কেননা, ধলা কালো প্রাকৃতিক প্রভেদ। কিন্তু হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ শূদ্র বর্ণ বিভেদ প্রকৃতির নয়, মানুষের সৃষ্টি। অথচ ধলা কালোর বৈষম্য বিরুদ্ধে উচ্চস্বর তুলতে আমরা যতটা সিদ্ধ, তার শতকরা এক ভাগ আন্তরিকতাও নেই কিন্তু আমাদের জাত পাতের বৈষম্যকে দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার দিকে। বরং অনেকেই একে 'রাজনৈতিক পুঁজি' হিসাবে ব্যবহার ক'রে আপন স্বার্থের গুছিয়ে নিতে উৎসুক। ফলে ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'চালুনি বলে সূঁচ তোর পেছনে কেন ছেঁদা'-র মতোই। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পণপ্রথা বা পতিতাবৃত্তির মতো কুৎসিত প্রথা আইন ক'রে রোধ করা সম্ভব নয়। সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত কোন না কোন চেহারায় তা থাকবেই আসর জাঁকিয়ে। কিন্তু এ সমাজ ব্যবস্থায় আর্থনীতিক তাৎপর্য শূন্য সতীদাহ বা অন্য পাঁচটা সামাজিক ও ধর্মীয় কুপ্রথার মতো অস্পৃশ্যতা ও জাত-পাতের বৈষম্য দূর করা সম্ভব আইনের সাহায্যে। তবে পথটি হওয়া চাই উপরোক্ত দুইয়ের যে কোন একটি। যারা প্রকৃতই হিন্দু সমাজকে এই গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চান তাদের অনুরোধ করি এই প্রস্তাবটি গুরুত্ব সহ বিচার বিবেচনা ক'রে দেখতে।

চার ।। পৌত্তলিকদের দেবতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা

পৌত্তলিকরা বন্দনা ক'রে থাকে গরু, বানর ও বিভিন্ন দৈত্য দানব অপদেবতারও, যে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান প্রকৃত দেবতার পাবার কথা তা ঢালে তারা এদেরই পায়ে। অবশ্য, স্বীকার করে তারা এরই পাশাপাশি আবার অনন্ত অসীম সর্বশক্তিমান অপার চৈতন্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বও। মানেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই অসীম ক্ষমতাবানেরই সৃজন। তারা কোন কোন অঞ্চলে স্মরণ করেন তাকে পরমেশ্বর বলে, আবার মালাবার প্রভৃতি কতক অঞ্চলে পেরেমযেল (পেরুমাল=মহান সত্তা) নামে। আর করমণ্ডল উপকূল অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের ভাষায় বলা হয় তাকে বিষ্ণু। বৃত্তই হল সব থেকে নিখুঁত আকৃতি, বোধ হয় এ তত্ত্বটি শুনেই তাকে আরো মার্জিত করার প্রেরণা থেকে ঈশ্বরের রূপকল্পনা করেছেন তারা ডিমেল। এ জন্যেই প্রতিটি মন্দিরে রাখেন তারা একটি ক'রে ডিমেল আকৃতির নুড়ি (শালগ্রাম)। এটি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে গঙ্গা নদী গর্ভ থেকে। পূজা করা হয় তাকেই ঈশ্বর রূপে। এই অন্ধ বিশ্বাসটি এমন-ভাবে শিকড় গেড়েছে মনে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি পরম জ্ঞানী তিনি ও কানে তুলতে চাইবেন না এর বিরুদ্ধবাদী কোন যুক্তিকে। যে জনসমাজের দিগদর্শকরাই এ হেন অপচরিত্রের তার জনসাধারণ যে আকাট ও কিম্ভূতকিমাকার পৌত্ত-লিকতার প্রতি ঝুঁকবে এতে আর আশ্চর্যের কি। এদের ভেতর একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার সর্বক্ষণ গলায় ঝুলিয়ে রাখে এই ডিমেল নুড়িটিকে। প্রার্থনাকালে চেপে ধরে তাকে আপন দেহের সাথে।

* এই শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলার কতক সংগৃহীত হয়ে থাকে শোণ নদী-শয্যা থেকে। ঘোরবর্ণ আগ্নেয় শিলার অন্তর্গত সিলিকা গোত্রীয় যৌগিক ধাতব শিলা বলে মনে করা হয় একে। কতক মেলে হিমালয় অঞ্চল থেকে। এগুলি মধ্যে রয়েছে জীবাশ্ম বা ফসিল গোত্রীয় এবং অ্যামোনাইট গোত্রীয় শিলা। কতক মেলে গণ্ডক নদী শয্যা থেকেও। শৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা শিবলিঙ্গকে বুকে ঝুলিয়ে রাখেন অনেক সময়। সুতরাং ট্যাভারনিয়ার হয়ত তাকেই শালগ্রাম শিলা মনে করেছেন ভুলে।

এ জাতীয় হাঁদা বুদ্ধি ও করুণ অজ্ঞতা নিয়েই এই পৌত্তলিকরা, প্রাচীন যুগের মূর্তিপূজকদের মতো, তাদের দেবতাদেরও ভাবে মানুষ বলে। যুগিয়ে দেয় এমনকি পত্নী ও তাদের। মনে করে, মানুষ যা কিছু ক'রে আনন্দ পায়, দেবতাদের আকর্ষণও ঠিক সে সবের দিকেই। এই সব ধ্যান ধারণা থেকেই তারা মনে করে, তাদের পরম দেবতা রামও মানুষ ছিলেন এককালে। ক'রে গেছেন তার জীবন-কালে চমকপ্রদ নানা কীর্তিকলাপ। হয়েছেন সেজন্যই স্মরণীয় ও বরণীয়। তার সম্পর্কে যে সব আখ্যায়িকা তারা শোনায় তা নিচে বলা ধরনের। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা সব থেকে অভিজ্ঞ তাদের মুখেই শুনেছি এ আমি।

রাম ছিলেন দেশেরত (দশরথ) নামের এক প্রতাপপ্রতিপত্তিশালী রাজার পুত্র। রাজার দুই শাস্ত্র সম্মত মহিষীর গর্ভে যে কজন সন্তান জন্মে তার মধ্যে তিনিই ছিলেন পরম গুণবান। ছেলেকে গভীর ভালবাসতেন রাজা, করেন তাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে নির্বাচন। এদিকে রাম মা হারা হলেন এক সময়ে। আর সেই সুযোগে অপর মহিষী গভীর প্রভাব বিস্তার করল রাজার ওপর। প্ররোচিত ক'রে তুলল স্বামীকে রাম ও তার ভাই লক্ষ্মণকে প্রাসাদ থেকে, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তা-ই করলেন রাজা। দুভাইকে বঞ্চিত ক'রে ঘোষণা করলেন অপর মহিষীর পুত্রকে আপন উত্তরাধিকারী রূপে। রাম ও তার ভাইকে নির্দেশ দেয়া হল রাজ্য-ছাড়া হবার জন্য। পিতার আদেশ শিরোধার্য ক'রে প্রস্তুত হল দুভাই রাজপুরী ত্যাগ ক'রে চলে যেতে। বিদায় নেয়ার জন্য উপস্থিত হলেন রাম পত্নী সীতার কাছে। এই সীতাকে একজন দেবী রূপে মান্য করে পৌত্তলিকরা। তিনি কাছ-ছাড়া হতে চাইলেন না রামের। প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন তিনিও সঙ্গী হবেন স্বামীর। তাই, তিনজনেই রাজপুরী ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন অজানা ভাগ্যের মুখোমুখি হতে। প্রথম দিকে দুর্ভাগ্য সাথী হল তাদের। এক অরণ্যাঞ্চল পাড়ি দেয়ার কালে রাম গেলেন একদিন পাখি শিকারে, ফিরলেন না দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়া সত্বেও। স্বামীর কোন বিপদ ঘটেছে ভেবে আকুল হলেন সীতা। অস্থির অনুরোধ জানিয়ে বাধ্য করলেন লক্ষ্মণকে তার খোঁজে যেতে। লক্ষ্মণ প্রথমে ঘোর আপত্তি জানান এতে। কেননা, সীতা একা থাকলে তার কি বিপদ ঘটতে পারে দিব্য দৃষ্টি বলে তা জানতে পেরে রাম তাকে বারণ ক'রে যান সীতার কাছ ছাড়া হতে। তবু, বৌদির গভীর আকুতি দেখে তার

কথা ঠেলতে না পেরে গেল সে ভাই রামের খোঁজে। এই ফাঁকে পৌত্তলিকদের অপর এক দেবতা রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হলেন সীতার নিকটে, চাইলেন তার কাছে ভিক্ষা। যাবার বেলা রাম সীতাকে বলে গিয়েছিলেন, যে স্থানটিতে তিনি তাকে রেখে যাচ্ছেন সেখান থেকে একপাও বাইরে না যায় যেন সে। সীতা তাই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেই ভিক্ষে বাড়িয়ে দিল তার দিকে। রাবণেরও অজানা ছিল না রামের সে নিষেধ। তাই, সীতা এগিয়ে এসে ভিক্ষা না দিলে রাজী হলেন না তা নিতে। ভুল ক'রেই হোক কিংবা রামের নিষেধ বিস্মৃত হবার দরুণই হোক, সীতা রাম-নির্দিষ্ট গণ্ডী পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন রাবণের দিকে। রাবণও এই সুযোগে তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে চলে গেলেন বনের গভীরে। সেখানে অপেক্ষা ক'রে চলছিল তার অনুগামীরা। সীতাকে নিয়ে সদলবলে অদৃশ্য হলেন তারপর তিনি নিজ রাজ্যে। শিকার থেকে ফিরে সীতাকে দেখতে না পেয়ে শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন রাম। হারালেন সংজ্ঞা। লক্ষ্মণ সুস্থ ক'রে তুললেন তাকে। তারপর বেরোলেন ভাইকে নিয়ে তার পরম প্রিয় পত্নী সীতার সন্ধানে।

ব্রাহ্মণরা যখন তাদের আরাধ্যা দেবী সীতার এই হরণ কাহিনী বর্ণনা করেন সে-সময়ে তাদের চোখ দিয়ে গড়িয়ে চলে জলের ধারা, হয়ে পড়েন তারা গভীর শোকে অধীর। সীতা হরণকারীকে শাস্তি দিতে গিয়ে রাম কি অসীম বীরত্ব দেখান সে কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে শোনান সেই সাথে অসংখ্য অবিশ্বাস্য আখ্যায়িকা। সীতার খোঁজে নিযুক্ত করা হল সমগ্র পশু-প্রাণীকে। সফল হল তাদের মধ্যে একমাত্র হনুমান। এক লাফে পার হল সে সাগর, উপস্থিত হল রাবণের কানন-কুঞ্জে। দেখা পেল সেখানে পরম শোকাভিভূতা সীতার। স্বামীর দূত রূপে এক বানরকে উপস্থিত হতে দেখে হয়ে গেলেন প্রথমে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। বিশ্বাস করতে চাইলেন না তাকে প্রকৃতই রামের প্রেরিত দূত বলে। হনুমান তখন তার হাতে রামের দেয়া সীতার একটি আঙটি দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করল তার মনে। এ আঙটিটি রাখা ছিল সীতার ফেলে আসা সামগ্রীগুলির মধ্যে। এক পশুর মাধ্যমে রাম যে কি ভাবে তার সংবাদ পাঠালেন, তার গভীর ভালবাসার এমন সুনিশ্চিত নিদর্শন পাঠালেন, এই অলৌকিকত্ব অভিভূত ক'রে তুলল সীতাকে। এই সাক্ষাৎকার পর্বে নানা অসাধ্য সাধন করল হনুমান। রাবণের অনুচররা গুপ্তচর বলে জানতে পেরে

আটক করল তাকে। শাস্তি দেয়ার জন্য তার লেজে ও শরীরে ন্যাকড়া প্যাঁচিয়ে দিলে তাতে আগুন ধরিয়ে। হনুমান সেই আগুনে রাবণের পুরো রাজপুরীটি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে তাকে ছারখার ক'রে। খড়ের গাদা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘটালো সে এমন ঘটনাটি। রাবণের হাতে দ্বিতীয় বার পড়লে তার যে আর রক্ষে নেই তা অনুভব করতে পেরে, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে দেহের আগুন নিভিয়ে, আবার এক লাফে সাগর পেরিয়ে ফিরে গেল সে রামের কাছে। শোনাল তাঁকে আপন অভিযানের আদ্যোপান্ত কাহিনী। স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীতা যে কিরূপ শোকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে জানালে তাও। সীতার বিচ্ছেদ-বেদনার সে কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন রাম। সংকল্প নিলেন, যে-ভাবেই হোক রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করবেন তাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে যাত্রা করলেন রাম। বানরটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাকে। বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন তিনি রাবণের পুরীতে। বিরাট অগ্নিকাণ্ডের দরুন তখনো ধোঁয়া উঠছে সে পুরীর বিভিন্ন স্থান থেকে। প্রজারা এর ফলে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ায় সহজেই সম্ভব হল প্রাণাধিকা সীতাকে উদ্ধার করা। রাবণ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলে পাহাড়-পর্বতে। রাম ও সীতা পরস্পরকে আবার ফিরে পেয়ে হয়ে উঠল আনন্দে বিহ্বল। হনুমান তাদের অসীম উপকার করার জন্য দেখাল তার প্রতি অকুণ্ঠ সমাদর।

রামের সেনাবাহিনী তার রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস ক'রে দেয়ার ফলে রাবণ নিল শেষমেশ দরিদ্র ফকীরের বেশ। কাটলো তার বাকি জীবন সে-ভাবেই। বর্তমানে আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভবঘুরের মতো পরিক্রমা ক'রে চলা যে অবিশ্বাস্য সংখ্যক ফকীর (সন্ন্যাসী)-এর দেখা পাই এদের উৎপত্তি এই রাবণ থেকেই। এরা এরূপ কৃচ্ছ্র জীবন যাপন ক'রে চলে যা দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয় পরম বিস্ময়ে।

পাঁচ ॥ পৌত্তলিক ফকীর বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও তাদের কৃচ্ছ্র-সাধনা

আগেই জানিয়েছি ফকীর সম্প্রদায়ের উদ্ভব রামের হাতে রাজ্যভ্রষ্ট রাবণ থেকে। শোক দুঃখে অভিভূত হয়ে বেছে নিল সে নিঃস্ব সর্বহারা, নগ্নবেশ ভবঘুরের জীবন। এ ধরনের জীবন-যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অল্পকাল মধ্যে জুটে গেল তার অনেক অনুগামী। এ জীবন-যাত্রা সুযোগ এনে দিল তাদের যে-কোন ধরনের নষ্টামি ক'রে চলার। সাধু সন্ত হিসাবে নাম যশ শ্রদ্ধা ভক্তি এনে দিল তাদের এই সুযোগে যে-কোন দুষ্কর্ম ক'রে চলার অবাধ সুবিধা।

সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে ফকিররা। প্রত্যেক দলেরই রয়েছে একজন প্রধান বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। কি শীত কি গ্রীষ্ম চলাফেরা করে তারা নগ্ন হয়ে, শোয়া বসা করে সবসময়ে মাটির ওপর। তাই নবীন ফকীররা ও এদের অন্ধ ভক্ত পৌত্তলিকের দল বিকেলের দিকে এদিক ওদিক খুঁজে পেতে যোগাড় ক'রে আনে গরু ও অন্যান্য প্রাণীর মল। রোদে শুকিয়ে নিয়ে ধরায় তা দিয়ে আগুন। কাঠ একরকম ব্যবহারই করে না তারা বলতে গেলে। ভয়, পাছে তার মধ্যে বাসা বাঁধা কোন জীবন্ত কীট পতঙ্গ প্রাণ হারায় এর ফলে। মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য ব্যবহার করে, যাতে কোন রকম কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধার উপায় নেই এমন ধরনের জলে ভেসে আসা কাঠকুটো। নবীন ফকীররা শুকনো মাটি মিশে থাকা এই মল বেশ কিছু পরিমাণ যোগাড় হবার পর জ্বালায় দলের আকার অনুযায়ী একাধিক বড় বড় আগুন। এক একটি আগুন ঘিরে বসে যায় দশ থেকে বার জন ফকীর। ঘুম পেয়ে গেলে মাটির কোলে ছাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ে তার ওপরেই, আকাশ নামের অনন্ত ছাউনির নিচে। যারা সাধনা ক'রে চলে, তারা দিনের মতো রাতও কাটায় একই আসন ভঙ্গিমায়। জ্বালানো হয় এজন্য তাদের দুদিকেই আগুন, নয়তো ঠাণ্ডা সহ্য করা হয়ে পড়বে অসম্ভব তাদের পক্ষে। এই সব তপস্বী ফকীরদের কথায় একটু পরেই আসছি আমি। ধনী পৌত্তলিকদের আবাসে এই সব ফকীরের দল উপস্থিত হলে তারা ধন্য মনে করে নিজেদের, মনে করে স্বর্গ থেকে দেবতাদের

আশীষ ঝরে পড়ল যেন। যে-ফকীর যত বেশি কৃচ্ছ্রসাধন পরায়ণ, দেখায় তাকে তত বেশি সম্মান ও সমাদর। ফলে, দলে কোন কঠোর সাধনাব্রত ফকীর থাকলে তা বিশেষভাবে গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দলটির।

এই সব ফকীরের দল জোটবদ্ধ হয়ে তীর্থ করতে যায় সে-দেশের বড় বড় মন্দির গুলিতে। দেখা যায় তাদের বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে অনুষ্ঠিত সর্ব-সাধারণের স্নান যাত্রার মেলাগুলিতেও। এসব পুণ্যস্নান মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেমন তাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন নদী গঙ্গায়, তেমনি বিজাপুর রাজ্য ও পর্তুগীজ অঞ্চল গোয়ার সীমান্ত রেখা বয়ে বয়ে চলা নদীটিতেও (কৃষ্ণা)। পরম কৃচ্ছ্রসাধন রত কিছু কিছু ফকীর বাস ক'রে থাকে তাদের মন্দিরগুলির কাছে অতি দীনহীন সব কুটিরে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ প্রতিদিন একবার ক'রে খেতে দেয়া হয় তাদের মন্দির থেকে।

গোমব্রুনের কাছে যে বিশেষ প্রজাতের গাছটি দেখা যায়, বলেছি যার কথা আমার পারস্য বিবরণে, দেখা যায় সে গাছটি ভারতের প্রায় সর্বত্র। ফিরিঙ্গীরা নাম দিয়েছে এর the trees of the Banians বা বেণিয়াদের গাছ (বট গাছ)। কেননা, যেখানেই এ গাছ রয়েছে, দেখা যাবে তার নিচে পৌত্তলিকদের বসে থাকতে, তারই নিচে তাদের রান্নাবান্না করতে। এ গাছটিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে তারা। মন্দিরগুলিকে গড়ে সাধারণতঃ তারই নিচে কিংবা আশেপাশে। সুরাটেও রয়েছে এ গাছ একটি। তার গুড়িতে থাকা কোকরে দেখা যায় স্ত্রীলোকের বিকৃত মুখাকৃতি সম্পন্ন একটি দানব মূর্তি। বলা হয়ে থাকে, এটি নাকি প্রথম মানবীর মূর্তি। তারা অভিহিত করে তাকে মমানিভ নামে (মহামায়া বা মামা দেবী)। এই দানবটিকে অর্চনা করার জন্য প্রতিদিন জড়ো হয় সেখানে অগুণতি লোক। তার সেবার জন্য সর্বক্ষণ হাজির থাকে মন্দিরটির কাছে জনাকয়েক ব্রাহ্মণ পুরোহিত। গ্রহণ ক'রে চলে পূজার্থীদের বয়ে আনা পূজাসামগ্রী—চাল, জোয়ার ও অন্যান্য শস্য। যারাই এখানে পূজা দিতে প্রার্থনা জানাতে আসে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কপালের মাঝখানটিতে এক ধরনের সিঁদুর দিয়ে এঁকে দেন পুরোহিত একটি ক'রে তিলক চিহ্ন। প্রতিমাটিও এই সিঁদুর দিয়ে চিত্র-বিচিত্রিত। তারা বলে কপালে এই তিলকটি থাকলে ক্ষতি করতে পারে না আর কোন অপদেবতাই, কেননা তারা তখন ঈশ্বরের রক্ষণাধীন।

সুরাটের বটগাছটির নিচে থাকা যে-সব প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে চিত্রটিতে, এবার একে একে দিই তাদের পরিচয়। এক চিহ্নাঙ্কিত স্থানটিতে ব্রাহ্মণরা মমনিভ, সীতা, মেদেদিন (মহাদেব ?) প্রভৃতির সংস্তরীয় কোন একটি দেব বিগ্রহকে সুসজ্জিত ক'রে থাকে সাধারণতঃ। দ্বিতীয়টি হল মন্দির মধ্যে থাকা মমনিভের মূর্তি। তৃতীয়টি তারই পাশে থাকা অপর একটি মন্দির। এর দ্বার প্রান্তে রয়েছে একটি গাভী, ভেতরে দেবতা রামের একটি মূর্তি (শ্রীকৃষ্ণের)। চতুর্থটি আরেকটি মন্দির। ফকীররা (সন্ন্যাসী বা যোগীরা) সাধনা করেন এখানে বসে। পঞ্চম স্থানটিতে রয়েছে চতুর্থ একটি মন্দির। এটিও রামের। ষষ্ঠ স্থানটিতে রয়েছে একটি সমাধি। প্রতি বছর বারকয়েক এটিতে এসে ঠাঁই নেন একজন ফকীর। একটি অতি ক্ষুদ্র ছেঁদা ছাড়া আর কোন পথ দিয়ে আলো পৌঁছয় না সেখানে। কোনরকম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ না ক'রে ন কি দশ দিন পর্যন্ত সেখানে কাটান তিনি এক এক সময়ে। এ এমন এক অকল্পনীয় ব্যাপার যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না কখনো আমি। কৌতূহল চাপতে না পেরে গেলাম তার সেই সাধনা দৃশ্য দেখার জন্য একদিন সুরাটের ডাচ অধিকর্তাকে সাথে নিয়ে। ফকীরটি দিন-রাত সত্যিই না খেয়ে কাটায় কিনা সেদিকে নজর রাখার জন্য নিয়োগ করলেন তিনি সর্বক্ষণের পাহারা। তিনি সত্যিই কোন কিছু খান এ প্রমাণ পাওয়া গেল না এ পাহারা বসিয়ে। ফকীরটি আমাদের দর্জিদের মতো একই আসন ভঙ্গিতে বসে কাটাল সর্বক্ষণ সেখানে এতটুকুও নড়াচড়া না ক'রে। তবে, দশদিন ওই ভাবে থাকার সঙ্কল্প ঘোষণা করেও পারলেন না তিনি সাতদিনের বেশি থাকতে। সমাধি গর্তে দীপ জ্বালিয়ে রাখার দরুন গরমে শ্বাসকষ্ট দেখা দিল তার। নিচে অন্য যে-সব কৃচ্ছ্রসাধনার কথা বলছি তা হাজার হাজার লোক নিজের চোখে না দেখলে পারত না মোটে সত্যি বলে মেনে নিতে। সপ্তমটি এক কৃচ্ছ্র-সাধনরত ফকীরের আসনভঙ্গি। দিনেরাতে কখনো এক মুহূর্ত না শুয়ে বহু বছর ধরে কাটিয়ে চলেছেন এভাবে। ঘুমোবার ইচ্ছে হলে পেছনে টানা দিয়ে রাখা একটা দড়ির গায়ে হেলান দেন তখন। এরূপ অকল্পনীয় ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর আসনে বসে থাকার দরুন রসস্রোত নিচে জমা হয়ে ফুলে ওঠে পা দুটো। অষ্টমটি অপর দুই যোগীর আসন ভঙ্গি। এরা আমৃত্যু হাতদুটিকে উর্ধমুখি ক'রে রাখেন ওই ভাবে। ফলে তার সন্ধিগুলি এমন কাঠ হয়ে যায় যে কখনো

আর চাইলেও নামানো যায় না হাত নিচের দিকে। মাথার চুল বেড়ে বেড়ে নেমে যায় কোমরের নিচ অব্দি। নখগুলিও হয়ে ওঠে আঙুল সমান লম্বা। কি দিন কি রাত, কি গ্রীষ্ম কি শীত, রোদ বর্ষা হিমের মধ্যে পুরো নগ্ন দেহে ওই ভাবে কাটান তারা। মশা হুল ফোটালে সাধ্যি নেই যে তাড়াবে তাকে। পান ভোজন ইত্যাদি জীবনের অন্যান্য আবশ্যিক কর্মগুলি পালনে তাদের সাহায্য করে দলে থাকা অন্যান্য ফকীরবা। তারাই সেবা যত্ন করে প্রয়োজন মতো। নবম চিত্রটি অপর এক যোগীর আসন ভঙ্গিমার। প্রতিদিন টানা কয়েক ঘণ্টা এভাবে হাতে একটি জ্বালানো ধুনী নিয়ে খাড়া হয়ে থাকেন এক পায়ে। চোখ দুটিকে নিবদ্ধ রাখেন সূর্যের দিকে। আরাধ্য দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে মাঝে মাঝে ছুঁড়ে চলেন ধুনীটি মধ্যে ধুনো। দশম ও একাদশ চিত্র দুটি অন্য দুই যোগীর যোগ ভঙ্গিমা। বসা অবস্থায় উর্ধ্ববাহু হয়ে আছেন তারা। দ্বাদশ চিত্রে ঠাঁই পেয়েছে উর্ধ্ববাহু অবস্থায় কি ভাবে যোগীরা ঘুমোন তারই দৃশ্য। এটি নিঃসন্দেহে দেহের সহন-ক্ষমতার ওপর চরমতম নির্যাতন। ত্রয়োদশ চিত্রে দেখা যাচ্ছে আরেক যোগীর সাধন-ভঙ্গিমা। হাত দুটি নামাতে না পারার দরুন অপুষ্টি রোগে আক্রান্ত হয়ে শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে ঝুলে পড়েছে সে দুটি পিছনের দিকে।

আরো অসংখ্য রকমের যোগী রয়েছেন এছাড়া। তাদের কতক এমন আসন ভঙ্গিমায় সাধনা ক'রে চলেন যা শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতার পুরো বিপরীত। রাখেন সব সময়ে দুচোখ সূর্যমুখি ক'রে। কতক থাকেন দু-চোখ ভূমি নিবদ্ধ ক'রে। না তাকান কারো পানে, না বলেন কথা। বৈচিত্র্য এত ব্যাপক যে তা নিয়েই দিব্যি আলোচনা চালানো চলে বহুক্ষণ।

কৌতূহলীদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে, বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা লাভের জন্যে এই সব যোগীর আরো কতক চিত্র দেয়া হল এই সাথে। ঘটনাস্থলেই স্বাভাবিক দৃশ্যানুযায়ী এঁকেছি এগুলি আমি। ভব্যতার খাতিরে গোপনাঙ্গ-গুলি গোপন ই রেখে দেয়া হয়েছে সেখানে। তবে, তাঁরা কিন্তু এতটুকুও শরম দেখায় না জনসমক্ষে সর্বক্ষণ তা অনাবৃত ক'রে রাখতে। কি শহর কি গ্রাম সর্বত্রই চলাফেরা করে তারা ওই রকম মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়া কালীন অবস্থায়। মহিলারাও ভক্তি গদগদ হয়ে উপস্থিত হয় তাদের সম্মুখে। এবং যে কাজটি করার জন্য, তা লিখতে লজ্জায় আটকে যায় কলম। যোগীরা

কিন্তু কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখায় না তাতে। বরং বিপরীত ভাবে, যে ধরনের নির্মোহ ভাব দেখায়, যে রকমটি চোখের তারায় অবিরাম পাক দিয়ে চলে তা দেখে মনে হবে তারা ডুবে রয়েছে যেন নিরাসক্তির সাগরে। (এই চিত্রগুলি প্রকাশ করা হয়নি তার গ্রন্থের কোন মূল সংস্করণে।)

ছয় ॥ মৃত্যুর পর মানবাত্মার পরিণতি সম্পর্কে পৌত্তলিক ধারণা

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাকে বিধাতার কাছে হাজির করা হয়—পৌত্তলিকদের মধ্যে চালু থাকা সংস্কারগুলির মধ্যে এটি একটি। মর্ত্য জীবনে সে যে ধরনের কর্ম ক'রে এসেছে তারই বিচার নিরিখে কোন না কোন যোনিতে তখন আবার তার জন্ম নির্দেশ করেন বিধাতা। ফলে ওই একই ব্যক্তি (সত্তা বা আত্মা) বার বার জন্ম নেয় পৃথিবীতে। অসৎ জীবন যাপনকারী মানুষের আত্মা বিভিন্ন পাপের পাকে ডুবে থাকার দরুন, প্রবৃত্তি নিচু সোপানমুখি হয়ে পড়ার দরুন হারিয়ে বসে মানব জন্ম লাভের অধিকার। জন্ম নিতে হয় তাকে তখন কুকুর, বেড়াল, গাধা—এ জাতীয় কোন না কোন ইতর প্রাণী কুলে। ওই ইতর জীবন খাঁচার ঘের-পাচিলে বন্দী হয়ে ক'রে চলে সে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। তবে, প্রচলিত বিশ্বাস, যে-সব আত্মা গো-জন্ম নেয়ার সুযোগ পান তারা পরম সৌভাগ্যবান। কেননা, এ প্রাণীটিকে দেব-তুল্য গণ্য করে তারা। মৃত্যুকালে কারো হাতে গরুর লেজ থাকলে তা-ই যথেষ্ট পরজন্মে পরম সুখী হবার সৌভাগ্য অর্জনের পক্ষে।

মানব-আত্মার ইতর প্রাণী রূপে জন্মান্তর নেয়ায় বিশ্বাসী হওয়ার দরুনই পৌত্তলিকরা যে-কোন ধরনের ইতর প্রাণী হত্যার গভীর বিরোধী। ভয়, এর ফলে হয়তো তারা জড়িয়ে পড়বেন স্বজন হত্যা বা তার প্রায়শ্চিত্তে ব্যাঘাত সৃষ্টির পাপে। হয়তো তারই কোন আত্মীয়-স্বজন জন্মান্তর লাভ করেছে ওই প্রাণীটি রূপে।

পৌত্তলিকদের বিশ্বাস, জীবনভর তীর্থ, ভিক্ষাদি দান-ধ্যান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম

করলে ওইসব মানুষের আত্মা পরজন্মে সুযোগ পায় রাজা বা বিত্তশালী হয়ে জন্মলাভের। পূর্ব জন্মের মহৎ কর্মাদির পুরস্কার রূপে তখন সৌভাগ্য অর্জন করে ভোগ-বিলাস সুখ উপভোগ ক'রে চলার। (আর্থ শ্রেণী বৈষম্য মূলক ধনতন্ত্রী ও সামন্ততন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থাকে কিরূপ অপকৌশলে সাধারণ মানুষের কাছে যুক্তি সিদ্ধ করা হয়েছে, কিভাবে এই সমাজ ব্যবস্থা ঈশ্বর নির্দিষ্ট এরূপ মিথ্যা প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে এর প্রতি অনুগত ও আসক্ত ক'রে তোলা হয়েছে এটি তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ রূপে আদৃত গীতা' মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার রূপে চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিসৃত বাণী রূপেই স্থান পেয়েছে এই প্রচার। গীতা দশম অধ্যায় দেখুন। ঈশ্বরের 'পবিত্র' ধারণাকে এভাবে কলুষিত করতে কোন ধর্মমত এবং তার ধ্বজাবাহীরাই পিছ পা হননি অবশ্য)।

এজন্যেই পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা সাধুসন্ত-যোগীরা ক'রে থাকেন ওইরূপ প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্রসাধনা (এ মন্তব্য অবশ্য সঠিক নয় পুরোপুরি)। যেহেতু প্রতিটি মানুষের পক্ষে এ ধরনের চরম কষ্ট স্বীকার সম্ভব নয়, তাই সে-অসামর্থ্যের ক্ষতি পূরণ করেন তারা মহৎ কর্মাদির দ্বারা। নিজেদের ইচ্ছাপত্র মধ্যেই তারা উত্তরাধিকারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে যান যাতে তার মৃত্যুর পর তারা দান-ধ্যান করেন ব্রাহ্মণদের। এ দান এমন পরিমাণ হওয়া চাই যাতে তারা তুষ্ট হয়ে সদগতি প্রার্থনা করে তার। এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিধাতা যেন অতি ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তি রূপে জন্ম নির্দেশ করেন তার।

১৬১১-র জানুয়ারীতে সুরাটে মারা গেলেন ডাচ কোম্পানীর শরাফ বা মুদ্রা-বিনিময়কারী মোনদাস (সম্ভবতঃ মোহনদাস) পারেখ (পারেখ=মুদ্রা পরীক্ষক)। ছিলেন তিনি যেমন ধনী, তেমনি অতি দানশীল। শুধু পৌত্তলিক-দেরই নয়, খ্রীষ্টানদেরও প্রচুর দিয়ে গেছেন তিনি জীবদ্দশা কালে। সুরাটের শ্রদ্ধেয় কপুচিন ফাদাররা বছরের একটা অংশ কাটিয়ে দিতেন তার পাঠানো চাল, মাখন, তরিতরকারী খেয়েই। মাত্র চার কি পাঁচদিন রোগ ভোগ করেন বেণিয়াটি। ওই সময়ে এবং তার মারা যাবার পর আট-দশ দিন ধরে বিতরণ করলেন তার ভাইরা না থেকে দশ হাজার টাকা। সাধারণ কাঠের সঙ্গে চন্দন ও অগুরু সহ শব সৎকার করলেন তার। করা হল এ সব এই বিশ্বাস নিয়েই যে এর সুবাদে তাদের ভাইয়ের আত্মা জন্ম নেয়ার সুযোগ পাবে কোন না কোন

বিরাট একজন অভিজাত হয়ে। এদের ভেতর এমন মূর্খও আছে কতক, যারা নিজেদের জীবদ্দশা কালে ধন-সম্পদ পুঁতে রেখে যায় মাটির নিচে। দৃষ্টান্তরূপে নাম করা যেতে পারে আসাম রাজ্যের ধনীদের। তারা প্রায় প্রত্যেকেই ক'রে থাকেন এমনটি। কারণ হল, পরজন্মে যদি কোন দরিদ্র কি নিঃস্ব ভিখারির ঘরে জন্ম নিতে হয় তাহলে সেই অভাবের দিনগুলিতে খরচ-খরচার অভাব মেটান যাবে এই আগাম রেখে যাওয়া পুঁজি থেকে কিছু কিছু নিয়ে। এ জন্যেই মাটির নিচে পোঁতা অবস্থায় সোনা-রূপা-রকমারি হীরেজহরৎ পাওয়া যায় ভারতে এত বেশি। যদি কোন পৌত্তলিক মাটির নিচে পুঁজি রেখে না যায় বুঝতে হবে ছিল সে সত্যি সত্যিই গরিব। মনে পড়ছে, ভারতে থাকা কালে একদিন কিনছি আমি আমাদের রূপোর বেকারের আকারের ও দু ইঞ্চি কানা উঁচু একটি অকীক পাথরে গড়া বাটি ৬০০ টাকা দিয়ে। বিক্রেতা আমায় জানালেন, গত চল্লিশ বছর ধরে মাটিতেই পুঁতে রেখেছিলেন তিনি এটিকে মৃত্যুর পর নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর টাকা কিংবা বাটি যা-ই পুঁতে রাখুন না কেন সবই এক কথা। শেষ বারের ভ্রমণ পর্বে এই পৌত্তলিক-দেরই একজনের কাছ থেকে কিনি আমি প্রতিটি ৬ গ্রেণ মতো ওজনের বাষট্টিটি হীরে। এতগুলি চমৎকার হীরের এমন একটি সুন্দর থোক কি ক'রে সংগ্রহ করল, আশ্চর্য হয়ে সে-প্রশ্ন তার কাছে তুলতে সে আমায় জানাল যে প্রায় পঞ্চাশ বছর লেগেছে তার এগুলি সংগ্রহ করতে। আর, করেছিল তা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পুঁজি রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অবস্থায় পড়ে আর্থিক সংকট মেটাবার দরুন নেহাৎই বাধ্য হচ্ছে এগুলি বেচে দিতে এখন। এরূপ পুঁতে রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ এক সময়ে অশেষ উপকারে এসেছিল বিজাপুর ও মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ রাজা শিবজীর। বিজাপুর রাজ্যের কল্লিয়ান বোন্দি (কল্যাণ-বিহন্দী) নামের ছোট শহরটি যখন দখল করলেন রাজা, তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে তিনি গুপ্তধন খুঁজে চললেন শহরটির একাংশ পুরোপুরি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে। ব্রাহ্মণরা জোর দিয়ে বলে-ছিলেন প্রচুর গুপ্তধন মিলবে সেখানে। পাওয়া গেল সত্যি সত্যিই ঐভাবে বিপুল ধন-সম্পদ; তা দিয়ে পুষে চলেছিলেন তিনি তিরিশ হাজারেরও বেশি সেনার আপন বাহিনীটিকে। এ জাতীয় মূর্খামির জন্য পৌত্তলিকদের কোন কিছু বলা বৃথা। মোটেই কান দেবে না তারা আপনার যুক্তিতে। চলে আসা

প্রাচীন রীতি-প্রথা সংস্কারের কাছে তারা তাদের বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞানকে বন্ধক রেখেছে পুরোপুরি।

সাত ॥ পৌত্তলিকদের শব-সংস্কার রীতি

মৃত্যুর পর দেহটিকে পুড়িয়ে ফেলার পৌত্তলিক প্রথাটি অতি সুপ্রাচীন। সাধারণতঃ নদী তটে সমাধা করা হয় এ কাজটি। জীবনকালে যে-সব পাপ ধুয়ে ফেলার অবকাশ পায়নি মৃত ব্যক্তিটি তা থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য এ সময়ে স্নান করিয়ে নেয়া হয় তার দেহটিকে। এই কু-সংস্কার এত গভীর পর্যন্ত শিকড় গেড়েছে যে মৃত্যু ঘনিয়ে এলে বেশির ভাগ সময়েই মরণাপন্নকে নিয়ে আসা হয় নদী কিংবা পুকুর ঘাটে; পা দুখানি নামিয়ে দেয়া হয় জলে। শেষের ক্ষণটি যতই ঘনিয়ে আসে ততই দেহটিকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেয়া হয় জলের ভেতর। শেষমেশ হাত দিয়ে ধরে চিবুক পর্যন্ত অংশটুকুই যা তুলে রাখা হয় জলের ওপরে। যাতে মৃত্যুক্ষণে আত্মা দেহ ছাড়ার মুহূর্তে আত্মা ও দেহ দুই-কেই জলে ডুবিয়ে পুণ্য স্নান করিয়ে সর্ব পাপ মুক্ত ক'রে দেয়া যায় সেজন্যই এ প্রক্রিয়া। পরম লগ্নে দেয়া হয় সেজন্য পুরো দেহটিই জলে ডুবিয়ে। তারপর ওই নদী বা পুকুর পাড়েই করা হয়ে থাকে শব সৎকার। ওই সৎকার স্থানটি সব সময়েই কোন না কোন মন্দিরের কাছ ঘেঁষে। (এ সম্পর্কে বাঙলায় চলিত রীতির জন্য বার্নিয়ারের বিবরণ ও ওয়ার্ডের 'দি হিন্দু' দেখুন)। পৌত্তলিক কেউ মারা গেলে যারা তার আপন বর্ণ কিংবা গোষ্ঠীর লোক তারা সকলে এসে জমা হন তার বাড়িতে। ব্যক্তিটির সামাজিক মর্যাদা ও রেখে যাওয়া সম্পদের সঙ্গে মানানসই ভাবে কতক সরেস কাপড় দিয়ে দেহটিকে ঢেকে একটি ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে চলা হয় সৎকারের স্থানে। উপস্থিত সকলে চলেন তার পিছু পিছু। যাদের ডুলিটি বয়ে চলার দায়িত্ব দেয়া হয় তারা বয়ে চলেন তা। প্রার্থনা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে, রাম-রাম ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলে সবাই। একজন ছোট্ট একটি ঘণ্টা বাজিয়ে পথে সচেতন ক'রে চলে সবাইকে মৃতের সদগতি কল্পে প্রার্থনা জানানোর জন্য। নদী বা পুকুর পাড়ে

পৌছনোর পর জলে ডুবিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে তারপর পুড়িয়ে ফেলা হয় মৃত-দেহটিকে। এ রীতি পালন করা হয়ে থাকে তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে। তার বিবরণ পরের অধ্যায়ে শোনাচ্ছি আপনাদের। পোড়ানোর বেলা সাধারণ কাঠের সঙ্গে যোগ করা হয় মৃতের আর্থিক অবস্থা অনুসারে কতক পরিমাণ চন্দন বা অন্যান্য সুগন্ধি কাঠ।

শুধু যে মৃতকেই সংকার করে পৌত্তলিকরা তা নয়। তাদের কুসংস্কারের নির্মমতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে সংকার করে তারা জীবন্তকেও। সাপকে মারার বেলা কুঁকড়ে যায় তারা। বিরাগ ছারপোকাটিকে মারতে পর্যন্ত। অথচ এতটুকু দ্বিধা দেখা যায় না তাদের মধ্যে জীবন্ত মহিলাকে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারতে। এর বেলা, মনে করে তাকে বিরাট মহৎকাজ, পুণ্যের কাজ বলে।

আট ॥ স্বামীহারা পত্নীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে কোন পুরুষ মারা গেলে আবার বিয়ে করার সুযোগ পায় না তার বিধবা পত্নী। এটিও তাদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা প্রথা। তাই, স্বামী মারা গেলে তাকে স্মরণ ক'রে স্ত্রীর শোক ক'রে চলা ভিন্ন কিছুই করার থাকে না আর। মৃত্যুর দিন কয়েক পর কামিয়ে দেয়া হয় তার কেশদাম। যে-সব অলংকার দিয়ে এতকাল নিজেকে তিনি মনোহর দর্শন ক'রে তুলতেন বর্জন করতে হয় তাও। অবশিষ্ট জীবন কাটাতে হয় তাকে সব রকম সহানুভূতি বঞ্চিত অবজ্ঞার পাত্র হয়ে। যে-গৃহে ছিলেন তিনি ইতিপূর্বে কর্ত্রী সেখানেই কাটাতে হয় তাকে কেনা বাঁদীর চেয়েও করুণ অবস্থায়। এই মর্মান্তিক পরিণতি স্বভাবতই জাগিয়ে তোলে তার মনে জীবন-বিতৃষ্ণা। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে, অপমান ও কলঙ্কের ভাগী হবার চেয়ে, বাঞ্ছিত হয়ে ওঠে তার কাছে মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় চেপে জীবন আহুতি দেয়া। এ হল এক দিকের ছবি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণরাও প্ররোচিত ক'রে তোলেন তাদের। এভাবে মৃত্যুবরণ ক'রে নিলে অপর জগতে আবার

তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটবে, পাবেন সেখানে অতীত জীবনের তুলনায় অনেক বেশি . সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গৌরব ভোগের সুযোগ, শোনান তাদের এসব রঙীন প্রলোভনের বাণী। তখন, দুই কারণ থেকেই, এইসব অসুখী মহিলারা সিদ্ধান্ত নেয় স্বামীর মৃতদেহের-সঙ্গে নিজেও অনলে জীবন আহুতি দেয়ার জন্য। পুরোহিতরা এ সময়ে তাদের আরো অনুপ্রাণিত ক'রে তোলেন এই বলে যে, স্বামীর সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঠাঁই নিলে আত্মা দেহ ছেড়ে বিদায় নেয়ার আগেই আবির্ভূত হবেন তার সুমুখে স্বয়ং ঈশ্বর (রাম), মূর্ত করবেন এক অপরূপ অলৌকিক জগৎ। তারপর, জন্ম-চক্র শেষে পাবে সে অনন্তকালের জন্য অপার আনন্দ ও গৌরব ভোগ ক'রে চলার সুযোগ।

স্থানীয় শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া পারে না কোন মহিলাই মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে। যে-সব শাসনকর্তা মুসলমান তারা পরম বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার চোখেই দেখে থাকেন এই বীভৎস প্রথাটিকে। সহজে রাজী হন না এজন্য অনুমতি দিতে তাই (এ প্রথা রোধ করার মুঘল প্রয়াস সম্পর্কে ওভিংটন বার্নিয়ার দেখুন)। অন্যপক্ষে, সহমরণে যাবার সাহস বা আকাঙ্খা না দেখানোর জন্য, স্বামীর প্রতি তিনি অনুরাগিনী নন এরূপ দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সারা জীবন লাঞ্ছনা ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু যা নিঃসন্তান স্বামীহারা-দেরই। কেননা, যে-সব বিধবাদের সন্তান রয়েছে তাদের কোন অবস্থাতেই অনুমতি দেয়া হয় না সহমরণের। এর সপক্ষে প্রথাগত বাধ্য-বাধকতা ছাড়াও বিধান রয়েছে সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যত্ন নেয়ার প্রয়োজনে বেঁচে থাকার জন্য। অন্যান্য যাদের সহমরণে যাবার আবেদন শাসনকর্তা দৃঢ় ভাবে নাকচ ক'রে দেন তারা অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে চলে কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনা ও সেবাব্রত অবলম্বন ক'রে। দেখা যায় এদের একাংশকে প্রধান রাজপথের পাশে শিম সহযোগে জল ফুটিয়ে চলতে। পথচারীদের পানের জন্য বিতরণ করে তারা তা। কিংবা ধূম-পানকারীদের তামাক ধরিয়ে দেয়ার জন্য সর্বক্ষণ অপেক্ষা ক'রে চলে আগুন নিয়ে। কতক আবার ব্রত নেয় ষাঁড়-গরু-মোষের মল মধ্যে থাকা অ-জীর্ণ শস্য কণার ওপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণের জন্য কিংবা ক'রে চলে তার চেয়েও উদ্ভট কিছু।

সহমরণে অনুমতি দানে শাসন কর্তার সবরকম আপত্তি সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্ররোচিত স্বামীহারারা সরে যেতে চায় না তাদের

নারকীয় নিষ্পত্তি থেকে। অটল থাকে ঐরূপ বীভৎস রাতিতে জীবন বিসর্জন সঙ্কল্পে। এক্ষেত্রে, আপন সচিবের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে শাসনকর্তা যখন নিশ্চিত হন যে অনুমতির জন্য ঘুষ পাওয়া গেছে, শেষ পর্যন্ত তখনই অনুমতি দেন তিনি যা খুশী তাই করার। স্বামীহারার সঙ্গে আসা পৌত্তলিকদের দিকে তাকিয়ে তখন তিনি উষ্মার ঝিলিক তুলে গর্জে ওঠেন-'জাহান্নামে যাও সব।'

অনুমতি মেলার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় তাদের নানা রকম বাজনা। ঢাক-ঢোল-বাঁশী ও আরো ক'তক সুরেলা যন্ত্রের ঐকতান। ফিরে যায় সকলে মৃতের আবাসে। সেখান থেকে যেমনটি আগে বলেছি ঐভাবে নিয়ে যাওয়া হয় পোড়ানোর জন্য মরদেহটিকে নদী বা পুকুর পাড়ে।

সহমরণের জন্য প্রস্তুত স্বামীহারা পরলোকে গিয়ে যে-সব সৌভাগ্যের অধিকারিণী হবেন সেজন্য আগাম অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেন এবার সমবেত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা। এরূপ মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবার ও সমগ্র গোষ্ঠীর মুখোজ্জ্বল করার জন্য, গৌরব বৃদ্ধির জন্যও শোনানো হয় স্তুতি প্রশংসা। সাজেন' স্বামীহারা বিবাহ-দিনটির সাজে। নিয়ে যাওয়া হয় ধুমধাম মহোল্লাসের সঙ্গে তাকে চিতাগ্নি-বেদীতে। শুরু হয় বাজনার মাতন, পিছু নেয়া মহিলাদের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মরণ আলিঙ্গনে এগিয়ে চলা হতভাগিনীর পরম প্রশংসা গীতি। সঙ্গে থাকা ব্রাহ্মণরা উদ্বুদ্ধ ক'রে চলে তাকে দৃঢ়তা ও সাহস দেখানোর জন্য। ইওরোপীয়দের অনেকেই মনে করেন, যার প্রতি মানুষ সহজাত ভাবেই বিরূপ সেই মৃত্যুর প্রতি ভয়ের ভাব দূর করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে তাকে কোন না কোন ধরনের উত্তেজক পানীয়। ফলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার চেতনা। তাই তাকে মৃত্যুগর্ভে ঠেলে দেয়ার জন্য ক'রে চলা এই আয়োজন স্বাভাবিক ভাবে তার মনে আতঙ্কের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কথা তা করতে পারে না আর। (দেয়া হত এজন্য ভাঙ দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের শরবৎ।)' এইসব হতভাগিনী রমণীরা এভাবে জীবন আহুতি দেবার সঙ্কল্প নিতে বাধ্য হন শুধু ব্রাহ্মণদের স্বার্থের বলি হিসাবেই। কেননা, তার দেহের যা-কিছু অলঙ্কার তার ওপর অধিকার জন্মায় সে পুড়ে মরার পর এই ব্রাহ্মণদেরই। তারা তখন ছাইয়ের গাদা হাতড়ে আত্মস্থ করে সেগুলো। মান মর্যাদা ও স্বচ্ছলতার তারতম্য অনুসারে সব মেয়েরাই পরে সাধারণতঃ সোনা কিংবা রূপার অলঙ্কার। যারা নেহাতই গরীব

-তাদেরই দেখা যায় শুধু তামা ও টিনের অলঙ্কার পরতে। সহমরণে যাবার কালে পরে না কেউই তারা রত্নালংকার।

বিভিন্ন রাজ্যে রীতির ভিন্নতা অনুসারে এই পুড়িয়ে মারার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতির অনুসরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে আমার। গুজরাট রাজ্যে এবং মোটামুটি ভাবে দিল্লী ও আগ্রায় শরণ নেয়া হয় নিচে বলা পদ্ধতিটির। নদী বা জলাধার প্রান্তে নল ও বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী কাঠ দিয়ে বানানো হয় প্রায় ১৩ ফুট বর্গাকার ছোটখাট একখানি কুঁড়ের মতো। যাতে সেটি অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেজন্য রাখা হয় কতক পাত্র ভবাট তেল ও অন্যান্য সামগ্রী। রমণীটি আধা-হেলান ভঙ্গিমায় ঠাঁই নেয় সেই কুঁড়েটির মাঝখানটিতে। মাথাটি থাকে বালিশের মতো সাজানো কাঠের পাঁজার ওপর। পিঠটি একটি কাঠেব খুঁটিতে। ব্রাহ্মণদের কেউ একজন তার কোমরটিকে বেঁধে দেয় ঐ খুঁটির সঙ্গে। পাছে আগুনের শিখার ঝলসানিতে সে পালাবার চেষ্টা করে, সেই আশঙ্কা থেকেই। ওই ভঙ্গিমায় বসে কোলের ওপর ধরে থাকে সে মৃত স্বামীর দেহটিকে, চিবিয়ে চলে সারাক্ষণ পাণ। প্রায় আধঘণ্টা খানেক এভাবে কাটার পর যে ব্রাহ্মণটি এতক্ষণ তার পাশে ছিল সে বেরিয়ে আসে কুঁড়েটি থেকে। মহিলাটি পুরোহিতকে তখন আহ্বান জানায় অগ্নি সংযোগের জন্য। উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনরা সাথে সাথে তৎপর হয়ে ওঠে সেজন্য। আগুন যাতে দ্রুত লেলিহান হয়ে ওঠে, মহিলাটি কম সময় যন্ত্রণা ভোগ ক'রে নিঃশেষ হতে পারে সেজন্য ছোঁড়া হয় তাতে পাত্র কয়েক তেল।

বাঙলা রাজ্যে অনুসৃত হয় ভিন্ন রীতি-পদ্ধতি। সে-দেশে সহমরণ পূর্বে মৃত স্বামী সহ গঙ্গাস্নান সেরে নেয়ার জন্য যদি কোন মহিলা না আসে বুঝতে হবে সে সত্যিই খুব গরিব। কুড়িদিনের পথ পাড়ি দিয়েও এজন্য তাদের আসতে দেখেছি আমি। ইতিমধ্যে শব পচে গলে শুরু করেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে। একজনকে দেখেছি, এসেছিল যে উত্তরদিককার ভুটান লাগোয়া অঞ্চল থেকে স্বামীর দেহটি নিয়ে এল মহিলা যানে ক'রে, নিজে এল পনের ষোল দিনের পথ অভুক্ত অবস্থায় পুরোপুরি পায়ে হেঁটে। গঙ্গাকূলে পৌছে স্বামীর শব দেহটিকে যখন স্নান করালে তখন ছড়িয়ে চলেছে তা থেকে উৎকট গন্ধ। নিজেও গঙ্গাস্নান সেরে নিয়ে যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে পুড়ে মরল তা দেখে অবাক বনে গেল

দর্শকরা। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। গঙ্গার সারা প্রবাহ পথের দুকূল জুড়ে এবং পুরো বাঙলা রাজ্যে জ্বালানীর নিদারুণ অভাব। ফলে এই সব হতভাগিনী মহিলারা চিতা সাজানোর কাঠ ভিক্ষার জন্য লোক পাঠায় চারিদিকে। চিতাটি সাজানো হয় ছোট ছোট কাঠ ও নল দিয়ে করা বালিশ সহ বিছানা মতো ক'রে। দেয়া হয় পাত্র কয়েক তেল ও অন্যান্য সামগ্রী, তাড়াতাড়ি পোড়াবার জন্য। সহমরণে যাবার জন্য সঙ্কল্প নেয়া মহিলাটি তার সেরা বস্ত্র-অলঙ্কারাদিতে সেজে, ঢাক-ঢোল-বাঁশি-সানাই-এর বাজনা সহ নাচের ভঙ্গিমায় এগিয়ে যায় চিতাশয্যার দিকে। ঠাঁই নেয় তার ওপরে আধা শোয়া আধা বসা ভঙ্গিতে। তার কোলের 'পরে শুইয়ে দেয়া হয় স্বামীর মৃত দেহটি। এগিয়ে আসে একে একে আত্মীয়-স্বজনেরা। কেউবা তার হাতে তুলে দেয় একখানি চিঠি, কেউবা একখানি কাপড়, কেউ কেউ ফুল, কেউ আবার একটি রূপা বা তামার মুদ্রা। অনুরোধ জানায় পরলোকে থাকা তার মা, বাবা, ভাই কি অন্য কোন প্রিয়জনের কাছে তার উপহার হিসাবে তা পৌছে দেবার জন্য। এই দেয়ার পালা ফুরিয়ে গেলে মহিলাটি তিনবার সমবেত সবাইকে প্রশ্ন করে, আর কেউ তার ওপর আর কোন কিছু কাজের ভার দিতে চান কিনা? কোন উত্তর না মিললে সেগুলিকে একখণ্ড তাফতা বস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে রেখে দেয় নিজের কোলের ওপর স্বামীর দেহ তলে। করে তারপর চিতায় আগুন ধরাবার জন্য আবেদন। আগেই বলেছি বাংলা রাজ্যে জ্বালানী কাঠের খুব অভাব। তাই, এইসব হতভাগিনীরা মারা গিয়ে কোন মতে আধপোড়া হতেই ফেলে দেয়া হয় দেহটিকে গঙ্গায়। ঐ সঙ্গে তার স্বামীর আধপোড়া দেহটিকেও। হয় সেখানে তারা কুমীরের খোরাক।

বাঙলার পৌত্তলিকদের মধ্যে চালু থাকা আরো একটি কুৎসিত প্রথার কথা না বলে পারছি না এখানে। জন্ম নেয়ার পর প্রায়ই দেখা যায় কোন কোন শিশু আগ্রহ দেখাচ্ছে না মায়ের বুকের দুধ খাবার জন্য। একটি চার কোণ গিঁট দেয়া কাপড়ের ঝোলায় ক'রে রেখে আসা হয় এদের গ্রামের বাইরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে। ওইভাবেই সেখানে পড়ে থাকে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যে। এর ফলে হতে হয় বেচারা শিশুটিকে কাকের শিকার। তারা ঠুকরে ঠুকরে অস্থির ক'রে তোলে তাকে, নেয় অনেক সময় তার চোখ খুবলে। এ কারণেই দেখা যায় বাঙলার পৌত্তলিকদের মধ্যে অনেকেরই একটি চোখ

কাণা, অনেকে আবার দুটিই হারিয়ে পুরোপুরি অন্ধ। সন্ধ্যেবেলা ওইসব শিশুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে রাতে পরখ ক'রে দেখা হয় এবার তারা মায়ের বুকের দুধ খেতে আগ্রহী কি না। না হলে, আবার তাকে ওইভাবে রেখে আসা হয় পরদিন সকালে। পরপর তিনদিন চলে এই প্রক্রিয়া। যদি এর মধ্যে তার মতির পরিবর্তন না হয় তবে ধরে নেয়া হয় সে কোন অপ-অস্তিত্ব, বিসর্জন দেয়া হয় তাকে গঙ্গায় কিংবা কাছাকাছি থাকা কোন নদী কি খাল-বিল-পুকুরে। যে-সব স্থানে বানর আছে সেখানে অবশ্য কাকদের অত জ্বালাতন সইতে হয় না শিশুটিকে। কেননা, কাকের বাসা চোখে পড়লেই বানররা তা ভেঙে দেয়, ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাদের ডিমগুলোকে এদিক ওদিক। অন্যদিকে ইংরাজ, ডাচ ও পর্তুগীজদের মধ্যে এমন হৃদয়বান কেউ কেউ আছেন যাদের মায়া জেগে ওঠে শিশুদের ঐ দশা দেখে। তারা নিয়ে আসে তাদের গাছ থেকে নামিয়ে, করে লালন পালন। হুগলীতে এর একটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সে ঘটনাটি ঘটেছিল তাদেরই কুঠীর কাছাকাছি।

শোনানো যাক এবার করমণ্ডল উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত সহমরণের রীতি-প্রথা। এজন্য খোঁড়া হয় সেখানে ২৫ থেকে ৩০ ফুট বর্গাকার ৯ বা ১০ ফুট গভীর একটি কুণ্ড। ফেলা হয় তার মধ্যে প্রচুর কাঠ এবং তা যাতে দ্রুত জ্বলে সে-জন্য নানা দাহ্য সামগ্রী। যখন খাদের আগুন ভালভাবে জ্বলে ওঠে তখন তার কিনারে আনা হয় স্বামীর মৃতদেহটি। তারপর পান চিবুতে চিবুতে নাচের ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসে তার স্ত্রী। তার পিছু নেয় সব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা, বেজে চলে ঢাক-ঢোল-করতাল। স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ করে ঐ অগ্নিকুণ্ডটিকে। প্রতিবারের পরিক্রমা শেষে আলিঙ্গন করে তার আত্মীয়-পরিজনদের। পূর্ণ পরিক্রমা সমাপ্ত হলে ছুঁড়ে দেন ব্রাহ্মণরা স্বামীর মৃতদেহটি ওই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে। স্ত্রী দাঁড়ায় তখন এসে অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, আগুনের দিকে পিছু মুখ ক'রে। ব্রাহ্মণরা ঠেলে দেয় তাকে, চিৎ হয়ে পড়ে যায় সে ওই লেলিহান আগুনের গর্তে। আত্মীয়-স্বজনরা ছুঁড়ে চলে তার মধ্যে তেল ভরাট পাত্র ও অন্যান্য নানা অগ্নি-উদ্দীপক সামগ্রী। এগুলি সাহায্য করে তাদের দেহ দ্রুত পুড়ে নিঃশেষ হতে। তবে, করমণ্ডল উপকূলের অধিকাংশ সকলেই আগুনে পুড়ে সহমরণে যান না পত্নীরা। স্বামীর মৃত-

দেহ সহ ঠাঁই নেয় একটি গর্তের মধ্যে।' তাদের দৈর্ঘের চেয়ে এক ফুট বেশি গভীর ক'রে খুঁড়ে দেয় এই গর্তটি ব্রাহ্মণেরা। নির্বাচন করা হয় এজন্য বালি-প্রধান কোন স্থান। স্বামী-স্ত্রীকে সেই গর্তে নামিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনবা প্রত্যেকে ঢেলে চলে তাদেব ওপর এক ঝোড়া ক'বে বালি। চলে এই প্রক্রিয়া যতক্ষণ না গর্তটি ভরাট হয়ে উঁচু হয় আরো আধ ফুট খানেক। এরপর সবাই মিলে নেচে-কুঁদে চলে তার ওপর। যখন নিশ্চিন্ত হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এতক্ষণে মারা গেছে মহিলাটি তখন ক্ষান্ত হয় তাতে।

করমণ্ডল অঞ্চলগুলিতে মরণ-আসন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় না অন্যান্য অঞ্চলেব মতো নদী কি পুকুব ঘাটে। এখানে তাব পাপ ধুয়ে-মুছে দেবাব জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সরাসরি যথাসম্ভব হৃষ্টপুষ্ট একটি গাইয়ের কাছে। * * * (শোধন করা হয় তাকে পঞ্চগব্য সহযোগে)।

যদি কোন গরু মবণাপন্ন হয়, মালিক বাধ্য হয সেটিকে নিয়ে যেতে নদী কিংবা পুকুর পাড়ে। নয় তো, বাড়িতে মারা গেলে ব্রাহ্মণরা চাপায় তার ওপর অর্থদণ্ড।

নয় || ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে জগন্নাথ মন্দির

শহর ও গ্রামের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোট বড় অসংখ্য মন্দির রয়েছে পৌত্তলিকদের। এগুলিকে বলে তারা প্যাগোডা। সেখানে, তাদের দেবতাদের কাছে জানায় তারা প্রার্থনা, করে স্তব-স্তুতি-পূজা-আরাধনা। তবে, যে-সব গরিব মানুষের দল শহর ও গ্রাম থেকে অনেক দূরে, বনে পাহাড়ে বাস করে তাদের কথা ভিন্ন। পাথরখণ্ড সংগ্রহ ক'রে তারই 'পরে হলুদ বা লাল রঙ দিয়ে কোন মতে একটি নাক ও একজোড়া চোখ ফুটিয়ে তাকেই পূজা-অর্চনা করে পরিবারের সবাই।

সব থেকে বেশি নাম-ডাক থাকা চারটি মন্দির বলতে বোঝায় জগন্নাথ, বনারস, মুত্রা (মথুরা) ও তিরুপতি।

জগন্নাথ হল গঙ্গানদীর একটি মোহনা-মুখের নাম। তারই কোলে গড়া

হয়েছে (জগন্নাথ ধামের) প্রসিদ্ধ মন্দিরটিকে। (প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার মোহনা থেকে বহু দূরে ওড়িশার বঙ্গোপসাগর কূলে পুরীতে)। পৌত্তলিকদের পুরোহিত প্রধান বাস করেন সেখানেই। এই মন্দিরটির ভেতরের আকৃতি এই রকমের : ক্রুশের আকারে বিন্যস্ত, একই আদলে গড়া অন্যান্য মন্দির-গুলির সঙ্গে এটির আয়তন আনুপাতিক ভাবে একই। মূল মণ্ডপের বেদীর ওপর থাকা প্রধান বিগ্রহটির দু চোখ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দুখণ্ড হীরে বসিয়ে। কোমরের কাছটিতে শোভা পাচ্ছে গলা থেকে ঝোলানো একটি পেনডেনট বা পদক। সেটিতে খচিত থাকা হীরেগুলির মধ্যে যেটি সবার চেয়ে ছোট সেটিও প্রায় ৪০ ক্যারাট ওজনের। বাহুতে তার বাহুবন্ধ। কতক মুক্তার, কতক চুনির। এই বিগ্রহটিকে বলা হয় কেশোর (কেশব রাঙ্গ বা কৃষ্ণ)। যে পরিমাণ অর্থ প্রণামী রূপে আদায় হয় এ মন্দিরটিতে তা প্রতিদিন পনের থেকে কুড়ি হাজার তীর্থযাত্রীকে অন্ন যোগানোর পক্ষে যথেষ্ট। এবং প্রায়ই এ পরিমাণ পুণ্য-পিপাসু আসে সেখানে। ভারতীয়রা এ মন্দিরটিকে দেখে থাকে পরম শ্রদ্ধার চোখে। তাই সব অঞ্চল থেকেই তীর্থ করার জন্য লোকে আসে এখানে। আসে রত্ন-ব্যবসায়ীরাও। কিন্তু দেয়া হয় না তাদের ভেতরে যেতে আজকাল। কেননা, মন্দির মধ্যে রাত কাটানোর অনুমতির সুযোগ নিয়ে করেছিল একজন বিগ্রহটির একটি চোখের হীরে খুবলে নিয়ে আত্মসাতের ফিকির। পরদিন সকালে মন্দির খোলার পর সে যখন সরে পড়ার চেষ্টা করে তখন নাকি মরণ কোলে ঢলে পড়ে মন্দির দুয়ারের কাছটিতে। তাকে চুরি অপরাধের শাস্তি দেয়ার জন্যই নাকি ঘটিয়েছিলেন এই অলৌকিক কাণ্ডটি দেবতা। গঙ্গার কূলে বিরাজিত বলেই লাভ করেছে এ মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। পৌত্তলিকদের বিশ্বাস, গঙ্গা নদীর রয়েছে একটি বিশেষ মাহাত্ম্য, এর জলে স্নান করলেই ধুয়েমুছে যায় মানুষের সব পাপ। এ মন্দিরটির সম্পদ মধ্যে রয়েছে বিশ হাজারের ওপর গরুও। এই বিপুল সম্পদের মূলে প্রতিদিন সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পুণ্যার্থীদের দেয়া পূজার্ঘ। এই পূজার্ঘ বা দান স্বেচ্ছানির্ভর নয় পুরোপুরি। পুণ্যাতুররা মাথা কামিয়ে, গঙ্গায় স্নান ক'রে, তাদের মানত পূরণ করার অনুষ্ঠানে ব্রতী হবার আগেভাগেই তাদের সামর্থ্য বিচার ক'রে সেই দেয়-র পরিমাণ ধার্য ক'রে দেন পুরোহিত প্রধান। কার কিরূপ আর্থিক অবস্থা তা যেন পুরোপুরি তার নখদর্পণে। এ

ভাবে বিপুল অর্থ পান তিনি। কিন্তু নিজের ভোগে লাগান না তা। পুরোটাই খরচ করা হয় দরিদ্রদের খাওয়াতে, মন্দিরের ব্যয় নির্বাহে। তীর্থযাত্রীদের বিতরণ করা হয় প্রতিদিন যার যেরূপ প্রয়োজন খাদ্য উপকরণ। ঘি, দুধ, চাল, ময়দা যা-কিছু। গরিবদের সাথে রান্নাবান্না করার মতো বাসনকোসন থাকে না বলে যোগানো হয় তাদের রান্না করা খাদ্য (এ বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ, এ বিষয়ে হেষ্টিংস ও হান্টারের বিবরণ দেখুন)। যে-সব গরিবের কাছে পাত্র নেই তাদের কিভাবে খাদ্য বাঁটা হয় তা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখার মতো। সকালের দিকে রকমারী আকারের মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হয়। বিতরণের বেলা ধর যদি 'পাঁচজনকে দিতে হবে, প্রধান ব্রাহ্মণ অপর' এক ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দেন সেই মতো এক হাঁড়ি অন্ন আনার জন্য। তিনি তখন হাঁড়িটিকে নিচে মাটিতে ফেলে দিতেই ভেঙে হয়ে যায় ঠিক সেটি পাচটি ফালি। দিয়ে দেয়া হয় তা পাঁচজনকে। সব সময়েই এরকম সংখ্যা অনুযায়ী হাঁড়িগুলিকে ভেঙে ফালি ক'রে বেঁটে চলা হয় তা। একই মাটির হাঁড়িতে কখনো দুবার রাঁধে না ব্রাহ্মণরা, তামার হাঁড়ির বেলা অবশ্য সে নিয়ম নেই, রাঁধা যেতে পারে তাতে যতবার খুশী। থালা হিসাবে ব্যবহার করে আখরোট পাতার চেয়ে বড় বড় আকারের গাছের পাতাকে কাঠি দিয়ে গেঁথে থালার আকার ক'রে নিয়ে তাই। ঘি গলানোর জন্য ব্যবহার করে অবশ্য তারা এক ফুটের কাছাকাছি ব্যাসের এ ধরনের থালা। খাবার বেলা ভাতের গরাস-কে আঙুলে নিয়ে সেই ঘিয়ের ভেতর ডুবিয়ে তার পর মুখে পোরে। নেয় এছাড়া একটি ছোট চামচও, খায় তা দিয়ে তুলে তুলে ঘি, ঠিক যেমনটি ভোজের পর চুমুক দিয়ে চলি আমরা স্প্যানিশ মদিরায়, সেই কায়দায়।

জগন্নাথের মন্দিরটির বেদীর ওপর থাকা বিগ্রহটি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বিবরণ দেয়া যাক এবারে। বিগ্রহটির ঘাড় থেকে নিচু পর্যন্ত ঢাকা থাকে বেদীর ওপর থেকে ঝোলানো একটি মনোহর দর্শন আবরণী দিয়ে। উৎসবাদির রকমফের অনুযায়ী কখনো এটি সোনার কখনো বা রূপার কিংখাব দিয়ে তৈরি। গোড়ার দিকে এ বিগ্রহটির না ছিল কোন হাত, না ছিল কোন পা। তার যে কারণ ব্যক্ত করা হয়ে থাকে তা এ রকমটি। তাদের এক ঋষির স্বর্গ লাভ ঘটল একদিন। তাকে হারিয়ে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল সকলে। তাই দেখে বিধাতা তারই মতো দেখতে এক দেবদূতকে পাঠাল স্বর্গ থেকে

তাদের কাছে। তাকে পেয়ে মহা আদর যত্ন সম্মান ক'রে চলল সবাই। দেবদূতটি গড়ে চলছিলেন এই বিগ্রহটিকে। কিন্তু সেটি তাকে সম্পূর্ণ করতে দেয়ার মতো ধৈর্য্য দেখাতে পারল না তারা। বিগ্রহটির হাত-পা তখনো পর্যন্ত গড়া না হওয়া সত্বেও সেইভাবেই এনে স্থাপনা করল তাকে মন্দিরে। মূর্তিটি যেহেতু পূর্ণাঙ্গ নয় তাই তার হাত দুটি বানিয়ে নিয়েছে তারা যাকে আমরা বলি 'Pearl by the ounce' বা 'Seed Pearl' সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মুক্তো দিয়ে। পা দুটির বেলা তা আবরণীতে ঢাকা থাকে বলে পড়ে না কারো চোখে। আসলে, দু-হাত ও মুখটি ছাড়া দেহের কোন অংশই অনাবৃত নয় তার। তয়ের করা হয়েছে সেটিকে চন্দন কাঠ দিয়ে। গম্বুজ বা চূড়া বিশিষ্ট সুউচ্চ মন্দিরটির বাইরের গায়ে ভিত থেকে চূড়া পর্যন্ত অসংখ্য কুলঙ্গি। রয়েছে তাতে নানা রকমের বিগ্রহ। বেশির ভাগই তার বিভিন্ন রঙা পাথর কুঁদে তৈরি বীভৎস দৈত্য আকৃতির। এই বড় দেউলটিকে ঘিরে রয়েছে চারিদিকে আরো কতক দেউল। সেগুলি বেশ ছোট ছোট। সেখানেও ঘুরে ঘুরে অল্পস্বল্প পূজা দেয় পুণ্যাতুররা। যারা রোগ নিরাময় বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কোন বিশেষ দেবতার কাছে মানত করেছে, নিয়ে যায় সেই বিশেষ দেব-দেউলে তার মূর্তি কিংবা যে-বিশেষ বস্তু দেবতা তাদের দিয়েছেন বলে মনে করে তারই প্রতিকৃতি। (কেশব রাঈ-এর) মূর্তিটিকে প্রতিদিন মাখানো হয় সুগন্ধি তেল। ফলে বনে গেছে তার রঙ কুঁচকুঁচে কালো। তার ডান দিকটিতে রয়েছে বোন সোতোরা (সুভদ্রা)-র মূর্তি। বাঁয়ে, ভাই বলবদের (বলভদ্র)-এর মূর্তি। দুটিই দাঁড়ানো ভঙ্গিমার এবং বেশভূষায় সাজানো। (প্রকৃত পক্ষে মাঝে সুভদ্রা, বামে কেশবরাঈ বা জগন্নাথ এবং ডাইনে বলভদ্র বা বলরাম)। আর, প্রসিদ্ধ এই বিগ্রহটির সুমুখ ভাগে, কিছুটা বাঁদিক ঘেঁষে দেখা যাবে তার পত্নীর মূর্তি-টিকে। নাম তার কেমুই (সম্ভবতঃ কামিনী বা রুক্মিণী)। নিরেট সোনায় তৈরি এ মূর্তিটিও দাঁড়ানো ভঙ্গিমায়। অন্য তিনটি মূর্তিই চন্দন কাঠের।

অন্য দেউল দুটি বানানো হয়েছে বড় দেউলটির পুরোহিত প্রধান ও অন্যান্য পুরোহিতদের বাসের জন্য। এই পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরা সকলেই চলাফেরা করে নাঙা মাথায়। অধিকাংশেরই মাথা কামানো। পোশাক বলতে সর্বমোট একখানি কাপড়। তারই আধেক ড্রয়ারের মতো কোমরে গিঁট দেয়া, আধেক প্যাঁচ দিয়ে গায়ে জড়ানো। দেউলটির কাছেই রয়েছে কবীর নামের জনৈক

সন্তের সমাধি গৃহ। তাকে গভীর শ্রদ্ধা করেন এরা ('পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবির্ভূত হন এই সন্ত ও প্রসিদ্ধ কবি)। একটি কথা জানাতে ভুলে গেছি এতক্ষণ। যে-সব বিগ্রহের কথা বললাম সেগুলি যাতে প্রধান পুরোহিত নির্দিষ্ট বিশেষ কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ ছুঁতে না পারে সেজন্য কিন্তু জাফরি ঘেরা এক ধরনের বেদীর ওপর বসানো।

দশ ॥ ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে বনারসের মন্দির

জগন্নাথের পরই সারা ভারত মধ্যে সব থেকে প্রসিদ্ধ বনারসের মন্দিরটি এটিও গঙ্গার কূলে বিরাজিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে সমান পবিত্র রূপে। এ মন্দিরের যে বৈশিষ্ট্যটি বেশি ক'রে চোখে পড়ে তা হল, মন্দিরটির দরজা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত নেমে গেছে ধাপ ধাপ লম্বা সিঁড়ি। মাঝে মাঝে এক একটি ধাপ চত্বরের মতোই চওড়া। রয়েছে তার পাশে অন্ধকার-প্রায় ছোট ছোট কুঠুরি। এর কোনটি ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করেন থাকার জন্য, কোনটি রাঁধা-বাড়ার জন্য। কেননা, স্নানান্তে স্তব পাঠ ও মন্দিরে পূজো দেয়া সেরে ক'রে থাকে পৌত্তলিকরা অন্য কাউকে ছুঁতে না দিয়ে নিজের হাতেই নিজের যা কিছু রান্না বান্না। ভয়, অন্য কেউ ছুঁয়ে দিলে হয়ে যাবে তা অপবিত্র। এর চেয়েও বড় কথা তারা বিশেষভাবে গঙ্গাজল পানে আগ্রহী। আগেই জানিয়েছি, তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এ জল পান করলেই উবে যাবে তাদের সব অপকর্মের অপরাধ। প্রতিদিন দেখা যাবে, অগুণতি ব্রাহ্মণ এক বালতি মতো জল ধরে এমন আকারের মাটির কলসীতে ক'রে নদীটির নির্মলতম স্থানটি থেকে ভরে নিয়ে চলেছে তার জল। ওই ভরাট কলসীগুলি প্রধান পুরোহিতের কাছে আনা হলে তার নির্দেশে বাঁধা হয় তার মুখ তিন কি চার ভাঁজ দেয়া একখণ্ড আগুন রঙা মিহি কাপড় দিয়ে। তারপর দেয়া হয় তাতে তার মোহর ছাপ। কাঠের ছিলকার মতো সমতল ও সরু একটি ছড়ির (বাঁক) ডগায় ঝোলানো ছটি ছোট দড়ির এক একটিতে এক একটি কলসী ঝুলিয়ে সেগুলি তখন বয়ে নিয়ে চলে ব্রাহ্মণরা কখনো কখনো তিন চারশো কোশ অব্দি। তারপর বেচে দেয় সেগুলি।

নয়তো দরাজ হাতের পুরস্কারের আশায় উপহার দেয় বেছে বেছে বিরাট অবস্থাপন্নদের। কতক পৌত্তলিক যে-কোন উৎসব কালে এবং বিশেষ ক'রে সন্তানদের বিবাহকালে ৪০০ কি ৫০০ ক্রু খরচ ক'রে কিনে পর্যন্ত পান করে এ জল। ইওরোপে আমরা যেমন হাইপোক্রাস বা মাসকত পান করি তেমনি ভোজের শেষে কেবল পান করা হয় তা এক কাপ কি তুকাপ যেমনটি বিতরণ করা গৃহস্বামীর ক্ষমতায় কুলোয় সেই মতো। যে প্রধান কারণটির জন্য গঙ্গা-জলের এত কদর তা হল, এ জল দূষিত হয় না কখনো, জন্ম দেয় না কোন বীজাণু কীটের। তবে, যে পরিমাণ মৃতদেহ নিয়মিত গঙ্গাগর্ভে ঠাঁই পায় তা স্মরণ ক'রে তাদের একথা বিশ্বাস করা উচিত হবে কিনা বলা বেশ শক্ত।

ফিরে আসি দেউলটির প্রসঙ্গে। এটির গড়ন শৈলীও অন্যান্য সব দেউলের মতোই। ক্রুশের আকৃতি সম্পন্ন এবং চারটি বাহুই সমান। অনেকটা মিনারের মতোই মাঝ থেকে ওপর দিকে মাথা তুলেছে সুউচ্চ একটি চূড়া। তার অসংখ্য ভুজ শেষ পর্যন্ত মিশেছে গিয়ে একটি বিন্দুতে। এছাড়াও দেউলটির (চার বাহুর) প্রতিটি বাহু প্রান্তে রয়েছে আরো একটি ক'রে চূড়া। চড়া যায় সেগুলিতে বাইরের দিক থেকে। শীর্ষ পর্যন্ত রয়েছে অনেকগুলি কুলঙ্গি, আছে কয়েকটি অলিন্দও। করা হয়েছে এগুলি মুক্ত বায়ু আহরণের সুবিধার জন্য। সমগ্র চূড়াটির গা জুড়ে খোদাই ভাস্কর্য রীতিতে স্থূলভাবে রূপায়িত করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীমূর্তি। এই মূল চূড়াটির নিচে, দেউলটির ঠিক মধ্যবিন্দুতে রয়েছে সাত কি আট ফুট লম্বা ও পাঁচ কি ছফুট চওড়া টেবিল আকৃতির একটি বেদী। সামনের দিকটিতে তার তুটি সোপান। সোপান তুটির ওপরে বিছানো থাকে সুন্দর কারুকার্যময় একটি আচ্ছাদনী। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে কখনো সেটি সোনার কখনো বা রেশমের। বেদীটির ওপর বিছানো থাকে সোনা বা রূপার কিংখাব বস্ত্র, নয়তো কোন সুন্দর চিত্রিত বস্ত্র। দেউলটির বাইরে থেকেই দেখতে পাবেন আপনি এই বেদীর 'পরে বিরাজমান বিগ্রহগুলিকে। এভাবে বিগ্রহগুলিকে স্থাপিত করার কারণ, এক বিশেষ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য আর কোন সম্প্রদায়ের নারী ও মেয়েদের যেতে দেয়া হয় না দেউলটির ভেতরে, প্রণাম জানাতে হয় দেবতাদের বাইরে থেকেই। বিগ্রহ-গুলির মধ্যে একটি পাঁচ কি ছ ফুট উঁচু। দেখতে পাবেন না তার হাত-পা ধড় কোন কিছুই। মাথা আর ঘাড়টুকুই চোখে পড়বে যা। দেহের বাকি অংশ

বেদীটির নিচে ক্রমশঃ চওড়া একটি পোশাক দিয়ে ঢাকা। কখনো কখনো শোভা পায় তার গলায় সোনা, চুনি, মুক্তা বা পান্নার দামী রত্নমালা। তৈরি করা হয়েছে এ মূর্তিটি বইনমাদো (বেণীমাধব)-এর সম্মানে তারই আদলে। ইনি অতীতকালের একজন বিরাট ও পবিত্র ব্যক্তি, প্রায়ই এদের মুখে শুনতে পাবেন উচ্চারিত হতে তার নাম। বেদীটির দক্ষিণ প্রান্তে দেখা যাবে একটি প্রাণীমূর্তি। ঠিক প্রাণী না বলে কাইমিয়্যারা বা কাল্পনিক কিম্ভূত জীব বলাই সঙ্গত। নিরেট সোনা দিয়ে গড়া আংশিক হাতি, আংশিক ঘোড়া এবং আংশিক খচ্চর এই জীবটির নাম গরউ (গরুড়)। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকেই যেতে দেয়া হয় না এটির কাছে। বলা হয়ে থাকে, ওই পবিত্র ব্যক্তি (বেণীমাধব বা বিষ্ণু) জীবিত থাকা কালে ব্যবহার করতেন একেই তার বাহন রূপে। দেউলটির প্রবেশ-পথে, প্রধান দ্বার ও মূল বেদীটির মাঝামাঝি এলাকায় বাঁদিক ঘেঁষে আরেকটি ছোট বেদী। দেখা যাবে তার ওপরে কালো মর্মরে তৈরি একটি বিগ্রহ। প্রায় দু ফুট মতো উঁচু। দু পা আড়াআড়ি ভাবে মুড়ে বসে আছেন তিনি। আমি যখন দেউলটিকে দেখতে যাই তখন এই মূর্তিটির বাঁদিকে বসে ছিল একটি ছোট্ট ছেলে। পুরোহিত প্রধানের পুত্র সে। যে-ই দর্শনের জন্য সেখানে আসছিল ছুঁড়ে দিচ্ছিল তার দিকে রুমাল আকারের একখণ্ড ক'রে তাফতা কিংবা কিংখাব। সেটি দিয়ে মূর্তিটিকে মুছিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল তা আবার ছেলেটি তার মালিককেই। কেউ কেউ ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রাকৃতিক সুগন্ধ যুক্ত ছোট সুপুরির আকারের পুঁতির মালা (রুদ্রাক্ষের মালা)। এগুলি পৌত্তলিকরা গলায় দেয়, প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ কালে তা পুনরাবৃত্তি ক'রে চলে প্রতিটি পুঁতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কেউবা ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রবাল বা হলুদরঙা অম্বরের মালা। কেউবা ফল ও ফুল। যে যা দিচ্ছিল তা-ই ছেলেটি বিগ্রহটির অঙ্গে ছুঁইয়ে ও চুমু দেয়ার জন্য তার মুখে ছুঁইয়ে ফিরিয়ে চলছিল আবার মালিককে। বিগ্রহটির নাম মুরলী রাম (মুরলীধর বা কৃষ্ণ)। সে মূল বেদীটির ওপর থাকা বিগ্রহটির ভাই। (বিশ্বেশ্বর মন্দির রূপে প্রসিদ্ধ এই শিব মন্দিরটি ১৬৬৯ অব্দে ধ্বংস করা হয় ঔরঙ্গজেবের আদেশে। গড়া হয় তার পরিবর্তে সেখানে পঞ্চগঙ্গা ঘাটের মসজিদটি মন্দিরের মালমশলা দিয়েই। এ কারণে লেখকের দেয়া মন্দিরটির এই বিবরণ অতি মূল্যবান।)

দেউলটির প্রধান প্রবেশদ্বারের নিচে বসে আছেন প্রধান ব্রাহ্মণদের

একজন। কাছে তার একটি বড় থালা ভরাট জলে গোলা হলদে রঙের কাথ। গরিব পৌত্তলিকদের প্রত্যেকেই একের পর আর দাঁড়াচ্ছিল গিয়ে তার সুমুখটিতে। তিনিও ওই রঙ দিয়ে এঁকে দিচ্ছিলেন তাদের কপালে, দু চোখের মধ্য বিন্দু থেকে নাকের শেষ সীমা পর্যন্ত তিলক। এঁকে দিচ্ছিলেন দু বাহু আর বুকেও তা। যারা গঙ্গায় স্নান করেছে এই চিহ্নগুলি থেকেই চেনা যায় তাদের। যারা বাড়ির ভেতর কুয়োর জলে বা নদী থেকে বয়ে আনা জলে স্নান করে, তারা পুরোপুরি পবিত্র নয় বলে নিজেদের রঞ্জিত করতে পারে না এভাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, পৌত্তলিকরা তাদের বর্ণ বা জাত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রঙে কাটে এই তিলক। মহামহিম মুঘল সম্রাটের রাজ্যে যারা হলুদ রঙ দিয়ে তিলক কাটে তারাই হল বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে কম অপবিত্র। প্রাকৃতিক নিত্যকর্ম সমাধানের বেলা অন্যরা শুধু এক পাত্র জল সঙ্গে নিয়েই তুষ্ট, তা দিয়েই নিজেদের ধৌত করে তারা। কিন্তু এরা সেই সাথে নেবে সর্বদা এক মুঠো বালিও। প্রথমে তাই দিয়ে দেহ ঘষবে, তারপর করবে স্নান। যাতে তারা বলতে পারে তাদের দেহ পবিত্র, কোন অপবিত্র কিছু নেই শরীরে লেগে এবং নিঃসংশয় চিত্তে ভাতের গরাস মুখে তুলতে পারে সেজন্যই এত সব।

এই বড় দেউলটির পাশেই, গ্রীষ্ম ঋতুর মাঝামাঝি কালে যে দিকটি থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায়, সেখানে বর্তমান একটি কলেজ গোত্রীয় বিদ্যাকেন্দ্র। মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে বর্তমান সব থেকে প্রতাপশালী পৌত্তলিক রাজা জয় সিংহ গড়ে দিয়েছেন এটি। ভদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্য। (পরে ১৬৯৩-এ বনারসের প্রসিদ্ধ মানমন্দিরটিও গড়েন তিনি)। রাজার পুত্রদের দেখলাম সেখানে। কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে বিদ্যাচর্চা ক'রে চলেছে তারা। এমন একটি ভাষায় লিখতে ও পড়তে শেখান তারা যেটি দেবার্চনা-কারী পুরোহিতদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত (সংস্কৃত)। সাধারণ মানুষ কথাবার্তা বলে পুরোপুরি অন্য এক ভাষায়। দেখার কৌতূহল হতে ঢুকে পড়লাম কলেজটির প্রাঙ্গণে, তাকালাম ওপর দিকে। চোখে পড়ল, সৌধটির চারদিক ঘিরে দ্বিস্তর ঘের বারান্দা। নিচেরটিতে বেশ কিছু অভিজাত ও অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের সাথে বসে রয়েছে রাজকুমার দুজন, খড়ি দিয়ে মেঝের ওপরে কষে চলেছে মনে হল গণিতেরই কিছু একটা। আমাকে দেখে রাজকুমাররা লোক পাঠালে আমার পরিচয় জানার জন্যে। যখন শুনলে আমি একজন

ফরাসা, জানালে ওপরে আসার আমন্ত্রণ। যেতে, ইওরোপ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলে আমাকে, বিশেষ ক'রে ফ্রান্স সম্পর্কে। দুটি গ্লোব ছিল ব্রাহ্মণদের একজনের কাছে, ডাচরা দিয়েছিলেন তাকে। ফ্রান্স কোথায় দেখিয়ে দিলাম তাতে। কিছুক্ষণ এ জাতীয় কথাবার্তা চলার পর খেতে দিলে তারা আমায় পাণ। বিদায় নেয়ার আগে ব্রাহ্মণদের কাছে জানতে চাইলাম কখন এলে খোলা পাওয়া যাবে মন্দিরটিকে। তাঁরা অনুরোধ করলেন আমায় পরদিন ভোরে সূর্যোদয়েব সামান্য আগে আসার জন্য। আমিও অন্যথা করলাম না তার। এলাম প্রবেশ পথের বাঁদিকে গড়া বাজার মন্দিরটিকে দর্শনের জন্য। দ্বারের সুমুখভাগে একটি স্তম্ভশোভিত মুক্ত-মণ্ডপ। পুরুষ, মহিলা, শিশু মিলিয়ে বহুলোক ইতিমধ্যে সেখানে জমা হয়ে ক'রে চলছিল মন্দির-দ্বার খোলার অপেক্ষা। যখন মণ্ডপ উপচে প্রাঙ্গণের কিছু অংশ ভরে গেল, তখন উপস্থিত হলেন আটজন ব্রাহ্মণ। প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে ধুনুচি। চারজন ক'রে দাঁড়িয়ে গেলেন মন্দির-দ্বারের দুপাশে। খোল ও অন্যান্য বাজনার তুমুল হট্ট-গীতি সহ এলেন তার পিছু পিছু আরো বহু ব্রাহ্মণ। প্রবাণতম দুজন সুরেলা কণ্ঠে জুড়ে দিলেন স্তবপাঠ। তাদের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে সমবেত সকলে আবৃত্তি ক'রে চলল তা। চলছিল সেই সঙ্গে বাজনাও। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের হাতেই ময়ূরের পালকে তৈরি কিংবা অন্য কোন না কোন রকমের একটি ক'রে মাছি তাড়ানোর পাখা। মন্দির-দ্বার খোলা হবার পর ঐ সব কীট-পতঙ্গরা দেবতাকে যাতে বিরক্ত করতে না পারে সেজন্যই আর কি। চলল ঠায় আধঘণ্টা ধরে এই গান-বাজনা, পাখার বাতাস। প্রবীণ-ব্রাহ্মণ স্তোত্র সাঙ্গ ক'রে দুটি বড় কাঁসরে ছোট কাঠের মুগুর দিয়ে ঘা মারলেন তিন তিনবার। খোলার জন্য মন্দিরের দরজায় এবার আওয়াজ তুলল অন্যরা। ছ জন ব্রাহ্মণ দিলেন ভেতর থেকে দরজা খুলে। সরিয়ে দেয়া হল পর্দা। ৭-৮ পা ভেতরে একটি বেদীর ওপর বিরাজিত দেবতার অবয়ব উদ্ভাসিত হল চোখের সুমুখে এবার। বিগ্রহটির নাম রাম-কম (প্রকৃতপক্ষে অন্নপূর্ণা), ইনি মোরলা রামের বোন। তার ডান কোলে একটি শিশু। কিউপিড বা শিশু অনঙ্গের মতোই আকার। ইনি হলেন দেবতা লক্ষ্মী। বাঁ কোলে আরেকটি শিশু কন্যা। ইনি হলেন দেবী সাতা (সরস্বতী)। উপস্থিত দর্শকরা সাথে সাথে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে প্রণিপাত

জানাল তিন তিনবার। তারপর খাড়া হয়ে ছুঁড়ে দিল সঙ্গে নিয়ে আসা পুষ্প ও মালা। ব্রাহ্মণরা সেগুলি বিগ্রহকে অর্পণ ক'রে ফিরিয়ে দিলে আবার দর্শকদের। নটি শিখাযুক্ত একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে বেদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেটি বিগ্রহের প্রতি নাচিয়ে চললেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে চললেন প্রদীপটির শিখায় কোন এক ধরনের ধুনো। এসব অনুষ্ঠান স্থায়ী হল প্রায় এক ঘণ্টা। এরপর ফিরে গেল সবাই, বন্ধ হল মন্দিরের দুয়ার। উপস্থিত পূজার্থীদের মধ্যে অনেকেই নিবেদন করল দেবীকে চাল, ময়দা, ঘি, তেল, দুধ প্রভৃতি। ব্রাহ্মণরা হাতছাড়া করলেন না তার কিছুই। এই বিগহটি এক নারী-দেবতার বলে মহিলারা সকলেই তার ভক্ত। এ জন্যেই সব সময়ে হয়ে থাকে এ মন্দিরটিতে মহিলা ও শিশুদের এত ভিড়।

বড় দেউল থেকে এ বিগ্রহটিকে সরিয়ে এনে নিজের গড়া দেউলে স্থাপনা করার জন্য ব্রাহ্মণদের উপহার এবং গরিবদের দান হিসাবে ব্যয় করেছেন রাজা পাঁচ লক্ষ টাকারও ওপর।

সড়কটির যে দিকটিতে এই মহাবিদ্যালয় ঠিক তার বিপরীত দিকে রয়েছে রিচোর দাস (রণছোড় দাস) নামের আরেকটি দেউল। ভেতরে থাকা প্রধান বিগ্রহটির নামানুসারেই এ নাম দেউলটির। নিচের দিকে ছোট আরেকটি বেদীতে রয়েছে আরো একটি বিগ্রহ। সেটি এই রণছোড় দাসের ভাই গৌপল দাস (গোপাল)-এর। (রণছোড় দাস ও গোপাল কৃষ্ণের দুই ভিন্ন রূপ)। পাথর বা কাঠ দিয়ে গড়া মুখ দুটিই যা দেখা যায় এ দুই বিগ্রহের। রঙটি তাদের ভুষো কালির মতোই কালো। রাজার দেউল মধ্যে থাকা রাম-কম (অন্নপূর্ণা)-এর মূর্তিটি-র দু'চোখে বসানো রয়েছে দুটি হীরে। গলায় বিরাট একটি মুক্তার হার। মাথার ওপরকার চাঁদোয়াটি ধরে রেখেছে চারটি রূপার স্তম্ভ।

বনারস থেকে উত্তর দিকে আট দিনের পথ এগিয়ে গেলে দেখা পাওয়া যাবে এক পার্বত্য অঞ্চলের। মাঝে মাঝে তার সুন্দর সমতল ভূমি। কোন কোনটি দু-তিন কোশ পর্যন্ত চওড়া। এই সমতল এলাকাগুলি অতি উর্বরা। ফলে সেখানে চাল, গম ও নানা ধরনের শাক-সবজী তরি-তরকারী। কিন্তু সইতে হয় স্থানীয় অধিবাসীদের হাতির নিদারুণ উপদ্রব (তৃতীয় পর্ব, চোদ্দ পরিচ্ছেদ দেখুন)। সবজী ও ফসলের এক বিরাট অংশ চলে যায় তাদের

পেটেই। কোন সরাই না থাকার দরুন বণিক ও যাত্রীদলকে রাত কাটতে হয় মুক্ত আকাশের নিচে। হাতির উপদ্রব আটকানোর জন্য সারা রাত কাটাতে হয় তাদের অতি তটস্থ হয়ে। সুযোগ পেলেই লুটে নেবে নয়তো সব খাদ্যসামগ্রী।

একটি দেউল রয়েছে এ অঞ্চলটিতেও। যেমন সুন্দর তার গড়ন, তেমনি প্রাচীন। দেউলটির ভেতর ও বাইরেব গা জুড়ে রয়েছে শুধু অসংখ্য নারী-মূর্তির কাজ। পুরুষরা কথনো যায় না পূজো দিতে সেখানে। এজন্য নাম সেটির নারীদের দেউল। মাঝে তার রয়েছে অন্য সব দেউলের মতোই একটি বেদী। বিরাজিত তার ওপরে নিরেট সোনায় গড়া চার ফুট উঁচু একটি নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিমার এই নারী দেবতার নাম রাম-মরিয়ন (রাম নারায়ণ বা রামের মূর্তি এটি, কোন দেবীমূর্তি নয়)। তার ডান-দিকে রয়েছে একটি শিশুমূর্তি। নিরেট রূপোয় গড়া ও দু ফুট মতো উঁচু। বলা হয়ে থাকে, এই মহিলাটি যাপন করতেন তপস্বিনীর জীবন। এই শিশুটিকে ব্রাহ্মণরা দিয়ে যান তার কাছে ধর্মশাস্ত্র ও সৎ জীবনচর্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। তিন-চার বছর মহিলার কাছে বাস ক'রে সেই অল্পকাল মধ্যেই শিশুটি এরূপ বুদ্ধিমান ও বিদ্যা-পারদর্শী হয়ে উঠল যে দেশের প্রত্যেক রাজাই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তাকে কাছে নিয়ে রাখতে। শেষ পর্যন্ত কোন এক রাজা রাতের অন্ধকারে হরণ ক'বে নিয়ে গেল তাকে। তারপর আর দেখা মেলেনি তার। নারী মূর্তিটির বাঁদিকে বেদীর নিচে রয়েছে একটি বৃদ্ধের মূর্তি। বলা হয়, সে ছিল রাম মরিয়ন ও ঐ শিশুটির সেবক। এই বিগ্রহটির প্রতি ব্রাহ্মণরা অতি শ্রদ্ধা পরায়ণ। বছরে একবার ক'রে আসেন তারা এখানে পূজা দিতে। এবং একটি বিশেষ দিনে। সে দিনটি হল নভেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। কেননা, এ দেউলটি খোলা থাকে শুধু পূর্ণিমার দিনই। মাঝের পনের দিন ধরে নারী ও পুরুষ পুণ্যার্থীরা ক'রে চলে মাঝে মাঝে উপবাস। করে প্রতিদিন তিনবার ক'রে স্নান। দেহ-মাথা না কামিয়ে চুলগুলি ঝরিয়ে ফেলে এক ধরনের মাটি ঘষে ঘষে।

এগার ॥ ভারতের চার প্রধান মন্দির প্রসঙ্গে মথুরা ও তিরুপতির মন্দির

জগন্নাথ ও বনারসের পর যে মন্দিরটি সব থেকে শ্রদ্ধাভাজন সেটি হল মুত্রা (মথুরা)। দিল্লী যাবার সড়কের ওপর আগ্রা থেকে ১৮ কোশের মতো দূরে এটির অবস্থান। সারা ভারতবর্ষের মহার্ঘ সৌধগুলির মধ্যে এটি একটি। তীর্থ-পিপাসুদের স্রোতও এখানেই সবচেয়ে বেশি ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন কদাচিত দেখা যায় কাউকে। যমুনা নদীটি আগে বয়ে যেত এই মন্দিটিরই পাশ দিয়ে। (এ বিবরণ প্রমাণিত হয় না সঠিক বলে। অতি সুদূর অতীতে যমুনা ওই মন্দিরটির কাছ ঘেঁষে বয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক কাল মধ্যে তার গতিপথ মন্দিরের কাছ ঘেঁষে ছিল না)। বর্তমানে গতিপথের পরিবর্তন ঘটিয়ে সরে গেছে প্রায় আধ কোশ দূরে। ফলে পৌত্তলিকদের কাছে ধীরে ধীরে কমে গেছে এর আকর্ষণ। কেননা, নদীতে স্নান ক'রে মন্দিরে পৌঁছতে প্রচুর সময় নেয় বর্তমানে। এরূপ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আশঙ্কা থাকে এমন কোন কিছুর মুখোমুখি হবার যা অপবিত্র, নোংরা ক'রে তুলতে পারে তাদের দেহ। মন্দিরটি বেশ বড় আকারের হলেও গড়া হয়েছে সেটিকে একটি নিচু এলাকায়। এজন্য চোখে পড়ে না সেটি পাঁচ-ছ কোশের বেশি দূর থেকে। তাও মন্দিরটি অতি উঁচু হবার জন্যই যা। দেখতেও অতি নয়ন-মনোহর। যে-সব পাথর দিয়ে গড়া হয়েছে এটিকে সেগুলি লাল রঙা, মেলে তা আগ্রার কাছে থাকা একটি বড় পাথর খনি থেকে। আমাদের শ্লেট পাথরের মতো ফালি করা চলে এগুলিকে। লম্বায় পনের ফুট, পাশে ন-দশ ফুট হলেও পুরু নয় কিন্তু ছ আঙুলের বেশি। তার মানে পাথর কাটালীরা প্রয়োজন মতো আকারে ফালি ক'রে নেয় এগুলিকে। তৈরি করা হয় এগুলি দিয়ে সুন্দর সুন্দর স্তম্ভও। আগ্রার দুর্গ, জহানাবাদের ঘের দেয়ালগুলি, রাজপ্রাসাদ, দুটি মসজিদ ও বড় বড় আমীরদের কতক বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এ পাথর দিয়েই।

ফিরে যাই মন্দিরটির বর্ণনায়। কাটা পাথর দিয়ে বাঁধানো বিশাল এক

আটকোণা উঁচু চত্বরের ওপর তোলা হয়েছে মন্দিরটিকে। চত্বরটির খাড়া দেয়ালের গায়ে খোদাই ভাস্কর্য রীতিতে রূপায়িত হয়েছে দুই সারি প্রাণীচিত্র। প্রধানতঃ বানরের। একটি সারি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে দু ফুট উঁচুতে, অন্যটি চত্বর-পৃষ্ঠ থেকে দু ফুট নিচে। দু ফুট চওড়া, প্রতিটি পনের কি ষোল ধাপের দুটি সিঁড়ি বেয়ে তবেই পৌছন যায় চত্বরটিতে। ফলে, পাশাপাশি একজনের বেশি ওঠার উপায় নেই। এই সিঁড়ি দুটির একটি দিয়ে পৌছন যায় মন্দিরটির প্রধান ফটকের সুমুখে, অন্যটি দিয়ে মন্দিরটির পিছনে। মন্দিরটি বড জোর চত্বরটির আধা জুড়ে বিরাজিত, বাকি সুমুখ প্রাঙ্গণ। অন্যান্য মন্দিরগুলির মতো এটিও ক্রশের আদলে গড়া। ঠিক মাঝ থেকে মাথা তুলেছে সুদীর্ঘ চূড়া। দুপাশে তার কিছুটা খাটো আকারের আরো দুটি চূড়া। সৌধটির বাইরের গা জুড়ে তল থেকে মাথা পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে পাথর কুঁদে তৈরি ভেড়া, বানর, প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণীমূর্তি। রয়েছে চারিদিকে তার অনেক কুলঙ্গি। সেগুলি জুড়ে বিরাজিত বিভিন্ন দানবাকৃতি মূর্তি। তিনটি চূড়াতেই তল থেকে মাথা পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর অন্তর পাঁচ কি ছ ফুট লম্বা জানালা। সাথে একটি ক'রে অলিন্দের মতো, বসতে পারে সেখানে জনা চারেক। মাথায় তার একটি ক'রে চন্দ্রাতপ। কতক চন্দ্রাতপ চার স্তম্ভের ওপর, কতক আবার আট স্তম্ভের ওপর। শেষেরটির বেলা রয়েছে অবশ্য পাশাপাশি দুটি ক'রে অলিন্দ, রয়েছে দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ। চূড়াগুলির গায়েও অনেকগুলি কুলঙ্গি, রয়েছে সেখানেও দানবাকৃতি সব মূর্তি। কোনটির চার হাত, কোনটির বা চার পা। কারো ধড়টি পশুর, মুণ্ডটি মানুষের। রয়েছে শিঙ ও পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকানো সুদীর্ঘ লেজ। এ ছাড়াও দেখা যাবে অসংখ্য বানর মূর্তি। এত অগুণতি কদাকার মূর্তি একসঙ্গে দেখা রীতিমতো এক অসহ্য ব্যাপার। মন্দিরটির দরজা মাত্র একটিই এবং উঁচু সেটি। দু-দিকে তার অনেকগুলি স্তম্ভ, মানব ও দানব মূর্তি। মন্দির গর্ভে যাবার দুয়ার মুখটি পাঁচ-ছ ইঞ্চি ব্যাসের পাথর স্তম্ভ দিয়ে জাফরি কাটা। নেই তাই ভেতরে ঢোকার উপায়। প্রধান ব্রাহ্মণরা যান সেখানে একটি গোপন দ্বারপথ দিয়ে। সেটি যে কোথায়, পেলাম না তা খুঁজে। সেখানে উপস্থিত কতক ব্রাহ্মণকে তখন জিজ্ঞাসা করলাম, মহান রাম রাম অর্থাৎ প্রধান বিগ্রহটিকে একবার দেখার সুযোগ পেতে পারি কিনা? উত্তর দিলে, যদি আমি কিছু দিতে রাজী থাকি তাহলে ঊর্ধ্বতনের কাছ থেকে

অনুমতি আনার চেষ্টা করবে তারা। তাদের হাতে দুটি টাকা গুঁজে দিতেই ছুটল তারা সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে। আধঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হল না, এমন সময় ভেতর থেকে খুলে দিল ব্রাহ্মণরা জাফরির মাঝখানে থাকা একটি দরজা। সেখান থেকে তাকিয়ে দেখি, দরজা থেকে ১৫ কি ১৬ ফুট মতো দূরে সোনা ও রূপোর পুরনো কিংখাব দিয়ে ঢাকা, একটি বর্গাকার বেদীর ওপর রয়েছে রাম রাম নামের সেই প্রসিদ্ধ বিগ্রহটি (কেশব বা কৃষ্ণের মূর্তি)। দেখা যাচ্ছে শুধু যা মুখটিই তার। তৈরি, কালো মর্মর দিয়ে। চোখে বসানো রয়েছে মনে হল দুটি চুনি। গলা থেকে পা পর্যন্ত অবশিষ্ট দেহ কারুকাজ শোভিত লাল রঙা ভেলভেটের পোশাক দিয়ে ঢাকা। চোখে পড়ল না বাহু দুটি। পাশে তার দু ফুট মতো উঁচু আরো দুটি বিগ্রহ। ওই একই ভাবে সাজানো। তবে তাদের মুখগুলি ফরসা, নাম বিছোর। এই মন্দিরটিতে ১৫ কি ১৬ ফুট বর্গাকার, ১২ থেকে ১৫ ফুট মতো উঁচু একটি যন্ত্রও দেখার সুযোগ হল আমার। বিভিন্ন ধরনের দানবমূর্তি আঁকা একটি চিত্রিত বস্ত্র দিয়ে সেটি ঢাকা। চারটি ছোট চাকার ওপর দাঁড়িয়ে সেটি। আমায় বলা হল, এটি একটি যান (রথ)। উৎসবের দিনগুলিতে এটিতে চড়ানো হয়ে থাকে মহা-দেবতাকে। যান তিনি তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য। প্রধান উৎসবের দিনে জনসাধারণ নিয়ে যায় এটিতে ক'রে তাকে নদীঘাটে।

চতুর্থ মন্দিরটি হল তিরুপতির-টি। এটি করমণ্ডল উপকূল ও কুমারিকা অন্তরীপের দিকে থাকা কর্ণাটক প্রদেশে। নবাব মীর জুমলার সাথে সাক্ষাতের জন্য মসুলিপত্তম থেকে গণ্ডিকোট যাবার বেলা যাই এটিকে দর্শন করার জন্য। বড় মন্দির একটি। তাকে ঘিরে আবার বেশ কিছু ছোট ছোট মন্দির এবং ব্রাহ্মণদের অগুণতি বাসস্থলী। সব মিলিয়ে একটি শহরের মতোই চেহারা। রয়েছে অনেকগুলি পুকুর এর চারদিকে। ছুঁৎমার্গ এত গভীর যে কোন ব্রাহ্মণ তুলে এনে না দিলে কোন পথচারীই জল নিতে সাহস করে না সেগুলি থেকে।

বার ॥ পৌত্তলিকদের তীর্থ-ভ্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্য ও গঙ্গানদীর দুপাশে থাকা অন্যান্য রাজাদের রাজ্যে বাস ক'রে চলা প্রত্যেক পৌত্তলিকই অন্ততঃ পক্ষে একবারটি তীর্থ করবে জীবনে। যাবে তার মনের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ইতিপূর্বে বলা চারটি মন্দিরের কোন না কোন একটিতে নেহাৎ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জগন্নাথের মন্দিরটিতে। যেহেতু এটিই হল প্রধান ও সর্বাধিক মান্য। ব্রাহ্মণ ও অবস্থাপন্নরা যান একবারটির বেশি। কেউ যান চার বছর পর পর। কেউ বা ছ বা আট বছর অন্তর। এ সময়ে ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে চলেন তারা নিজের মন্দির দেবতা ও (তার সেবক) ব্রাহ্মণদেরও। এগোন তারা শোভাযাত্রা সহ, যে-মন্দিরটির প্রতি বেশি আকর্ষণ, সেটির দিকে। আর শুরুতেই বলেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যান তারা জগন্নাথের মন্দিরটিতে। কিংবা বনারসের মন্দিরটিতে। কেননা, দুটিই তাদের পরম শ্রদ্ধেয় নদী গঙ্গার কূলে (জগন্নাথ মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে ট্যাভারনিয়ারের ধারণা বা সংগৃহীত সংবাদ যে ভুল আগেই বলেছি তা)।

এইসব তীর্থযাত্রা ইওরোপবাসীদের মতো করা হয় না একা কি জনা দুই মিলে। একটি শহর বা গুটি কয়েক গ্রামের সব তীর্থ-পিপাসু চলেন একত্রিত হয়ে, দল বেঁধে। যে-সব তীর্থযাত্রী গরীব, আসে বহু দূর থেকে, এমনকি তিন-চারশ কোশ পাড়ি দিয়ে, পারেনা অনেক সময় তারা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়েও পথ খরচা মেটাতে। ধনীরা সাহায্য করে তাদের। এরূপ দানের জন্য বহু সময়ে অতি বিপুল অর্থ খরচ করেন তারা। চলেন প্রত্যেকে আপন পদমর্যাদা ও সংস্থান অনুসারে। কেউ কেউ পালকী বা ডুলিতে। অন্য কতক শকটে বা বহলে। গরিবদের ভেতর কেউ পায়ে হেঁটে, কেউবা ষাঁড়ের পিঠে চেপে। মা কাঁখে ক'রে বয়ে নিয়ে চলে তার শিশু সন্তানকে, বাপ বয়ে নিয়ে চলে রান্নার সাজ সরঞ্জাম।

বড় দেবতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে আসার জন্য নিয়ে যান তারা গৃহদেবতা বা স্থানীয় দেবতাকে রূপোর ঝালর দেয়া সোনার কিংখাব ঢাকা সুসজ্জিত পালকীতে চাপিয়ে সারা পথ। নিচে পাতা থাকে গদি, মাথায় পায়ে কুশনের

কাছটিতে বালিশ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় আমাদের সমাধি-সৌধগুলিতে মৃতের পুত্তলিকার ক্ষেত্রে। ব্রাহ্মণরা দল মধ্যে থাকা অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিতরণ করে সোনা ও রূপার পাত মোড়া সাত-আট ফুট দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত পাখা। পালকীর মতো একই ধরনের কিংখাব দিয়ে মোড়া দু-তিন ফুট ব্যাসের এই পাখাটি দণ্ডের মাথায় লাগানো থাকে ঠিক ভাটি-তে ব্যবহৃত বেলচার মতো ক'রে। ঘেরা থাকে পাখাটি ময়ূরের পালক দিয়ে। ফলে, করা যায় তা দিয়ে জোর বাতাস। অনেক সময় বীজনার শব্দ জাগানোর জন্য বাঁধা থাকে তার সঙ্গে ঘুন্টিও। বিগ্রহের মুখ থেকে মাছি তাড়ানোর জন্য সাধারণতঃ নিয়ে চলা হয় এরকম পাঁচ-ছটি পাখা। যারা এগুলি বয়ে নিয়ে চলে তারা পালকী বাহকদের মতো কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পালা বদল করে অন্যদেরও এই মহান দেব সেবা করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ব্যাপারটি স্যাক্সনী ও জর্মানীর বহু অঞ্চলে চালু থাকা প্রথাটির চেয়ে বেশি আজব নয় কিছু। সেখানে, গ্রীষ্মকালে গীর্জায় কোন মৃত ব্যক্তির শেষ কৃত্য ক'রে চলা কালে শবাধারে উন্মুক্তভাবে শায়িত শব দেহটিকে ক'রে চলে কেউ না কেউ মাছিকে দূরে হটিয়ে রাখার জন্য সর্বক্ষণ বাতাস। মৃতদেহের স্পর্শানুভূতি কোন অংশেই বেশি নয় একটি বিগ্রহের চেয়ে।

১৬৫৩ অব্দে M. d' Ardiliere-র সঙ্গে যখন আমি গোলকুণ্ডা থেকে সুরাট ফিরছি, পথে দৌলতাবাদের কাছে দেখা পেলাম এরকম একটি শোভাযাত্রার। পুরুষ-মহিলা-শিশু মিলে চলেছে দুহাজারেরও বেশি লোক। এসেছে সবাই তত্তের (সিন্দ) দিক থেকে তাদের বিগ্রহ সহ। বয়ে নিয়ে চলেছে সেটিকে মহার্ঘ পালকীতে ক'রে। যাবে তিরুপতির মন্দিরের বড় দেবতার কাছে। বিগ্রহটি শোয়ানো রয়েছে টকটকে লাল রঙা মখমলের গদিতে। আচ্ছাদনী এবং তাকিয়াগুলিও ওই একই কাপড়ের। যে বাঁশ বা দণ্ডের সাহায্যে পালকাটি বয়ে চলা হচ্ছে সেগুলি সোনা ও রূপার কিংখাব দিয়ে মোড়া। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো তার কাছে ঘেঁষা নিষেধ। দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম অদৃশ্য হতে এই দীর্ঘ শোভাযাত্রাটিকে। গভীর মায়া হল এই সব হতভাগ্যদের অন্ধত্বের বহর দেখে।

তের ।। পৌত্তলিকদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান

ব্রাহ্মণদের গভীর দখল রয়েছে জ্যোতিষের ওপর। জনসাধারণকে নির্ভুল ভাবে জানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে তারা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের দিনক্ষণ। বাঙলা রাজ্যের একটি শহর পাটনায় ১৬৬৬-র দোসরা জুলাই পরাহ্ন একটায় প্রত্যক্ষ করা গেল এক সূর্যগ্রহণ দৃশ্য। বিভিন্ন দিক্ থেকে যেরূপ অগুণতি নর-নারী-শিশু গঙ্গায় স্নান করার জন্য এল সে জমজমাট দৃশ্য অভিভূত হয়ে দেখার মতো। এই স্নানপর্ব সুরু করতে হয় তাদের গ্রহণ প্রত্যক্ষ হবার তিনদিন আগে থেকে। এই দিন কটি দিবা-রাত্রি কাটায় তারা গঙ্গার কূলে।

দুধ মিঠাই ও চালের বিভিন্ন প্রকার পদ তৈরি ক'রে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে তা মাছ ও কুমীরদের খাবার জন্য। ব্রাহ্মণরা সময় নির্দেশ করা মাত্র, যে-কোন ধরনের সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণই হোক না কেন, ভেঙে ফেলে পৌত্তলিকরা ঘরকন্নার কাজে ব্যবহৃত যা কিছু মাটির হাঁড়ি কলসী। ফলে সারা শহর জুড়ে শোনা যায় সেই ভাঙার কানফাটা আওয়াজ।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কাছেই রয়েছে তার জাদু-পুঁথি (পাঁজি ও জ্যোতিষিক গণনার পুঁথি)। দেখা যাবে তার মধ্যে বেশ কিছু বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ ও আরো নানাপ্রকার জ্যামিতিক নকশা। মাটির ওপর বিভিন্ন রকমের নকশা ও আঁক কষে যেই তারা জেনে যায় পরম লগ্ন আগত অমনি জোরে চীৎকার তুলে নির্দেশ দেয় জনসাধারণকে গঙ্গায় খাদ্য নিক্ষেপের জন্যে। শুরু ক'রে দেয় ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টা-করতালের হট্ট-নিনাদ। খাদ্য নিক্ষেপ সাঙ্গ হবার পরে পরেই শুরু হয়ে যায় সকলের দেহ মার্জনা ও স্নানের পালা। যতক্ষণ না গ্রহণ শেষ হয় চলতে থাকে তা। এ সময়কার গ্রহণ যোগ পড়েছিল বর্ষা ঋতু পার হয়ে যাবার পর। তাই গঙ্গার বুকে স্বভাবতই তখন অগভীর জল। শহরের ডাইনে-বাঁয়ে তিন কোশ দূর পর্যন্ত গঙ্গার সারা বুক জুড়ে চোখ পড়ল শুধু জলের ওপরে জেগে থাকা মানুষের মুণ্ডু। ব্রাহ্মণরা কিন্তু রয়ে গেল সব ডাঙাতেই। ক'রে চলছিল, যাদের কাছে বেশি পাবার আশা সেই সব ধনী পুণ্যার্থীদের গা মুছতে, শুকনো কাপড় যুগিয়ে দিতে সাহায্য। তারপর বদল গিয়ে তারা একটি

বিশেষ স্থানে চেয়ারে। সে জায়গাটিতে জমা করেছিল বিশিষ্ট ধনী পৌত্তলিকরা প্রচুর চাল, ভারতীয় অন্যান্য দানা-শস্য, বিভিন্ন রকমের শাক-সবজী ও সেই সাথে দুধ, ঘি, চিনি, ময়দা ও কাঠ। প্রতিটি চেয়ারের সামনে ক'রে নিল ব্রাহ্মণরা পাঁচ কি ছ' ফুট বর্গাকার পরিমিত স্থান একেবারে তকতকে পরিষ্কার। তারপর একটি বড় থালার মধ্যে থাকা হলুদ রাঙা কাথের মধ্যে গোবর মিশিয়ে তাই দিয়ে লিপে নিলে জায়গাটিকে। পাছে কোন পিঁপড়ে টিপড়ে সেখানে আসে ও পুড়ে মরে এই ভয় দূর করার জন্য আকুকি। সম্ভবপর হলে তারা তাদের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে কাঠ না জ্বালিয়েই। রাঁধার জন্য ব্যবহার করে সাধারণতঃ শুকনো গোবর বা ঘুঁটে। যখন কাঠ ব্যবহারে বাধ্য হন, সতর্কতার সঙ্গে দেখে নেন কোন কীট-পতঙ্গ বা তার শুক রয়ে গেছে কিনা তার মধ্যে। কেননা, আগেই বলেছি তারা মানবাত্মার বিভিন্ন প্রাণীদেহে জন্মান্তরে বিশ্বাসী। তার ফলে, কীট-পতঙ্গ রূপে জন্ম নেয়া নিজের কোন আত্মীয়-স্বজনকেই পাছে পুড়িয়ে মারে এই ভয়েই এত সতর্কতা। যে স্থানটি এতক্ষণ তারা সযত্নে পরিষ্কার করে নিল, আঁকল এবার তার ওপরে নকশা। ত্রিভুজ, অর্ধ-ত্রিভুজ, বৃত্তাভাগ, অর্ধ-বৃত্তাভাগ ইত্যাদি নানা ধরনের গুঁড়ো চক দিয়ে। রাখল প্রতিটি নকশার ওপরে দু'তিন খানি ক'রে গাছের টুকরো ছোট ডাল এবং একটুখানি ক'রে গোবর। পাছে ডাল-গুলিতে কোন পোকা-মাকড় থাকে তাই সেখানে রাখার আগে ভাল ক'রে গা মেজে নিল তার। তারপর ডালগুলির কোনটির ওপর রাখল গম, কোনটির ওপর চাল, বা অন্য কোন শাক-সবজী। মোটকথা, সেখানে জমা প্রতিটি খাদ্য উপকরণই রাখল ঐভাবে কাঠের ওপর একটু একটু ক'রে। প্রতিটি স্তূপের ওপর ঢাললো তারপর বেশ খানিকটা ঘি, দিলে তারপর তাতে আগুন। ওই আগুনের শিখার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে পূর্বাভাস জানিয়ে চলল এ বছর কেমন হবে দেশের চাল, গম ও অন্যান্য কৃষির উৎপাদন।

মার্চ মাসের পূর্ণিমার দিনটিতে হয়ে থাকে এ রাজ্যে নাগ-বিগ্রহের পূজা-উৎসব। প্রথম পর্বে আগেই বলেছি এ সম্পর্কে কিছু। নদিন ধরে চলে এ উৎসব। মানুষ ও গৃহপালিত পশু, থাকে সকলেই এ সময়ে নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে। পশুদের বেশির ভাগেরই চোখের চারদিকে সিঁদুর দিয়ে এঁকে দেয়া হয় একটি ক'রে বৃত্ত। দেয়া হয় তা দিয়ে শিঙ-গুলিকেও চিত্রিত ক'রে। যে প্রাণীটিকে বেশি স্নেহ করা হয় সাজানো হয় তাকে ঝিঁনুকের সংগে চুমকি দিয়েও। বিগ্রহটির

পূজা-অর্চনা করা হয় প্রতিদিন সকালে। ঢাক-ঢোল-বাঁশির বাজনা সহ ঘণ্টা-খানেক তাকে ঘিরে নেচে চলে মেয়েরা। করে তারপর. এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া। চলে হই-চই-আনন্দ সন্ধ্যে ঘনিয়ে না আসা অব্দি। শুরু হয় আবার তখন দ্বিতীয় দফা পূজা-অর্চনা ও নাচ।

পৌত্তলিকদের মধ্যে মদিরা পানের প্রথা না থাকলেও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক'রে থাকে এই পূজা-উৎসব কালে তারা তালগাছের রস থেকে তৈরি মদিরা পান। যে-সব গ্রাম প্রধান যোগাযোগ সড়কগুলি থেকে বহু ভেতরে সেখানে এই মদের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয় একধরনের স্পিরিট। কেননা, মুসলমান শাসনকর্তারা দেয়না তাদের মদ পরিশোধন কিংবা পারস্য বা অন্যান্য দেশ থেকে আনা মদ বেচাব অনুমতি। স্পিরিট তৈরি করে এরা এই প্রণালীতে: ব্যবহার কবে এ কাজে তারা মার্তাবন (martaban) নামের ভেতরে উজ্জ্বল প্রলেপ থাকা নানা আকারের বড় বড় মৃৎপাত্র। ধরে এক একটিতে তার ৩০০ প্যারিস পাইণ্টের মতো তালের মদ বা তাড়ি। তার মধ্যে ঢালে তারা ৫০-৬০ পাউণ্ডের মতো অপরিস্রুত কালো চিনি বা ঝোলাগুড়। দেখতে সেগুলি হলুদ বাঙা মোমের মতো। দেয় ওই সঙ্গে ২০ পাউণ্ডের মতো এক ধরনের কাঁটা গাছের মোটা কালো ছাল (the gum of acacia leucophloea)। যা দিয়ে আমাদের দেশের ট্যানাররা চামড়া পাকা করে ঠিক তারই মতো দেখতে এগুলি। এই গাছের ছালের দরুন চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের নতুন মদের মতোই গেঁজে যায় তাড়ি। মিষ্টত্ব হারিয়ে পরিণত হয় তা আমাদের বুনো নাশপাতির মতোই ঝাঁঝালো টকে। এরপর করা হয় তাকে পরিশোধন, যোগ করা হয় পছন্দসই সুবাস। একপাত্র স্পিরিট মধ্যে ফেলা হয় ছোট এক থলি লবঙ্গ কিংবা তিন চার মুঠো মৌরী বা জৈত্রী। পরিশোধনের জন্য ব্যবহার করা হয় বড় আকারের কড়াই। এই স্পিরিট তৈরি করা চলে যেমন খুশী নরম বা কড়া ক'রে।

১৬৪২ অব্দে আমি যখন আগ্রায়, ঘটল বেশ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ডাচদের ছিল একজন বুড়ো দালাল। নাম ভোলদাস। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তার কাছে এ সময়ে খবর এল, মারা গেছেন মথুরার দেউলটির প্রধান পুরোহিত। শুনেই ছুটে এলেন তিনি ডাচ ফ্যাকটরির প্রধানের কাছে। অনুরোধ জানালেন দেনা-পাওনার ফয়সালা ক'রে হিসাব-খাতায় ইতি টানার জন্য। কারণ, প্রধান

পুরোহিত মারা যাওয়ায় তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জীবন-ত্যাগের, পরলোকে গিয়ে সেই মহাপুরুষের সেবা করার। হিসাব-পত্রের নিষ্পত্তি ক'রে দিতেই ছায়ার মতো তার পিছু নেয়া আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে উঠলেন গিয়ে একটি গাড়িতে। করলেন সঙ্গে সঙ্গে মথুরা যাত্রা। কিন্তু খবর পাওয়া অবধি অন্ন জল ত্যাগ করায় দরুন মারা গেলেন তিনি পথেই।

পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রথা রয়েছে হাই উঠলেই আঙুলে তুড়ি মেরে 'জিনরমি' (জয় নারায়ণ-র) নাম বার বার উচ্চারণ করার। তার মানে, তাদের এক বিশিষ্ট সন্ত নরমি-কে স্মরণ করেন এ সময়ে তারা। আঙুল দিয়ে তুড়ি মারার কারণ হিসেবে বলা হয়, এর ফলে রোধ হয়ে থাকে হাই তোলা ব্যক্তির দেহ মধ্যে কোন দুষ্ট-আত্মার প্রবেশ সম্ভাবনা।

১৬৫৩ অব্দ। আমি সুরাটে। এসময়ে ঘোড়ার পিঠে দু'তিন খানি বস্ত্র সহ নিয়ে আসা হল এক রাজপুত সেনাকে ঐ বস্ত্রের দরুন শুল্ক প্রদানে বাধ্য করার জন্য শাসনকর্তার কাছে। রাজপুতটি তখন শাসনকর্তার দিকে দৃপ্ত-ভঙ্গিতে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন ফোটালে: যে সৈনিক সারা জীবন সম্রাটের সেবা করেছে তাকেও কি তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য কেনা সামান্য চার-পাঁচ টাকা দামের দু' তিন খানি তুচ্ছ কাপড়ের জন্য গুণতে হবে শুল্ক? তার এই প্রতিবাদে উষ্ণ হয়ে উঠে শাসনকর্তা দিয়ে বসলেন তাকে বেঠিকো বা বেজন্মা বলে গালি। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন, সে যদি একজন রাজা-মহারাজাও হয় তাহলেও তার কাছ থেকে সে আদায় করবে এ শুল্ক। সেনাটি তার গালিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এমন ভঙ্গি করলে যেন সে দাবি মতো শুল্ক মেটানোর জন্য বার করছে টাকা। তারপর শাসনকর্তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে তার পেটে ছোরা দিয়ে সাত-আটটি কোপ। সেই আঘাতের দরুন মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত শাসনকর্তা। এদিকে রাজপুত সেনাটিকেও টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল শাসনকর্তার অনুচরেরা।

এমনিতে এই সব পৌত্তলিকরা 'প্রকৃত ঈশ্বর' সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার অতলে ডুবে থাকলেও, তা কিন্তু বহুক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়নি তাদের নীতিপূর্ণ জীবন-যাপনে। বিবাহিত জীবনে পত্নীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতার দৃষ্টান্ত তাদের ক্ষেত্রে বিরল। ব্যাভিচারের ঘটনাও শোনা যাবে অতি কদাচিৎ। মেলে না কোন অস্বাভাবিক (যৌন) অপরাধের দৃষ্টান্তও। এজাতীয় কোন

রকম মতিচ্ছন্নতা যাতে তাদের মধ্যে দেখা না দেয় সেজন্য ৭।৮ বছর বয়সেই ছেলে মেয়েদের দিয়ে দেয় তারা বিয়ে।

তাদের বিয়ের রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছু শোনাই এই সুযোগে। ধার্য দিনক্ষণ মতো বরকে নিযে তার আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত হয় কনের বাড়িতে। সঙ্গে নেয় একজোড়া বড় মল। এটি দেখতে দু আঙুল মোটা হলেও ভেতরটি কিন্তু ফাঁপা। এবং দুটি টুকরায় খণ্ডিতভাবে তৈরি। খোলা ও আটকানোর সুবিধার জন্য মাঝে কবজা লাগানো। বরপক্ষের আর্থিক ক্ষমতা মতো সোনা, রূপা, পিতল বা টিন দিয়ে গড়া। যারা চরম হত-দরিদ্র তারা গড়ে শুধু যা সীসা দিয়ে। কনে পক্ষের বাড়িতে পৌছবার পর পরিয়ে দেয় বর এ দুটি কনের দু-পায়ে। এর তাৎপর্য হল, পায়ে বেড়ি পরিযে কনেকে সে শিকলের বাঁধনে বাঁধল চিরকালের মতো, কনে কখনো আর যেতে পাবে না তাকে ছেড়ে। পরের দিন করা হয় ভোজের আয়োজন। বরের বাড়িতে। সে ভোজে যোগ দেয় দু তরফেরই আত্মীয়-স্বজনরা। কনেকে নিযে আসা হয় বিকাল ৩টা নাগাদ। উপস্থিত থাকেন কতক ব্রাহ্মণও। তাদের প্রধান বালক বরের মাথাটিকে ছুঁইয়ে দেন বালিকা-বধূর মাথায়। কতক মন্ত্র পাঠ ক'রে ছিটিযে দেন তাদের গায়ে-মাথায় জল। আনা হয় থালা বা কলাপাতায় ক'রে নানাপ্রকার খাদ্য। আনা হয় পোশাক ও বস্ত্রাদি। ব্রাহ্মণ বরকে উপদেশ দেন ঈশ্বর তাকে যা কিছু দেবে সবই যেন ভোগ করে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাগ ক'রে। সে যেন প্রয়াস করে আপন শ্রমের উপার্জন দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার। বর যখন সম্মতি জানায় 'হ্যাঁ' বলে তখন বসেন সমবেত অতিথিরা ভোজনে। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক। বর পক্ষের ধন সম্পদ ও উঁচু মহলের সঙ্গে তার আসনাইয়ের বহর অনুসারে করা হয়ে থাকে বিয়েতে ধুমধাম। অতি বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তা অজস্র অর্থব্যয় ক'রে বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে। বর যায়-আসে হাতিতে চেপে, কনে কোন না কোন যানে চেপে। অন্য সকলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেন হাতে এক একটি মশাল নিয়ে। জাঁকজমক দেখাবার জন্য চেয়ে আনা হয় স্থানীয় শাসনকর্তা ও বন্ধুস্থানীয় বিশিষ্ট অভিজাতদের কাছ থেকে যতগুলি সম্ভব হাতি। সেই সঙ্গে খেলোয়াড় ঘোড়াও। চলে আড়ম্বরের সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে, কোটায় আঁধার ঘনিয়ে এলে আলো ও রঙের জলুস জাগানো বাজী। এগুলি ফোটানো হয় সাধারণত পথের ধারে ও খোলা মাঠে। তবে, ব্যয়ের

প্রধান খাত হল গঙ্গা জল কেনার খরচ। বিশেষ ক'রে থাকেন যারা ওই নদীটি থেকে তিন চারশো কোশ দূরে। এক একটি বিয়েতে খরচ হয় শুধু এই খাতেই দু থেকে তিন হাজার টাকা। (এ সম্পর্কে তৃতীয় পর্ব, নবম পরিচ্ছেদ দেখুন। এ ব্যাপারে ট্যাভারনিয়ারের বর্ণনা মনে হয় অতিরঞ্জিত বলেই কেননা, বিয়েতে গঙ্গা জলের গুরুত্ব বিশেষ নেই, তার গুরুত্ব শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে।)

৮ই এপ্রিল (১৬৬৬)। বাঙলায় মালদা নামের একটি শহরে সেদিন আমি। সেখানকার পৌত্তলিক অধিবাসীদের বিশেষ একটি উৎসব পালনের দিন সেটি। দল বেঁধে চলল সবাই শহর ছেড়ে (মেলা প্রাঙ্গণে)। গাছের ডালে আংটা ঝুলিয়ে লটকাল নিজেদের সেই আঙটায়। কেউ বা পিঠের সঙ্গে বিঁধিয়ে নিয়ে একটি আংটায়। কেউ বা দুপাশে বিঁধিয়ে নিয়ে দুটি আংটায়। আংটাগুলি ঢুকে গেছে বেচারাদের দেহের মধ্যে। সেই ভাবেই ঝুলে রইল তারা। কেউ বা ঘণ্টাখানেক, কেউ বা ঘণ্টাদুয়েক। মোটকথা যতক্ষণ না মাংস খুবলে বেরিয়ে গেল ঝুলন্ত দেহ থেকে। তখনি বাধ্য হয়েই বিরতি দিতে হল তাতে। অবাক কথা, এজন্য কিন্তু দেহ থেকে ঝরতে দেখা গেল না এক ফোঁটাও রক্ত, এমনকি দেখা গেল না আংটাতেও এতটুকু রক্তের দাগ। আর, ব্রাহ্মণদের দেয়া ওষুধ খেয়ে দিব্যি ভাল হয়ে যায় তারা দু-দিনের মধ্যেই। কেউ কেউ এ উৎসবে খাড়া তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটার বিছানা ক'রে শুয়ে রয়েছে তারই ওপরে। ঢুকে গেছে ঐ কাঁটাগুলি গভীর হয়ে তাদের দেহের ভেতরে। উভয় প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনকারীরা তা ক'রে চলার কালে তাদের আত্মীয় স্বজন পরিচিতরা নিয়ে আসে তাদের জন্য পাণ, টাকা পয়সা, কাপড় ইত্যাদি উপহার। সাধনা শেষে সেগুলি তুলে নিয়ে গরিবদের দান ক'রে দেয় তারা, কোনরকম লাভ ওঠাতে চায় না এথেকে। কতকের কাছে আমি জানতে চাইলাম, কেন তারা এ পূজা-উৎসব করে, কেনইবা সয় এ ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনার নিগ্রহ? উত্তর দিলে, এসব ক'রে তারা প্রথম মানবকে স্মরণ করে (দেবাদিদেব মহাদেব)। আমাদের মতো তারা আদম বলে তাকে। (চড়ক পূজা-উৎসবের বর্ণনা এটি)।

আর একটি বিচিত্র কৃচ্ছ্রসাধনার (নিষ্ঠুর পীড়নের) বর্ণনা শোনাই। এটি দেখার সুযোগ হয় আমার গঙ্গার বুকের ওপর নৌকায় পাড়ি দিয়ে চলার কালে। সেদিনটি ছিল ১৬৬৬-র ১২ই মে। গঙ্গার কূলে ক'রে নেয়া হয়েছে একটি

স্থানকে তকতকে পরিষ্কার। হতভাগ্য এইসব পৌত্তলিকদের একজনকে বাধ্য করা হয়েছে সেখানে কৃচ্ছ্র সাধনা (প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তি ভোগ) ক'রে চলতে। হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে লম্বাভাবে উবু হয়ে ক'রে চলতে হচ্ছে বেচারীকে মাটি চুম্বন। প্রতি পালায় তিনবার ক'রে। দেহ যাতে মাটি স্পর্শ না করে সেইভাবে। তারপরেই যা পাচ্ছে সে একটু উঠে দাঁড়াবার সুযোগ। তাও ডান পা টি শূন্যে রেখে, বাঁয়েরটির সাহায্যে একপায়ে। ক'রে চলতে হবে এ কাজ তাকে পুরো একটি মাস। এবং জল ও অন্ন স্পর্শ করার আগে প্রতিদিন সকালে একটানা পঞ্চাশ বার। তার মানে প্রত্যহ ঐভাবে ১৫০ বার করতে হবে তাকে মাটি চুম্বন। জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, আপন বাসভিটেতে গরুকে মরতে দেয়ার অপরাধের দরুন তাকে এ শাস্তি দিয়েছে ব্রাহ্মণরা। (তৃতীয় পর্ব নবম পরিচ্ছেদ দেখুন) ঃ

চালু রয়েছে তাদের মধ্যে আরো একটি রীতিমতো হিং-টিং-ছট প্রথা। যদি কোন পৌত্তলিকের কোন মুদ্রা বা যা-হোক পরিমাণ অর্থ খোয়া যায়, তা সে তার ভুলের দরুনই হোক, আর চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির ফলেই হোক, দিতে হয় সেজন্য তাকে আবার সমান পরিমাণ খেসারত প্রধান ব্রাহ্মণের কাছে। যদি তা না দিয়ে চেপে যায় ঘটনাটি, তবে জানাজানি হয়ে গেলে সুনাম খুইয়ে হতে হয় তাকে গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত। লোককে সতর্কমনা ক'রে তোলার জন্যই নেয়া হয় এ ধরনের পদক্ষেপ। (এ ধরনের কোন প্রথা ভারতের কোথাও চালু থাকার কথা জানা যায়নি আর কোনও সূত্রে কিংবা অনুসন্ধান ক'রে।)

গঙ্গা নদী পেরিয়ে আরো উত্তরে নগরকোট পাহাড়মালার দিকে রয়েছে দু'তিন জন রাজা। 'রাজ্যের প্রজাদের মতো তারাও বিশ্বাসী নন কি ঈশ্বর কি শয়তান কারো অস্তিত্বে। তাদের ব্রাহ্মণদের কাছে দেখা যাবে তাদের ধর্মমত সংক্রান্ত একটি পুঁথি। সেটি শুধু অর্থহীন আবর্জনায় ভরাট। এবং এজন্য সে গ্রন্থটির রচয়িতা, যাকে তারা বলেন বৌদ্ধো (গৌতম বুদ্ধ) কোন যুক্তি দর্শিয়ে যাননি। এই রাজারা মুঘল সম্রাটের অধীন, গোণেন তাকেই কর।

আরেকটি অদ্ভুত প্রথার কথা শুনিয়ে শেষ করি এ অধ্যায়টিকে। মালাবার অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ তাদের বাঁ-হাতের নখ না কেটে রেখে চলে সেগুলিকে সযত্নে। রাখে মাথার চুলও মেয়েদের মতো। ক্ষেত্রবিশেষে আধ আঙুল দীঘল হয়ে পড়া এই নখগুলি মেটায় তাদের চিরুনীর প্রয়োজন। এ-

ছাড়াও যে সব কাজ নোংরা বা অপবিত্র রূপে গণ্য শুধু সেগুলিই করে তারা বাঁ-হাতটি দিয়ে। খাওয়া বা মুখ ধোয়া কি স্পর্শ করা এসব ভুলেও করে না বাঁ হাত দিয়ে। সে-সবের জন্য ব্যবহার করা হয় শুধু ডান হাতটিকে। (লিনসকোটেন জানিয়ে গেছেন, মালাবারের নায়ার গোষ্ঠীর মধ্যেই শুধু, তারা যে শ্রমজীবি নয়, সম্ভ্রান্ত, তা'ই নিদর্শন রূপে চালু ছিল নখ রাখার প্রথাটি।)

চোদ্দ ॥ ভুটান রাজ্য

ভূটান রাজ্যটি অতি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তবে, তার সম্পর্কে হয়নি এখনও পর্যন্ত আমাদের সঠিক ধারণা সংগ্রহের সুযোগ। সে রাজ্যের যে সব অধিবাসী ব্যবসা উপলক্ষে ভারতে আসেন আমার দেয়া যা কিছু বিবরণ তাদের কাছ থেকেই বিভিন্ন ভারত ভ্রমণ পর্বে সংগ্রহ করা। তবে শেষ ভ্রমণ কালেই অন্যান্য বারের তুলনায় সুযোগ পাই বেশি ভালভাবে খবরাখবর লাভ করার। এ-সময়ে যাই আমি বাঙলার সব থেকে বড় শহর ও অতি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র পাটনায়। যোগাযোগ হয়ে গেল তখন কস্তুরী বেচার জন্য সেখানে আসা ভূটানের কতক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। দুমাস পাটনায় থাকার অবকাশে কিনে ফেললাম তাদের কাছ থেকে ২৬ হাজার রূপিয়ার মতো কস্তুরী। থলির মধ্যে থাকা কস্তুরীর এক এক (ফরাসী) আনসের দাম পড়ল আমাদের মুদ্রার চার লিভর চার সোল। আর থলিতে না থাকা কস্তুরীর বেলা আট ফ্রাঙ্ক। ভারত ও ইওরোপে এজন্য যে পরিমাণ শুল্ক আদায় করল তা গুণতে না হলে রীতিমতো মোটা অঙ্কের লাভ ওঠানো যেত এ থেকে। সেরা জাতের Rhubarb-ও আসে এই ভূটান রাজ্যটি থেকেই। 'যে ধরনের বীজ দিয়ে কাটনাশক চূর্ণ তৈরী হয় তা এবং আরো নানা রকমের ওষধিও যোগায় এ দেশটি আমাদের। যোগান দেয় ক্ষার বা লোম সহ পশুচর্মও। তবে Rhubarb এর ক্ষেত্রে অশেষ ঝঞ্ঝাট সইতে হবে আপনাকে স্থানান্তরের বেলা। তা সে যে পথ ধরেই আপনি নিয়ে যান না কেন। উত্তরের, কাবুলের পথ ধরে নিয়ে গেলে সেঁতা লেগে নষ্ট হয়ে যায় এগুলি। দক্ষিণের পথ ধরে নিয়ে গেলে পথ দীর্ঘ হবার দরুন, বর্ষার ফলে নষ্ট হবার সম্ভাবনা আরো বেশি।

কস্তুরীর বেলা তা গ্রীষ্মকালে বেচে লাভ ওঠান রীতিমতো দুষ্কর। তাপে ওজনে তা হালকা হয়ে যায় তখন। এ সামগ্রীটির ওপর শুল্ক গুণতে হয় এক চৌথা। সাধারণতঃ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তা গোরখপুরে। কেননা, ভূটানের দিকে মুঘল সীমান্ত আরো ৫৬ কোশ এগিয়ে হলেও সীমান্ত শহর বলতে এটিই (এ তথ্য সঠিক নয়। আসলে, বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট, ভূটানের আয়তন ও সীমারেখা সম্পর্কে ট্যাভারনিয়ারের ধারণা ছিল বেশ ধোঁয়াটে)। ভারতীয় বণিকদের এ শহরটিতে উপস্থিত হয়ে দেখা করতে হয় শুল্ক কর্মচারীর সাথে। করতে হয় ঘোষণা দাখিল যে ভূটানে যাচ্ছেন তারা কস্তুরী বা রুবার্ব কিংবা দুই ই কেনার জন্য। কত টাকা লগ্নী করতে চান সেজন্য তাও জানাতে হয় ওই সাথে। কর্মচারী নথিভুক্ত ক'রে নেন তা। দেয় শুল্কের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ হলেও রফা করেন বণিকেরা সাত কি আট শতাংশ দেয়ার জন্য, সংগ্রহ করেন শুল্ক কর্মচারী বা কাজীর কাছ থেকে সায়-পত্র। যাতে ফেরার বেলা বেশি শুল্ক দাবি না ক'রে বসেন সেজন্য। শুল্ক কর্মচারীর সঙ্গে ভদ্র বোঝা-পড়ায় পৌঁছুন যদি সম্ভব না হয়, তবে যান সে দেশে তারা ভিন্ন এক সড়কপথ ধরে। ওই পথটি যেমন দীর্ঘ তেমনি কষ্টসাধ্য। যেতে হয় চিরতুষারাবৃত পার্বত্য এলাকা ও মরুময় সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে। এগোতে হয় প্রথমে ৬০ ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত; বাঁক নিতে হয় তার পর ৪০ ডিগ্রীতে অবস্থিত কাবুলের দিকে পশ্চিমাভিমুখি (এ বিবরণ ত্রুটিপূর্ণ। উত্তরাভিমুখি ঐ পথ ধরে ৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত এগোতে হয় না। তাছাড়া কাবুলের অবস্থান ৩৪°২১´ অক্ষাংশে)। এই কাবুল থেকে ভাগ হয়ে বাণিজ্য-যাত্রীদের কেউবা চলে যান বালখ, কেউবা বিশাল তাতার দেশে। শেষোক্ত দেশটিতে ভূটানী সওদাগরেরা হাজির হয়ে থাকেন তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে, করেন তা ঘোড়া, খচ্চর, উট এ সবের সঙ্গে বিনিময়। কেননা, ওই সব দেশে মুদ্রার একান্ত অভাব। তাতার-রা ভূটানীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ওই সব সামগ্রী বেচার জন্য নিয়ে যায় তারপর পারস্যের অর্দবিল ও তাবরিজে। ভূটান থেকে যে সব ব্যবসায়ী কন্দাহার কিংবা ইস্পাহান পর্যন্ত আসেন তারা তাদের পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে সংগ্রহ করেন সাধারণতঃ প্রবালের পুঁতি, হলুদাভ অম্বর এবং সুযোগ পেলে ল্যাপিস গোত্রীয় পাথরের তৈরী পুঁতির মালা। কেউ কেউ চলে আসেন মুলতান, লাহোর কিংবা আগ্রা অবধি। সংগ্রহ করেন সেখান থেকে বিভিন্ন বস্ত্রসম্ভার,

নীল ও প্রচুর পরিমাণে কর্নিলিয়ান জাতীয় রক্তাভ পাথর ও স্ফটিকের তৈরি পুঁতি। আসেন অনেকে গোরখপুর হয়ে পাটনা ও ঢাকাতেও। গোরখপুরের শুল্ক-কর্মচারীর সঙ্গে বোঝাপড়া রয়েছে এদের। নিয়ে যান তারা পাটনা ও ঢাকা থেকে প্রবাল, হলুদাভ অম্বর, কচ্ছপের খোল এবং শঙ্খ ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের হাতে পরার অলঙ্কার। আমি যখন পাটনায়, পরিচয় হল দন্তজিক থেকে আসা চারজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে। তৈরি করিয়ে নিয়ে চলেছেন তারা হলুদাভ অম্বর দিয়ে অসংখ্য রকমের পশুপাখি দৈত্য দানবের মূর্তি ভুটানের রাজার কাছে। এগুলি রাখবেন তিনি তার মন্দিরগুলিতে। প্রজাদের মতো রাজাও গোঁড়া পৌত্তলিক। যেখানে পয়সা সেখানেই আর্মেনিয়ানরা। আপত্তি নেই তাদের পয়সার জন্য পৌত্তলিকতার সামগ্রী যোগাতেও। আমায় তারা জানালেন, রাজা বরাত দিয়েছিলেন তাঁদের একটি দেব-বিগ্রহের জন্যও। সেটি দিতে পারলে পেতেন তারা মোটা রকমের লাভ। বিগ্রহটি দৈত্যাকৃতি। তার ছটি শিং, চারটি কান, চারটি হাত, হাতের প্রতিটি পাতায় ছটি ক'রে আঙুল। মূর্তিটি হওয়া চাই হলুদাভ অম্বরের। কিন্তু এজন্য যেরূপ বড় আকারের অম্বর প্রয়োজন, সংগ্রহ করতে পারেননি তারা।

পাটনা থেকে যে-পথ ধরে সচরাচর ভুটান যাওয়া-আসা করা হয় সে-পথ পাড়ি দিতে সময় নেয় তিন মাস (সাধারণতঃ এত সময়ের প্রয়োজন হবার কথা নয়। এ থেকে মনে হয়, ভুটান বলতে এখানে লাসা পর্যন্ত অঞ্চলকে ধরেছেন ট্যাভারনিয়ার)। পাটনা থেকে এজন্য যাত্রা করা হয় সাধারণতঃ ডিসেম্বরের শেষাশেষি। গোরখপুরে পৌছে যায় যাত্রীরা অষ্টম দিনে। মুঘলদের এই সীমান্ত শহরটি থেকে সংগ্রহ ক'রে নেয় তারা পথে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর একাংশ। গোরখপুর থেকে উঁচু পাহাড়মালার গোড়ায় পৌছুতে কেটে যায় আট-ন দিন। সারা পথ অরণ্য ভরা অঞ্চল মধ্য দিয়ে এগোতে হয় বলে বেশ দুর্ভোগ সইতে হয় যাত্রীদের (তরাই অঞ্চল)। রয়েছে এ অরণ্যে অসংখ্য বুনো হাতি। নেই তার ফলে রাতে ঘুমোবার উপায়। বড় আকারে আগুনের গণ্ডী তৈরি ক'রে তার মাঝে রাত কাটাতে হয় সজাগ চোখে। করে চলতে হয় ভয় দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ। কেননা, হাতির দল সাধারণতঃ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে এমন আচমকা আক্রমণ ক'রে বসে যে তার আগ পর্যন্ত টেরই পাওয়া যায়না তাদের অস্তিত্বের কথা। তবে তাদের লোভ মানুষের খাদ্যের

ওপর নয়, তাদের সঙ্গে থাকা খাদ্যসামগ্রীর ওপর। চাল, ময়দার বস্তা কিংবা ঘিয়েব হাঁড়ি, যা সব সময়ই যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে থাকে, হানা দিয়ে উদরাস্থাৎ করে তারা। পাটনা থেকে ওই পাহাড়মালার গোড়া পর্যন্ত চাইলে যাওয়া যেতে পারে পালকী চেপেও। তবে ষাঁড়, উট ও দেশী ঘোড়াই ব্যবহার করা হয় এজন্য সাধারণতঃ। এই দেশী ঘোড়াগুলি (টাট্টু) এত ছোট যে কোন লোক তার পিঠে বসলে মাটিতে ঠেকে যায় তার পা। তবে, বেশ তেজী এরা, একটানা ২০ কোশ পথ ভাঙার ক্ষমতা ধরে, জল আর খাদ্যের চাহিদাও কম। এ প্রজাতের কোন কোন ঘোড়ার মূল্য ২০০ একু পযন্তথ' আর, পাহাড়ী পথে চলার বেলা এরা ছাড়া কাজে আসেনা আর কোন বাহন-ই। কেননা, এ পাহাড়ী পথে চলার বেলা পার হতে হয় অসংখ্য গিরি-পথ এবং তা রীতিমতো সরু। এমন কি, তেজী কষ্টসহিষ্ণু এবং ছোট-খাট হওয়া সত্ত্বে এ ঘোড়াগুলিকেও রীতিমতো বেগ পেতে হয় ওই সব গিরিসংকট পার হতে। ফলে, নিতে হয় এসব আকাশ ছোঁয়া পাহাড় ডিঙোবার জন্য অনেক সময় ভিন্ন কৌশলের আশ্রয়। একটু পরেই বলছি তার কথা।

গোরখপুরের পাঁচ কি ছ কোশ পর থেকে শুরু হয়েছে নেপাল রাজ্য এলাকা। এরপর, ভুটানের আগ্র পর্যন্ত পুরো পথই এই নেপালের মধ্য দিয়ে। এখানকার রাজা মুঘলসদনা করদ, কর হিসাবে যোগান প্রতিবছর হাতি। নেপাল শহরে তার রাজপুরী। রাজধানীর নামানুসারে দেশেরও নাম তাই। ব্যবসা বাণিজ্য এবং মুদ্রা দুই-ই সে-দেশে নেহাৎ নামমাত্র। কেননা, পাহাড় আর অরণ্যে-ই দেশটি ভরা।

নগরকোট নামের ওই উঁচু পাহাড়মালার গোড়ায় পৌঁছুবার পর শুরু হয় ওই পাহাড় ডিঙোবার পালা। এই পাহাড় পথ অতি উঁচু ও সংকীর্ণ বলে পার হতে সময় নেয় ন থেকে দশ দিন। বণিক যাত্রীদলের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আশেপাশের নানা অঞ্চল থেকে হাজির হয় এসময়ে এখানে প্রচুর লোক। বেশির ভাগই এদের যুবতী ও বয়স্কা নারী। যাত্রীদের সঙ্গে দর কষাকষির পর রফা হলে বয়ে নিয়ে চলে যা কিছু সামগ্রী, এমনকি যাত্রীদেরও, পাহাড়ের অপর কিনারে। কাঁধে আঁটা ফিতে দিয়ে এদের পিঠে বাঁধা থাকে একটি ক'রে বড় চেয়ার। যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেটিতে বসিয়ে। এক একজন যাত্রীকে এভাবে নিয়ে চলার জন্য দরকার হয় তিনজন ক'রে স্ত্রীলোক। পালা ক'রে বয়ে

চলে তারা তাকে। পণ্যসামগ্রী তল্পি-তল্পার বেলা চাপানো হয় সেগুলিকে ছাগের পিঠে। এক একটি ছাগ বইতে পারে ১৫০ লিভর পর্যন্ত ওজনের সামগ্রী। যারা ঘোড়া (টাট্টু) সঙ্গে নেন তারা সংকীর্ণ ও দুরূহ গিরিসংকটগুলি পার হবার বেলা বাধ্য হন ঝোলানো দড়িপথের সাহায্যে সেগুলিকে অপর প্রান্তে নিয়ে যেতে। আর এই অসুবিধার জন্যই ঘোড়ার ব্যবহার একরকম নেই বললেই চলে এসব অঞ্চলে। যেসব স্ত্রীলোক যাত্রী বহন করে তারা দশদিনের পুরো যাত্রার জন্য পায় মাত্র দু'টাকা। ছাগ ও ভেড়ারা যেসব সামগ্রী বয়ে নেয় তার জন্য দিতে হয় কিন্তার বা কুইন্ট্যাল (১০০ পাউণ্ড) পিছু দু'টাকা। মালবাহী ঘোড়ার বেলাও তাই।

এ পাহাড়মালা পার হবার পর ভূটান পর্যন্ত যাবার জন্য নেয়া যেতে পারে ষাঁড়, উট, ঘোড়া সব কিছুই। এমনকি পালকীও। দেশটি ভালই, ফলে নানারকম দানা-শস্য, চাল, শাক-সবজি। মদও অঢেল। বাসিন্দারা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই গরমকালে পরে মোটা সুতী বা শণের তৈরী পোশাক, শীতকালে ফেলট বা জমাট পশমের মতো পুরু জাতীয় গরম পোশাক। মাথায় দেয় মেয়ে মর্দ সকলেই ইংরাজদের মতো প্রায় একই রকমের চেহারার টুপি (ইংরাজদের মধ্যে ওই সময়ে চলিত 'Pork Pie' হ্যাটের মতো)। এগুলিকে বলে তারা বউকুইনকন। শোভাবর্ধক হিসাবে লাগানো হয় তাতে শূয়োরের দাঁত ও আমাদের ১৫ সোলের মুদ্রার মতো আকারের গোল বা চৌকো কচ্ছপের খোলের টুকরো। ধনীরা যোগ করে তার সাথে প্রবাল ও হলুদাভ অম্বরের পুঁতি, যা দিয়ে সাধারণতঃ হার বানায় সে দেশের মেয়েরা। মেয়েদের মতো পুরুষেরাও চুড়ি পরে থাকে হাতে। তবে, বাঁ হাতেই শুধু যা এবং কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত। মেয়েরা যে ধরনের চুড়ি পরে সেগুলি খুব সরু সরু, কিন্তু পুরুষদের চুড়িগুলি দু আঙুল চওড়া চওড়া। গলায় একটি রেশমি দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে প্রবাল বা হলুদাভ অম্বরের পুঁতি বা শুয়োরের দাঁত। এছাড়া শরীরের বাঁ দিকে, বক্ষনীর সাথেও ঝোলানো থাকে এরকম অম্বর বা প্রবালের পুঁতি বা শুয়োরের দাঁতের ছড়। গোঁড়া পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু খায় তারা সব রকম প্রাণী মাংসই। ব্যতিক্রম শুধু যা গরুর মাংসের বেলায়ই। তাকে তারা পূজা করে সব মানুষের জননী ও পুষ্টি প্রদায়িনী ধাত্রী হিসাবে। ভূত-প্রেত অপদেবতার অস্তিত্বেও গভীরভাবে বিশ্বাসী তারা। দেখা যায় তাদের কতক

চৈনিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেও। যেমন ধরুন, চীনাদের মতো তাদের অগ্নি পূজা করতে দেখা না গেলেও ভোজ উৎসবে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পোড়ায় তারা চীনাদের মতোই হলুদাভ অম্বর। পাটনায় বড় বাদাম আকারের আকাটা স্বচ্ছ ও সুন্দর-রঙা অম্বর প্রতি সের ৩৫ থেকে ৪০ টাকা দাম দিয়ে খরিদ ক'রে থাকেন ভূটানীরা। এক সের বলতে অম্বর, তিমির অন্ত্রজাত সুরভি, কস্তুরী, প্রবাল, রুবার্ব ও অন্যান্য সুরভি বা ওষধির ক্ষেত্রে আমাদের নয় (ফরাসী) আন্সের সমপরিমাণ. সোবা, দানা শস্য, চাল, চিনি এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী এই সের পরিমাপ ভিত্তিতেই বিক্রি হয়ে থাকে বাঙলায়। তবে, ওই সের আমাদের ১৬ আন্স-অলা লিভরের ৭২ লিভরের সমান। আর, এরূপ ৪০ সেরে এক মণ। (এ তথ্য ত্রুটিপূর্ণ। সুরাটের একমণ যেখানে ৩৪ লিভরের সমান, সেখানে বাঙলার একমণ ছিল সম্ভবতঃ ৭২ লিভরের সমান)। যখন আমি সে-দেশ ত্যাগ করি তখন এক মণ চাল বিক্রি হচ্ছিল সেখানে দু টাকায়।

অম্বর এক এক খণ্ড এক সের বা (ফরাসী) ন আন্স ওজনের হলে রঙ ও সৌন্দর্যের তারতম্য অনুসারে বিক্রি হয়ে থাকে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। প্রবাল, কাটা ও আকাটা, দুই-ই বেচা সম্ভব হয় বেশ ভাল লাভ রেখে। তবে, আকাটা প্রবাল-ই বেশি পছন্দ (ভূটানী ব্যবসায়ীদের)। কেননা, সেক্ষেত্রে সুযোগ হয় দেশীয় রুচি অনুসারে সেগুলিকে পুঁতির আকার দেয়া। এরূপ পুঁতি তৈরীর কারিগররা বলতে গেলে সকলেই প্রায় স্ত্রীলোক। স্ফটিক এবং অকীক পাথর দিয়েও বানানো হয়ে থাকে পুঁতি। পুরুষদের ব্যবহৃত চুড়িগুলি তৈরি হয় কচ্ছপের খোল, শঙ্খ, এবং তার গোল ও চৌকো আকারের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে। কচি-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা মাথায় এবং কানেও পরে এসব দিয়ে তৈরী অলংকার। পাটনা ও ঢাকায় দু হাজারেরও ওপর লোক এইসব ব্যবসায় (শঙ্খকার বা শাঁখারির কাজে) নিযুক্ত। তারা যত যা উৎপাদন করে তার পুরোটাই রপ্তানি হয়ে থাকে ভূটান, আসাম, শ্যাম এবং মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূব দিকে থাকা দেশগুলিতে।

সিমেনসিন বা কীট নাশক ওষধি বীজ এর চাষ হয় না কিন্তু অন্যান্য ফসলের মতো একই পদ্ধতিতে। এ এমন এক প্রজাতের উদ্ভিদ, আপনা থেকে মরে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যাকে রেখে দিতে হয় ক্ষেতেই। এ ফসলের বড় শত্রু

হল ঝড়-বাতাস। পূর্ণতা লাভের আগেই বহু গাছ হেলে ভেঙে নষ্ট হয়ে যায় এর দাপটে। ঘটে এর ফলে এ ফসলের প্রচুর ক্ষতি। এ কারণেই এর দাম এত চড়া। (দক্ষিণপূর্ব) পারস্যের ক্রেমান প্রদেশে জন্মায় এগুলি। তবে ভূটানের মতো অতোটা সরেস প্রজাতের নয় তা। দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে চালান দেয়ার মতো প্রচুরও নয় আবার। কৃমি নাশ ক'রে এ ওষধিটি যে শিশুদের জীবন রক্ষা করে শুধু তা-ই নয়। পারসিকরা, উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা, এমনকি ইংরাজ ও ডাচরা ব্যবহার ক'রে থাকে এটিকে মৌরীর মতো সুগন্ধি মশলা রূপেও।

রুবার্ব হল এক জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়। ছোট আকারে কেটে দশ কি বারোটি টুকরোকে এক একটি আঁটিতে বেঁধে শুকানো হয় তারপরে।

মস্কোভি অঞ্চলের বাসিন্দাদের মতো ভূটানীরা যদি নেউল শিকারে সুদক্ষ হত তাহলে পেতে পারত তারা প্রচুর মূল্যবান ফার। কেননা, রয়েছে সে দেশে অগুণতি নেউল।

সাত থেকে আট হাজারের মতো রক্ষী পুষে থাকেন সব সময়ে ভূটান অধিপতি। অস্ত্র বলতে ধনুক আর তীর ছাড়াও থাকে অধিকাংশের কাছে কুঠার ও ঢাল। কুঠারগুলির পিছনের দিকটি যুদ্ধে ব্যবহৃত গদার মতো সূঁচালো ধরনের। বহুকাল আগেই প্রথম রপ্ত করেছে তারা গলতে বন্দুক, লোহার কামান ও বারুদের ব্যবহার। এদের ব্যবহৃত বারুদ লম্বাটে দানার এবং বেশ শক্তিশালী। আমাকে নির্ভরভাবে জানানো হয়েছে যে সেখানকার অনেক বন্দুকের গায়ে এমন সংখ্যা ও অক্ষরে লেখা খোদাই দেখা যায় যা ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া নিয়ে যেতে দেয়া হয় না কোন বন্দুক কি কামান রাজ্যের বাইরে। আবার সঠিক মতো ফিরিয়ে আনা হবে এ সম্পর্কে কোন নিকট আত্মীয় জামীনদার না দাঁড়ালে সাহসও পায় না কেউ কোন বন্দুক রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে। এই বাধা না থাকলে সেখানকার একটি বন্দুক আমি নিয়ে আসতাম ঠিক। যারা পুরনো অক্ষর পড়তে জানেন তারা ওই বন্দুকটির গায়ে থাকা লেখা পড়ে আমায় জোরের সঙ্গে জানালেন যে সেটি ১৮০ বছর আগেকার তৈরি। বন্দুকটি বেশ ভারি, নলের মুখটি তার টিউলিপ ফুলের আকারের, আর নলের ভেতরটি ঠিক আয়নার মতোই ঝকমকে মসৃণ। গায়ে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খোদাই পদ্ধতিতে রূপায়িত পটি।

দুটি পটির মাঝের ফাঁকে সোনা ও রুপার প্রলেপ দেয়া. ফুলের কারুকাজ। এর গুলিগুলো এক (ফরাসী) আন্স ওজনের। যে ভূটানী সওদাগরটি এটির মালিক তিনি এটি হাতছাড়া না করার ব্যাপারে এমন অনড় মনোভাব দেখালেন যে মোটা অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও রাজী করানো গেল না তাকে। এমন কি, আদায় করা গেল না বারুদের কিছুটা নমুনা পর্যন্ত। তবে, প্রায় ওই একই ধাঁচের অন্য দুটি বন্দুক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছি আমি ফ্রান্সে। এর একটি সিংহল দ্বীপে তৈরি, অন্যটি বাঙলায়। (এ দুটি 'শেরবাচ্চা' নামে বহু সময়ে অভিহিত ঘণ্টা-মুখাকৃতির ব্লাণ্ডার বাস গোত্রীয় পলতে বন্দুক)।

ভূটান অধিপতির বাস পুরীটিকে প্রহরা দিয়ে চলেছে সবসময়ে পঞ্চাশটি হাতি, পঁচিশটি উঠ। পিঠে জিনের ওপর বসানো ছোট আকারের একটি ক'রে কামান। এতে ব্যবহৃত গোলাগুলি আধ পাউণ্ড ওজনের।

ভূটানের অধিপতিকে তার প্রজারা যেরূপ ভয় ও ভক্তি ক'রে থাকেন পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় তুলনা মেলা ভার। এমনকি, তারা তাকে পূজা করে পর্যন্ত। যখন তিনি বিচার সভায় কিংবা দরবারে আসীন থাকেন তখন আগত প্রত্যেকে দূর থেকে দু হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানায় তাকে। সিংহাসনের কাছাকাছি হতেই ভুঁয়ে লুটিয়ে জানায় তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। ভয়ে সাহস করে না কেউ মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। ওই রকম অবনত ভঙ্গিতে জানায় তাকে তারা আপন আকুতি, অভিযোগ। বিদায় নেয়ার বেলা নেয় তারা তা রাজার দিকে মুখ ক'রে পিছু পায়ে হেঁটে হেঁটে। ব্রাহ্মণদের অহরহ প্রচার এইসব সরল বেচারাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে রাজা হলেন পৃথিবীতে নরদেহধারী দেবতা। বিশেষ ক'রে যে সব রাজার জন্মস্থলী উত্তরের কোন দেশ।

ভূটানের অধিবাসীদের দেহ সবল ও সুগঠিত। তবে, নাক মুখ কিছুটা চ্যাপটা ধরনের। মেয়েরা নাকি, পুরুষদের চেয়ে বেশি লম্বা, বেশি সজীব ও কর্মোৎসাহী। কিন্তু গলগণ্ড রোগের প্রকোপ আবার পুরুষের তুলনায় তাদের মধ্যেই প্রবল, তা থেকে রেহাই পায় খুব কম মেয়েই। যুদ্ধ সম্পর্কে নেই তাদের কোন অভিজ্ঞতাই। তবে, ভয় তাদের একমাত্র যা মুঘল সম্রাটকে নিয়েই। কিন্তু আগেই জানিয়েছি, এ রাজ্যটির দক্ষিণ সীমানা মুঘল সাম্রাজ্যের লাগোয়া হলেও পুরো রাজ্যটি উঁচু পার্বত্য এলাকায়, যেতে হয় অতি সংকীর্ণ সব গিরিপথ

অতিক্রম ক'রে। আর, রাজ্যের উত্তর দিকটি বসতিশূন্য বনাঞ্চল এবং তাও আবার প্রায় চির তুষারাবৃত। পূব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ঊষর এলাকা, মেলেনা তিতো বিস্বাদ জল ছাড়া অন্য কোন কিছুই আর। বসতি অঞ্চল বলতে যতটুকু যা রয়েছে তাও স্থানীয় রাজাদের শাসিত, শক্তিও তাদের নামমাত্র।

একটি রূপার খনি আছে ভূটানে। তার রূপা দিয়েই রূপিয়ার সমতুল মূল্যের মুদ্রা তৈরি করেন রাজা। এ মুদ্রা গোল নয়, আটকোণা চেহারার। ওই মুদ্রায় ব্যবহৃত অক্ষর না ভারতীয়, না চৈনিক। ভূটানের যে ব্যবসায়ীরা পাটনায় এসব বিবরণ আমায় শোনালেন তারা কিন্তু বলতে পারলেন না ওই রূপার খনিটি সে রাজ্যের কোথায়। সোনা অল্পস্বল্প যা সেখানে মেলে তা বয়ে আনে সেখানে পূবের দেশগুলির সওদাগরেরা।

পনের ।। ত্রিপুরা রাজ্য

এই মুহূর্ত পযন্তও অনেকের ধারণা পেগু রাজ্যটি চীনকে পরিবেষ্টন ক'রে বিরাজমান। আমি নিজেও কিন্তু তা-ই ভেবে এসেছি এত কাল। কিন্তু আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগত তিনজন সওদাগর। বিশেষ সম্মান সমাদর পাবার লোভ নিয়ে তারা এদেশে আসার বেলা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন সারাপথ ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু আসলে ছিলেন তারা বণিক, এসেছিলেন ব্যবসায়িক কেনাকাটার জন্যই পাটনা এবং ঢাকায়। সেখানেই তাদের সাথে দেখা ও পরিচয় হয় আমার। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রবাল, হলুদ স্ফটিক, কচ্ছপের খোল, শঙ্খের আভরণ ও বাঙলার এই শহর দুটিতে তৈরি অন্যান্য খেলনা সামগ্রী। এদের একজনের সাথে পরিচয় হল আমার ঢাকায়, অপর দুজনের সঙ্গে পাটনায়। পরিচয়ের পর করলাম তাদের খাবার নিমন্ত্রণ। নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক অথবা তাদের দেশের রীতি-বৈশিষ্ট্যের দরুনই হোক, তারা ছিলেন স্বল্পভাষী লোক। জানা ছিল তাদের একজনের ভারতীয় ভাষাও। কেনাকাটার বেলা দাম হিসাব করছিলেন তারা অকীকের (agate) মতো দেখতে ক্ষুদে ক্ষুদে পাথরের সাহায্যে। পাথরগুলি নখের

আকারের, রয়েছে তার ওপর সংখ্যা খোদাই করা। সঙ্গে এনেছিলেন তারা ওজন করার কাঁটাও। দেখতে তা তুলাদণ্ডের মতোই। এর পাল্লাগুলি লোহার নয়। ব্রাজিল কাঠের (সপন কাঠ) মতোই কোন শক্ত কাঠের। ওজন জানার জন্য যে আংটাটিতে বাটখারা চাপানো হয় সেটি একটি শক্ত রেশমের দড়ির ফাঁস। এর সাহায্যে এক ড্রাম থেকে দশ লিভর পর্যন্ত ওজন করে তারা। পাটনায় যে দুই বণিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ত্রিপুরার সব অধিবাসীই যদি সেই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে এই জাতিটি মদিরার প্রতি নিদারুণভাবে আসক্ত। সারাক্ষণ মদিরা পানের ক্ষেত্রে যে দক্ষতার পবিচয় তারা দিয়েছিলেন যদি ঠিক সে-রকমটি দক্ষতা দেখাতে পারতেন তারা-তাদের দেশ সম্পর্কে তথ্য-বিবরণাদি প্রদান ক্ষেত্রে তাহলে সে দেশ ও জাতি বিষয়ে পারা যেত অনেক খবরই সংগ্রহ করা যেতে। এই বণিকেরা এসেছিলেন এখানে আরাকান রাজ্য হয়ে। ওই রাজ্যটি ত্রিপুবার দক্ষিণ ও পূবদিক ঘিরে। তারা আমায় জানালেন, নিজেদেব দেশটি পার হতে সময় লেগেছে তাদের পনের দিন। কিন্তু এ বর্ণনা থেকে সে দেশের আয়তন সম্পর্কে কোন সু-ধারণায় পৌছন কঠিন। কেননা, প্রতিটি বিরাম পর্ব পরপর সমান দূরবর্তী নয়। কোনটি বেশ কাছে, কোনটি আবার অনেক দূরে। পানীয় জলের লভ্যতার ওপরই নির্ভর করে তা।

পরিবহনের জন্য ভারতের মতো তারাও ব্যবহার ক'রে থাকে ষাঁড় এবং ঘোড়া। যেমনটি আগে আমি বর্ণনা করেছি সেইরকমটি তারা ছোট আকারের হলেও অন্যান্য দিক থেকে বেশ সরেস। রাজা ও বড় বড় অভিজাতরা যাতায়াত করেন পালকীতে চেপে। যুদ্ধের জন্য চলন রয়েছে হাতির ব্যবহার। সেজন্য শিক্ষিত ক'রে তোলা হয় তাদের। ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে গলগণ্ড রোগের ব্যাপকতাও ভূটানের চেয়ে কিছু কম নয়। সেখানে কোন কোন রমণীর বুকেও নাকি হতে দেখা গেছে এ রোগ। ত্রিপুরার যে বণিকটির সঙ্গে ঢাকায় পরিচয় হয়েছিল তার ছিল হাতের মুঠি আকারের দু-দুটি গলগণ্ড। ইওরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মতো সেখানেও এ রোগটি হয়ে থাকে দূষিত জলের দরুন।

বিদেশীদের (ব্যবসায়িক) প্রয়োজনে লাগার মতো কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না ত্রিপুরায়। তবে, রয়েছে একটি সোনার খনি। কিন্তু সে সোনাও অতি

নিম্নমানের। উৎপাদিত হয় রেশমও। তাও অতি মোটা। এ দুটিই হল সেখানকার রাজার রাজস্বের উৎস। করেন না কোনরকম কর আদায় তিনি প্রজাদের কাছ থেকে। তবে, ইওরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয় বিশিষ্ট নাগরিকরা বাদে অন্যান্য নিচু স্তরীয়দের প্রতি বছরে ছ'দিন বেগার খাটতে হয় রাজার কাছে। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন তিনি সোনা খনিতে ও রেশম শিল্পে। এই সোনা ও রেশম বেচার জন্য পাঠান তিনি চীনে। বিনিময়ে মেলে সেখান থেকে রূপা। তাই দিয়েই গড়েন তিনি মুদ্রা। এই রূপার মুদ্রার প্রতিটির মূল্যমান ১০ সোলের সমান। তুর্কী অ্যাসপার-এর মতো তৈরি করা হয় ক্ষুদে সোনার মুদ্রাও। দু রকমের। একটির মূল্যমান $\frac{1}{8}$ একু, অন্যটির $\frac{1}{16}$ একু। এ দেশটি সম্পর্কে যতদূর যা জানতে পেরেছি আমি, সবই শোনালাম আপনাদের। আশা করি, ভবিষ্যতে পাব আমরা অধুনাকাল পর্যন্ত অজানা এ দেশটি সম্পর্কে আরো বিশদভাবে সব কিছু জানার সুযোগ। ঠিক যেমনটি বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণী থেকে ক্রমশঃ জানতে পেরেছি আমরা অন্যান্য সব দেশ সম্পর্কে। সব কিছু একদিনেই আবিষ্কার করা কি জানা সম্ভব নয় কখনো।

ষোল ॥ আসাম রাজ্য

আসাম রাজ্যটি সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছুই জানা যায়নি এর আগে কখনো। মহাকুশলী সেনানায়ক মীর জুমলা সব কজন ভাইয়ের প্রাণ ও পুত্রের বন্দীদশার বিনিময়ে ঔরঙজেবকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বানাবার পরেও কিছুকাল ছিল সকলে সেই অজানার মধ্যেই। মীর জুমলার মনে ইতিমধ্যে ভাবনা দেখা দিল এ (গৃহ) যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টলে যাবে হয়তো তার আসন। ঔরঙজেবের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে থাকার দরুন, দরবারে তার বহু সমর্থক থাকার দৌলতে যে অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ ক'রে এসেছেন এতকাল, লাভ ক'রে এসেছেন যে উচ্চ সম্মান ও সমাদর—অব্যাহত থাকবে না তা আর হয়ত। তাই, আপন উচ্চ আসন,

সেনাবাহিনীর ওপর আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আসাম রাজ্য জয়ের জন্য অভিযান করার। তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন এরূপ অভিযান করলে বিরাট কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে না সেখানে। কেননা, বিগত পাচ-ছশো বছরের মধ্যে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি সে দেশকে, সুতরাং যুদ্ধে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ হয়ে পড়েছে সে-দেশের অধিবাসীরা। এরূপ এক বিশ্বাস চলিত রয়েছে যে প্রাচীন কালে এরাই প্রথম আবিষ্কার করে বারুদ, তৈরি করে বন্দুক। এবং আসাম রাজ্য থেকেই তার কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করে পেগু এবং পেগু থেকে চীন। এর দরুনই এর আবিষ্কার গৌরব সাধারণতঃ আরোপ করা হয়ে থাকে চীনাদের ওপর। এই যুদ্ধ অভিযান থেকে ফেরার বেলা সে-দেশে তৈরি অসংখ্য লোহার বন্দুক ও বারুদ নিয়ে আসেন মীর জুমলা। ওই বারুদ অতি সরেস মানের। তার দানা ভূটানে তৈরি বারুদ দানার মতো লম্বাটে নয়, ঠিক আমাদের মতোই গোলাকার ও ক্ষুদে ক্ষুদে। এবং অন্যান্য বারুদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যক্ষম।

যাই হোক, পরিকল্পনা-অনুযায়ী আসাম রাজ্য বিজয়ের জন্য শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন মীর জুমলা ঢাকা থেকে (নভেম্বর ১, ১৬৬১)। ঢাকা শহর থেকে পাচ কোশ এগিয়ে গেলে দেখা মিলবে গঙ্গা-নদীর সাথে অপর এক নদীর একটি শাখার সঙ্গম স্থলের (করতোয়া নদী)। এ নদীটি জন্ম নিয়েছে চিয়ামে হ্রদ থেকে (চিয়ামে হ্রদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণই এক কপোল-কল্পনা, অতীতকালের বহু পর্যটকই বিশ্বাস করেছেন এই আখ্যায়িকায়)। তারপর বয়ে এসেছে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রীতি-প্রথা মতো বিভিন্ন নামে বিশেষিত হতে হতে। দুটি নদীর এই সঙ্গমস্থানের দুদিকে রয়েছে দুটি দুর্গ। প্রত্যেকটিই উন্নত ধরনের কামান দ্বারা সুরক্ষিত। এ কামানের দ্বারা গোলা দাগা চলে নদীর জলরেখার বুক ছুঁয়ে। এখান থেকেই সেনাবাহিনী নিয়ে নৌকায় চাপলেন মীর জুমলা। নদীর ওপর-প্রবাহ ধরে উপস্থিত হলেন আসাম সীমান্তে, ২৯ কি ৩০ ডিগ্রীতে। স্থলপথ ধরে এগিয়ে গেলেন তারপর সে-দেশের ভেতর অঞ্চলে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীই পর্যাপ্ত ভাবে বর্তমান সেখানে। তবে প্রতিরোধের সাজ-সরঞ্জাম অতি সীমিত। অবশ্য এই অতর্কিত অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তারা। সে-দেশের সকলেই বিগ্রহ পূজক। অপর দিকে অভিযানকারী

সেনাবাহিনীর সকলেই মুসলমান। তাই, তাদের একটি মন্দিরও অটুট রাখল না তারা। যেটিই সামনে পড়ল হানা দিয়ে ভেঙে, লুটপাট ক'রে, আগুন জালিয়ে মিশিয়ে দিলে ধুলোয়। এগিয়ে গেল এভাবে তারা ৩৫ ডিগ্রী অবধি। (মুঘল বাহিনী গডগাঁও থেকে আরো ভেতর দিকে এগিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। সেখানে পৌছন তারা ১৬৬২-র ১৭ই মার্চ। এগিয়েছিলেন খুব বেশি হলে তারা ২৮ ডিগ্রী অক্ষাংশের কাছাকাছি)।

মীর জুমলা এ সময়ে খবর পেলেন, আসাম অধিপতি আস্থান নিয়ে অপেক্ষা ক'রে চলেছেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। সঙ্গে তার অপ্রত্যাশিত সংখ্যার বিরাট সেনাদল। রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রচুর বন্দুক। এছাড়াও, অনেকটা আমাদের গ্রেনেড ধরনের বিপুল পরিমাণ আতসবাজী। এগুলি, যেমনটি আগেই আমি জানিয়েছি, বাঁধা থাকে ছোট হাতবর্শা আকারের এক একটি লাঠির গোড়ায়। আগুন ধরালে সেটিকে নিয়ে উড়ে যেতে পারে ৫০০ পায়েরও বেশি। গুপ্তচর মুখে এ-সব খবর পাওয়ার পর আর এগোন বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন না মীর জুমলা। তবে, এই ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রধান কারণ কিন্তু অন্য। নেমে গেছে শীত। এ দেশ জয় করতে হলে এগিয়ে যাওয়া দরকার ৪৫ ডিগ্রী পর্যন্ত। ফলে, হিমের দরুন বিপুল ক্ষয় ঘটতে পারে সেনাবাহিনীর। ভারতীয়রা অতিমাত্রায় হিম-কাতর। প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে তাদের পক্ষে ৩০ কি ৩৫ ডিগ্রীর বেশি এগোন অসম্ভব। যে-সব ভারতীয় কর্মচারীদের আমি সঙ্গে ক'রে পারস্যে নিয়ে এসেছি, এসেছে তারা বড় জোর কজভীন পর্যন্ত। এটাই তাদের পক্ষে বিরাট কৃতিত্বের। কাউকেই তাবরিজ পর্যন্ত নিয়ে আসতে সফল হইনি কখনো। যেই মিডিয়ার তুষার ঢাকা পাহাড়-চূড়া দৃষ্টি সীমানায় এসেছে অমনি গুটিয়ে গেছে তারা, বাধ্য হয়েছি তাদের ফিরে যাবার অনুমতি দিতে।

উত্তর দিকে আর এগোন অসম্ভব হয়ে পড়ার দরুন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাঁক নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মীর জুমলা। সেই মত্তে এগিয়ে অবরোধ করলেন অজু (কোচ হাজো, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁ কূলে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজ্য)। সফল হলেন অল্পকাল মধ্যেই সেটিকে অধিকার ক'রে নিতে। পেলেন সেখানে বিপুল ধন-সম্পদ। অনেকে বলে থাকেন তার এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল আসলে এটিই। এই শহরটিকে দখলে এনে লুটপাট ক'রে তার

ধন-সম্পদ হাতিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা। আর, প্রকৃতপক্ষে করে-ছিলেন ঠিক তা-ই তিনি।

* মহম্মদ কাজিম জানিয়ে গেছেন যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির ঘেরের মধ্যে পড়ে সেনাবাহিনী ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেখে মীরজুমলা এক রফানামায় এলেন আসামবাসীদের সঙ্গে (১৭ই জানুয়ারী ১৬৬৩)। দুটি জেলা মুঘল সম্রাটকে অর্পণ করা ছাড়াও দিতে রাজী হল তারা ২০ হাজার তোলা সোনা, নগদ ১,২৮,০০,০ রূপিয়া এবং ১২০টি হাতি। সম্মত হত এছাড়াও বিজয়ীর সাথে তাদের রাজনন্দিনীর বিবাহ দিতে। তিনি তখন লখুগড ও কজলী হয়ে ফিরে এলেন বাঙালায়। ১৬৬৩ অব্দের '৮ই এপ্রিল পৌছলেন এসে খিজিরপুরে। সেখানে কিছু দিন ক্ষয় রোগে ভুগে বিদায় নিলেন প্রকৃতির এই অঙ্গন থেকে।

এই অজু শহরটিতেই রয়েছে আসাম রাজবংশের প্রত্যেক রাজা ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সমাধি সৌধ। আসামীরা পৌত্তলিক হলেও দাহ করেন না তাদের মৃতদেহ, ক'রে থাকেন তা সমাধিস্থ। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর যাবেন তারা অপর এক লোকে। এই পৃথিবীতে যারা সৎভাবে জীবন যাপন করে তাদের কোন কিছুরই অভাব হয় না সে-লোকে। কিন্তু যারা অসৎ জীবন যাপন করে, অন্যের ধনসম্পদ ঠকিয়ে নেয়, ভোগ করতে হয় তাদের সেখানে অশেষ দুর্গতি। বিশেষ ক'রে সইতে হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জালা। যাতে সে-দুর্গতি ভোগ করতে না হয় তাই দূরদর্শীর মতো মৃতদেহের সাথে দিয়ে দেয় তারা কতক প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পরলোকে বিপদের সময় তাদের প্রয়োজনে আসবে এই আশায় আর কি! তাই, বহু শতাব্দী ধরে সেখানকার প্রত্যেক রাজাই ওই শহরের প্রসিদ্ধ মন্দিরটির পরিসর মধ্যে ভজনালয় ধরনের এক একটি সমাধি-গৃহ রচনা ক'রে গেছেন আপন মরদেহ সেখানে চিরশয়ান রাখার জন্য। আর, আপন আপন জীবন কাল মধ্যেই জমা ক'রে গেছেন প্রত্যেকে সেখানে যতটা পেরেছেন সোনা, রূপা, কার্পেট, ও অন্যান্য সামগ্রী। এছাড়া প্রত্যেক রাজার মরদেহ সমাহিত করার বেলা দিয়ে দেয়া হয় তার সাথে পরলোকে প্রয়োজনে লাগার মতো যা কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী, তার ব্যবহৃত যত কিছু মূল্যবান সম্পদ। এমনকি তিনি যে সোনা বা রূপার দেব-বিগ্রহের অর্চনা করতেন তাকেও। ফলে, সেই সমাধি গৃহগুলিতে হানা দিয়ে

পেয়ে গেলেন অকল্পনীয় ধন-সম্পদ মীর জুমলা। (মহম্মদ কাজিমের মতে, মীর জুমলার সেনারা পেয়েছিলেন ওই সমাধিগুলিতে হানা দিয়ে ৯০ হাজার রুপিয়া মূল্যের সোনা-রুপা। অহম রাজাদের সমাধি-রীতি সম্পর্কে **E. T. Dalton-এর Descriptive Ethnology of Bengal, p. 9** দেখুন।)

সব থেকে হতবাক কাণ্ড, রাজা মারা যাবার সাথে সাথে তার কতক অতি প্রিয় পত্নীকে এবং রাজপ্রাসাদের কতক প্রধান কর্মচারীকে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ খাইয়ে হত্যা ক'রে সমাহিত করা হত তারই সাথে। উদ্দেশ্য, যাতে তারা পরলোকেও সঙ্গ দিতে পারে, সেবা করতে পারে তার। এ রীতিমতো বর্বরোচিত নক্কার এক প্রথা। সমাধিস্থ করা হয় ওই সঙ্গে তার সাথে একটি হাতি, বারোটি উট, ছটি ঘোড়া, এবং বেশ কিছু শিকারী কুকুরও। পরলোকে এরাও যাতে রাজার সেবা করতে পারে সেজন্যই আর কি! (মহম্মদ কাজিম একই ধরনের বিবরণ দিলেও নেই সেখানে উটের কথা। বরঞ্চ আসামে উট অজানা প্রাণী বলেই উল্লেখ ক'রে গেছেন তিনি।)

আসাম রাজ্যটি এসিয়ার সেরা দেশগুলির একটি। জীবন ধারণের জন্য যত যা কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন, উৎপাদিত হয় তার সব কিছুই সেখানে। প্রয়োজন হয় না তার কোন কিছুর জন্যই কোন পড়শী দেশের দ্বারস্থ হবার। রয়েছে সোনা, রুপা, ইস্পাত, সীসা এবং লোহার আকর। উৎপন্ন হয় প্রচুর রেশমও। তবে মোটা ধরনের। এক ধরনের রেশম আছে যার চাষ করা হয় সেখানে গাছে। আমাদের রেশম কীট গোত্রের এক ধরনের পোকা-ই উৎপাদন করে তা। সেগুলি দিয়ে তৈরি বস্ত্রাদি দেখতে অতি চমৎকার। তবে টেকসই নয় একেবারেই, ছিঁড়ে ফেটে যায় বড্ড তাড়াতাড়ি। এইসব রেশমের চাষ হয়ে থাকে রাজ্যটির দক্ষিণাঞ্চলে। সোনা ও রুপার আকরগুলিও সেখানে। উৎপন্ন হয় ঐ-দেশে প্রচুর পরিমাণে চাঁচ-গালাও। দুই প্রজাতের। যেগুলি গাছে জমা হয় তা লাল রঙের। এদিয়ে তারা বস্ত্রাদি ও পোশাক আশাক রাঙায়। লাল রঙ নিষ্কাশন ক'রে নেয়ার পর যে লাক্ষা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে রঙ করা হয় আসবাব ও ওই ধরনের অন্যান্য সামগ্রী, বানানো হয় স্প্যানিশ ওয়াক্স বা সীল মোহর করার গালা। এর এক বিরাট অংশ রপ্তানি হয়ে থাকে চীন ও জাপানে। সেখানে ব্যবহৃত হয় তা আসবাব শিল্পে। এ ধরনের কাজের জন্য এই লাক্ষাই হল সারা এশিয়ার মধ্যে সেরা জাতের। সোনার ক্ষেত্রে নেই তা কারো

রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি। বানানো হয় না তা দিয়ে মুদ্রাও। সঞ্চয় করা হয় ছোট ও বড় বাটের আকারে। স্থানীয় কেনা কাটা, ব্যবসা বাণিজ্যেও ব্যবহৃত হয় এসব বাট, কিন্তু করা হয় না বাইরে রপ্তানি। রূপার বেলা তা দিয়ে বানিয়ে থাকেন রাজা মুদ্রা। আয়তন ও ওজনের দিক থেকে তা মুঘল রুপিয়ারই সমান, আটকোণা আকারের। রাজ্যের বাইরে নেয়া যেতে পারে তা। আগেই বলেছি জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই প্রাচুর্য রয়েছে সেখানে। তৎসত্ত্বেও খাদ্য হিসাবে সব চেয়ে বেশি কদর কিন্তু কুকুরের মাংসের। ভোজে-উৎসবে এটিই হল সব থেকে আকর্ষণীয় পদ। রাজ্যের প্রত্যেকটি শহরে এজন্য বিশেষ হাট বসে প্রতি মাসে, বেচা হয় সেখানে শুধু কুকুর। আনা হয় তা সব প্রান্ত থেকেই। রয়েছে সেদেশে আঙুরেরও চাষ, ফলন হয় ভাল জাতের আঙুরের, কিন্তু বানানো হয় না তা দিয়ে মদ। শুকিয়ে ব্যবহার করা হয় তা স্পিরিট চোলাইয়ের কাজে। নুন একেবারেই নেই। তাই দুটি উপায়ে তৈয়ের করা হয় তা। প্রথমতঃ বদ্ধ জলে যে-সব উদ্ভিদ জন্মায়, হাঁস ও ব্যাঙেরা যা খায়, তা থেকে। এগুলিকে শুকিয়ে পোড়ান হয় প্রথমে। তারপর সেই ছাই জলে গুলে ফুটিয়ে ও নিচে বলা পদ্ধতিতে পরিস্রুত ক'রে ব্যবহার করা হয় নুন হিসাবে। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই বলতে গেলে ঘরে ঘরে চালু। এক্ষেত্রে কলাগাছের বড় বড় পাতা সংগ্রহ ক'রে তাকে শুকিয়ে পোড়ান হয় প্রথমে। কিন্তু এই ছাই থেকে যে নুন মেলে তা এত কটু, যে তার তীব্রতা দূর না ক'রে নিলে খাওয়া যায় না মোটেই। তা দূর করার জন্য নেয় তারা এই কৌশল। ওই ছাইকে জলে গুলে দশ কি বারো ঘন্টা ঘুটে চলে তাকে। তারপর তা বার তিনেক ছাঁকে ও জাল দেয় উনুনে। জল ফুটে বাষ্প হয়ে উবে গেলে, তলানি হিসাবে থেকে যায় শুধু নুন। এই নুন যেমন পরিষ্কার সাদা, তেমনি স্বাদও তার ভাল।

এই কলাপাতার ছাই দিয়ে এদেশে তৈয়ের করা হয় লাই বা রেশম ধোয়ার জন্য উগ্র ক্ষারীয় মিশ্রণ। সেই জলে রেশমকে সেদ্ধ করা হলে হয়ে যায় তা তুষারের মতোই ধবধবে সাদা। সে দেশে যে পরিমাণ কলাগাছ আছে তার চেয়ে বেশি থাকলে আসামীরা তাদের সব রেশমই ধুইয়ে সাদা ক'রে নিত এভাবে। কেননা, সাদা রেশমের দাম ও কদর দুই-ই অনেক বেশি। কিন্তু কলাগাছের ঘাটতির দরুন সম্ভব হয় না, সারা দেশে উৎপন্ন রেশমের অর্ধেকের বেশি ধোয়ানো।

আসামের রাজা যে শহরে বাস করেন নাম তার কেম্মেরৌফ (কামরূপ)। পুরনো রাজধানী থেকে এ শহরটি ২৫ থেকে ৩০ দিনের পথ দূরে। রাজ্যটির নামও শহরটির সাথে অভিন্ন। (বর্তমানে কামরূপ একটি জেলার নাম, গৌহাটি এর প্রধান শহর। মীর জুমলা যে অহম সেনাবাহিনীর নিকট এই কামরূপেই পরাজিত হন কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু কামরূপ ছিল তখন অহম শাসনকর্তার আবাস। রাজার রাজধানী ছিল শিবসাগর জেলার নাজির বা গড়গাঁও। যদুনাথ সরকার দেখুন।)

রাজা কোনরকম কর আদায় করেন না তার প্রজাদের কাছ থেকে। তবে রাজ্যের সোনা রূপা সীসা ইস্পাত ও লোহার আকরগুলি সবই তার। প্রজা পীড়ন এড়ানোর জন্য খনিগুলির কাজ চালানো হয় কেনা দাসদের দিয়ে। এই সব দাসদের কেনেন তিনি পড়শী রাজ্যগুলি থেকে।

বিশদ বিষয়সূচী